নন্দিত জাতি নিন্দিত গন্তব্যে

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

নন্দিত জাতি নিন্দিত গন্তব্যে

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক
গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১১২৭৬৪৭৯

নন্দিত জাতি নিন্দিত গন্তব্যে

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক : **আলহাজ্ব শামীম সাঈদী**
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১১২৭৬৪৭৯
অনুলেখক : আব্দুস সালাম মিতুল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০১৪

কম্পিউটার কম্পোজ :
নাবিল কম্পিউটার
৫৩/২ (৩য় তলা), সোনালীবাগ
বড় মগবাজার ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ : মাসউদ সাঈদী
মুদ্রণ : আল আকাবা প্রিন্টার্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় : ৩৫০ টাকা মাত্র।

Nandita Jati Nindita Gontobe by Maulana Delawar Hossain Sayedee, Co-operated by Alhaj Shamim Sayedee, Managing director of Global Publishing Network, Copyist : Abdus Salam Mitul. Published by Global publishing network, Banglabazar, Dhaka-1100, 1st Edition February 2014. Price 350 taka only in bd. 20 Doller in USA. 15 Pound in UK.

উৎসর্গ

আমার কলিজার টুকরা জ্যোষ্ঠ পুত্র মুফাস্‌সীরে কুরআন **মাওলানা রাফীক বিন সাঈদীর** রুহের মাগফিরাত কামনায়, হে মহান আল্লাহ! তুমি আমার নয়নের মণি প্রিয় সন্তানকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান বানিয়ে নিয়ো।

সাঈদী

মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে যা বলতে চেয়েছি

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিনি সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করে সম্মানিত করেছেন। দরুদ ও সালাম মানবকুলের শ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি যাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ 'ইসলাম' নামক এক অভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থা দান করে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'সরল সহজ পথ প্রদর্শন আল্লাহরই দায়িত্ব, যেখানে রয়েছে কিছু বাঁকা পথ'-সূরা আন্ নাহ্লঃ ৯। সূরা আত্ ত্বীনের ৪-৫ আয়াতে বলেছেন, 'অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি, তারপর (তার অকৃতজ্ঞতার কারণেই) আমি তাকে সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করবো'।

মানুষ সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে উদ্দেশ্য বিহীন পথে ছেড়ে দেননি, তাদের সুনির্দিষ্ট একটি পথে চলার জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের দায়িত্বই ছিলো মানব গোষ্ঠীকে আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্বের প্রতি আহ্বান জানানো এবং আল্লাহর দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন। যেহেতু ইসলাম গতানুগতিক কোনো ধর্মের নাম নয়, এতে রয়েছে জীবন পরিচালনার সকল নীতিমালা। যতদিন মুসলিম উম্মাহ্ পবিত্র কোরআন উপস্থাপিত নীতিমালাসমূহকে একমাত্র আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করেছে ততদিন পর্যন্ত তাঁরাই ছিলো বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে আসীন এবং নন্দিত জাতি। যতদিন ইসলাম প্রদর্শিত পথে তাঁরা ব্যক্তি থেকে শুরু করে পারিবারিক নীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, নারীনীতি, শ্রমনীতি, সভ্যতা- সাংস্কৃতিক নীতিমালাসমূহ পরিচালনা করেছে, ততদিন তাদের মধ্যে ছিলো না হিংসা-বিদ্বেষ, বিভেদ, স্বার্থপরতা, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ইত্যাদি। বরং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও পরোপকারিতার মাধ্যমে রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলো মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্ণালী অধ্যায়ের।

সম্মান মর্যাদার সুউচ্চ সোপান থেকে নন্দিত এ জাতির পতন ঘটলো তখনই কোরআন প্রদর্শিত সহজ সরল পথ বর্জন করে তাঁরা যখন মানব রচিত বাঁকা পথ অবলম্বন করে নিন্দিত পথের যাত্রী হলো। নন্দিত এ জাতি যাত্রী ছিলো পবিত্র মক্কা-মদীনার, কিন্তু এরা আরোহী হলো দিল্লী, পিকিং, মস্কো ও ওয়াশিংটনের গাড়ীর। এ জাতির হতভাগ্য নেতৃবৃন্দ ইসলাম সম্পর্কে অবলীলাক্রমে বলা শুরু করলো, 'সাম্প্রদায়িক, পশ্চাৎপদ, সেকেলে, মৌলবাদ ও মধ্যযুগীয় এবং এসব কারণে আধুনিক ডিজিটাল যুগে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম চলতে পারে না। ইসলাম থাকবে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও মাযারে। এর বাইরে ইসলামের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ'। মুসলিম নামধারী অর্বাচীন নেতৃবৃন্দ ইসলামের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে কাফির, মুশরিক, নাস্তিক মুরতাদদের আবিষ্কৃত ইসলাম বিদ্বেষী ঘৃণিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, সমাজতন্ত্র, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র, সাম্যবাদ ও সঙ্কীর্ণ জাতিয়তাবাদকে আঁক্ড়ে ধরলো। পরিণতিতে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নন্দিত জাতি ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হলো।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় হ্যামিলনের সেই বংশী বাদকের অনুরূপ স্বয়ং ইবলিশ শয়তান ঐসব মানব রচিত মতবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বাঁশী বাজিয়ে চলেছে আর সে বাঁশীর ঐন্দ্রজালিক সুরের মূর্ছনায় উন্মাদের ন্যায় বিবস্ত্র হয়ে ছুটে চলেছে মুসলিম নামধারী জড়বাদ আর বস্তুবাদী চেতনা তাড়িত একশ্রেণীর আত্মমর্যাদাহীন মাসোহারাপ্রাপ্ত সেবকের দল। তারা তাদের মেধা, প্রজ্ঞা, চিন্তা-চেতনা, দূরদর্শিতা, বিদ্যা-বুদ্ধি, বিবেক ও সৃজনশীলতা নিবেদন করেছে ভোগবাদ, বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের পদপাদ্যে। এরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে মানব রচিত মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ইসলামের নাম শুনলে এদের গাত্রদাহ শুরু হয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ মানুষগুলো এদের কাছে জঙ্গী সন্ত্রাসী, প্রাণের দুশমন এবং কোরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যসমূহ এদের কাছে জঙ্গী বই। মুসলিম হিসেবে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁদের স্মরণে রাখা উচিত যে, জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুই মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সূরা আলে ইমরাণের ৮৫ নং আয়াতটি দেখুন, আল্লাহ

তা'য়ালা বলেন, 'জীবন ব্যাবস্থা হিসেবে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করা হবে না, বরং আখিরাতে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে'।

জাতির চালকের আসনে আসীন হয়ে যাঁরা ইসলামের প্রতি অসহিষ্ণু এবং বিদ্বেষ পোষণ করছেন, তাঁদের কাছে আমি বিনয়ের সাথে আবেদন করছি, ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার অর্থই হলো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রোহ করা। ধ্বংসের এ পথ পরিহার করুন, যদি না করেন তাহলে আদালতে আখিরাতে কঠিন মূল্য দিতে হবে এবং জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডই হবে শেষ ঠিকানা। মৃত্যুর পূর্বে তা বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, এটাই অটল বাস্তবতা ও মহাসত্য। আমরা আপনাদের শত্রু নই বরং অধিক কল্যাণকামী। আপনারা ধ্বংসের পথে চলছেন দেখে আপনাদের জন্য আমাদের হৃদয়ে যন্ত্রণা অনুভূত হয়। আপনারা মানব রচিত মতবাদ পরিহার করে ফিরে আসুন মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পথে। আমাদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সবটাই মহান আল্লাহর জন্য। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'বন্ধুত্বও আল্লাহর জন্য আর শত্রুতাও আল্লাহর জন্য'। আপনারা মহান আল্লাহর পথে ফিরে আসুন আমরা আপনাদেরকে বন্ধু হিসেবে বুকে জড়িয়ে ধরবো। আর যদি শয়তানের পথই অনুসরণ করতে থাকেন তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আপনাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা বিরাজ করবে।

একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন তো, আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা তাড়িত হয়ে ক্ষমতায় যাওয়া ও টিকে থাকার জন্য আপনারা কিভাবে মিথ্যাচার করছেন, কত মায়ের বুক শূন্য করছেন, কত সন্তানকে ইয়াতিম বানাচ্ছেন, কত সম্পদ ধ্বংস করছেন, কিভাবে দম্ভ অহঙ্কার প্রদর্শন করছেন, প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার জন্য দিন রাত বৈঠক করে কত পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। এ সকল অপকর্মের জবাব কি মহান আল্লাহর কাছে দিতে হবে না? এসব নিষ্ঠুর কর্মের কি কোনোই অশুভ পরিণতি নেই? আপনারা আমাদের দুনিয়া ধ্বংস করছেন, এ কারণে আপনাদের আখিরাত ধ্বংস হচ্ছে। মহান মালিক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আদালতে আখিরাতের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস থাকলে নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে ধির স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

বিগত কয়েক দশকব্যাপী নন্দিত জাতি মুসলিম মিল্লাতের চরম অধঃপতন দেখে আমার হৃদয়ে যে যন্ত্রণা আর্তনাদ করে ফিরছিলো, আমি সে যন্ত্রণাগুলো ভাষার তুলিতে অঙ্কন করে ছাপার অক্ষরে জাতির সম্মুখে **'নন্দিত জাতি নিন্দিত গন্তব্যে'** শিরোণাম দিয়ে পেশ করলাম। আমার উদ্দেশ্য একটাই, অবহেলিত, নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত মুসলিম মিল্লাতের পথহারা উদ্ভ্রান্তদের একজনও যদি ফিরে আসে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত মহামুক্তির রাজপথে, তাহলে আমি আমার শ্রম স্বার্থক বলে মনে করবো। মহাদুর্যোগ পরিবেষ্টিত অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমি এ গ্রন্থের শেষাংশে পবিত্র কোরআন হাদীস থেকে সাধ্যানুযায়ী দিকনির্দেশনা দিয়েছি। পাঠক-পাঠিকাদের কষ্ট হবে জানি, তবুও আমি সকলকে অনুরোধ করছি, ধৈর্য্য সহকারে এ গ্রন্থের সবটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়ার জন্য। হতে পারে এ গ্রন্থ আপনার দৃষ্টির সম্মুখের পর্দা অপসারিত করবে এবং আপনি ঘৃণিত ও নিন্দিত পথ থেকে সরে এসে নন্দিত পথের সৌভাগ্যবান যাত্রী হবেন।

এ গ্রন্থ রচনায় যেসব প্রাজ্ঞ গবেষক, লেখক ও চিন্তাবিদদের রচিত গ্রন্থ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এবং এ গ্রন্থটি প্রকাশে যিনি যেভাবে যতটুকু সহযোগিতা করেছেন মহান আল্লাহ তাঁদের দুনিয়া আখিরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন।

পরিশেষে নির্যাতিত নিপিড়ীত ও হতাশাগ্রস্থ মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে বিশ্বকবি- কবি সম্রাট ড. আল্লামা ইকবাল (রহঃ) এর একটি কবিতার মাধ্যমে শেষ করছি আমার এ গ্রন্থের ভূমিকা। কবিতাটির বাংলা অনুবাদ–

অশ্রু ফেলোনা হেরিয়া, হে মালী! দৈন্য তোমার মালঞ্চের,
ফুটিবে কুঁড়িরা তারার মতন, নব বসন্ত আসিবে ফের।
সব রিক্ততা অবসান হবে নব পল্লব গৌরবে,
শহিদী রক্তের রং মেখে ফের ফুটিবে গোলাপ সৌরভে।

ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় মহান আল্লাহর করুণা ভিখারী
–সাঈদী–

অনুলেখকের কথা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আলীশানে অগণিত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাদেরকে নবী করীম (সা:) এর উম্মাতের অন্তর্গত করে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অগণিত দরুদ ও সালাম রাসূল (সা:) এর প্রতি, যিনি মানবতার মহান মুক্তিদূত হিসেবে আজীবন সংগ্রাম মুখর জীবন অতিবাহিত করেছেন। মহান মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রাসূল (সা:) এর প্রতি অর্পিত হয়েছিলো, সে দায়িত্ব তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন এবং তাঁর অবর্তমানে সে দায়িত্ব মুসলিম মিল্লাতের ওপর বর্তেছে। নবী করীম (সা:) এর পূর্বেও যাঁরা এ দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদেরকে অসীম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এবং তাঁর বিদায়ের পরে এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কারবালার ময়দান থেকে যে রক্তঝরার সূচনা হয়েছে, বর্তমান সময় পর্যন্ত সে রক্তঝরার গতি অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালাই ভালো জানেন, আর কত দিন পবিত্র কোরআনের সৈনিকদের রক্তে পৃথিবীর মাটি রঞ্জিত হবে।

আমার দৃষ্টিতে আব্বার প্রত্যেকটি গ্রন্থই পথহারা মুসলিম মিল্লাতকে পথপ্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট। তাঁর কাছ থেকে মহান আল্লাহ্ যে সকল পরীক্ষা গ্রহণ করছেন, জানিনা এর শেষ কোথায়। আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বশত: তাঁকে কারাবন্ধ হতে হলো। এ অবস্থায় তিনি মমতাময়ী মা ও কলিজার টুকরা জ্যোষ্ঠ সন্তান মাওলানা রাফীক বিন সাঈদীকে হারালেন- আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাত নসীব করুন। শুধুমাত্র কোরআন প্রচারের অপরাধেই তাঁকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ শুনতে হয়েছে এবং ফাঁসির কুঠুরীতে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন। মহান আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চাইছি, তিনি যেন কোরআন প্রেমিক জনতার মাঝে তাঁকে ফিরিয়ে দেন।

আব্বার অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ প্রকাশে আমরা আন্তরিক, কিন্তু অনুকূল পরিবেশের অভাব। আমরা যারা তাঁর একান্ত কাছের, তাঁকে কারাবন্ধ করার পরে আমরা সকলেই নিরাপত্তাহীন। তাঁর আপনজন হবার অপরাধে (?) কারাগার ও আত্মগোপনই হয়েছে আমাদের নিয়তি। এসব নানাবিধ

কারণে আমার প্রতি আব্বা যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা পালন করতে পারিনি। অর্থাৎ আব্বার অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করতে পারিনি। প্রতিটি গ্রন্থ প্রকাশ হবার পূর্বে শেষবারের মতো আব্বা যে শ্রমদান করেন, এ গ্রন্থটির ক্ষেত্রে তিনি সে শ্রম দিতে পারলেন না। কারাগারের সুউচ্চ দেয়াল ও ফাঁসির সেল তাঁকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখলো। গ্রন্থটি প্রকাশ হবার পূর্বে শেষবারের মতো আব্বা দেখতে পারলে, আরো তথ্য সমৃদ্ধ ও সুন্দর হতো- এটি আমার অভিজ্ঞতা লব্ধ বিশ্বাস। 'নন্দিত জাতি নিন্দিত গন্তব্যে' নামক সুবিশাল এ গ্রন্থের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাই জ্ঞানের আলোক বর্তিকা এবং সত্যানুসন্ধিৎসু লোকদের জন্য সত্যের দিশারী। ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ এ গবেষণাধর্মী গ্রন্থে লেখক নিপুন শিল্পীর ন্যায় প্রকৃত সত্য অঙ্কন করেছেন। ধর্মবিরোধিতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমার বিশ্বাস, এ গ্রন্থটি মুসলিম মিল্লাতকে নন্দিত পথে ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

আব্দুস সালাম মিতুল

E-mail : mitul.global@gmail.com

আলোচিত বিষয়

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

জাতি গঠনে জাহেলী ভিত্তি ও এর উপাদান

মানব সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষ নিজ চিন্তাধারা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর স্বার্থেই বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়েছে। কেউ নিজ বংশের স্বার্থে জাতিয়তা সৃষ্টি করেছে আবার কেউ নিজ গোত্রের স্বার্থে জাতিয়তা গড়েছে। কেউ একই এলাকা বা দেশের অধিবাসী হিসেবে ভৌগলিক জাতিয়তা সৃষ্টি করেছে। আবার অনেকে ভাষাগত ঐক্যের কারণে ভাষাভিত্তিক জাতিয়তা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। কেউ বর্ণকে মূলভিত্তি হিসেবে ধরে তথা বর্ণবাদ ভিত্তিক জাতিয়তা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। অনেকেই শাসন ব্যবস্থার ঐক্য ও অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনের লক্ষ্যে জাতিয়তা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। মানবজাতির অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এমন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক জাতিরই সন্ধান পাওয়া যাবে, যারা নিতান্তই ক্ষুদ্র স্বার্থকে সম্মুখে রেখে জাতিয়তার ভিত্তি রচিত করেছে। আধুনিককালের উন্নত অথবা অনুন্নত প্রায় দেশেই উল্লেখিত কোনো না কোনো উপাদানকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে জাতিয়তা সৃষ্টি করেছে।

বর্ণবাদ ভিত্তিক জাতিয়তা শ্বেতাঙ্গদের মনে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি প্রবল ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মনে শ্বেতাঙ্গদের প্রতি প্রবল আক্রোস সৃষ্টি করে উভয়েরই রক্ত ঝরিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বর্ণভিত্তিক জাতিয়তার কারণেই দেসমণ্ড টুটুর আক্রোসে নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে দীর্ঘ ২৭ বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছে। আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের নির্মম নির্যাতনের ইতিহাস সচেতন ব্যক্তির মাত্রই জানা রয়েছে। ভারতে এখন পর্যন্ত উচ্চ বর্ণের লোকগুলোই রাষ্ট্র ও প্রশাসন যন্ত্র পরিচালিত করছে। নিম্ন বর্ণের লোকদের উচ্চ পদস্থ অফিসার নিয়োগে প্রবল বাধার সৃষ্টি করা হয়।

ভৌগলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতিয়তা আরেক ভূ-খণ্ডের অধিবাসী এবং ভিন্ন ভাষাভাষীদের প্রতি এক ধরনের ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাবের সৃষ্টি করে থাকে। মানুষের মনে আত্মম্ভরীতা, অহঙ্কার এবং শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব জাগিয়ে তা হানাহানি ও রক্তপাতের জন্ম দিয়ে থাকে। ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধই এর বড় প্রমাণ। পশ্চিম পাকিস্তানের একশ্রেণীর লোকদের আত্ম অহঙ্কার, আত্মম্ভরীতা, তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানী

বাংলাভাষীদের চাষাভুষা জ্ঞান করে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করা, পদে পদে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে শোষণ করা এক ভয়াবহ রক্তাক্ত অবস্থার সৃষ্টি করেছিলো। অর্থাৎ এর মূলেও ছিলো ভৌগলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতিয়তা।

শাসন ব্যবস্থার ঐক্য ও অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনের লক্ষ্যে সৃষ্টি হওয়া জাতিয়তা মানুষের মনে প্রবল লোভ, নিষ্ঠুরতা, শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের মতো দস্যু তস্কর বৃত্তির জন্ম দিয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ দেশগুলো দখল, শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদির শিকার হচ্ছে শাসন ব্যবস্থার ঐক্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে সৃষ্টি করা জাতিয়তাবাদে বিশ্বাসীদের দ্বারা। এরা দস্যু তস্করের মতোই বিভিন্ন দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পৃথিবীর প্রায় দেশই এদের দ্বারায় প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যেসব রাজনৈতিক দল বা সামরিক বাহিনী তাদের শোষণে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত তাদেরকেই এরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসিয়ে দিচ্ছে। যারা প্রস্তুত নয় তারা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হলেও রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করছে।

আদর্শই জাতি গঠনের মূলভিত্তি

পৃথিবীর সকল মানুষই মানুষ হিসেবে একটি জাতি এবং এর মধ্যে দু'টি ধারা রয়েছে, এর একটি পুরুষ ও আরেকটি নারী। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের সমন্বয়েই মানবজাতি। মানবজাতির সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান বিজ্ঞানের হিরণময় কিরণে উদ্ভাসিত আধুনিক এ সময়কাল পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তায় নানা জাতিতে বিভক্ত হয়েছে। জাতি গঠনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ধর্মহীন গবেষকগণ জল-বায়ু, পরিবেশ, স্থান, ভৌগলিক অবস্থান, বংশ, গোত্র, অর্থনৈতিক উন্নতি, রাজনৈতিক স্বার্থ এবং ভাষাকেই মূল উপাদান হিসেবে নির্ণয় করেছেন ও জাতির ধর্মীয় পরিচয় ভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানব সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস এ সত্যই সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, প্রত্যেক জাতি গঠনের মূলে সক্রিয় রয়েছে ধর্মীয় আদর্শ এবং ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতেই জাতি গঠিত হয়েছে বা মানুষ স্বতন্ত্র পরিচিতি লাভ করেছে।

নবী করীম (সাঃ) এর যারা অনুসারী তাঁরা নিজেদেরকে 'মুসলিম' হিসেবে পরিচয় দেয়। হযরত মূসা (আঃ) এর অনুসারীগণ 'ইয়াহূদী' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। হযরত ঈসা (আঃ) কে যারা জেসাস ক্রাইষ্ট নাম দিয়েছে, তারা নিজেদেরকে 'ক্রিশ্চিয়ান বা খৃষ্টান' হিসেবে পরিচয় দেয়।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের নামেই নিজেদেরকে জাতিতে 'বৌদ্ধ' হিসেবে পরিচয় দেয়। গুরু নানকের অনুসারীগণ নিজেদেরকে 'শিখ' হিসেবে পরিচয় দেয়। অর্থাৎ কোনো না কোনো একটি ধর্মীয় মত ও পথই মানুষকে এক জাতিতে আবদ্ধ করেছে। জাতি গঠনের মূলে রয়েছে একটি আদর্শ, সেই আদর্শের অনুসারীগণই নিজেদেরকে একটি জাতি হিসেবে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত করেছে।

ইসলাম তার অনুসারী মুসলমানদের সামষ্টিক সত্তাকে বুঝানোর জন্যে 'দল' বা 'হিজব' শব্দ ব্যবহার করেছে। কারণ, ইসলাম মানবগোষ্ঠীকে একতাবদ্ধ করতে গিয়ে দেশ, বর্ণ, ভাষা, রক্ত ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেয়নি। ইসলাম আদর্শ ও নীতিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে মানুষকে একতাবদ্ধ ও সংগঠিত করেছিলো এবং মুসলিম জাতির উন্মেষ ঘটেছিলো অসীম ত্যাগ, দেশত্যাগ তথা হিজরত এবং বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। নানাবিধ কারণে মুসলমানদের জাতি হিসেবে উল্লেখ করা হলেও এরা একটি দল বিশেষ। কারণ জাতির উৎপত্তি ঘটে বংশ, প্রজন্ম ও ধর্মের ভিত্তিতে। আর দল গঠিত হয় আদর্শ ও দলীয় কর্মসূচীর ভিত্তিতে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের জাতি না বলে দল হিসেবেই চিন্তানায়কগণ উল্লেখ করেছেন। কারণ মুসলিমদেরকে সমগ্র পৃথিবীর প্রচলিত আদর্শ, মতবাদ, রীতি, নীতি ও প্রথার বিপরীত প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র একটি নন্দিত আদর্শ ও রীতি নীতির গর্বিত অনুসারী হওয়ার ভিত্তিতে পরস্পরের সাথে একতাবদ্ধ করা হয়েছে। যে সকল মানুষ ইসলামী আদর্শের সাথে সম্পর্কহীন, তারা পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু যেই হোক না কেনো, তাদের সাথে মুসলিমদের দলীয় সম্পর্ক নেই।

সমগ্র পৃথিবীর অগণিত মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও দলের অস্তিত্ব থাকলেও ইসলাম সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মাত্র দুটো দলের অস্তিত্ব স্বীকার করে। এর একটি হলো 'আল্লাহর দল' অর্থাৎ ইসলামের অনুসারীগণ আর অপরটি হলো 'শয়তানের দল' অর্থাৎ যারা মানব রচিত আদর্শের অনুসারী। মানব রচিত আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচীর দিক দিয়ে যতোই বিরোধ ও পার্থক্য থাক না কেনো, ইসলাম এদের সকলকেই একই দলভুক্ত বলে মনে করে। কারণ নীতি, রীতি, নৈতিকতা, গুণ-বৈশিষ্ট্য, চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতিতে এরা শতধা বিভক্ত হলেও এরা কেউই ইসলামী আদর্শের নয়। এদের মধ্যে মতপার্থক্যের ব্যবধান শত যোজন হলেও এরা সকলেই কোনো

না কোনোভাবে মানব রচিত মতবাদের অনুসারী তথা শয়তানের আনুগত্য করার ব্যাপারে এরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে–

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ– أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ–

প্রকৃতপক্ষে শয়তান এদের ওপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছে, শয়তান এদের আল্লাহর স্মরণ সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিয়েছে; এরা হচ্ছে শয়তানের দল; (হে রাসূল) আপনি জেনে রাখুন, শয়তানের দলের ধ্বংস অনিবার্য। (সূরা আল মুজাদিলাহ-১৯)

মুসলিমদেরকে ইসলাম 'আল্লাহর দল' হিসেবে উল্লেখ করেছে। আর এ দলের সদস্যগণ দেশ, জাতি, বংশ, গোত্র, ভাষা, সভ্যতা- সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐতিহ্য ইত্যাদির দিক থেকে একের সাথে অপরের সম্পর্ক না থাকলেও যখনই তারা আল্লাহর বিধান মেনে চলার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছে, তখনই তারা আল্লাহর দলে শামিল হয়েছে। আল্লাহর দলে প্রবেশের সাথে সাথে শয়তানের দলভুক্তদের সাথে তাদের সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও একজন আল্লাহর দলের ও অন্য জন শয়তানের দলের সদস্য হলে ইসলাম তাদের মধ্যে দলীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। এমনকি তাদের মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আদর্শিক ক্ষেত্রে দলগত এ বিভেদ রক্ত সম্পর্ক ও ভৌগলিক জাতিয়তার বন্ধনকেও ছিন্ন করে দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহর দলের সদস্যদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ– أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ– وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا– رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ– أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ–

(হে রাসূল,) আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এমন কোনো সম্প্রদায়কে আপনি কখনো পাবেন না যে, তারা এমন লোকদের ভালোবাসে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি সে (আল্লাহ বিরোধী) লোকেরা তাদের পিতা, ছেলে, ভাই বা নিজেদের জাতি গোত্রের লোকও হয় তবুও নয়, এ আপোসহীন ব্যক্তিরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান এঁকে দিয়েছেন এবং নিজস্ব গায়েবী মদদ দিয়ে তিনি তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন, কিয়ামতের দিন তিনি তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে; আল্লাহ তাদের ওপর প্রসন্ন হবেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হবে; আল্লাহর দলই সফলতা অর্জন করে। (সূরা আল মুজাদিলা-২২)

পবিত্র কোরআনে মুসলিমদেরকে 'মধ্যমপন্থী উম্মাহ্' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে তথা সকল জাতিসমূহের মধ্য থেকে বেছে বেছে এমন কিছু লোককে নির্বাচিত করা হয়েছে, যারা একটি বিশেষ নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করতে, বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে এবং তাদের ওপর বিশেষ দায়িত্ব পালনে যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে সকল সময় প্রস্তুত থাকবে। সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে এরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। অর্থাৎ এরা মানবজাতিকে অকল্যাণ থেকে রক্ষাকারী প্রহরাদার। হাদীসে এ মুসলিমদেরকে একটি জামায়াত বা দল হিসেবে উল্লেখপূর্বক অন্যান্য মানবগোষ্ঠীকে এ দল বহির্ভূত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ দলের নীতি আদর্শকে যারা অনুসরণ করতে ইচ্ছুক, কেবল তারাই এ দলের সদস্য হতে পারবে। কেউ যদি এ দলের নীতি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে সে আর এ দলের প্রতিনিধিও হতে পারে না এবং এ মুসলিম দলের নাম ব্যবহার করে জাগতিক কোনো স্বার্থ উদ্ধারে তার কোনো অধিকারও থাকে না।

ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে, মুসলিম নামক এই দলের সদস্যদের মধ্য থেকেই পরস্পরে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য। আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মদেরকে দলীয় আদর্শের প্রশিক্ষণ দিয়ে দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলামী দাওয়াতের কার্যক্রমকে প্রসারিত করেও এ দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির তাগিদ দেয়া হয়েছে। সকল সদস্যদের সম্মিলিত শক্তি একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম একটি জাতির নাম নয়, বরং এটি একটি দলের নাম। আদর্শভিত্তিক এ দলটি জাতিতে পরিণত হলেও এদের জাতিয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ইসলামী চেতনার ওপরে।

নন্দিত আদর্শের উৎস

একটি জাতিকে সমগ্র পৃথিবীতে নন্দিত, প্রশংসিত ও অনুসরণীয় জাতি হিসেবে পরিচিতি দেয় সে জাতির উন্নত আদর্শ। অর্থাৎ প্রশংসিত জাতি গঠনে নন্দিত আদর্শের বিকল্প নেই। সুন্দর আদর্শ অনুসরণ করেই মানুষ উন্নত সভ্যতা- সংস্কৃতি বিনির্মাণ করে। ইতিহাস ও বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, চরম নোংড়া চরিত্রের ব্যক্তি, গোত্র বা সম্প্রদায় উন্নত আদর্শ অনুসরণ করে অনুসরণীয় চরিত্রের ব্যক্তিত্বে, গোত্রে ও সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে, সকল মানুষের কাছে বরণীয় স্মরণীয় হয়েছে এবং ইতিহাস তাদের নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করে তাদেরকে দেদিপ্যমান করেছে। যাঁরা ছিলো পশুর রাখাল, উন্নত আদর্শ তাদেরকে সমগ্র মানবজাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে স্থান দিয়েছে। অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করাই ছিলো যাদের পেশা ও নেশা, নন্দিত আদর্শ তাদেরকে সমগ্র মানুষের সম্পদের প্রহরাদার বানিয়েছে। দ্বিধাহীন চিত্তে যারা নারীর সম্ভ্রম বিনষ্ট করতো, উন্নত আদর্শ অনুসরণে তাঁরাই নারীকে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে আসীন করেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নন্দিত আদর্শের উৎস সম্পর্কে জানার মাধ্যম কি? মানুষ হিসেবে আমাদের যে জ্ঞান আছে, এই জ্ঞান কি আমাদেরকে কোনো নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত করে? এই প্রশ্নের সঠিক এবং একমাত্র জবাব হলো, না। মানুষের জ্ঞান সসীম, এই সসীম জ্ঞান মানুষকে সকল বিষয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে না। মানুষের জ্ঞান মানুষকে ভুল পথেও পরিচালিত করে। মানুষের দৃষ্টি শক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। শ্রবণ, অনুভব, বাক শক্তি তথা সকল শক্তিই সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন মানুষ রেল লাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে অনেক দূরে সে দেখতে পায়, দু'পাশের রেল লাইন যেন এক হয়ে গিয়েছে। রেল লাইন আর দুটো নেই, একত্রে মিশে গেছে। আকাশের প্রান্তের দিকে তাকালে দেখা য়ায়, অনেক দূরে আকাশ পৃথিবীর মাটির সাথে মিশে গেছে। বিশাল জলধী সমুদ্রের দিকে তাকালে দেখা য়ায়, শুধু পানি আর পানি। ওপার দেখা য়ায় না। ওপারে যে বৃক্ষ-তরু লতার অস্তিত্ব রয়েছে, জনবসতী রয়েছে, দৃষ্টিশক্তি তা অনুভব করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং মানুষের দৃষ্টিশক্তি মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়।

মানুষের শ্রবণশক্তির অবস্থা আরো শোচনীয়। একত্রে পাঁচজন মানুষ যদি কোনো শব্দ শোনে, পাঁচজন পাঁচ ধরণের মন্তব্য করে। প্রকৃত যে কিসের শব্দ, তা আড়াল থেকে অনুভব করা বড় কঠিন। মানুষের শ্রবণ শক্তিও মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেয় না। মানুষের ত্বক, যা দিয়ে মানুষ

স্পর্শ অনুভব করে, ত্বকও মানুষকে প্রকৃত সত্য অবগত করতে ব্যর্থ হয়। আড়াল থেকে একজন মানুষকে আরেকজন মানুষ স্পর্শ করলে সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় চোখে না দেখে বলতে পারে না। মানুষের অনুভব শক্তি তথা ত্বক মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেয় না। সুতরাং নন্দিত আদর্শের সন্ধান পেতে হলে নবী-রাসূল ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ মানব জাতির সামনে খোলা নেই। এ ব্যাপারে মানুষের বিবেক বুদ্ধিও রায় দেয়, ওহী জ্ঞান ব্যতীত অনুসরণীয় উন্নত আদর্শের সন্ধান জানার আর কোনো মাধ্যম নেই।

এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ মানুষ প্রেরণ করেছেন। এই মানুষকে সহজ সরল ও সত্য পথ প্রদর্শন তথা নন্দিত আদর্শ উপহার দেয়ার দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'য়ালার। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ–

আল্লাহ তা'য়ালার ওপরই (নির্ভর করে মানুষদের) সরল পথ নির্দেশ করা, (বিশেষ করে) যেখানে (অন্য পথের) মধ্যে কিছু বাঁকা পথও রয়েছে। (সূরা আন্ নাহল-৯)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের রব বা প্রতিপালক। তিনিই আইন দাতা, বিধান দাতা, তথা মানুষের জীবনের যতগুলো দিক রয়েছে, সকল দিকের অনুসরণীয় আদর্শ দানের দায়িত্ব মহান আল্লাহর। কেননা পৃথিবীর মানুষের জন্য অবলম্বন করার নানা ধরনের আদর্শ রয়েছে। কিন্তু এ সকল আদর্শের সবগুলো আদর্শ কোনোক্রমেই নন্দিত হতে পারে না, পারে মাত্র একটি আদর্শ। আর একমাত্র সঠিক এবং সহজ সরল ও নির্ভুল আদর্শ তাই হতে পারে যা সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত তথা যে আদর্শ মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী-রাসূলের মাধ্যমে মানব জাতিকে উপহার দিয়েছেন। সে আদর্শের নাম ইসলাম এবং কেবলমাত্র ইসলামই পথিবীতে অভ্রান্ত নন্দিত আদর্শ।

ইসলাম গতানুগতিক কোনো ধর্মের নাম নয়

ইসলাম গতানুগতিক কোনো ধর্মের নাম নয়, বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটি একটি বিশাল মতাদর্শের নাম। এর কোনো একটি দিক ও বিভাগে সামান্যতম সঙ্কীর্ণতা নেই। কোনো মানুষ কর্তৃক এ আদর্শের

নামকরণ করা হয়নি। কোনো স্থান বা ব্যক্তির সাথেও সম্পর্কিত করে এ বিশাল মতাদর্শের নামকরণ করা হয়নি। এ আদর্শের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং এর মূল ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এ আদর্শের নামকরণ করেছেন মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এ আদর্শ গ্রহণ, অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করলে মানবজাতির জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তির অনাবিল ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়ে সমগ্র পরিবেশও শান্তিময় হয়ে ওঠে। এ পরিবেশের আওতাধীন মানুষসহ সকল প্রাণীও শান্তির পরিবেশ লাভ করে। এ আদর্শের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাকৃতিক পরিবেশও ভারসাম্য হারানোর ঝুঁকিতে পড়ে না, এ সকল নানাবিধ কারণেই 'ইসলাম' শব্দের অর্থ শান্তি বলে বিবৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় ইসলাম বলতে বুঝানো হয়েছে, আনুগত্য ও বাধ্যতা। মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি প্রশ্নাতীত সার্বিক আনুগত্য ও বস্যতা স্বীকার ও বাস্তবায়ন করাই এ আদর্শের মূল লক্ষ্য, এ কারণেই এর নামকরণ করা হয়েছে ইসলাম। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রকাশ করলে সকল ক্ষেত্রে শান্তির সমীরণ প্রবাহিত হতে থাকে, এ জন্যেই ইসলামকে শান্তির আদর্শ বলা হয়েছে। আর এ বিষয়টি কোনো অবাস্তব দৃষ্টান্তহীন বিষয় নয়, প্রায় অর্ধ পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমগ্র মানব মণ্ডলীর সম্মুখে বাস্তব দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছে।

এ পৃথিবীতে যতগুলো মতবাদ, মতাদর্শ ও ধর্ম রয়েছে, এর প্রত্যেকটিরই নামকরণ করা হয়েছে ব্যক্তি বিশেষের নামে অথবা যে জাতির মধ্যে উক্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন সেই জাতির নামে। তাওরাত ও যুবর কিতাব বিকৃত করে ইয়াহূদা নামক এক বিশেষ গোষ্ঠী ইয়াহূদী ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে ইয়াহূদী ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মের নামরকরণ করা হয়েছে এর প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের নামে। পারস্যে জরদশ্‌ত নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলো, তার নাম অনুসারেই সেই ধর্মের নামকরণ করা হলো। ঈঞ্জিল কিতাব বিকৃত করে যে ধর্মের আবিষ্কার করা হলো, সেই ধর্মের নামকরণ করা হলো হযরত ঈসা (আঃ) এর নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঈসায়ী ধর্ম।

ইসলামের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। নারী বা পুরুষ হোক, যে মানুষ মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাঁর নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস করেছে, আল্লাহ তা'য়ালার অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করেছে এবং এ কিতাবে বর্ণিত জীবন ব্যবস্থা অনুসরণে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থেকেছে, তাকেই মুসলিম হিসেবে পরিচিতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে

থেকেও যারা বিশেষ ছয়টি গুণ-বৈশিষ্ট্যে অগ্রগামী হয়েছে, তাদেরকে বিশেষ মর্যাদার আসনে উন্নীত করে মুত্তাক্বী বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে।

উক্ত ছয়টি গুণ-বৈশিষ্ট্য হলো, (এক) আল্লাহভীরু হতে হবে। ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার স্বাভাবিক ক্ষমতা ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে। অন্যায় ও দুষ্কর্ম থেকে তাকে বিরত থেকে কল্যাণকে গ্রহণ ও কল্যাণ অনুসন্ধানী হতে হবে। (দুই) গায়েবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। গায়েব বলতে সেই নিগূঢ় সত্যসমূহকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষের ইন্দ্রিয়ের অতীত, প্রত্যক্ষভাবে যা কখনো মানুষের গোচরীভূত হয় না। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালার সত্তা ও গুণাবলী, ফিরিশতা, ওহী, জান্নাত- জাহান্নাম ইত্যাদি। (তিন) নামাজ কায়েম করা, অর্থাৎ নামাজের শিক্ষা নিজ জীবনে অনুসরণ করা, পারিবারিক জীবনে অনুসরণ করা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আন্দোলন করা। (চার) ব্যক্তিকে সঙ্কীর্ণ মনা, কৃপণ ও অর্থের পূজাড়ী হওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, এ সম্পদে অন্যান্য মানুষের যে অধিকার নির্ধারিত রয়েছে,তা তাকে আদায় করতে হবে এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অর্থ সরবরাহ করতে হবে। (পাঁচ) পবিত্র কোরআনসহ অন্যান্য আসমানী কিতাবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং নবী করীম (সাঃ)সহ অন্যান্য সকল নবী-রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। (ছয়) আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এ পৃথিবীতে সে যা কিছুই করছে সকল কিছুর হিসাব মহান আল্লাহর আদালতে দিতে হবে। এই অনুভূতি জাগ্রত রেখে তাকে পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে হবে।

ইসলামী আদর্শ কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এগুলো মানুষকে মহান আল্লাহর বিধান সর্বাধিক যোগ্যতার সাথে পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের সকল বিধি বিধান পূর্ণ যোগ্যতার সাথে যেনো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়, এ প্রশিক্ষণই নামাজ-রোজা হজ্জ ইত্যাদির মাধ্যমে পেয়ে থাকে। মানুষ ব্যক্তিগত ক্ষেত্র থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত কিভাবে চলবে, লেনদেন কিভাবে করবে, কার সাথে কোন্ পর্যায়ে কেমন সম্পর্ক রাখবে, তার রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সভ্যতা-সাংস্কৃতিক নীতিমালা, শিল্পনীতি, শ্রমনীতি, ভূমিনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, পরিবেশনীতি, যুদ্ধ ও সন্ধিনীতি এবং আন্তর্জাতিক নীতিসহ সকল নীতিমালা ইসলাম মানবজাতিকে উপহার দিয়ে তা বাস্তবায়ন করেও দেখিয়েছে। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর পূর্বে যে সকল নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন, তাঁরা সকলেই মানুষকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকেই

আহ্বান করেছেন। কারণ ইসলামই মহান আল্লাহর কাছে মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে–

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ– وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ– وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ–

নি:সন্দেহে মানুষের জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ইসলামই একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) ব্যবস্থা। যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তারা (এ জীবন বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে) নিজেরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে (বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে) মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, (তাও আবার) তাদের কাছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সঠিক জ্ঞান আসার পর; যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অস্বীকার করবে (তার জানা উচিত), অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান-১৯)

পৃথিবীতে যতগুলো ধর্মমতের আবিষ্কার করা হয়েছে, এসব ধর্মের কোনো একটি ধর্মও দাবি করে না যে, মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের চাহিদা সে পূরণ করতে সক্ষম। বেদ, গীতা, বাইবেল, ওল্ডটেষ্টামেন্ট, নিউটেষ্টামেন্ট, গ্রন্থ সাহেব, ত্রীপটক, দিঘানিকায়া, তালমুদ, জেন্দাভেস্তা ইত্যাদি যতগুলো গ্রন্থকে ধর্ম গ্রন্থের মর্যাদা প্রদান করা হয়, এসব গ্রন্থ মানব জীবনের সকল বিভাগে অনুসরণীয় নীতিমালা পেশ করেনি। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল কোরআন মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নীতিমালা পেশ করে ঘোষণা করেছে, এ নীতিমালা ব্যতীত অন্য কোনো নীতি আদর্শ মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে–

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ–

যদি কেউ ইসলাম ছাড়া (নিজের জন্যে) অন্য কোনো জীবন বিধান অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে সে (উদ্ভাবিত) ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, পরকালে সে চরমভাবে ব্যর্থ হবে। (সূরা আলে ইমরান-৮৫)

পৃথিবীতে এমন কোনো সমস্যা নেই এবং অনাগতকালেও মানুষ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হবে, নন্দিত আদর্শ ইসলাম সকল সমস্যার কল্যাণকর সমাধান দিয়েছে। ইসলামকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মহানেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, এ ইসলামে কোনোই অপূর্ণতা রাখা হয়নি। মানুষের জন্যে এটি শুধু জীবন ব্যবস্থাই নয়, এটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا–

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতও আমি পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবনের ব্যবস্থা হিসেবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম। (সূরা আল মায়েদা-৩)

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা এবং তিনিই সমগ্র সৃষ্টি জগতের একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। মানুষের জন্যে সকল প্রকার আইন কানুন বিধান রচনা করারও দায়িত্ব কেবলমাত্র তাঁরই। এ দায়িত্ব তিনি কোনো মানুষর ওপর অর্পণ করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে মানুষদের প্রশ্ন করতে বলছেন–

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ– سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ– قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ– سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ– قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ–

(হে নবী, এদের) জিজ্ঞেস করুন, যদি তোমরা জানো তাহলে বলো, এ যমীনে এবং এখানে যা (কিছু সৃষ্টি) আছে তা কার (মালিকানাধীন)? ওরা বলবে (হ্যাঁ), সব কিছুই আল্লাহর; (আপনি) বলুন, এরপরও তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করবে না? আপনি (এদের আরো) জিজ্ঞেস করুন, এ সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে? ওরা জবাব দিবে, (এসব কিছুই) আল্লাহর; আপনি বলে দিন, তারপরও তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? আপনি

আবারও জিজ্ঞেস করুন, যদি তোমরা (সত্যি সত্যিই) জানো তাহলে বলো, কার হাতে রয়েছে (আসমান যমীন) সবকিছুর একক কর্তৃত্ব? (হ্যাঁ) তিনি (যাকে ইচ্ছা তাকেই) পানাহ্ দেন, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কাউকে পানাহ্ দিতে পারে না। (সূরা আল মুমিনুন-৮৪-৮৮)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে সকল সৃষ্টিই তাঁর কাছে জবাবদীহী করতে বাধ্য, কিন্তু তাঁকে কারো কাছে জবাবদীহী করতে হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ–

তিনি যা কিছু করেন সে ব্যাপারে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, বরং তাদেরই (তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে) প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আল আম্বিয়া-২৩)

রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্বে কারো কোনো অংশীদার নেই, তিনিই এক এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا–

আপনি আরো বলে দিন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্যে, যিনি কখনো কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, আল্লাহ তা'য়ালার সার্বভৌম ক্ষমতায় আর কেউ অংশীদার নেই, আর তিনি এমন দুর্বলও নন যে, তাঁর সাহায্যকারীর প্রয়োজন হবে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দাও, চূড়ান্ত পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব। (সূরা বানী ইসরাঈল-১১১)

তিনি অকল্পনীয় অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং বরকতময়। তিনি অনুগ্রহশীল, অসীম ক্ষমাকারী মহাদয়াবান এবং উত্তম প্রতিফল দানকারী। তিনি কঠিন শাস্তি দানকারী। তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ এবং সকল দোষত্রুটি ও দুর্বলতা অক্ষমতা থেকে পবিত্র। তাঁর রয়েছে শ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম গুণাবলী এবং তিনি অভ্রান্ত পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কারো কাছে দায়ী নন বরং প্রত্যেকেই তাঁর কাছে দায়ী। সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক অনু-পরমাণুও তাঁর সম্মুখে অবনত। তিনিই সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক, সর্বোত্তম রক্ষক ও সাহায্যকারী। তিনিই একমাত্র দোয়া শ্রবণকারী ও গ্রহণকারী, তাঁর কাছে ব্যতীত আর কারো কাছে দোয়া করা যাবে না। তিনিই আশ্রয় ও সাহায্যদাতা। তাঁর দৃষ্টির আড়ালে যাওয়া যায় না এবং

নির্ভর ও আস্থা স্থাপনের জন্য তিনিই যথেষ্ট। সকল কিছুর চূড়ান্ত পরিণতি কেবল তাঁরই হাতে। তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই। কেউ তাঁর অংশীদার নয় এবং তাঁর সাম্রাজ্যে কেউ তাঁর অংশীদার নেই। তিনিই একমাত্র দাসত্ব লাভের অধিকারী এবং তিনিই বিশ্বলোকের সকল কিছুর পথ নির্দেশ দান করেন।

তিনি নিজ সৃষ্টির প্রতি দয়াবান, স্নেহশীল এবং ভালোবাসা পোষণকারী, প্রতিটি জিনিসের ওপর তাঁর রহমত পরিব্যাপ্ত। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং তিনি তাওবা কবুলকারী। তিনিই মৃতকে জীবিত এবং জীবিতকে মৃত্যু দান করেন। তিনিই প্রত্যেক সৃষ্টির ভাগ্য নির্ধারণ করেন এবং সকলকেই তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক, পরিচালক এবং শাসক। সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র তাঁরই জন্যে। রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন কানুন রচনা করার ক্ষমতা তিনি ব্যতীত আর কারোই নেই। তিনি ঘোষণা করেছেন–

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ - أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ–

আইন বিধান জারি করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই; আর তিনি আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবে না। কারণ এটাই হচ্ছে সঠিক জীবন বিধান। (সূরা ইউসুফ-৪০)

'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং প্রজাতন্ত্রের মালিক', সাধারণ মানুষকে শোষণ, শাসন, লুণ্ঠন ও দাসে পরিণত করার জন্যেই এ কথাটি বলা হয়ে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা ভয়ঙ্কর গোনাহ। স্মরণে রাখতে হবে, রাষ্ট্রের মালিক ও সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ নিজেকে রব্বুন নাস তথা মানুষের প্রভু, ইলাহিন্নাস তথা মানুষের উপাস্য এবং মালিকুন নাস তথা মানুষের শাসক হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন–

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ–

সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও চলবে তাঁর। (সূরা আল আ'রাফ-৫৪)

একজন বা কিছু সংখ্যক মানুষ দেশের জনগণের প্রভু হতে পারে না। কিছু সংখ্যক মানুষ আইন রচনা করবে আর সমগ্র জনগণ সে আইন মেনে চলতে বাধ্য নয়। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন–

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء-

তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণকৃত জিনিসের অনুসরণ করো এবং তাঁকে ত্যাগ করে অন্যান্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। (সূরা আল আ'রাফ-৩)

আল্লাহ তা'য়ালার বিধান ত্যাগ করে যারা আইন কানুন বিধান রচনা করে এবং সে অনুযায়ী বিচার বিভাগসহ দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তাদেরকে পবিত্র কোরআন ফাসিক, জালিম ও কাফির হিসেবে ঘোষণা করেছে।

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ-

যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, তারাই হচ্ছে কাফির। (সূরা আল মায়েদাহ-৪৪)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ-

যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, তারাই হচ্ছে জালিম। (সূরা আল মায়েদাহ-৪৫)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ-

যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, তারাই হচ্ছে ফাসিক। (সূরা আল মায়েদাহ-৪৭)

সুতরাং যারা নিজেদেরকে মুসলিম এবং ইসলামের অনুসারী হিসেবে দাবি করবে, তাদের জন্য মানুষের বানানো আইন কানুন সংবিধান বাতিল করে মহান আল্লাহর দেয়া সংবিধান প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন করা ঈমানের একান্ত দাবি। এ দাবি পূরণে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে বা কোনো অযুহাতে এ দাবি থেকে দূরে অবস্থান করলে আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হয়ে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

ইসলামে জাতিয়তার ধারণা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ কথা প্রমাণিত অকাট্য সত্য যে, ক্ষুদ্র স্বার্থে রচিত জাতিয়তা মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি করে কোন্ পশুস্তরে উপনীত করে। বংশীয়, গোত্রভিত্তিক, বর্ণ ও ভৌগলিক, ভাষাভিত্তিক,

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জাতিয়তা মানুষে মানুষে প্রবল ভেদাভেদ সৃষ্টি করে মানুষের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, জিঘাংসা সৃষ্টি করে অগণিত মানুষের তপ্ত রক্তে এই পৃথিবীর মাটিকে সিক্ত করেছে। স্বার্থান্ধ এসব উগ্র জাতিয়তা মানোবেতিহাসে এমন ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে, যেসব যুদ্ধ শতাব্দী ব্যাপীও স্থায়ী হয়েছে। এসব কুৎসিত বিভৎস জাতিয়তার বিষ বাষ্প থেকে মানব জাতিকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যেই ইসলাম এক অপূর্ব সুন্দর নন্দিত জাতিয়তার ধারণা পেশ করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করেও পৃথিবীবাসীকে দেখিয়েছে।

সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো ব্যক্তি এ কালেমা পাঠ করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। সে ব্যক্তি শ্বেত বর্ণের বা কৃষ্ণ বর্ণের হোক না কোনো, সে ধনী বা গরীব হোক না কোনো, সে অভিজাত শ্রেণীর বা নিম্ন শ্রেণীর হোক না কেনো, মুসলিম জাতির মধ্যে শামিল হতে তাকে কোনো কিছুই বাধার সৃষ্টি করেনি এবং পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত করবেও না। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসকদের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, তাদের শাসনামলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলিম ব্যবসায়ী এবং পর্যটকগণ এদেশে আগমন করেছেন। তারা শাসন যন্ত্রের বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করেছেন এবং এদেশেই চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। তাদের বংশধরগণ এখনো ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্থান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল ইত্যাদী দেশে রয়েছেন।

তাদের জীবনধারা, সংস্কৃতি, ভাষা পৃথক হলেও শুধুমাত্র মুসলিম পরিচিতিই তাদেরকে মুসলিম জাতিয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। সুদূর আফ্রিকা থেকে আগমন করে ভারতীয় উপমহাদেশের কোনো মুসলিম নারীকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করতে ভাষা বা বর্ণ বাধার সৃষ্টি করেনি। অবাধে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হয়েছেন। এদেশকে তারা নিজের জন্মভূমির তুলনায় অধিক ভালোবেসে এদেশের উন্নতি অগ্রগতিতে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে ইসলামের সেই অমর বাণীর কারণে, 'সকল মুসলিম ভাই ভাই, কুল্লু মুস্লিমিনা ইখ্ওয়াহ্'। ক্ষুদ্র স্বার্থভিত্তিক সঙ্কীর্ণ জাতিয়তাবাদের বিষ বাম্পের আধিক্য সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত হজ্জের দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে ইসলামের সুমহান জাতিয়তা বোধের বাস্তব দৃশ্য পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ইস্লামী জাতিয়তার মর্মবাণী যাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, এমন সব লোকজন যারা পৃথিবীর

বিভিন্ন দেশ থেকে হজ্জ ও উমরাহ্ আদায় করতে মহাপবিত্র ভূমি মক্কায় আগমন করেন, ভাষা ও বর্ণের ব্যবধান তাদেরকে স্পর্শ করে না। একের জন্যে অপরে কি পরিমান ত্যাগ করবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلْمُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا–

'মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে একটি প্রাচীরের ন্যায় শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। তার প্রত্যেকটি অংশ অপর অংশকে দৃঢ় করে দেয়'।

নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন–

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تُدَاعِيْ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى–

'পারস্পরিক প্রেম ভালোবাসা ও স্নেহ বাৎসল্যের দিক দিয়ে মুসলিম জাতি একটি পূর্ণাঙ্গ দেহের সমতুল্য। তার একটি অঙ্গে ব্যথা অনুভূত হলে সমগ্র দেহই সে জন্যে নিদ্রাহীন ও বিশ্রামহীন হয়ে পড়ে'।

সূর্যের সাথে পৃথিবীর বন্ধন রজ্জু দৃশ্যমান না হলেও সূর্য কিরণ ব্যতীত পৃথিবী টিকে থাকবে না। সূর্য কিরণ ব্যতীত পৃথিবীর বৃক্ষ, তরুলতা ও প্রাণী জগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সূর্য আর পৃথিবীর মাঝের ব্যবধান শত কোটি যোজন দূরে হলেও উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যেমন অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নেই, তেমনি পবিত্র কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠের মাধ্যমে পৃথিবীর একপ্রান্তের একজন মুসলিম এবং অপর প্রান্তের আরেকজন মুসলিমের মধ্যে যে অদৃশ্য বন্ধন রুজ্জু সৃষ্টি হয়, এ বন্ধনকে অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নেই। রক্তের সম্পর্ক বা আত্মীয়তার বন্ধনের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। অমর এ বন্ধন সৃষ্টির জন্যে চোখে দেখারও কোনো প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র একটি শব্দ 'মুসলিম' এ শব্দটিই দুই প্রান্তের দুইজনকে একই মোহনায় এনে মিলিত করে।

ভারত শাসিত কাশ্মির, গুজরাট, আহমেদাবাদ ইত্যাদি স্থানে, মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিন, চীনের উইঘর, রাশিয়ার তাসখন্দ, সমরখন্দ, বোখারা, বার্মা বা মিয়ানমারে তথা পৃথিবীর যে কোনো দেশেই মুসলিম জনগোষ্ঠী নির্যাতনের শিকার হলে বাংলাদেশের অগণিত মুসলিমের চোখ থেকে প্রিয়জন হারানোর

বেদনাশ্রু ঝরতে থাকে। ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং রাজপথ প্রকম্পিত করে প্রতিবাদ মিছিল করে। এসবই হলো ইসলামী জাতিয়তাবোধের অনিবার্য ফলশ্রুতি। এ জন্যেই মুসলিম দরদী কবি দার্শনিক ডক্টর আল্লামা ইকবাল (রাহ:) বলেছেন–

চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা,

মুসলিম হ্যয় হাম ওয়াতান হ্যয় সারা জাঁহা হামারা।

চীন, আরব ও হিন্দুস্তান আমার, মুসলিম আমি সমগ্র পৃথিবীই আমার বাসস্থান।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বংশভিত্তিক, গোত্রবাদ, বর্ণবাদ, সম্প্রদায়ভিত্তিক, ভৌগলিক, ভাষাভিত্তিক এক কথায় বৈষয়িক ও কুসংস্কারভিত্তিক আঞ্চলিক জাতিয়তাবাদের যে প্রাসাদ একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ মানুষ নির্মাণ করেছে, ইসলাম এসবই বাতিল হিসেবে ঘোষণা করেছে। সম্প্রদায়, গোত্র, বংশ, বর্ণ, ভৌগলিক অবস্থান, আঞ্চলিকতা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং ভাষাভিত্তিক জাতিয়তা সবই যুক্তিহীন বিরোধ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে মানুষকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর দলে বিভক্ত করেছে। অপরদিকে ইসলামী জাতিয়তাবোধ সূচনাতেই এসব অবৈজ্ঞানিক মতবাদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকল শ্রেণীর মানুষকে সমান অধিকারী ও সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে ঘোষণা করেছে। মূর্খতাসুলভ এসব বর্বর চিন্তা-চেতনাভিত্তিক জাতিয়তা অস্বীকার করার পর ইসলাম যুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক জাতিয়তার ধারণা মানবজাতির সম্মুখে উত্থাপন করেছে। ইসলামী জাতিয়তাবোধও মানুষে মানুষে পার্থক্য করেছে, কিন্তু পার্থক্য বৈষয়িক কোনো বিষয়ে করেনি।

নিজ স্রষ্টা আল্লাহতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, এ দুটো বিষয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয়েছে। যে মানুষের নৈতিকতার বাঁধন অধিক দৃঢ়, মানবিকতা যার মধ্যে অধিক প্রস্ফুটিত, মানবিয় সুকুমার বৃত্তিসমূহের বিকাশ যার মধ্যে সর্বাধিক, সততা ও স্বচ্ছতার মানদণ্ডে যিনি উত্তীর্ণ, আধ্যাত্মিকতা তথা আল্লাহভীরুতার সোপান যার অধিক উচ্চ, তাঁকেই ইসলাম সর্বাধিক সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছে। এই শ্রেণীর উন্নত ও নন্দিত চরিত্রবিশিষ্ট মানুষের সমষ্টিকে ইসলাম এক জাতির অন্তর্ভূক্ত করেছে, আর যারা নিজ স্রষ্টার বিধান অমান্য করে নিজেদেরকে ভ্রষ্ট পথে পরিচালিত করছে, তারা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হলেও ইসলাম এদেরকে একটি পথভ্রষ্ট জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই দুটো জাতির মধ্যে বর্ণ, গোত্র, আঞ্চলিকতা,

ভাষা এবং অন্য কোনো দিক দিয়ে কোনোই পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধুমাত্র বিশ্বাস ও কর্মে।

একই পিতামাতার দু'টি সন্তানের মধ্যে একজন ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামী জীবন বিধান অনুসারে জীবন যাপন করছে, সে এক জাতির মধ্যে গণ্য হবে। আরেকজন আল্লাহকে অস্বীকার করে বা ইসলামী জীবন বিধান অস্বীকার করে ভিন্ন কোনো আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করছে, তিনি হবেন আরেক জাতির অন্তর্ভূক্ত। এক কথায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এ পৃথিবীতে দুইটি জাতিয়তা রয়েছে। একটি ইসলামী জাতিয়তা আরেকটি কুফুরী জাতিয়তা। এ কুফুরী নানা রূপের, ধরনের ও অবয়বের হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে সকল কুফুরীই একই জাতিয়তার অন্তর্ভূক্ত। ইসলাম ঘোষণা করেছে, 'আল কুফ্রু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ্' অর্থাৎ কাফিরগণ একই জাতির অন্তর্ভূক্ত। ইসলামী বন্ধনের বাইরের দুইজন লোক যদি পরস্পর পরস্পরকে না চিনে, তারা এক দেশ অঞ্চলেরও নয়। তবুও তারা একই জাতির লোক হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে ইসলামী বন্ধনে আবদ্ধ দুইজন লোক উত্তর মেরুর আর দক্ষিণ মেরুর হলেও তারাও মুসলিম জাতির মধ্যে গণ্য হবে। উভয়ের জন্মভূমির মধ্যে যোজন যোজন ব্যবধান থাকলেও তা উভয় জাতির মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্যের কারণ হবে না।

ইসলামী জাতিয়তায় পার্থক্য সৃষ্টি হয় শুধু মাত্র সত্য আর মিথ্যার ভিত্তিতে। এ বিষয়টি স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, সত্য আর মিথ্যার নিজস্ব কোনো অঞ্চল ও দেশ নেই। একই ছাদের নিচে অবস্থান করে বা একই ঘরে বসবাস করেও দুইজন মানুষের জাতিয়তা দুই ধরনের হতে পারে। যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ইসলামী বিধান অনুসারে চলছেন, তিনি মুসলিম জাতিয়তার মধ্যে শামিল রয়েছেন, আরেকজন ইসলামের বিপরীত মতবাদ মতাদর্শ অনুসারে চলছেন, তিনি কুফুরী জাতিয়তার মধ্যে শামিল রয়েছেন। বর্ণের পার্থক্যের কারণেও ইসলামে জাতিয়তায় পার্থক্য হয় না। একজন কৃষ্ণাঙ্গ ও একজন শ্বেতাঙ্গ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের কারণে একই জাতিয়তার অন্তর্ভূক্ত আবার দুইজন শ্বেতাঙ্গও শুধুমাত্র বিশ্বাসের কারণে দুই জাতিয়তার মধ্যে শামিল।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে যারা আরেক মানুষের প্রভুত্ব মেনে নেয়, মানুষের বানানো আদর্শ, মতবাদ ও মতাদর্শ মেনে চলে তারা এক জাতি আর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নিয়ে যারা ইসলামী আদর্শ অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে চায় তারা আরেক জাতি। এ ক্ষেত্রে কে কোন্ দেশের নাগরিক এবং কোন্

ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থব্যবস্থার অধীনে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে, তাতে জাতিয়তায় কোনো পার্থক্য সূচীত হবে না। মহান ইসলাম জাতিয়তার যে সীমারেখা নির্দেশ করেছে তা কোনো বৈষয়িক স্বার্থভিত্তিক নয়, এটি সম্পূর্ণ এক মহাবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলামী জাতিয়তার মূল উপাদান ও কেন্দ্র হচ্ছে পবিত্র কালেমায়ে তাইয়্যেবা। এ কালেমার প্রতি আন্তরিক স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতিই জাতিয়তা নির্ধারণ করে। আন্তরিকতা, হৃদয়তা ও বন্ধুত্ব এবং শত্রুতাও এই কালেমার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। কালেমার প্রতি স্বীকৃতি দূরের মানুষকে কাছে টেনে পরম আপনজনে পরিণত করে, আবার কালেমার প্রতি অস্বীকৃতি একই মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করা দুই ভাই ও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়।

পবিত্র কালেমায়ে তৈইয়্যেবার ভিত্তিতে পরস্পর কেউ যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে পৃথিবীতে এমন কোনো সুত্র নেই যে, তাদেরকে পুনরায় একত্রিত করতে সক্ষম। আবার এই কালেমা যাদেরকে একত্রিত করে, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। এখানে এ ভুল ধারণার কোনো অবকাশ নেই যে, যাদের সাথে কালেমার বন্ধন নেই অর্থাৎ যারা অমুসলিম তাদের সাথে মুসলমানরা কোনোই সম্পর্ক রাখতে পারবে না। কালেমার বন্ধন শুধুমাত্র আদর্শিক ও জাতিয়তার ক্ষেত্রে। তাছাড়া জীবনের সকল দিক ও বিভাগে জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের প্রতি মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা, সহানুভূতি, সদাচার প্রদর্শন এবং নমনীয় কোমল আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। কুফর ও ইসলামের পার্থক্যের কারণে মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়েছে জাতিয়তার ক্ষেত্রে, কিন্তু মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই ইসলামের দৃষ্টিতে সমান। কারণ ইসলামী জাতিয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ঈমানের ওপরে আর অন্যান্য সকল জাতিয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে নানা ধরনের বৈষয়িক ভিত্তির ওপর।

অমুসলিমদের যে কোনো বিপদে মুসলিমদেরকে সাহায্য সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। প্রতিবেশী অমুসলিম হলে তার সকল দুঃখ যন্ত্রণার অংশীদার হবার জোর তাগিদ দিয়েছে ইসলাম। অমুসলিম প্রতিবেশী অভূক্ত রয়েছে জেনেও একজন মুসলিম উদর পূর্ণ করে খাবে, এ অধিকার ইসলাম তাকে দেয়নি। নবী করীম (সা:) ঘোষণা করেছেন, 'কোনো মুসলিম যদি কোনো অমুসলিমের ওপর সামান্যতম জুলুম করে, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে আমি স্বয়ং সেই অমুসলিমের পক্ষাবলম্বন করে মামলা দায়ের করবো'।

ইসলামী জাতিয়তার অনুপম দৃষ্টান্ত

ইসলাম জাতিয়তা নির্ধারণ করেছে ঈমান ও কুফুরীর ভিত্তিতে এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীতে মাত্র দুটি জাতিয়তা বিদ্যমান। একটি মুসলিম জাতিয়তা ও অপরটি কুফুরী জাতিয়তা। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ–

তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে অনুকরণযোগ্য আদর্শ, যখন তারা তাদের জাতিকে বলেছিলো, তোমাদের সাথে এবং তোমরা যাদের আল্লাহর পরিবর্তে উপাসনা করো তাদের সাথে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদের এসব উপাস্যদের অস্বীকার করি, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এখন থেকে চিরদিনের জন্যে এক শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেলো, যতোদিন তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকে মাবুদ বলে স্বীকার না করবে। (সূরা আল মুমতাহানা-৪)

হযরত ইবরাহীম (আ:) কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে মুসলিম জাতির পিতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর জাতিকে মহান আল্লাহর নির্দেশে যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেই কথাগুলোই উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে। ইসলামী জাতিয়তা ও কুফুরী জাতিয়তার পার্থক্যের কারণে ইবরাহীম (আ:) নিজ পিতার সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করে দেশ ত্যাগ করলেন। একজন মুসলিমের কাছে পৃথিবীর সকল বস্তু, স্থান এবং রক্তের সম্পর্কের উপরে ইসলামের স্থান। ইসলামের জন্য একজন মুসলিম, তার পিতামাতা, ভাইবোন, স্ত্রী, সন্তান সন্ততি ও সকল আত্মীয় স্বজনকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে। কারণ মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ–

হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছো! তোমরা তোমাদের পিতা এবং ভাইদেরকেও তোমাদের বন্ধু বানিও না, যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফুরীকে বেশী ভালোবাসে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু বানায় তারাই জালিম। (সূরা আত্ তাওবা-২৩)

ইসলামের জন্যে একজন মুসলিম পৃথিবীর সকল কিছু ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়েই সে ইসলাম ত্যাগ করতে পারে না। পৃথিবীর যে কোনো ধর্ম ও আদর্শের লোক যদি তাদের আদর্শ ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করে, তাহলে তৎক্ষনাৎ তারা মুসলিম জাতিয়তার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং সকল মুসলমানদের ভাই হয়ে গেলো। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ–

যদি তারা কুফর পরিহার করে তাওবা করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তারা হবে তোমাদেরই দ্বীনি ভাই। (সূরা আত্ তাওবা-১১)

নবী করীম (সাঃ) এর স্বর্ণালী যুগের বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। তিনি এক সময় রাসূল (সাঃ) এর পবিত্র মাথা মোবারক ছিন্ন করতে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ ছিলেন। তারপর যখনই তিনি নিজের ভুল অনুভব করলেন তৎক্ষণাৎ তাওবা করে ইসলামের মধ্যে শামিল হলেন। তিনি ইসলামী জাতিয়তার সীমার মধ্যে পদার্পণ করে সকল মুসলিমের ভাই হয়ে গেলেন। বর্তমান যুগেও এ ধরনের বহু লোকের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। আবুল আসাদ এক সময় ইয়াহূদী ছিলেন, মরিয়াম জামিলাও ইয়াহূদী ছিলেন। ড. ইসলামুল হক এক সময় মূর্তিপূজক ছিলেন। ইউসুফ ইসলাম এক সময় পৃথিবী বিখ্যাত পপ গায়ক ও অমুসলিম ছিলেন। ইসলাম বিদ্বেষী চলচ্চিত্র 'ফিত্না' এর নির্মাতা আর্নোড ভ্যান দুর্ণ ইয়াহূদী ছিলেন। এই ডাচ নেতা নেদারল্যাণ্ডের উইল্ডার্স ফ্রিডম পার্টিরও সদস্য ছিলেন।

ধনাঢ্য ইয়াহূদীদের অর্থানুকূল্যে তিনি 'ফিত্না' নামক চলচ্চিত্রে নবী করীম (সাঃ) কে সন্ত্রাসীদের নেতা এবং মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী ও ইসলামকে সন্ত্রাসী আদর্শ হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন। এর প্রতিবাদে সমগ্র মুসলিম দুনিয়ায় প্রবল প্রতিবাদ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় এবং বহু মুসলিম শাহাদাতবরণ করেন। মিঃ দুর্ণ ইসলাম কবুল করে মুসলিম হয়ে হজ্জ

আদায় করেছেন। হজ্জ আদায়কালে তিনি সৌদী গেজেটে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তা এখানে তুলে ধরা হলো। মিঃ দুর্ণের ভাষায়, 'আমি একটি সত্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করলাম, কিন্তু এর মধ্যে এমন কি ছিলো যে কারণে কোটি কোটি মুসলিম ব্যথিত হয়ে বিক্ষোভ করলো এবং অকাতরে প্রাণ দিলো! কিন্তু কেনো? আমি এই কেনোর জবাব অনুসন্ধানের জন্যে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক পড়া শোনা শুরু করলাম। তারপর ইসলামের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে আমি তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমি নিজেকে এই বিশ্বাসীদের (মুসলিমদের) হৃদয়ে খুঁজে পেয়েছি। হজ্জ আদায়ের পরে আমি আমার শূন্য হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করছি'।

তিনি যখন সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর চোখ থেকে অবিরল ধারায় অনুতাপের অশ্রু ঝরে পড়ছিলো। আবেগ আপ্লুত বাকরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলছিলেন, 'নবী করীম (সাঃ) এর সুমহান ব্যক্তিত্ব ও ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য আমি চলচ্চিত্র নির্মাণ করবো ইনশাআল্লাহ। আমি হজ্জে এসে পবিত্র মক্কা মদীনায় আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলো অতিবাহিত করলাম। আমি অনুতপ্ত ও লজ্জিত, বিশেষ করে নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র রওজা মোবারকে দাঁড়িয়ে আমি আমার জীবনের মারাত্মক ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জিত হয়েছি। আমার জীবনের অতীত পাপ মোচনের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন আমি করার চেষ্টা করছি। আমি মহান আল্লাহর রহমতের ওপর আশাবাদী, তিনি আমার তাওবা কবুল করে আমাকে ক্ষমা করবেন'। (সৌজন্যেঃ সৌদী গেজেট)

মিঃ দুর্ণ ইসলামের কঠোর দুশমন এবং কুফুরী জাতিয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলাম কবুল করার সাথে সাথে তিনি হয়ে গেলেন মুসলিম জাতিয়তার অধিকারী এবং সকল মুসলিমের ভাই। যে লোকটির কারণে অগণিত মুসলিমকে প্রাণ হারাতে হয়েছে এবং বহু মুসলিম পঙ্গুত্ববরণ করেছে, সে লোকটির কালিমা লিপ্ত অতীত ভুলে গিয়ে মুসলিমগণ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে। এটাই হলো মুসলিম জাতিয়তার বাস্তব অনুপম দৃষ্টান্ত। ইসলামী আদর্শের মোকাবেলায় বর্ণ, ভাষা, রক্ত, মাটি, ধনী-গরীব, দারিদ্র এবং আভিজাত্য কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে না। ডক্টর আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) এর ভাষায়–

একহি সফ্ মেঁ খাড়ে হো গ্যয়ি মাহ্মুদ ও আয়াজ
না কোই বান্দা রাহা না কোই বান্দে নেওয়াজ।

একই কাতারে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন সম্রাট সুলতান মাহ্মুদ আর তাঁর ভৃত্য আয়াজ। এখানে সম্রাট আর ভৃত্যে কোনোই পার্থক্য নেই।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) সুদূর ইরান থেকে মহাসত্যের সন্ধানে দুর্গম পথ অতিক্রম করে আরবভূমিতে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। ঈমানের মোকাবেলায় তাঁর জন্মভূমির আকর্ষণ, কষ্টার্জিত অর্থ সম্পদ ও রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজনের মায়া-মমতা কোনো কিছুই বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁকে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাবে বলতেন, 'সালমান বিন ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের পুত্র সালমান'। মক্কা ও মদীনার সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সাথে এমন আচরণ করতেন যে, তাঁকে তাঁরা অনুভব করতে দেননি তিনি ইরানের অধিবাসী। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে বলতেন, 'সালমান আমাদেরই পরিবারের একজন'। হযরত বাযান বিন সাসান (রাঃ) ও তাঁর সন্তান হযরত শাহার বিন বাযান (রাঃ) বহরামগোর এর বংশধর। নবী করীম (সাঃ) হযরত বাযান (রাঃ) ও তাঁর সন্তান হযরত শাহার (রাঃ) কে যথাক্রমে ইয়ামান ও সানয়া'র শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত বিলাল ইবনে রবাহ্ (রাঃ) মক্কা মদীনার মূল অধিবাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ার নিগ্রো। গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণের ইতিহাস বিখ্যাত হযরত বিলাল (রাঃ) ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। বর্ণ এবং দেশ ইসলামী জাতিয়তার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। হযরত উমার (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতেন, 'বিলাল হলো 'নেতার' গোলাম এবং তিনি আমাদেরও নেতা'। হযরত সুহাইব রুমী (রাঃ) ছিলেন সুদূর রোমের অধিবাসী। ইসলামী জাতিয়তা তাঁকে মর্যাদার এমন উচ্চস্তরে পৌঁছে দিয়েছিলো যে, হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে নামাজের ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করতেন।

ইসলামী জাতিয়তা একজন কৃতদাসকেও শুধু ঈমানের কারণে দেশের রাষ্ট্র প্রধানের পদে নিয়োগে বাধার সৃষ্টি করে না। হযরত আবু হুযাইফা (রাঃ) এর ক্রীতদাস ছিলেন হযরত সালিম (রাঃ)। তাঁর সম্পর্কে হযরত উমার (রাঃ) বলেছিলেন, 'এখন পর্যন্ত সালিম যদি জীবিত থাকতো তাহলে আমার পরবর্তী খলীফা পদের জন্যে আমি তাঁর নাম প্রস্তাব করতাম'। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ) ছিলেন ক্রীতদাস। রাসূল (সাঃ) নিজের আপন ফুফাতো বোন হযরত যয়নাব (রাঃ)কে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ক্রীতদাস হযরত জায়েদ (রাঃ)কে ইয়ারমুকের যুদ্ধে এক পর্যায়ে সেনা প্রধানও নিযুক্ত করা হয়েছিলো। তাঁর সুযোগ্য সন্তান হযরত উসামা ইবনে জায়েদ

(রা:)কে নবী করীম (সা:) পরম স্নেহে বড় করেছেন এবং তাঁকে এমন সেনাবাহিনীর সেনা প্রধান নিযুক্ত করেছেন যে, হযরত আবু বকর (রা:), হযরত উমার (রা:), হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রা:) প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সেনাপতিত্বে সাধারণ একজন সৈনিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন।

হিজরত করে মদীনায় আগমন করার পরে নবী করীম (সা:) এর প্রথম যে কাজ ছিল মাসজিদ নির্মাণ করা। এই কাজটিই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই মাসজিদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত করবেন। এরপর তিনি দৃষ্টি দিলেন মদীনার আনসার ও মক্কার মুহাজিরদের সম্পর্কের প্রতি। কারণ মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলমানদের কারণে মদীনার আনসারদের ওপরে বিরাট চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং আনসারদের ওপর চাপ যেনো কিছুটা হ্রাস পায় এবং মুহাজিরগণ যেন স্বাবলম্বী হতে পারে এ ধরণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকেই যাঁরা হিজরত করে মদীনায় আগমন করেছিলেন, তাঁরা নিজেদের জীবিকা অর্জনের একটি উপায় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা নিতান্ত অসহায় ছিলেন। আরেকটি ব্যাপার ছিল তাঁদের মধ্যে বিপরীত তাহলো, মক্কার অধিবাসীগণ ছিলেন ব্যবসায়ী এবং মদীনার অধিবাসীগণ ছিলেন কৃষিজীবী। জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন পরস্পর বিপরীত মুখী। একজন কৃষি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আরেকজন ব্যবসার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। মক্কার মুসলমানরা মদীনার মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতায় ব্যবসায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল। যদিও তাঁরা প্রথম দিকে তেমন বৃহৎ ব্যবসা ক্ষেত্র গড়তে পারেনি, তবে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁরা তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ব্যবসার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করেছিল।

মদীনার মুসলমানদেরকে মক্কার মুসলমানরা যেমন ব্যবসার দিকে আকর্ষণ করেছিল তেমনি মক্কার মুসলমানদেরকে মদীনার মুসলমানরা কৃষির দিকে আকর্ষণ করেছিল। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ব্যবসার। এই কাজটি মক্কার ও মদীনার মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে আঞ্জাম দিয়েছিল। ফলে অতিদ্রুত মদীনায় অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। সাথে তাঁরা লাভ করেছিল ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এ সকল কারণে তাঁদের উন্নতির শিখরে পৌঁছতে দেরী হয়নি। নবী করীম (সা:) দেখলেন, মদীনার মুসলমানরা মক্কার মুসলমানদের প্রতি এত অধিক সৌজন্যবোধ প্রকাশ করছে যে, মক্কার মুসলমানরা রীতিমত কুণ্ঠিত হয়ে

পড়ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মক্কার একজন মুসলমানের সেবা যত্ন করা নিয়ে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যাচ্ছে। যা ছিল নবী করীম (সাঃ) এর কাছে বিব্রতকর। এই বিব্রতকর অবস্থা দূর করার লক্ষ্যে তিনি ইসলামী জাতিয়তার ভিত্তিতে অপূর্ব এক পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন, সমগ্র পৃথিবীর মানব ইতিহাসে এর একটিও দৃষ্টান্ত নেই।

মক্কার মুসলিমদের সাথে মদীনার মুসলিমদের ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তাদের পরস্পরের জুটি নির্বাচন ছিল অদ্ভুত অপূর্ব। যার সাথে যার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া হয়েছিল, তাদের উভয়ের মধ্যে সকল দিক দিয়ে অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। তাদের একের চরিত্রের সাথে আরেকজনের চরিত্রের মিল ছিল। আবেগ উচ্ছ্বাস রুচি ইত্যাদীতেও মিল ছিল। একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের এ সকল দিকে মিল না থাকলে তাদের মধ্যে কৃত্রিম সম্পর্কে গড়ে উঠতে পারে কিন্তু আন্তরিক সম্পর্ক তথা হৃদয়ের বন্ধন সৃষ্টি হতে পারে না।

নবী করীম (সাঃ) মনস্তাত্বিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই একের সাথে আরেকজনের সম্পর্কে স্থাপন করে দিয়েছিলেন। কারো রুচি বা আবেগ উচ্ছ্বাস এবং পছন্দের বিপরীত কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি। ফলে তাদের মধ্যে এমন এক বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল, যে বন্ধনকে শুধুমাত্র ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বলে চিহ্নিত করা যায় না। তাঁরা একে অপরের জন্য ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, একই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী আপন ভাইও একে অপরের জন্য ত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। ইসলামী জাতিয়তার এটি ছিলো অলৌকিক দিক। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) মক্কার অধিবাসী ছিলেন। তিনি যুবক বয়সেই রাসূল (সাঃ) এর সাথী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ধনী এবং একজন দক্ষ ব্যবসায়ী। ইসলাম বিরোধিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি পরপর দুই বার হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তারপর তিনি প্রায় নিঃশ্ব অবস্থায় মদীনায় হিজরত করেন।

মদীনায় তিনি হযরত সায়াদ ইবনে রাবিয়া (রাঃ) এর মেহমান ছিলেন। নবী করীম (সাঃ) তাদের মধ্যে ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। হযরত সায়াদ (রাঃ) তাঁর জন্য ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, পৃথিবীর কোনো জাতি ও জাতিয়তাবাদের ইতিহাসে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বোখারী হাদীসে তাঁর সম্পর্কে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের এখানে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁর সাথে সায়াদ (রাঃ) এর ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে

দিলেন। সায়াদ (রাঃ) হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) কে বললেন, 'ভাই, সবাই অবগত আছে আমি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। আমি আমার সকল সম্পদ দুই ভাগে ভাগ করে অর্ধেক আপনাকে দিচ্ছি। আমার দুইজন স্ত্রী আছে, আপনি তাদেরকে দেখুন। যাকে আপনার পছন্দ হয় আমাকে বলুন আমি তাকে তালাক দিচ্ছি। তারপর তাঁর ইদ্দত পার হলে আপনি তাকে বিয়ে করুন'।

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত সায়াদ (রাঃ) কে বললেন, 'ভাই, মহান আল্লাহ আপনার পরিবার ও সম্পদের ওপর রহমত নাজিল করুন। আমার এসবে কোনোই প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে এখানের বাজার দেখিয়ে দিন। আমি ব্যবসা করেই আমার জীবিকা নির্বাহ করবো'। হযরত সায়াদ (রাঃ) তাঁকে বাজার দেখিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বাজারে গিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। মহান আল্লাহ তাঁর ব্যবসায় এমন বরকত দিয়েছিলেন যে, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই মদীনার অন্যতম ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয়েছিলেন। তিনি যে ব্যবসায় হাত দিতেন সে ব্যবসাতেই আশাতীত ফল অর্জিত হতো। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি পাথর উঠালেও মনে হত তার নিচে স্বর্ণ বা রৌপ্য পাবো'। (তাবাকাতে ইবনে সায়াদ)

হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) এর ব্যবসা মদীনায় এতটা বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে, তাঁর ব্যবসার পণ্য প্রায় সাত শত উট বোঝাই করে মদীনার বাজারে নিয়ে আসা হতো। যেদিন তাঁর ব্যবসার পণ্য নিয়ে আসা হতো সেদিন মদীনায় শোরগোল পড়ে যেত। হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনায় কাপড়ের কারখানা স্থাপন করে ব্যবসা করতেন। হযরত উসমান (রাঃ) খেজুরের ব্যবসা করতেন। হযরত উমার (রাঃ) ব্যবসা করতেন। তাঁর ব্যবসার ক্ষেত্র সুদূর পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। নবী করীম (সাঃ) হযরত উমার (রাঃ) এর সাথে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। বিশ্বনবীর যুগে হযরত উবাই (রাঃ) সর্বপ্রথম লেখকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত অর্থাৎ কেরাত শাস্ত্রের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম ছিলেন। তিনি এতটা উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে, হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে 'সাইয়িদুল মুসলিমিন' বা মুসলমানদের নেতা বলে সম্বোধন করতেন।

মক্কার মুসলমানরা ব্যবসা করতো আর তাদেরকে সহযোগিতা দিতেন মদীনার মুসলমানরা। লভ্যাংশ তাঁরা ভাগ করে নিতেন। মদীনার মুসলমানরা কৃষি কাজ করতেন আর মক্কার মুসলমানরা তাদেরকে সহযোগিতা দিতেন। উৎপন্ন ফসলের সমান ভাগ করে তাঁরা গ্রহণ করতেন। মদীনার যে মুসলমানের সাথে মক্কার যে

মুসলমানের ভায়ের সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া হয়েছিল, মদীনার সে মুসলমান তাঁর এই আদর্শিক ভাইয়ের জন্য নিজের সম্পত্তির অর্ধেক দান করেছিলেন। আনসারদের যেসব জমি ছিল সেসব জমি মক্কার মুহাজিরদের দান করেছিলেন। মক্কার মুসলমানরা সেখানে গৃহ নির্মাণ করে বাস করতেন। যেসব আনসারের জমি ছিল না, তাঁরা তাদের বাড়ির অর্ধেক মক্কার ভাইদেরকে দান করেছিলেন। সর্ব প্রথমে জমি দিয়েছিলেন হযরত হারেসা ইবনে নুমান (রাঃ)।

পরে মক্কার মুসলমানরা স্বাবলম্বী হলে মদীনার মুসলমানদের কাছ থেকে গ্রহণ করা অর্থ ফেরৎ দিয়েছিলেন। কিন্তু মদীনার মুসলমানরা মক্কার মুসলমানদের যেভাবে ঋণী করেছিলেন, তাদের সেই ঋণ কোনো মানুষের পক্ষে পরিশোধ করা ছিল অসম্ভব। তাদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ছিল শুধু মহান আল্লাহর কুদরতী হাতে। তাদের এই ত্যাগের কারণে মহান আল্লাহ খুশী হয়ে পবিত্র কোরআনে তাদের সম্পর্কে প্রশংসামূলক আলোচনা করেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ–

নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে (এবং ঈমানের জন্যে হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা (মুহাজিরদের) আশ্রয় দিয়েছে ও তাদের সাহায্য করেছে, তারা সবাই পরস্পরের বন্ধু। (সূরা আল আনফাল-৭২)

ইসলামী জাতিয়তার বন্ধনের কারণে তাদের ত্যাগের কাহিনী পাঠ করলে অবাক বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়। মদীনার কোনো আনসারের মৃত্যু হলে মক্কার মুহাজির তাঁর সম্পত্তির অংশ লাভ করতো। ইসলামী জাতিয়তা এমন এক সম্পর্ক তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীতে মহান আল্লাহ কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে এই ব্যবস্থা রহিত করেন। আনসারগণ মক্কার মুহাজিরদের বড় বড় খেজুরের বাগান দান করেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) খায়বার যুদ্ধে জয়ী হয়ে মদীনায় এসে আনসারদের দান করা খেজুরের বাগানগুলো তাদেরকে পুনরায় ফেরৎ দিয়েছিলেন।

মুসলমানরা যখন বাহরাইন বিজয় করে তখন বিজিত এলাকা সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) আনসারদের মাঝে ঘোষনা করেন, 'আমি এই বিজিত এলাকা আনসারদের মধ্যে বন্টন করে দিতে ইচ্ছুক'।

মদীনার আনসাররা মক্কার মুহাজিরদের জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকার করলেন, তারপরেও তাঁরা আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! মুহাজির ভাইদের যদি সমান অংশ দান করা হয় তাহলে আমরা তা গ্রহণ করতে রাজী আছি। নতুবা তা আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব'।

ইসলামী জাতিয়তা কর্তৃক রচিত ভ্রাতৃত্বের এই সম্পর্ক স্থাপনের কারণ শুধু এটাই ছিল না যে, মক্কার মুসলমানদের সাময়িক সমস্যার সমাধান করা। এই সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল আরো গভীরে। যে লোকগুলো দিয়ে নবী করীম (সাঃ) পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তন করবেন, মানবজাতিকে একটি নন্দিত সভ্যতা সংস্কৃতি উপহার দিবেন, তাদের মধ্যে প্রকৃত মানবিক ও ত্যাগের গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

নবী করীম (সাঃ) তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কতটা সফল হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বদরের প্রান্তরে। আদর্শের জন্য সকল কিছুই কুরবান করতে হবে, এ চেতনা তাদের মধ্যে এমন তীক্ষ্ণভাবে শানিত হয়েছিল যে, তাঁরা ইসলামের প্রথম যুদ্ধ- বদরের যুদ্ধে বাস্তবায়ন করেছিলেন। এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল আপনজন তথা রক্তের বাঁধনে আবদ্ধ পরম ঘনিষ্ঠজনদের সাথে। পিতার সাথে পুত্রের, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের, বন্ধুর সাথে বন্ধুর। হযরত আবু উবাইদা (রাঃ) তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন আদর্শের মমতায়। হযরত উমার (রাঃ) হত্যা করেছিলেন তাঁর আপন মামাকে। হযরত হুযাইফা (রাঃ) নিজের পিতার ওপর আক্রমণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজ পুত্র আব্দুর রহমানের ওপর অস্ত্রের আঘাত হেনেছিলেন। মদীনার আনসাররা তাদের বন্ধুদের হত্যা করেছিলেন আদর্শিক মমতায়। নবী করীম (সাঃ) এর আপন চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ), চাচাত ভাই হযরত আকীল ও নিজ কন্যার স্বামী আবুল আছ প্রমুখকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে মদীনায় এনে সাধারণ কয়েদীদের অনুরূপ রাখা হয়েছিলো।

ত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত শুধু তাঁরা তাদের পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখেননি। যুদ্ধের ময়দান থেকে শুরু করে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তা বাস্ত বায়ন করেছিলেন।

নিজে অনাহারে থেকে তাঁরা আরেক ভাইকে খাদ্য দিয়েছেন। একজন ক্ষুধার্ত লোক নবী করীম (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি প্রথমে তাঁর নিজের ঘরে খাদ্যের সন্ধান করলেন। তাঁর নিজ ঘর সে সময় খাদ্য শূন্য ছিলো। তিনি মদীনার আনসারদের বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে

আছে, যিনি এই লোকটির মেহমানদারী করবে?' হযরত আবু তালহা (রাঃ) বললেন, 'আমি করবো মেহমানদারী'। মেহমানকে সাথে নিয়ে তিনি বাড়িতে গেলেন। কিন্তু তাঁর বাড়িতে সে সময় মাত্র একজনের খাবার ছিল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঘরের আলো নিভিয়ে দিতে বলে তাদের খাবার মেহমানকে দিলেন আর তাঁরা এমন ভাব করতে থাকলেন, মেহমান যেন বুঝতে না পারেন তাঁরা খাচ্ছেন না। মেহমান তৃপ্তি সহকারে আহার করলেন আর তাঁরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে অভুক্ত থাকলেন। ত্যাগের এই অপূর্ব দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র ঈমানের ভিত্তিতে রচিত জাতিয়তাই উপহার দিতে পারে। পার্থিব স্বার্থকে ভিত্তি করে পৃথিবীতে যেসব জাতিয়তা গড়ে উঠেছে, তা মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপনের পরিবর্তে লোভ-লালসা, জিঘাংসা, হিংসা-বিদ্বেষ আর হানাহানি ছড়িয়ে অগণিত মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে।

নন্দিত আদর্শের স্পর্শে ঐতিহাসিক পরিবর্তন

ইতিহাস সাক্ষী, মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে শুধু মক্কারই নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানব সভ্যতা ধ্বংস গহ্বরের প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে আরবদের কাছে যুদ্ধ ছিল তাদের আয় রোজগারের সর্বোত্তম মাধ্যম তথা মহৎ পেশা। যুদ্ধহীন জীবন তাদের কাছে ছিল এক অকল্পনীয় বিষয়। এর কারণ হিসাবে ঐতিহাসিক এবং গবেষকবৃন্দ বলেছেন, তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্বাহের উপায়-উপকরণের দৈন্যতা, অর্থ-সম্পদ উপার্জন ক্ষেত্রের স্বল্পতা এবং সর্বোপরি তাদের সমাজে ঐক্য, সামাজিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত না থাকা।

এ ধরণের নানাবিধ কারণে তাদের রক্তের শিরায় শিরায় যুদ্ধ যেন মিশে ছিল। কারণে অকারণে যুদ্ধ, রক্তপাত, নরহত্যা এবং লুঠতরাজ করা তাদের কাছে সম্মান ও মর্যাদার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হত। ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন, চারণভূমিতে পশু চরানোর দখলদারী এবং নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রথমে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল। এই ধরনের যুদ্ধ তাদের ভেতরে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হত ফলে তাঁরা যুদ্ধে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী কারণে-অকারণে যুদ্ধে জড়িত থাকার ফলে তাঁরা নররক্ত দর্শনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের চরিত্রে কল্পনাতীত পাশবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল।

অর্থপ্রাপ্তির আকাংখা এবং লোভই তাদেরকে যুদ্ধোন্মাদ ও জঙ্গী করে তুলতো। আরবের কোনো ব্যক্তি যখন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে হাতে অস্ত্র ধারণ করতো, তখন তার মনের কোণে যে আকাংখা জাগ্রত থাকতো তাহলো, সে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ, দাস-দাসী ইত্যাদী হস্তগত করবে। কেননা, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ছিল তাদের কাছে বড় পবিত্র সম্পদ। যুদ্ধ করে জীবিকা নির্বাহ করা ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাকর পেশা। ব্যবসা বা নিজের দেহের শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করা ছিল তাদের কাছে অপমানজনক।

শত্রু ভাবাপন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠী রাতের অন্ধকারে হঠাৎ একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে নানা ধরনের দ্রব্য সামগ্রীসহ পশুসম্পদ ও নারী-পুরুষদের ছিনিয়ে নিয়ে যেত। মানুষগুলোকে তারা দাস-দাসী হিসাবে ব্যবহার করতো বা বিক্রি করে দিত।

আরো একটি কারণে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো, তাহলো নিজেদের সাহসিকতা এবং বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। একে অপরের আভিজাত্য প্রদর্শন এবং তা নিয়ে গর্ব করা এবং পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজেকে একজন সাহসী বীর হিসাবে সবার কাছে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল তাদের হৃদয়ের সবচেয়ে বড় আকাংখা। তাকে সবাই সাহসী যোদ্ধা বলুক, বিখ্যাত বীর বলুক এটা ছিল তাদের মনের ঐকান্তিক কামনা।

এ উদ্দেশ্যে তাঁরা যে কোনো ধরনের পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতো। তাকে বীর এবং সাহসী হিসাবে সবাই জেনে তার পশুচারণ ভূমিতে অন্য কেউ পশু চরাতে যেন সাহস না পায়, তার বাসস্থানের পাশে যেন কেউ বাস করতে সাহস না পায়, তার কূপ থেকে যেন কেউ পানি নিতে সাহস না পায়, তার তুলনায় অন্য কেউ যেন নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে না করে, তার মতো রং এবং ধরনের পোষাক যেন কেউ পরিধান না করে, সে যাকে খুশী হত্যা করবে, কেউ যেন প্রতিবাদের সাহস না পায়, সে যে কোনো নারীকে ভোগ করবে কেউ যেন বাধা না দেয়, তার ওপর কেউ যেন মাথা উঁচু করে উচ্চকণ্ঠে কথা না বলে, সবাই যেন তাকেই নেতা হিসাবে মান্য করে, তাকে সবাই যেন সেবা-যত্ন করে এ ধরনের কামনা-বাসনা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেও তারা যুদ্ধ করতো।

মনের এ ধরনের কামনা-বাসনা ব্যক্ত করে তারা অজস্র কাব্য রচনা করেছে। আজো সেসব কাব্য ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান। বর্তমান পৃথিবীতে পরাশক্তিগুলো যেমনভাবে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার অশুভ লক্ষ্যে, প্রয়োজনে রক্তের খেলায় মেতে ওঠে, সে যুগেও তেমনইভাবে একজন ব্যক্তি তার প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে তরবারী ধারণ করতো। 'আইয়ামূল আরাব' অর্থাৎ আরবের লোকগাঁথা পাঠ করলে জানা যায়, সে সময় যতগুলো ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং দশকের পর দশক যুদ্ধ চলেছে তা সবই ছিল তাদের অহঙ্কার ও আভিজাত্য প্রদর্শনের কারণে। 'হারবে বাসুস' বা বাসুস যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শুধুমাত্র নিজের অহঙ্কার এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রাখার হীন উদ্দেশ্যে। বনী তাগলাব এবং বনী বকর গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ব্যাপী এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল।

বনী তাগলাবের গোত্রপতি ছিল কুলাইব ইবনে রাবিয়া। তার নীতি ছিল তার কূপ থেকে কেউ পানি নিতে পারবে না এবং অন্য কারো পশুকে সে পানি পান করতে দিত না। সে যেখানে শিকার করতো, সেখানে অন্য কাউকে শিকার করতে দিত না। সে যে চারণভূমিতে পশু চরাতো, সেখানে অন্য কারো পশু চরাতে দিত না। সে যেখানে অগ্নি প্রজ্জলিত করতো সেখানে আর কাউকে আগুন জ্বালাতে দিত না। একবার বনী বকরের গোত্রে এক অতিথির আগমন ঘটলো। সে অতিথির উট চরতে চরতে তাগলাব গোত্রের গোত্রপতি কুলাইবের চারণভুমিতে গিয়ে তার উটের সাথে চরতে থাকে। কুলাইব তা দেখে রাগে হিতাহিত জ্ঞান শুন্য হয়ে তীর ছুড়ে উটের স্তনে বিদ্ধ করলো। বনী বকরের সে অতিথি তার উটের এই দুর্দশা দেখে চিৎকার করে বললো, 'আহ্‌হা, কি আফসোস! এ কি অসম্মান!' বনী বকর গোত্রের প্রতিটি লোকের রক্ত যেন প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে থাকলো। তাদের অতিথির এই অপমান তারা সহ্য করলো না।

এই গোত্রের ভেতরে আত্মীয়তার বন্ধনও ছিল। বনী বকর গোত্রের জাসসাস ইবনে মুররা তার বোনকে বিয়ে দিয়েছিল বনী তাগলাব গোত্রের গোত্রপতি কুলাইবের সাথে। এই জাসসাস স্বয়ং গিয়ে তার বোনের স্বামী কুলাইবকে হত্যা করলো। কুলাইবের ভাই মুহালহিল তার ভাই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে বলে ঘোষনা দিল। মুহালহিল কেনো বনী বকর গোত্রের জাসসাসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের ঘোষনা দিল- অহঙ্কারে লাগলো বনী বকর গোত্রের। শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘ চল্লিশ বছর। এই যুদ্ধে দুই গোত্র প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সে যুগে আরবদের ধারণা ছিল, কেউ নিহত হলে তার আত্মা পাহাড়-পর্বতে পাখি হয়ে উড়ে বেড়ায়। সে পাখির নাম তারা বলতো হামা পাখি বা সাদা পাখি। নিহত ব্যক্তির আত্মা পাখি হয়ে উড়তো আর বলতো, 'পান করাও আমাকে পান করাও!' আবার কেউ ধারণা করতো, কেউ নিহত হলে যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় তাহলে সে নিহত ব্যক্তি কবরে জীবিত থাকে। আর প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে কবরে সে মৃত অবস্থায় থাকে। কারো বিশ্বাস ছিল, নিহত ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে কবরে সে অন্ধকার পরিবেশে অবস্থান করে। প্রতিশোধ গ্রহণ করলে তার কবর আলোকিত হয়। এ সকল কুসংস্কারের কারণে তারা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠতো। ফলে যুদ্ধে বা অন্য কোনো কারণে যারা নিহত হত, তাদের গোত্র প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোনো ফয়সালায় না এসে যুদ্ধের পথই অবলম্বন করতো। নিহত ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে কেউ যদি বিলম্ব করতো বা কোনো অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিত, তাহলে তা ছিল তাদের কাছে লজ্জার বিষয়। এ সব ছিল তাদের কাছে নীচুতা এবং মর্যাদাহানীকর ব্যাপার। সুতরাং কোনো প্রকার আপোষে না এসে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

আরবের কবিগণ তাদের কবিতায় নিজ নিজ গোত্রকে কোন অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা যেন করা না হয়, এ ধরনের কবিতা রচনা করে তাদেরকে উস্কানী দিত। তারা নিহত ব্যক্তির মাথার খুলিতে মদ পান করতো। আরবদের বিশ্বাস ছিল কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে নিহত না হয়ে অন্য কোন কারণে শয্যায় শুয়ে মারা গেলে তার আত্মা নাক দিয়ে বের হয়। আর নাক দিয়ে আত্মা বের হওয়া ছিল তাদের কাছে চরম অপমানজনক বিষয়। আর যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর হাতে নিহত হলে তার আত্মা বের হয় আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষতস্থান দিয়ে। এটা ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে সম্মানজনক মৃত্যু। এ কারণে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে মারা যাওয়াকে তারা বলতো, 'অমুক নাক নিয়ে মরেছে'। আর যুদ্ধের ময়দানে কেউ নিহত হলে তারা বলতো, 'সে নাক নিয়ে মরেনি'। নাক নিয়ে মৃত্যুবরণ করা অর্থাৎ যুদ্ধে নিহত না হয়ে অন্যভাবে মৃত্যুবরণ করা ছিল লজ্জার বিষয়। এ জন্য তাদের কবিগণ গর্ব করে বলেছে, 'আমাদের গোত্রের কোনো নেতা নাক নিয়ে মরেনি'। অর্থাৎ তাদের গোত্রের নেতা শয্যায় শুয়ে রোগ যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করেনি।

ইয়াওমে মাসহালান যুদ্ধ, তাহ্লাকুল লামাম যুদ্ধ, দাহেস যুদ্ধসহ এ ধরনের নানা যুদ্ধ কোনো যুক্তি সংগত কারণে সংঘটিত হয়নি। সামান্য ঘোড় দৌড় নিয়ে- কার ঘোড়া আগে দৌড়ালো আর কার ঘোড়া পরে দৌড়ালো এই নিয়ে

দাহেস যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রায় ৫০ বছরব্যাপী এই অহঙ্কার প্রদর্শনীর যুদ্ধ চললো। আউস এবং খাজরাজ গোত্রের মধ্যে শুধুমাত্র ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও হিংসার কারণে প্রায় ১০০ বছরব্যাপী যুদ্ধ চলেছিল। যথা সময়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবন বিধান অবতীর্ণ করা না হলে উভয় গোত্রই ধরা পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিল বদর ইবনে পাশা। উকাজের মেলায় এই ব্যক্তি একস্থানে উপবেশন করে সামনের দিকে তার পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে কোনো কারণ ছাড়াই অহঙ্কার প্রদর্শনের লক্ষ্যে ঘোষনা করলো, 'সমগ্র আরবের মধ্যে আমিই সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি। আমার চেয়ে কেউ যদি নিজেকে অধিক মর্যাদাবান মনে করে তাহলে তার সাহস থাকলে সে যেন আমার পায়ে তরবারীর আঘাত হানে'। লোকটির এ অর্থহীন ঘোষনা অনেকের মনে আগুন ধরিয়ে দিল। বনী দাহমান গোত্রের একজন যুবকের শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠলো। সে এসে বদর ইবনে পাশার পায়ে তরবারী দিয়ে আঘাত করলো। আর যায় কোথা, শুরু হয়ে গেল কুখ্যাত ফুজ্জার যুদ্ধ। কিনানা গোত্র এবং হাওয়াজেন গোত্রের মধ্যে এমন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল যে, উভয় পক্ষের মিত্র গোত্রগুলো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো এবং এই দুই গোত্রের মধ্যে আর আপোষই হলো না।

শেষ ফুজ্জার যুদ্ধও ছিল প্রতিহিংসা আর অহঙ্কারের অনিবার্য পরিণতি। ঐতিহাসিকদের মতে আরবের শেষ ফুজ্জার যুদ্ধের মত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর ইতোপূর্বে সংঘটিত হয়নি। নবী করীম (সাঃ) এর আগমনের ছাব্বিশ বছর পূর্বে হিরার রাজা নোমান ইবনে মুনজের আরবের উকাজ নামক স্থানে যে বিখ্যাত মেলা অনুষ্ঠিত হতো, একটি বাণিজ্য বহর সে মেলায় প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তখন তিনি আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার বাণিজ্য বহরের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে?' তার প্রশ্নের জবাবে কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশ রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, 'আমি আমার গোত্রের পক্ষ থেকে আপনার বাণিজ্য বহরের যাবতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম'। অপর দিকে হাওয়াজেন গোত্রের নেতা উরওয়াতুর রাহহাল অহঙ্কার প্রদর্শন করে বললো, 'আমি আপনাকে সকল আরবের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিলাম'।

হাওয়াজেন গোত্রের এই নেতার কথা কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশের শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। হাওয়াজেন গোত্রের নেতা হিরার রাজার বাণিজ্য বহর নিয়ে যখন যাত্রা করলো, তখন কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে

কায়েশ হাওয়াজেন গোত্রের উরওয়াতুর রাহহালকে পথিমধ্যে তায়মান নামক এলাকায় হত্যা করলো। পরিণতিতে যা হবার তাই হলো। এই দুই গোত্রের পুরোনো শত্রুতায় ঐ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। উভয় গোত্রে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হলো। কুরাইশ গোত্র কানানা গোত্রের সাহায্যে এগিয়ে গেল আর বনী সাকিফ গোত্র এগিয়ে গেল হাওয়াজেন গোত্রের পক্ষে। ইয়াওমে শামতাত, ইয়াওমে শারব ও ইয়াওমুল হারিবার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। প্রায় চার বছরের অধিক কাল এই যুদ্ধ স্থায়ী হলো। এই যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং বিভৎসতা এতই প্রকট ছিল যে, ঐতিহাসিকগণ বলেন, আরবের অতীতের সকল যুদ্ধের নৃশংসতাকে এই যুদ্ধ ম্লান করে দিয়েছিল।

কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশ তায়মান নামক এলাকায় যখন হাওয়াজেন গোত্রের উরওয়াতুর রাহহালকে হত্যা করে, সে সময় কুরাইশরা উকাজের মেলায় ছিল। তাদের কাছে এ সংবাদ পৌছা মাত্র তারা মক্কার কা'বাঘরের দিকে চলে আসছিলো। কিন্তু তারা কা'বার এলাকায় প্রবেশের পূর্বেই হাওয়াজেন গোত্র তাদের পেছনে ধাওয়া করে ধরে ফেললো। ফলে শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ, সারা দিন যুদ্ধ চলার পরে রাতে কুরাইশরা কা'বা এলাকায় প্রবেশের সুযোগ পেলো। ফলে হাওয়াজেন গোত্র যুদ্ধে বিরতি দিল। কিন্তু তারপর দিন থেকে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হলো। ফিজারের এই শেষ যুদ্ধ ছিল ফিজার আল বারাদ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের পূর্বে আরো তিনবার ফিজার যুদ্ধ হয়েছিল। এ যুদ্ধ প্রথম হয়েছিল কেনানা এবং হাওয়াজেন গোত্রের মধ্যে। দ্বিতীয়বার হয়েছিল কুরাইশ এবং হাওয়াজেনের মধ্যে। তৃতীয় বার হয়েছিল হাওয়াজেন এবং কেনানা গোত্রের মধ্যে। সর্বশেষ ফিজার যুদ্ধে কুরাইশ এবং কেনানার যৌথ বাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন কুরাইশ গোত্রের হারব ইবনে উমাইয়া। তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের পিতা এবং হযরত মুয়াবিয়ার দাদা।

আরব ভূখণ্ডে নবী করীম (সাঃ) এর ইসলামী আন্দোলন শুরুর পূর্বে এটাই ছিল সেখানের লোকগুলোর বাস্তব অবস্থা এবং নানাবিধ জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়ে তারা নিশ্চিত ধ্বংস ও সর্বগ্রাসী অনলে ভস্ম হয়ে যাচ্ছিলো। এই অবস্থা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছিলো মহান আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক প্রেরিত নন্দিত আদর্শ ইসলাম। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবা কেরাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আগমন করে ইসলামী কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ফলে ইসলামের নান্দনিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করেছিলো আরব জাহানসহ সমগ্র পৃথিবীর মানুষ। যুগযুগ ব্যাপী যুদ্ধ ও অবর্ণনীয় অত্যাচারে জর্জরিত পরস্পর বিরোধী আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় ইসলামের ছায়াতলে

সমবেত হয়ে পরস্পর একই মোহনায় মিলিত হয়ে মানবেতিহাসে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো। মক্কা থেকে আগত মুসলমানদের প্রতি এই গোত্রদ্বয় এমন অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব ত্যাগ ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলো যে, যা আপন ভাইয়ের মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয় না।

ইসলামী বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করলে এভাবেই মানব জীবন সুন্দর, কল্যাণময় ও সজীব হয়ে ওঠে। ইসলাম পূর্ব অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

আল্লাহর সেই অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যা তিনি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন। তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে, অতপর তিনি তোমাদের মন পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ এভাবেই তাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করে ধরেন এই উদ্দেশ্যে যে, হয়ত বা এই নিদর্শনাবলী থেকে তোমরা তোমাদের কল্যাণের সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। (সূরা আলে ইমরান-১০৩)

অর্থাৎ তারা এমন ধরনের অন্যায়-অত্যাচারে পরস্পর অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো যে, জাতি হিসাবে তারা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যেতো। এই অবস্থাকেই আল্লাহ তা'য়ালা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের প্রান্তে দাঁড়ানোর সাথে তুলনা করে বলেছেন, ইসলামী জীবন বিধান অবতীর্ণ করে তিনি তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। কিভাবে রক্ষা করলেন, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদের পরস্পরের হৃদয় থেকে যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ ও অমানবিকতা বিদায় গ্রহণ করলো এবং তারা পবিত্র কোরআন পরিবেশিত সর্বোত্তম গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হলো। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দেয়া জীবন বিধানের অতুলনীয় সুন্দর রূপ-সৌন্দর্য এভাবেই সমুজ্জল করে তোলেন, এসব দেখে পৃথিবীর মানুষ যেন আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রতি

আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করে অনাবলি শান্তির পথ অনুসরণ করতে পারে। নন্দিত আদর্শ ইসলাম কিভাবে পরস্পরের মধ্য থেকে সকল তিক্ততা মুছে দিয়ে তাদের হৃদয়ে প্রেম, প্রীতি-ভালোবাসার বন্যা বইয়ে দিয়েছিলো তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং মানবেতিহাসে এ ধরনের কোনো দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না।

ইসলাম ও সার্বজনীন বিশ্বমানবিকতা

পৃথিবীর সকল মতবাদ মতাদর্শ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে সার্বজনীনতা অর্জনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত আদর্শসমূহের মধ্যে রয়েছে সঙ্কীর্ণতা, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, একশ্রেণীকে আরেক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার প্রবণতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি। ইসলাম-কেবলমাত্র ইসলামই সমগ্র মানবজাতির অধিকার রক্ষায় ইনসাফভিত্তিক বিধান উপহার দিয়েছে। ইসলাম বিশেষ কোনো গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, বর্ণ বা শ্রেণীকে সম্বোধন করেনি। সমগ্র মানবজাতিকে এভাবে আহ্বান জানিয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ–

হে মানুষ, তোমরা সেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব (স্বীকার) করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিলো তাদের (সবাইকে) সৃষ্টি করেছেন, আশা করা যায় (এর ফলে) তোমরা (যাবতীয় সঙ্কট থেকে) বেঁচে থাকতে পারবে। (সূরা আল বাক্বারা-২১)

মানুষ সঙ্কীর্ণ চিন্তা চেতনা, ক্ষুদ্র স্বার্থ, হিংসা-বিদ্বেষের কারণে যে সকল সমস্যায় জর্জরিত, যে সকল কারণে মানবজাতি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে, এ সকল সমস্যা থেকে মুক্তির একমাত্র মাধ্যম হলো নিজের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব করা। আর এ লক্ষ্যে ইসলাম মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বান জানিয়ে সকল মানুষকে সমস্যামুক্ত জীবন যাপনের পথ প্রদর্শন করেছে। পৃথিবীর সমগ্র ভূ-ভাগ, পানি সম্পদসহ অন্যান্য সকল সম্পদ কোনো দেশ বিশেষের একার নয়, বিশেষ কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীরও একার নয়। এসব কিছুই আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণেই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ–

তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য শয্যা বানালেন, আসমানকে বানালেন ছাদ এবং আসমান থেকে পানি পাঠালেন, তার সাহায্যে তিনি নানা প্রকারের ফলমূল উৎপাদন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন, অতপর জেনে বুঝে (এসব কাজে) আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে শরীক করো না। (সূরা আল বাক্বারা-২২)

আল্লাহ তা'য়ালা শুধুমাত্র 'রাব্বুল মুসলিমীন' বা মুসলমানদেরই প্রতিপালক নন, তিনি 'রাব্বুল আলামীন' সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক। সকল শ্রেণী, গোষ্ঠী ও বর্ণের মানুষই তাঁর দৃষ্টিতে সমান এবং সকলের জন্যেই তাঁর দান উন্মুক্ত অবারিত। সমস্যা ও সঙ্কট মুক্ত জীবন যাপনের লক্ষ্যে মানবজাতিকে তিনি যে বিধান বা জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন, সে জীবন ব্যবস্থা সকল মানুষের জন্যেই সমভাবে ইনসাফপূর্ণ। এ জন্যেই ইসলামই একমাত্র আদর্শ যা সার্বজনীন এবং বিশ্বমানবতা কেন্দ্রিক। ইসলামই একমাত্র আদর্শ, যা সাদা কালো এবং ধনী গরীবে মানুষ হিসেবে কোনো পার্থক্য করেনি। কোনো ধর্মের অবস্থা এমন যে, নিজ ধর্মগ্রন্থও তারা স্পর্শ করার অধিকার পায়নি, এমনকি ধর্মগ্রন্থের বাণীও শোনার অধিকার পায়নি। যদি কেউ ধর্মগ্রন্থের বাণী শোনে তাহলে তার শাস্তি হিসেবে কানে তপ্ত শিশা ঢেলে দেয়ার শাস্তির বিধান রয়েছে। এরা ধর্ম মন্দিরেও প্রবেশের অনুমতি পায় না। অথচ ইসলাম যে কোনো মানুষকে পবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ ও কোরআন পাঠের অনুমতি দিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, সকল মানুষের উৎপত্তি একই সুত্র থেকে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء–

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি (মাত্র) ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তা থেকে (তার) জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, (এরপর) তিনি তাদের (এই আদি জুড়ি) থেকে বহু সংখ্যক নর-নারী (পৃথিবীর চারদিকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা আন নেসা-১)

পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সম্বোধন করা হয়েছে, তার মধ্যে নারী ও পুরুষও রয়েছে। এই উভয় শ্রেণীর মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, নর ও নারী তা যে বর্ণ, গোত্র, অঞ্চলের ও ভাষারই হোক না কেনো, তারা একই উৎস থেকে প্রবাহিত মানবতার দুটি স্রোতধারা। বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল ও ভাষার কারণে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নর ও নারী একই জীবন সত্তা থেকে সৃষ্ট এবং একই বংশ থেকে নি:সৃত। পৃথিবীর এই বিপুল সংখ্যক নর ও নারী সেই একই সত্তা থেকে উদ্ভূত। নারী যেমন কোনো স্বতন্ত্র জীবসত্তা নয়, এবং পুরুষও পৃথক কোনো জীবসত্তা নয়। নারীও পুরুষের অনুরূপই মানুষ, পৃথক কোনো জীব নয়। উভয়ের মধ্যে মৌলিকতার দিক দিয়ে পার্থক্য নেই। পুরুষের মধ্যে যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা নারীর মধ্যেও বিদ্যমান। এসব দিক দিয়ে উভয়ে উভয়ের একান্তই কাছের এবং ঘনিষ্ঠ। নারী ও পুরুষ এ দুয়ে মিলেই বিশ্বমানবতার এক অভিন্ন অবিভাজ্য সত্তা। মৌলিক মানবাধিকার থেকে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ–

হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে এর মাধ্যমে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে আল্লাহ তা'য়ালাকে বেশী ভয় করে। (সূরা আল হুজুরাত-১৩)

উল্লেখিত আয়াত এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পৃথিবীর সকল মানুষ, সকল যুগ ও কালের, সকল দেশ, জাতির ও বংশের মানুষকে কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষই সমান, এখানে কেউ ছোট, কেউ বড়, কেউ উচ্চ আবার কেউ নিচু নয়। সৃষ্টিগতভাবে কেউ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্টও নয়। সকল মানুষের দেহেই একই প্রাণসত্তার রক্ত প্রবাহিত। পৃথিবীর সকল মানুষই একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকেই সৃষ্ট। পৃথিবীর এমন কোনো পুরুষ নেই, যার সৃষ্টি ও জন্মের ক্ষেত্রে নারীর প্রত্যক্ষ অবদান নেই। এমন কোনো নারীও নেই, যার জন্মের ক্ষেত্রে কোনো পুরুষের প্রত্যক্ষ যোগ অনুপস্থিত। ঠিক এ কারণেই নারী ও পুরুষ কেউই কারো ওপর কোনোরূপ মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি

করতে পারে না। কেউই অপর কাউকে জন্মগত কারণে হীন, নীচ, নগণ্য ও ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট বলে ঘৃণাও করতে পারে না। মানবদেহের সংগঠনে পুরুষের সাথে নারীরও যথেষ্ট অংশ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। বরং মেডিক্যাল সাইন্সের দৃষ্টিতে মানবদেহ গঠনে নারীর অংশই বেশী থাকে।

নর ও নারীর সৎকাজে ইসলাম কোনো পার্থক্য করেনি। ইসলাম নারীর মর্যাদা সমুন্নত রেখে ঘোষণা করেছে–

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ–

নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করে দিই না তোমাদের মধ্য থেকে কোনো আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তোমরা পরস্পর পরস্পর থেকে, আসলে এক ও অভিন্ন। (সূরা আলে ইমরান-১৯৫)

নর ও নারী একই প্রকৃত ও মূল থেকে উদ্ভূত এবং তারা পরস্পরের সাথে এমনভাবে জড়িত ও মিলিত যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের প্রাচীর গড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইসলামের দৃষ্টিতে নর ও নারী সমান, সেই অনুযায়ী আমল করার দায়িত্বও দুইজনের সমান এবং সমানভাবেই সে আমলের সওয়াব লাভের অধিকারী। নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ–

নারীরা হচ্ছে পুরুষদের পোশাক, আর তোমরা পুরুষরা হচ্ছো নারীদের পোশাক। (সূরা আল বাক্বারা-১৮৭)

শোষিত নিপিড়ীত ও নির্যাতিত মানবতার মুক্তির দিশারী নবী করীম (সা:) নারীদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন–

اِنَّمَاالنِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِجَالِ–

নারীরা যে পুরুষেরই অর্ধাংশ অথবা সহোদর এতে কোনো সন্দেহ নেই। (তিরমিযী, আবু দাউদ, আহমাদ)

ইসলামী জাতিয়তায় এটাই নর ও নারীর অবস্থান। অন্যায় অপরাধে দণ্ডিত হলে কারো শাস্তি যেমন হ্রাস বৃদ্ধি করা হয় না, তেমনি সৎকাজেও কারো বিনিময় হ্রাস বৃদ্ধি করা হবে না। নিজ কর্মের মাধ্যমে একজন পুরুষও যেমন সুউচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম এবং একজন নারীও অনুরূপ মর্যাদা অর্জনে সক্ষম।

মানবসৃষ্ট সঙ্কীর্ণ জাতিয়তাবাদ, ধর্মমত ও অন্যান্য আদর্শ নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা প্রদানে শুধু ব্যর্থই হয়নি, নারীকে মানুষ হিসেবেই গণ্য করেনি। ইয়াহূদী ধর্মে নারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে, 'পুরুষের প্রতারক' হিসেবে। আদি পুস্তক তথা ওল্ড টেষ্টামেন্টে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আ:) এর বহিষ্কার কাহিনী এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডেকে বললেন, তুমি কোথায়? তিনি বললেন, আমি উদ্যানে, তোমার আওয়াজ শুনে ভীত হলাম। কারণ আমি উলঙ্গ, তাই নিজেকে লুকিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি যে উলঙ্গ তা তোমাকে কে বললো? যে বৃক্ষের ফল খেতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল খেয়েছো? আদম বললেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করে যে স্ত্রী দিয়েছো, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়েছিলো, তাই খেয়েছি। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে বললেন, তুমি এ কি করলে? নারী বললেন, সাপ আমাকে ভুলিয়েছিলো, তাই খেয়েছি। (আদি পুস্তক, মানব জাতির পাপের পতন- ১০-১১ ক্ষেত্র)

উল্লেখিত বর্ণনার স্পষ্ট অর্থ, জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হওয়া আদম মানব মণ্ডলীর জন্যে অভিশাপ বিশেষ এবং এ অভিশাপের মূল কারণ হচ্ছে একজন নারী আর তিনিই হচ্ছেন আদমের স্ত্রী হাওয়া। এ জন্যে নারী জাতি তাদের সমাজে চিরলাঞ্ছিতা এবং জাতিয় অভিশাপ বিশেষ ও ধ্বংস বা পতনের কারণ। এ কারণেই নারীর ওপর প্রভুত্ব করার স্বাভাবিক অধিকারী পুরুষগণ। আর এ অধিকার হাওয়া কর্তৃক আদমকে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানোর শাস্তি বিশেষ। যতদিন নারী জীবিত থাকবে ততদিন তাকে এ শাস্তি ভোগ করতেই হবে। এ কারণে ইয়াহূদী আদর্শে নারী ক্রীতদাসীর তুলনায়ও অধম। পিতা নিজের কন্যাকে নগদ মূল্যে বিক্রি করার অধিকারী এবং কন্যাগণ পিতার সম্পত্তিতে ওয়ারিস হিসেবে গণ্য নয়। গণ্য কেবল তখনই হতে পারে যখন পিতার কোনো পুত্র সন্তান না থাকে। ইসলাম পূর্ব যুগে মদীনার ইয়াহূদী বাদশাহ 'ফিতুম' আইন জারী করেছিলো, 'যে মেয়েরই বিয়ে হবে, স্বামীর কাছে যাবার পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে তার কাছে এক রাত অতিবাহিত করতে হবে'।

হিন্দু ধর্মে মনু সংহীতায় নারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'স্রষ্টা কোনো মানুষকে যদি হাজার বছর জীবন দান করতেন এবং সেই সাথে তাকে হাজারের অধিক মুখ দিতেন, এবং সে হাজারের অধিক মুখ দিয়ে হাজার বছর ধরে নারীর দোষত্রুটি বর্ণনা করলেও নারীর দোষ বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না'। প্রাচীন যুগে হিন্দু পুরোহিতদের বিশ্বাস ছিলো, পারিবারিক জীবন বর্জন না করলে কোনো মানুষ জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবে না। মনু বিধান দিয়েছেন, 'পিতা বা স্বামী ও সন্তানের কাছ থেকে কোনো কিছু পাবার মতো অধিকার নারীর নেই'। এক সময় সহমরণ প্রথা চালু ছিলো। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও স্বামীর চিতার জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দিতে হতো। পরবর্তীকালে বিধান দেয়া হলো, স্বামীর মৃত্যুর পরে নারীকে চির বৈধব্যের জীবন অতিবাহিত করতে হবে। কোনো ধরনের স্বাদ, আনন্দ উৎসবে যোগ দেয়া তার জন্যে চিরদিনের তরে নিষিদ্ধ। মাথার চুল ছোট বা ন্যাড়া করতে হবে, সাদা কাপড় পরতে হবে আতপ চালের ভাত ও নিরামিষ খেয়ে জীবন যাপন করতে হবে। প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, মৃত্যু, অগ্নি, সর্প, বিষ ও নরক, এর কোনো একটিও নারীর তুলনায় মারাত্মক ও ক্ষতিকর নয়। যুবতী নারীদেরকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হতো এবং বিখ্যাত মন্দিরগুলোয় তাদেরকে দেবদাসী হিসেবে রেখে পুরোহিতদের লালসা পূরণের সামগ্রীতে পরিণত করা হয়েছিলো।

খৃষ্টীয় আদর্শ অনুসরণকারীদের বিভিন্ন দল উপদলের কাছে নারী ছিলো সকল পাপ, অন্যায় ও অপবিত্রতার উৎস। নারী হলো শয়তানের বাহন এবং প্রবেশ পথ। নারী এমন বিষধর সর্প যা পুরুষকে দংশন করতে কখনো দ্বিধা করেনি। এথেন্সে এক সময় পশু বিক্রির ন্যায় নারী বিক্রির বাজার ছিলো। ইংরেজদের দেশে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত আইন ছিলো যে, পুরুষ তার স্ত্রীকে বিক্রি করতে পারে। ১৮ শতকের শেষভাগে ফরাসী পার্লামেন্টে দাস প্রথার বিরুদ্ধে যে আইন পাশ করা হয়েছিলো, তার মধ্যে নারীকে গণ্য করা হয়নি। ৫৮৬ সালে পাদ্রীরা একত্রিত হয়ে বহু তর্কবিতর্ক ও চিন্তা গবেষণার পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো, নারীরা পশু নয়, মানুষ বটে। মানুষ হলেও তারা কোনো ধরনের অধিকার লাভের যোগ্য নয়। অপরদিকে ইসলামী জাতিয়তা উদার দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে ঘোষণা করেছে, 'মাতার পদতলে সন্তানের বেহেশ্ত এবং পিতার তুলনায় সন্তানের কাছ থেকে মাতা তিনগুণ বেশী উত্তম আচরণের অধিকারিণী'। মানব রচিত জাতিয়তাবাদ নারীকে এক সময় মানুষ

হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়নি, যখন তাকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তখন তাকে ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করেছে। কেবলমাত্র ইসলামই নারীকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে উঠিয়ে মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। ইসলাম একটি উদার এবং বিশ্বমানবিক মতাদর্শ, এখানে সঙ্কীর্ণতার কোনো স্থান নেই।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিশেষ কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করার কারণে কেউ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না। ইসলামী জাতিয়তা এ অধিকার কাউকে প্রদান করেনি। এ পৃথিবীতে কোনো মানুষই নিজ ইচ্ছায় বিশেষ কোনো দেশ ও স্থান নির্বাচন করে জন্মগ্রহণ করতে পারে না। কে কোথায় জন্মগ্রহণ করবে এ বিষয়টি সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ–

তিনি তোমাদের মাত্র একটি ব্যক্তি সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি বানিয়ে দিলেন তোমাদের থাকার জায়গা ও মালসামান রাখার জায়গা। (সূরা আল আনয়া'ম-৯৮)

পবিত্র কোরআনের সূরা হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে এর মাধ্যমে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে আল্লাহ তা'য়ালাকে বেশী ভয় করে'। জাতি ও গোত্রের পার্থক্য শুধুমাত্র পারস্পরিক পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। পরস্পরে ঘৃণা বিদ্বেষ ও গৌরব অহঙ্কার অথবা সংঘর্ষে লিপ্ত হবার উদ্দেশ্যে নয়। এ বাহ্যিক পার্থক্যের কারণে মানবতার মৌলিক ঐক্য ভুলে যাওয়ার সুযোগ ইসলাম দেয়নি। বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করার কারণে একশ্রেণীর পথভ্রষ্ট মানুষ জাতিয়তাবাদের যে ঘৃণ্য মতবাদের জন্ম দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে এক সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপক বিপর্যয়, হিংসা-বিদ্বেষ ও চরম অশান্তি সৃষ্টি করেছে, তা সংশোধন করার জন্যেই মানুষকে মহান আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মূলতঃ তোমরা একজন পুরুষ ও নারী থেকেই সৃষ্টি হয়েছো।

সুদূর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া প্রাচীনতম কাল থেকে বর্তমান আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগেই মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব ভুলে গিয়ে নিজেদের চতুষ্পার্শ্বে জাতিয়তার নামে এমন সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনী রচিত করেছে যে, এই পরিবেষ্টনীর মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদেরকে আপনজন হিসেবে গ্রহণ করেছে, আর যারা এই ভৌগলিক পরিবেষ্টনের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদেরকে অপর বা শত্রুপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ভৌগলিক এই পরিবেষ্টনী কোনো নীতি, আদর্শ, বিবেক-বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও নৈতিকতার ভিত্তিতে নির্মিত হয়নি, নির্মিত হয়েছে জন্মস্থানের ওপর ভিত্তি করে। অথচ জন্মস্থান নির্ধারণে মানুষের কোনো ইচ্ছা স্বাধীনতা নেই। সঙ্কীর্ণ এই জাতিয়তাবাদের পরিবেষ্টনী গড়তে গিয়ে কোথাও ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে বংশ বা পরিবার অথবা গোত্র, আবার কোথাও অভিন্ন ভৌগলিক সীমা রেখাসম্পন্ন ভূখণ্ড, বিশেষ কোনো বর্ণধারা অথবা বিশেষ কোনো ভাষা। আর এগুলোই হলো মানুষে মানুষে পার্থক্যের প্রাচীর নির্মাণে আধুনিক জাহিলী ভিত্তি।

এই অবাস্তব অবৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন ভিত্তিসমূহের ওপর নির্ভর করে পর ও আপনের মধ্যে যে পার্থক্য রেখা সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটাও শেষ পর্যন্ত ঐ সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। একই জাতিয়তাবাদের পরিবেষ্টনে যাদেরকে আবদ্ধ করা হয়েছে, তাদের প্রতিও ইনসাফভিত্তিক আচরণ করা সম্ভব হয়নি। অথচ জাতিয়তাবাদ রচনাকালে এ ধারণা প্রচার করা হয় যে, এ জাতিয়তার অধীনে যারা রয়েছে সকলের সাথে সহযোগিতামূলক সমআচরণ করা হবে। জাতিয়তার রেখা টেনে যে পার্থক্যের সৃষ্টি করা হলো, তা হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা- জিঘাংসা, শত্রুতা, অপমান, লাঞ্ছনা এবং জুলুম নির্যাতনের নিকৃষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। জাতিয়তাবাদের সকল জুলুম অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়নকে বৈধতা দেয়ার লক্ষ্যে নানাবিধ দার্শনিক তত্ত্ব ও মতাদর্শ রচিত হয়েছে। নিত্য নতুন ধর্মের জন্ম দিয়ে নানা আইন ও বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। তৈরী করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের নৈতিক রীতি নীতি। আর এসব কিছুকে রাষ্ট্রসমূহ স্থায়ী পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এরই ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে।

এরই ভিত্তিতে ইয়াহূদী সম্প্রদায় নিজেদেরকে স্রষ্টার সর্বাধিক পছন্দের জাতি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছে। এ ধর্মগ্রন্থ এমনভাবে রচিত হয়েছে যে, ইয়াহূদী ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য সকল মানুষকে পশু থেকেও অত্যন্ত নীচ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এমনকি ইয়াহূদীদের ক্ষুদ্র থেকে

ক্ষুদ্রতম স্বার্থের জন্যে অ-ইয়াহূদীদের নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যার আদেশ রচনা করা হয়েছে। ফিলিস্তিনী মুসলিমদের ক্ষেত্রে তারা এর বাস্তব প্রমাণও প্রদর্শন করছে। নিজ স্বার্থে রচিত ধর্মগ্রন্থানুযায়ী তারা নিজেদেরকে সকল মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করে সমগ্র পৃথিবীর শাসনদণ্ড নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রভাবশালী বিভিন্ন দেশের প্রশাসনিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে শাসকদের ওপরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। একই লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন দেশে আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়ে সকল কিছুকেই প্রভাবিত করছে। রাষ্ট্রের চালিকা শক্তির সকল পর্যায়ে তারা অনুপ্রবেশ করেছে অথবা তাদের মাসোহারা প্রাপ্ত সেবকদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ঘৃণ্য এই জাতিয়তাবাদের কারণেই হিন্দু সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথার উদ্ভব ঘটেছে এবং নিজ স্বার্থে ধর্মগ্রন্থও রচিত হয়েছে। ধর্মগ্রন্থানুযায়ী ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে মানবশ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য সকল মানুষকে হীন থেকে হীনজীবে পরিণত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য মানুষের ছায়া মাড়ালেও ব্রাহ্মণ অপবিত্র হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একই জাতিয়তাবাদের পরিবেষ্টনে পরিবেষ্টিত শূদ্র শ্রেণীর মানুষকে 'হরিজন' নাম দিয়ে চরম ঘৃণা, লাঞ্ছনা, অবহেলা ও অপমানের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। প্রায়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে অগণিত জীবন্ত মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পবিত্রস্থানসমূহ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহায়-সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে। এসবই করা হচ্ছে সঙ্কীর্ণ জাতিয়তাবাদের উগ্র উদ্দীপনায়।

পশ্চিমা দুনিয়ার সভ্যতাগর্বীরা কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে পার্থক্যরেখা সৃষ্টি করে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর জুলুম নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চালিয়ে দিচ্ছে। ক্ষুদ্রগণ্ডীতে আবদ্ধ জাতিয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে শুধুমাত্র নিজেদের ভোগ বিলাস অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে হামলা চালিয়ে অগণিত আদম সন্তানের রক্তের প্লাবন প্রবাহিত করে সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে। সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারা তাড়িত হয়ে হার্জেগোভিনা ও বসনিয়ায় মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে এবং নির্লজ্জের মতো হুঙ্কার দিয়ে বলা হয়েছে, 'ইউরোপের বুকে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র সহ্য করা হবে না'। খৃষ্টীয় জাতিয়তাবাদী চেতনায় তাড়িত আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট

বুশ ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে আমাদের সভ্যতা গ্রহণ করতে হবে'।

ইউরোপের লোকজন আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করে রেড-ইণ্ডিয়ানদের সাথে পশুসুলভ আচরণ করে মানবতাকে কলঙ্কিত করেছে। ইউরোপ ও আমেরিকা সম্মিলিতভাবে সমগ্র মুসলিম দুনিয়ায় শোষণ চালিয়ে আসছে এবং এ শোষণ ও কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রতিদিন মুসলিমদের রক্তে স্নান করছে। কোনো মুসলিম দেশেই নিজেদের পছন্দের বিপরীত কোনো শাসক বা রাজনৈতিক দল ও আদর্শকে তারা বরদাস্ত করছে না। এ সকল কিছুর মূলেই রয়েছে জাতিয়তাবাদের উগ্র সহিংস চেতনা। এই চেতনা দ্বারা তাড়িত হয়েই ইউরোপ ও আমেরিকা নিজেদের দেশ ও জাতির বাইরে জন্মগ্রহণকারী মানুষের প্রাণ, সম্পদ, সম্মান-মর্যাদাকে নিজেদের ঐচ্ছিক সম্পদে পরিণত করে নির্বিচারে লুণ্ঠন করছে। নির্যাতিত দেশসমূহের মালিকদেরকে নিজেদের ভৃত্যে পরিণত করছে অথবা তাদেরকে বংশধরসহ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে পাশ্চত্যের জাতিসমূহের সহিংস জাতিয়তাবাদ তাদেরকে এমন হিংস্র হায়েনায় পরিণত করেছে যে, নিজেদেরই রচিত সাধারণ নিয়ম নীতি ও নৈতিকতাকেও তারা নূন্যতম সম্মান প্রদর্শন করছে না। এককালে কসাইখানার জন্যে আমেরিকায় যে স্থানটি নির্ধারিত ছিলো, সেখানে জাতিসংঘ ভবন নির্মাণ করে উক্ত ভবনে বসেই পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহকে লোমহর্ষক পদ্ধতিতে জবেহ করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের সাম্প্রদায়িক জাতিয়তাবাদীরা নিজেরা সকল ধরনের মারণাস্ত্র প্রস্তুত করে রাখলেও অন্যান্য জাতিকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় অস্ত্র যোগাড়ের সুযোগ দিতে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। শুধুমাত্র নিজেদের অর্থব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এরা গণতন্ত্র রক্ষার নামে পৃথিবীর বহু দেশে বন্য হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিদিন অগণিত মানুষের প্রাণহরণ করছে।

এই পশুত্ব, বর্বরতা, হিংস্রতা ও নীচুতা থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যেই নন্দিত আদর্শ ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করেছে, সকল মানুষের মূল উৎস এক ও অভিন্ন। একজন পুরুষ আর একজন নারী থেকেই সমগ্র মানব প্রজাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের যতগুলো বংশ ও গোত্র রয়েছে, তা সবই মূলত একটি প্রাথমিক বংশেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র, এসব শাখা প্রশাখার সূচনা হয়েছিলো একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। সঙ্কীর্ণ জাতিয়তার যে ধারণা মানুষের মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা

সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মানব সৃষ্টির ধারায় কোথাও কোনো পার্থক্য অথবা উঁচু-নীচুর তারতম্য নেই। মানুষের বিভিন্ন বংশ, গোত্র এবং জন্মের স্থান বিভিন্ন স্রষ্টার সৃষ্টি নয়। সকলকেই সেই একই আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন। তিনি একই প্রাণ-জীবাণু থেকে সকলকে সৃষ্টি করেছেন। কিছু সংখ্যক মানুষকে পবিত্র ও উন্নতমানের প্রাণ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর কিছু সংখ্যক মানুষকে অপবিত্র নিম্নমানের সৃষ্টি বীজ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ ধারণা করার কোনো অবকাশ নেই।

সমগ্র মানুষের সৃষ্টির পদ্ধতি ও নিয়ম এক এবং অভিন্ন। সকল মানুষের দেহেই সেই একই পিতামাতার শোনিত ধারা প্রবাহিত। মূলের দিক দিয়ে সকল মানুষের এক ও অভিন্ন হওয়ার পরও বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে মানুষের বিভক্ত হওয়া অতি স্বাভাবিক বিষয়। সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষ একই বংশোদ্ভূত হতে হবে, এটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। মানব বংশ বৃদ্ধির ফলে অসংখ্য অগণিত বংশে বিভক্ত হওয়া এবং এসব বংশের সমন্বয়ে নানা গোত্র এবং জাতি গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা, অঞ্চল এবং বিশেষ বিশেষ ভৌগলিক পরিবেশে অবস্থানের কারণে মানুষের বর্ণ, আকৃতি, ভাষা, উচ্চারণভঙ্গী, সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা রকম হওয়াও একান্তই স্বাভাবিক। একই ভৌগলিক পরিবেশে বসবাসকারী মানুষদের পরস্পর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া এবং দূরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব সৃষ্টি হওয়াও স্বাভাবিক।

এই স্বাভাবিক পার্থক্য ও বৈষম্যকে ভিত্তি হিসেবে ধরে মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ, ভদ্র-অভদ্র, হীন ও মহান ইত্যাদির পার্থক্য সৃষ্টি করা কোনোক্রমেই বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। ইসলাম এ ধরনের পার্থক্য রেখা অঙ্কনের ঘোর বিরোধী। এক বংশের লোক অন্য বংশের লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের অধিকারী হবে কোন্ যুক্তিতে? এক বর্ণের লোকজন অন্য বর্ণের লোকজনের তুলনায় উত্তম বা হীন নীচ হবে কোন্ কারণে? একটি জাতি অপর একটি জাতির ওপর নিজের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে এবং মানবীয় অধিকারে এক শ্রেণীর লোক আরেক শ্রেণীর লোকদের তুলনায় অগ্রাধিকার লাভ করবে কিসের ভিত্তিতে?

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করে তাকে বিভিন্ন গোত্রে ও বর্ণে বিভক্ত করেছেন কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়। সৃষ্টিগতভাবে এই বিভক্তির মূলে পারস্পরিক পরিচিতি এবং একে অপরকে সহযোগিতা করবে এই উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে। একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে এবং পরস্পর

পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে একটি গোত্র ও জাতির লোকজন পরস্পর মিলিত হয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নন্দিত সমাজ সংস্থা নির্মাণ করবে। এভাবে তারা একে অপরের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে জীবনকাল অতিবাহিত করবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই উদ্দেশ্যেই মানুষকে নানা বংশ, গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের পারস্পরিক পরিচিতি লাভের মাধ্যম যে বিষয়টিকে বানিয়েছেন, মানুষ মূর্খতাসুলভ আচরণের মাধ্যমে সেটিকে গর্ব, অহঙ্কার, বিভেদ- বিচ্ছেদ, হিংসা-বিদ্বেষের হাতিয়ার বানিয়ে এক এলাকার মানুষ আরেক এলাকার মানুষের ওপর নির্যাতন করবে, এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং শয়তানী প্রবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ইসলাম ঘোষণা করেছে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য ও প্রাধান্য নেই, তবে একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে। পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা, প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহভীরুতা তথা নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব। এক ব্যক্তি অন্য আরেক ব্যক্তির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রাধান্য ও মর্যাদা লাভ করতে পারে নৈতিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। যে মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে ভয় করে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার, মিথ্যাচারিতা, হঠকারিতা, অহঙ্কার, আত্মম্ভরীতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ- লালসা ইত্যাদি পরিহার করে এবং কুপ্রবৃত্তি দমন করে চলে, সৎকাজ ও পবিত্রতার দিকে দিয়ে যে ব্যক্তি অগ্রগামী, সেই ব্যক্তিই অন্যদের তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। আর এ বিষয়টি সকল দিক দিয়ে যুক্তিসঙ্গত এবং সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য।

এই ধরনের মানুষ যে বংশ, গোত্র, বর্ণ, দেশ ও জাতিরই হোক না কেনো, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার কারণেই সে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। আর যে মানুষ এর বিপরীত চরিত্র, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে, সে মানুষ অবশ্যই কম মর্যাদার অধিকারী হবে। সে ব্যক্তি যে কোনো বংশ, গোত্র বা জাতিরই হোক না কেনো। পবিত্র কোরআন এভাবেই সঙ্কীর্ণ জাতিয়তার চেতনা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। নবী করীম (সা:) মক্কা বিজয়ের পর মহান আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ শেষে সর্বপ্রথম যে বক্তৃতা করেছিলেন সে বক্তৃতায় তিনি আঞ্চলিক, ভৌগলিক, ভাষা ও বর্ণভিত্তিক সকল সঙ্কীর্ণ জাতিয়তাবাদের চেতনায় কুঠারাঘাত হেনে বলেছিলেন—

الحمد لله الذى اذهب عنكم عيبة الجاهلية وتكبرها- ياايها الناس-
الناس رجلان-برتقىء كريم على الله- وفاجر شقى هين على الله-
الناس كلهم بنو ادم وخلق الله ادم من تراب-

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার, যিনি তোমাদের মধ্য থেকে মূর্খতার সকল দোষত্রুটি এবং যুগসঞ্চিত সকল গর্ব ও অহঙ্কার বিদূরিত করে দিয়েছেন। হে মানব মণ্ডলী! সকল মানুষ মাত্র দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর অনুগত, আল্লাহভীরু এবং সৎকর্মশীল। এরা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত মর্যাদাবান। আরেকটি শ্রেণীর মানুষ পাপিষ্ঠ, দুষ্কৃতিকারী, পাপপ্রবণ ও হতভাগ্য। এ শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার কাছে চরমভাবে অভিশপ্ত লাঞ্ছিত। প্রকৃত বিষয় হলো, সকল মানুষই আদমের সন্তান। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আদমকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকার উপাদান থেকে। (তিরমিযী, বায়হাক্বী- শুআ'বুল ঈমান)

পবিত্র মক্কা নগরী পৃথিবীর সকল মুসলমানের মাথার মণি, কিন্তু সেখানের অধিবাসীদেরকে মক্কার বাইরের অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীর ওপর মর্যাদা প্রদান করা হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ-

(মক্কাকে) আমি স্থানীয় ও অস্থানীয় নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য একই রকম বানিয়েছি। (সূরা আল হাজ্জ-২৫)

কুফর এবং শিরকের পর ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু হলো বংশীয়, গোত্রীয়, স্বদেশভিত্তিক আভিজাত্য ও হিংসা বিদ্বেষ। নবী করীম (সাঃ) এর দীর্ঘ ২৩ বছরের আন্দোলন ছিলো কুফর ও আভিজাত্য ভিত্তিক সঙ্কীর্ণ জাতিয়তার বিরুদ্ধে। তাঁর মহান উদ্দেশ্যই ছিলো এই মূর্খতাকে চিরতরে নির্মূল করা। ইসলামের ইতিহাস ও নবী করীম (সাঃ) এর জীবনেতিহাসের সকল গ্রন্থ পাঠ করলে এ সত্যই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তিনি মানুষের রক্ত, বর্ণ, ভাষা, মাটি ও উচ্চ নীচের পার্থক্যকে নির্মূল করেছেন এবং মানুষের পারস্পরিক বিরোধ বৈষম্যের অস্বাভাবিক দুর্ভেদ্য প্রাচীর চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতিকে সমান ও একিভূত করেছেন। নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَّاتَ عَلَى الْعَصَبِيَّةِ لَيْسَ مِنَّا دَعَى اِلَى الْعَصَبِيَّةِ لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى الْعَصَبِيَّةِ-

আভিজাত্যবোধ এবং হিংসা বিদ্বেষ আঁকড়ে ধরে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, যে ব্যক্তি সেদিকে অন্য মানুষদের আহ্বান জানায় এবং সে জন্য যে যুদ্ধ সংগ্রাম করে, সে ব্যক্তি আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। (বোখারী)

কোন্ কারণে মানুষের মর্যাদা হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে এবং মানুষে মানুষে পার্থক্য হতে পারে, সে রেখা অঙ্কন করে তিনি ঘোষণা করেছেন-

لَيْسَ لاَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى اَحَدٍ اِلاَّ بِدِيْنٍ وَتَقْوَى- اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ أَدَمَ وَأَدَمُ مِنْ تُرَابٍ-

আল্লাহভীরুতা ব্যতীত অন্য কোনো ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া যেতে পারে না। সকল মানুষই আদমের সন্তান আর আদমকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিদায় হজ্জ আদায়কালে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে নবী করীম (সা:) এক বক্তৃতায় বলেছিলেন-

يا ايها الناس-الان ربكم واحد- لافضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى-ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى-ان اكرمكم عند الله اتقكم- الاهل بلغت؟ قالوا بلى يارسول الله- قال فليبلغ الشاهد العائت-

হে মানব মণ্ডলী! তোমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করো, তোমাদের আল্লাহ মাত্র একজন। কোনো আরব লোকের ওপর কোনো অনারব লোকের, কোনো অনারব লোকের ওপর কোনো আরব লোকের, কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের এবং কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গের একবিন্দু পরিমাণও শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য নেই। মর্যাদা, প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে শুধুমাত্র আল্লাহভীরুতার দিক দিয়ে, আল্লাহভীরুতার বিচারে। মহান আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত হলো সেই ব্যক্তি, যে সর্বাপেক্ষা

বেশী আল্লাহভীরু- আল্লাহর অনুগত। তোমরাই বলো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছি? সমবেত লোকজন বললো, জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। তিনি বললেন, তাহলে এখানে যারা উপস্থিত আছো, তারা যেনো সেই লোকদের কাছে এসব কথা পৌছে দেয় যারা এখানে উপস্থিত নেই। (বায়হাক্বী)

স্বদেশ, বংশ, গোত্র, বর্ণ ও ভাষাভিত্তিক জাতিয়তাকে নবী করীম (সাঃ) ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিয়ে ঘোষণা করেছেন–

لَاَفَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلَى عَجَمِىٍّ وَلاَ لِعَجَمِىٍّ عَلَى عَرَبِىٍّ كُلُّكُمْ اَبْنَاءُ أٰدَمَ–

আরবের ওপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, অনারবের ওপর আরবেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। (বোখারী)

ইসলাম সাদা-কালো, আরব- অনারব, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোনো ব্যবধান রাখেনি। সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষই সমান মর্যাদার অধিকারী। নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন–

لَاَفَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلَى عَجَمِىٍّ وَلاَ لِعَجَمِىٍّ عَلَى عَرَبِىٍّ وَلاَ لِاَبْيَضَ عَلَى اَسْوَدَ وَلاَ لِاَسْوَدَ عَلَى اَبْيَضَ اِلاَّ بِالتَّقْوَى–

অনারবের ওপর আরবের, আরবের ওপর অনারবের এবং শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের এবং কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনোই বিশেষত্ব নেই। শুধুমাত্র আল্লাহভীরুতার দিক দিয়েই এ বিশেষত্ব হতে পারে। (যাদুল মায়া'দ)

বংশ, গোত্র, বর্ণ, জাতি ও দেশের গৌরব করা ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিশ্বনবী (সাঃ) জানিয়ে দিয়েছেন–

كلكم بنوادم و ادم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بابائهم اوليكو نن اهون على الله من الجعلان–

তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। আর আদম মৃত্তিকা উপাদান থেকে সৃষ্টি। মানুষের উচিত তাদের পিতা দাদার নামে গৌরব প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা। নতুবা তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে এক নিকৃষ্টতম কীট থেকেও অধিক লাঞ্ছিত হবে। (বাজ্জার)

ইসলাম ঘোষণা করেছে, কে কোন্ দেশের মানুষ এবং কে কোন্ বর্ণের, কোন্ গোত্রের বা কোন্ জাতির, এ প্রশ্ন আল্লাহ তা'য়ালা করবেন না। আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে কোন্ মানুষ নিজেকে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকেছে এ বিষয়টিই আল্লাহ তা'য়ালা দেখবেন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

ان الله لايسئلكم عن احسابكم ولاعن اسا بكم يوم القيامة ان اكرمكم عند الله اتقكم–

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে তোমাদের বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানীত হলো সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু- আল্লাহর অনুগত। (ইবনে জারীর)

আল্লাহভীরু কোনো ব্যক্তি, তিনি যে বর্ণের, ভাষার, গোত্রের বা দেশেরই হন না কেনো, তিনি যদি মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার উপযুক্ত হন, তাহলে তাঁরও আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন নবী করীম (সাঃ)। তিনি বলেছেন–

اِسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيْبَةٌ–

কিসমিস (ক্ষুদ্র জাতের শুকনো আঙ্গুর) আকৃতির (ক্ষুদ্র) মাথা বিশিষ্ট কোনো হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের রাষ্ট্রনেতা নিযুক্ত করা হয়, তবুও তোমরা তার কথা শুনবে, মানবে এবং তার পূর্ণ আনুগত্য করবে। (বোখারী)

মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী নিজেদের গোত্র, বংশ, ভাষা, এলাকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিজেদেরকে অন্যদের তুলনায় অভিজাত হিসেবে বিবেচনা করতো। মক্কা বিজয়কালে মুসলিম শক্তির কাছে যখন তাদের দুর্বিনীত মস্তক অবনমিত হলো, তখন নবী করীম (সাঃ) তাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন–

اَلاَ كُلُّ مَا ثَرَةٍ اَوْ دَمٍ اَوْ مَالٍ يُدْعَى فَهُوَ تَحْتَ قَدَمِىْ هَاتَيْنِ–

জেনে রেখো, আভিজাত্যবোধ, অহমিকা, অহঙ্কার, গৌরব ইত্যাদির সকল সম্পদ, রক্ত ও সম্পত্তি সম্পর্কিত সকল অভিযোগ আজ আমার দুই পায়ের নীচে নিষ্পিষ্ট।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সম্মুখে অবনত মস্তকে উপবিষ্ট আত্মম্ভরী কুরাইশদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন–

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِنَّ اللهَ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نُخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا الاَبَا–

হে কুরাইশ সম্প্রদায়! মহান আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জাহেলী যুগের সকল হিংসা বিদ্বেষ, গর্ব অহঙ্কার, আভিজাত্য এবং পৈত্রিক গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ নির্মূল করেছেন।

তিনি তাঁর বলা অমূল্য কথাগুলো উপস্থিত মানুষের মর্মমূলে প্রবেশের সময় দিয়ে পুনরায় বললেন–

اَيُّها النَّاسُ كُلُّكُمْ مِنْ أدَمَ وَأدمُ مِنْ تُرَابٍ– لاَفَخْرَ لِلاَنْسَابِ لاَفَخْرَ لِلْعَرَبِىِّ عَلَى الْعَجَمِىِّ وَلاَ لِلْعَجَمِىِّ عَلَى الْعَرَبِىِّ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ–

হে মানব সম্প্রদ্রায়! তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। আর আদমকে মৃত্তিকার উপাদান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বংশ গৌরবের কোনোই অবকাশ নেই। অনারবের ওপর আরবের, আরবের ওপর অনারবের কোনোই শ্রেষ্ঠত্ব বা গৌরব নেই। তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানীত ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি সর্বাধিক আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে।

মানুষ কে কি বর্ণের, কার আকৃতি কেমন এবং মানুষের ধন-সম্পদ কি পরিমাণ, এসবের দিকে আল্লাহ তা'য়ালা দৃষ্টি দেন না। তিনি মানুষের হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি দেন। নবী করীম (সা:) বলেছেন–

ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم–

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের আকার আকৃতি ও ধন সম্পদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তোমাদের হৃদয় ও কাজের প্রতি। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল কোরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে, সঙ্কীর্ণ জাতিয়তাবাদের আচ্ছাদনে অন্ধ হয়ে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও অবিচার করা না হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ–

কোনো জাতিগোষ্ঠীর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ যেনো তোমাদেরকে অন্যায় বিচারে প্ররোচিত না করে। ন্যায় বিচার করবে, এটাই আল্লাহভীরুতার নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় করবে। (সূরা আল মায়েদাহ্-৮)

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ-

যখন তোমরা বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে সালিশ নিযুক্ত হও তখন ন্যায় বিচার করবে। (সূরা আন্ নিসা-৫৮)

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى-

যখন তোমরা কথা বলো তখন ইনসাফের ভিত্তিতে বলো, যদি তা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও যায়। (সূরা আনআ'ম-১৫২)

ইসলাম যা কিছু ঘোষণা করেছে তা শুধু উপদেশ আকারে বা গ্রন্থাবদ্ধই থাকেনি, এসব ঘোষণার ভিত্তিতে এবং সকল পবিত্রতা পরিচ্ছন্ন ভাবধারার সমন্বয়ে সর্বোন্নত চরিত্র বিশিষ্ট্য লোকদের একটি বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বের সমাজ বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছে। সে নন্দিত সমাজে উচ্চ-নীচ, ছুঁতমার্গ, বিভেদ বৈষম্য, হিংসা বিদ্বেষের অস্তিত্ব যেমন ছিলো না, তেমনি বর্ণ, বংশ, ভাষা ও দেশের পার্থক্যবোধও ছিলো না। এই সমাজের অন্তর্ভূক্ত সকল মানুষ, বংশ, গোত্র, জাতি, দেশ ও ভৌগলিক অঞ্চল নির্বিশেষে সম্পূর্ণ সমান অধিকার সম্পন্ন ছিলো এবং তাঁরা সেই সমান অধিকার ও মর্যাদা লাভ করেছে। ইনসাফ, সাম্য ও ঐক্যের মূলনীতিসমূহ যতটা সাফল্যের সাথে নন্দিত মুসলিম সমাজে বাস্তবায়িত হয়েছে, পৃথিবীর কোনো ধর্ম, আদর্শ বা জীবন দর্শনে অথবা বাস্তব সমাজে এর কোনোই দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং এখন পর্যন্তও কোনো জাতির পক্ষে তেমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

ইসলামই সেই নন্দিত আদর্শ বা জীবন ব্যবস্থা, যা বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সমতল, দুর্গম, পর্বত সঙ্কুল ও বনাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অগণিত বংশ, গোত্র ও জাতিসমূহকে একত্রিত করে একটি মাত্র জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামের কঠোর সমালোচক ও দুশমনরাও এ সত্য অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রায় অর্ধর্ব পৃথিবী শাসন করেছে ইসলাম। মুসলিম ও ইসলামের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র মক্কা-মদীনা নগরীতে সাধারণ একজন নাগরিক যে অধিকার ভোগ করেছে, সেই একই অধিকার ভোগ করেছে আফ্রিকা মহাদেশের মিসর সীমান্তের একজন নাগরিক। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান যে অধিকার ভোগ করেছেন, রাষ্ট্র প্রধানের

গোলামও সেই একই অধিকার লাভ করেছেন। খলীফা হযরত উমার (রাঃ) জেরুসালেম ভ্রমণকালে উটের পিঠে আরোহী হবার ক্ষেত্রে নিজ গোলামের সাথে বিষয়টির সাম্যতা এনেছিলেন। জেরুসালেমের নিকটবর্তী হলে গোলামের পালা এসেছিলো। খলীফা তাঁর গোলামকে উটের পিঠে বসিয়ে নিজে উটের রশি টেনে জেরুসালেম নগরে প্রবেশ করেছিলেন।

ইতিহাসে নন্দিত জাতির নিন্দিত পরিণতি

পৃথিবীতে ইয়াহূদী জাতি একসময় সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পবিত্র কোরআনে তাদের প্রসঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে। তাদের প্রতি মহান আল্লাহ তা'য়ালা অসীম অনুগ্রহ করে বারবার নেয়ামত নাযিল করেছেন। কিন্তু তারা সে নেয়ামত ভোগ করেও মহান আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করেছে। আল্লাহর অনুগৃহীত একটি বিশেষ জাতি ছিল ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের মধ্যে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তারা সে সকল নবী-রাসূলের সাথে অমানবিক আচরণ করেছে। মহান আল্লাহ তাদেরকে দুটো আসমানী কিতাব যবুর এবং তওরাত দিয়ে ধন্য করেছিলেন। কিন্তু তারা এতই হতভাগা যে, ঐ কিতাবের কোনো নির্দেশ অনুসরণ করেনি। হযরত মূসা (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ) এর মত বিখ্যাত নবী তাদের মধ্যে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগা জাতি ইয়াহূদীরা তাদের স্বভাবের পরিবর্তন করেনি।

তারা তাদের প্রত্যেক নবীকেই অমানবিক কষ্ট দিয়েছে। কাউকে তারা হত্যা করেছে। কাউকে শূলে চড়িয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) এর ওপর তারা সীমাহীন নির্যাতন করেছে। হযরত ঈসা (আঃ) কে তারা হত্যা করার চেষ্টা করে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে ব্যর্থ হয়েছে। পরিশেষে অন্য একলোককে ঈসা মনে করে ক্রুশে বিদ্ধ করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এই ইয়াহূদীরা তাদের সমসাময়িক নবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) কেও তারা একাধিকবার হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ ইয়াহূদী জাতির ইতিহাস। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে যেখানেই বড় ধরণের কোনো হত্যাযজ্ঞ বা বিপর্যয় ঘটেছে, অনুসন্ধানে দেখা গেছে সে ঘটনার পেছনে ইয়াহূদীদের কালো হাত সক্রিয়। এই ইয়াহূদীদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড আলোচনা করতে গেলে ভিন্ন

একটি গ্রন্থ রচনা করা প্রয়োজন। আমরা এখানে সংক্ষেপে ইয়াহূদী জাতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করবো।

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পৌত্র হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর আরেকটি নাম ছিল ইসরাঈল। এ কারণেই তাঁর বংশধরদের বানী ইসরাঈল বলা হয়। ইসরাঈল শব্দের অর্থ 'আল্লাহর বান্দাহ্'। ব্যাবিলন সম্রাট নমরুদের দরবারের রাজ পুরোহিত ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পিতা। এমন এক লোকের সন্তান হয়েও তিনি শিরকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এ কারণে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় এবং মহান আল্লাহর অসীম রহমতে তিনি রক্ষা পান । তারপর তিনি পিতৃভূমি ইরাক ত্যাগ করে আরবের ভিন্ন এলাকায় গিয়ে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর এক সন্তানের নাম হযরত ইসহাক (আঃ)। তাঁর সন্তান হযরত ইয়াকুব (আঃ)। তাঁরই আরেক নাম ইসরাঈল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর বংশধর এই বনী ইসরাঈলগণ মহান আল্লাহর অনুগ্রহভাজন হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। বনী ইসরাঈলদের একটি শাখা পরবর্তীকালে নিজেদেরকে ইয়াহূদী হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করে। হযরত ইয়াকুবের এক সন্তানের নামও ছিল ইয়াহুদা। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় বসবাস করতে থাকেন। তাঁর সন্তান হযরত ইয়াকুব (আঃ) মিসরে চলে যান। তাঁর সন্তান হযরত ইউছুফ (আঃ) কে মহান আল্লাহ মিসরে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেন। এভাবে বনী ইসরাঈলগণ মিসরে বসবাস করতে করতে ক্রমশঃ তারা সমগ্র মিসরে প্রসার লাভ করে।

প্রায় চারশত বছর যাবৎ তারা দাপটের সাথে মিসর শাসন করে। কিন্তু নিজেদের সীমাহীন জুলুমের কারণে শাসন যন্ত্র তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ফিরআউন নামক উপাধিধারী এক জালিম শাসক গোষ্ঠীর হাতে এই বনী ইসরাঈলগণ বা ইয়াহূদীরা পরাজিত হয়ে তাদের গোলামে পরিণত হয়। শাসক গোষ্ঠী তাদের ওপরে লোমহর্ষক নির্যাতন চালাতে থাকে। অদূর ভবিষ্যতে ইয়াহূদী জাতির মধ্যে যেন শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম সৃষ্টি করার মতো কোনো শক্তি দানা বাঁধতে না পারে, এ কারণে ফিরআউন শাসকবৃন্দ বনী ইসরাঈদের বা ইয়াহূদী জাতির সকল পুত্র সন্তানকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর অসীম রহমতে হযরত মূসা (আঃ) রক্ষা পান এবং ফিরআউনের রাজপ্রাসাদেই প্রতিপালিত হন। আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আঃ) নবুওয়াত লাভ করার পরে তিনি ফিরআউনকে উৎখাত করার লক্ষ্যে বনী ইসরাঈলীদের সুসংগঠিত করতে

থাকেন। আন্দোলনের ধারা পরিক্রমায় তিনি তাঁর অনুসারী বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে একদিন রাতে মিসর থেকে বের হয়ে পড়েন। তাঁরা সাগর পাড়ে পৌঁছলে ফিরআউনও সৈন্য বাহিনীসহ তাদেরকে ধাওয়া করে।

মহান আল্লাহর নির্দেশে সাগরের পানি দু'ভাগ হয়ে বনী ইসরাঈলদের আত্মরক্ষার পথ করে দেয়। ঐ একই পথে ফিরআউন তার বাহিনীসহ এগিয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশে সাগরের বিভক্ত পানি পুনরায় এক হয়ে যায় এবং ফিরআউনের সদল বলে সলিল সমাধি ঘটে। সাগর পাড়ি দিয়ে তারা সিনাই এলাকায় তীহ্ মরুভূমি অতিক্রম করে। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে পানির তৃষ্ণায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাঁরা অস্থির হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ তাদের মাথার ওপরে মেঘমালা সৃষ্টি করে ছায়ার ব্যবস্থা করেন। শিলাখণ্ড বিদীর্ণ করে তাদের জন্য সুপেয় পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করেন। সরাসরি আকাশ থেকে মান্না ও সালওয়া নামক বিশেষ খাদ্য প্রেরণ করেন। তাদের পরিশ্রম করতে হয়নি কোনো কিছুর জন্য। সকল কিছুর ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যক্ষভাবে করে দেন। এর পরেও তারা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

হযরত মূসা (আঃ) ওহী লাভের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর আদেশে তূর পাহাড়ে গমন করেন। এই সুযোগে বনী ইসরাঈলগণ গোশাবকের মূর্তি বানিয়ে পূজা আরম্ভ করে। হযরত মূসা (আঃ) ফিরে আসার পরে তারা পুনরায় তওবা করে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের ক্ষমা করে দেন। কিন্তু আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দিলে মূসা (আঃ) তাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। সেই হতভাগারা জবাব দেয়, 'হে মূসা! তুমি আর তোমার আল্লাহই যুদ্ধ করো, আমরা বসে বিশ্রাম গ্রহণ করবো'। এই অবাধ্যতার কারণে মহান আল্লাহ্ তাদের প্রতি গযব নাজিল করেন। তারা যাযাবরের মত দীর্ঘ চল্লিশ বছর পথে প্রান্তরে ঘুরতে থাকে। নিজের দেশ নেই, অপরের আশ্রয়ে থাকতে হয়, এভাবে অপমানজনক জীবন-যাপন করতে তারা বাধ্য হয়। এর মধ্যে তাদের সকল বয়স্ক লোকগুলো ইন্তেকাল করে। হযরত মূসা (আঃ)ও ইতোমধ্যে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন। এর দীর্ঘদিন পরে তারা পুনরায় ফিলিস্তিনে বানী ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে। রাষ্ট্রশক্তি হাতে পেয়ে এই অবাধ্য জাতি পুনরায় আল্লাহর দেয়া বিধানের সাথে বিদ্রোহ করে। এর শাস্তি হিসাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা জালুত নামক এক জালিম শাসককে তাদের ওপরে চাপিয়ে দেন।

জালুতের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তারা তালুত নামক এক মহান নেতার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তালুতের নেতৃত্বে তারা যুদ্ধ করে জালুত নামক জালিমের অত্যাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করে। তালুতের পরে হযরত দাউদ (আ:) ও হযরত সুলায়মান (আ:) এর নেতৃত্ব তারা লাভ করে। সে সময় তারা উন্নতির স্বর্ণ শিখরে গিয়ে পৌঁছে। কারণ, এ সময় আল্লাহর আইনের কঠোর প্রয়োগের কারণে তারা সৎভাবে জীবন পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছিল। হযরত সুলায়মান (আ:) এর অবর্তমানে অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে তারা পুনরায় অহঙ্কারী হয়ে ওঠে। জুলুম অত্যাচারের সয়লাব বইয়ে দেয়। চারিত্রিক অধ:পতনের শেষ স্তর অতিক্রম করে ইয়াহূদী জাতি। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ প্রকাশ্যে আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করতে থাকে। ইয়াহূদী আলেম সমাজ ধনীক ও শাসক শ্রেণীর গোলামে পরিণত হয়। আল্লাহর বিধান শাসক ও সমাজের ধনীক শ্রেণীর স্বার্থে তারা পরিবর্তন করে। আলেম নামে পরিচিত লোকগুলো ক্ষমতাসীনদের মর্জি মাফিক আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যা করে শাসকদের সকল কুকর্মের সমর্থন যোগাতে থাকে।

বাহ্যিকভাবে ইসলামের খোলসটা শুধু বজায় রেখে ভেতরে তার পরিপন্থী কার্যকলাপে সকল সীমা অতিক্রম করে। জ্বিনা ব্যভিচার মদ পানসহ যাবতীয় অশ্লীল কার্যকলাপ প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সূদ ব্যবস্থা চালু করে নির্মম শোষন আরম্ভ হয়। মহান আল্লাহ সংশোধন করার লক্ষ্যে একের পর এক নবী তাদের জাতির মধ্যে প্রেরণ করতে থাকেন। ধ্বংসের অতল তলে নিমজ্জিত ইয়াহূদী জাতিকে তারা উদ্ধারের যাবতীয় প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী। ইয়াহূদী জাতি নবীদের ওপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে বহু সংখ্যক নবীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন–

يَكْفُرُوْنَ بِايٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ–

আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করতে থাকলো এবং আল্লাহর নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করতে থাকলো। (সূরা আল বাক্বারা-৬১)

এই ইয়াহূদীরা কেবল নিজেরা আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত পথ থেকে বিরত থেকেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সেই সাথে তারা এতদূর দু:সাহসী অপরাধ প্রবণ হয়ে গিয়েছে যে, পৃথিবীর মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য যত আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে, এসব আন্দোলনের পেছনেই ইয়াহূদীদের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি

এবং অর্থও কাজ করেছে এবং বর্তমানেও করছে। পক্ষান্তরে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর লক্ষ্যে যত আন্দোলন এ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে এবং আন্দোলন চলছে, এ ধরণের প্রতিটি আন্দোলনের সম্মুখে যেসব শক্তি বাধার বিন্ধ্যাচল সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমানেও করছে, এ সকল শক্তির পেছনেও ইয়াহূদীদের কালোহাত এবং অর্থ সক্রিয় রয়েছে। অথচ এই হতভাগাদের কাছে বর্তমানেও আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ বিকৃত হলেও রয়েছে এবং তাদের মধ্যেই নবী-রাসূল বেশী আগমন করেছে। তাদের অত্যাধুনিক অপরাধ হলো অধুনা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও জাতিয়তাবাদী আন্দোলন। এসব আন্দোলন ও মতবাদ ইয়াহূদী মস্তিষ্কে উৎপন্ন হয়েছে এবং তাদের অধীনে উৎকর্ষ লাভ করেছে। এই তথাকথিত আহলি কিতাবের ললাটে এই অপরাধ-টীকাও লিখিত ছিল যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম আল্লাহর অস্তিত্বে সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি, আল্লাহর সাথে প্রকাশ্য দুশমনি ও আল্লাহভিত্তিক মতাদর্শ নির্মূল করার প্রকাশ্য সংকল্পের ভিত্তিতে জীবন বিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও সেভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়েছে তবুও চীনসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বর্তমানেও টিকে রয়েছে। এই সমাজতন্ত্রের উদ্ভাবক, আবিষ্কারক ও প্রতিষ্ঠাতাও হচ্ছে একজন ইয়াহূদী। সমাজতন্ত্রের আধুনিক বিশ্বে পথভ্রষ্টতার সবচেয়ে বড় স্তম্ভ হলো ফ্রয়েডীয় দর্শন এবং ফ্রয়েড নামক লোকটিও একজন ইয়াহূদী। কার্লমার্ক্স, লেলিন, ষ্ট্যালিন-ব্রেজনেভ সকলেই ছিল ইয়াহূদী।

২০০১ সনের সেপ্টেম্বার মাসের ১১ তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের ওপরে হামলা করে তার দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে মুসলমানদের ওপরে। এ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পৃথিবীর ইসলামী আন্দোলনসমূহকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে আমেরিকা আফগানিস্থানে হামলা করে একটি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকার উৎখাত করলো। সভ্য জগতের সকল নিয়ম-নীতি পদদলিত করে পবিত্র রমজান মাসে এবং ঈদের দিনেও অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করলো। তাদের প্রচার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার চালালো। এই ঘটনার পেছনেও ইয়াহূদীদের চক্রান্ত সক্রিয় ছিল। কারণ যেদিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা হলো, সেদিন সেখানে একজন ইয়াহূদীও তাদের কর্মস্থলে যোগ দেয়নি। অথচ প্রায় চার হাজার ইয়াহূদী সেখানে চাকরী করতো।

ঘটনা যেভাবে সংঘটিত হলো, তা সম্পূর্ণ ভিডিও করে সকল প্রচার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হলো। এ ধরনের একটি মারাত্মক ঘটনার সম্পূর্ণ দৃশ্য

যারা ভিডিও করলো, তারা ঘটনার ব্যাপারে পূর্ব থেকেই অবহিত না থাকলে যাবতীয় দৃশ্য ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করলো কিভাবে? অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের দ্বারা এ ঘটনা সংঘটিত হবার অসংখ্য প্রমাণ মওজুদ থাকার পরও ইয়াহূদীদের প্রতিপালক ইসলাম বিদ্বেষী আমেরিকা সকল দোষ ইসলামপন্থীদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে রক্তশোষক ভ্যাম্পায়ারের মতই নির্বিচারে গণহত্যা চালালো এবং স্বাধীনতাকামী মুসলিম সংগঠন, সেবামূলক মুসলিম সংগঠনসহ ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী দলগুলোকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করলো। অগণিত প্রাণ ও অসীম ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৯১ সালে আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট জনগণের ভোটে বিজয়ী হলেও আমেরিকা ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে সরকার গঠন করতে না দিয়ে সেনাবাহিনীকে ক্ষমতায় নিয়ে এলো। এরপর শুরু হলো ইসলামপন্থীদের ওপর হত্যাযজ্ঞ ও নির্মম নির্যাতন, যা এখন পর্যন্ত চলছে। মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমীন নামক জনপ্রিয় সংগঠন কোনোক্রমেই যেনো রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করতে না পারে, এ লক্ষ্যে ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইজরাঈল আমেরিকার সহযোগিতায় ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে এবং মুসলমানরা এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ করলে গুলী চালিয়ে অগণিত নারী-পুরুষকে হত্যা করা হচ্ছে। এ সকল অশুভ ঘটনার নেপথ্যে ইয়াহূদীদের ভূমিকা সক্রিয় রয়েছে।

হযরত সুলায়মান (আঃ) এর পরে বনী ইরাঈলীদের ইয়াহূদী রাষ্ট্র দ্বি-খণ্ডিত হয়ে যায়। ইসরাঈল নামে আরেকটি রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে। তখন এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূচনা হয়। ইয়াহূদীরা একে অপরের প্রাণের দুশমনে পরিণত হয়। একে অপরকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তারা মিত্র শক্তির সাহায্য কামনা করে। এ সময় আল্লাহর নবী হযরত ইউহান্না (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে ইয়াহূদীদের তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকেন। তাদেরকে আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান জানান। এই অপরাধে তাঁকে ইয়াহূদী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি 'আছা' কারাগারের অন্ধকার কুঠুরীতে বন্দী করে। হযরত ইলিয়াস (আঃ) ইয়াহূদীদের আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আন্দোলনের সূচনা করেন। মানব রচিত বিধান দূরে নিক্ষেপ করে তাদেরকে আল্লাহর দেয়া জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে বলেন। ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি 'আখিয়াব' এর স্ত্রী মহান আল্লাহর নবীকে হত্যা করার দাবী জানায় তার স্বামীর কাছে। নিজের স্ত্রীর অভিলাষ পূরণ করার জন্য রাষ্ট্রপতি আখিয়াব আল্লাহর নবীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশেষে হযরত ইলিয়াস (আঃ) আত্মরক্ষার জন্য সিনাই এলাকায় পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ইয়াহূদীরা আল্লাহ তা'য়ালার আরেকজন নবীকে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে। কারাগারে তাঁকে খাদ্য এবং পানীয় দেয়া হতো না।

আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর বিধানের ছায়াতলে নিয়ে আসার লক্ষ্যে হযরত ইরমিয়া (আঃ) পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতেন। ইয়াহূদী জাতি আল্লাহর নবীর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে থাকে এবং শারীরীক নির্যাতন করে। অবশেষে অভিশপ্ত এই ইয়াহূদী জাতি আল্লাহর নবী হযরত ইরমিয়া (আঃ) কে গ্রেফতার করে এবং পরে তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার জন্য কাদা পানি ভর্তি চৌবাচ্চার ভেতরে রশি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় বেঁধে রাখে। ইয়াহূদী শাসক হিরোদিসের রাজ সভায় প্রকাশ্যে যৌনাচার, মদপানসহ যাবতীয় অশ্লীল কাজ সংঘটিত হতে থাকে। আল্লাহর নবী হযরত ইয়াহ্‌হিয়া (আঃ) এসব জঘন্য কার্যকলাপের বিরোধিতা করেন এবং তাদের নোংড়া কাজের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। ইয়াহূদী রাষ্ট্রপতি হিরোদিস আল্লাহর নবী হযরত ইয়াহ্‌হিয়া (আঃ) কে হত্যা করে তাঁর ছিন্ন মাথা এমন এক নারীকে উপহার দেয়, যে নারী ছিল দেহপসারিণী এবং রাষ্ট্রপতি হিরোদিসের রক্ষিতা।

হযরত ঈসা (আঃ) সত্য কথা বলে বনী ইসরাঈলী আলেম ও রাষ্ট্র নেতাদের খোদাদ্রোহীতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করে বিরাগ ভাজন হন। আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান জানানোর কারণে ইয়াহূদীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। হযরত ঈসা (আঃ) কে ইসলামী আন্দোলন থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। বিচারের নামে প্রহসন করে তাঁর বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়।

তারপর ঈদ উপলক্ষ্যে একজন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীকে মুক্তি দেয়ার ঘোষনা শোনানোর জন্য সম্রাট পিলাতুস সাধারণ জনগণ ও আলেমদের এক সমাবেশ আহ্বান করে। সে সমাবেশে সম্রাট জানতে চায় কাকে মুক্তি দেয়া উচিত। সে সময় কারাগারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী ছিল দু'জন। একজন হযরত ঈসা (আঃ) ও আরেকজন বুরাবা নামক নিকৃষ্ট এক ডাকাত। সমবেত ইয়াহূদী জনগোষ্ঠী হযরত ঈসা (আঃ) এর মুক্তির পরিবর্তে ঐ নিকৃষ্ট ডাকাতের মুক্তি দাবী করে এবং হযরত ঈসা (আঃ) কে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দাবি তোলে। এ সকল ইতিহাস খোদ ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই জানা যায়। বাইবেলেও এ ধরণের বহু ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আর পবিত্র কোরআন তো ইয়াহূদী জাতিকে অভিশপ্ত বলে ঘোষনা দিয়ে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে।

ইয়াহূদীদের অবাধ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরাধ প্রবণতার কারণে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করেন। পবিত্র কোরআনে সূরা

তাওবায় মহান আল্লাহ ঘোষনা করেছেন, তাঁর শাস্তি প্রদানের একটি নিয়ম হলো, তিনি কোনো অবাধ্য জাতিকে শায়েস্তা করেন আরেকটি পরাক্রমশালী জাতিকে দিয়ে। পাপাচারে লিপ্ত অবাধ্য জাতিকে পরাক্রমশালী জাতির গোলামে পরিণত করেন। এই ধরণের শাস্তি অবাধ্য ইয়াহূদী জাতির ওপরে একাধিকবার এসেছে এবং এখন পর্যন্ত তারা শান্তিতে নেই। সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত তাদেরকে সজাগ-সতর্ক সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হচ্ছে। তাদের সমর্থক পাপাচারে লিপ্ত অন্য জাতির সহযোগিতা ব্যতীত তারা এক মুহূর্ত টিকে থাকতে পারবে না।

ইতিহাসে দেখা যায় এই ইয়াহূদী জাতির অবাধ্যতার কারণে তাদের ওপরে বিভিন্ন জাতি বারবার আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে ঘর-বাড়ি ছাড়া করেছে, তাদের সহায়-সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে এবং তাদের সকল কিছু তছনছ হয়ে গেছে। আশুরীয় বাদশাহ পিয়ার খৃষ্টপূর্ব ৭২৪ সালে ইসরাঈল রাজ্য আক্রমণ করে অগণিত ইয়াহূদীকে হত্যা করে। কয়েক হাজার ইয়াহূদীকে রশি দিয়ে বেঁধে নিজের দেশে নিয়ে দাসে পরিণত করে।

খৃষ্টপূর্ব ৫৬১ সালে ব্যাবিলনের শাসক বখত নেছার জেরুসালেম আক্রমণ করে সমগ্র জনপদ ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। তারপর ৭০ হাজার ইয়াহূদীকে বন্দী করে নিজের দেশে নিয়ে দাসে পরিণত করে। রোমান শাসকবৃন্দ ঈসায়ী ৭০ সালে ইয়াহূদী রাষ্ট্র আক্রমণ করে অগণিত ইয়াহূদীকে তীর, তরবারী, বর্শা ইত্যাদী দিয়ে হত্যা করে এবং ইয়াহূদী রাজ্যে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়। রোমানগণ পুনরায় ১৩২ সালে ফিলিস্তিন আক্রমণ করে অসংখ্য ইয়াহূদীকে হত্যা করে, অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করে এবং তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়।

একাধিক বার ভিন্ন জাতির আক্রমণের ফলে রোমানদের নির্যাতনে টিকতে না পেরে ইয়াহূদী জাতি পৃথিবীর দেশে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এভাবে তারা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। নিজের দেশ বলে তাদের আর কিছুই থাকে না। পৃথিবীর যেখানেই তারা আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সেখানেই তারা আশ্রয়দাতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয়েছে। ফলে সর্বত্রই তাদের ওপর নেমে এসেছে তাদের অসৎ কর্মের অশুভ পরিণাম। লোভের যতগুলো মানদণ্ড আছে সকল মানদণ্ডেই উত্তীর্ণ হবে ইয়াহূদী জাতি। এদের অর্থ লোভ এতই প্রবল যে, ঘৃণ্য সুদ বৈধ করার জন্য তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন করে হারাম সুদকে হালাল বানিয়েছে। সুদী ব্যবসায় তাদের কলঙ্ক সমগ্র পৃথিবীময়।

অপরের অর্থ নিজের পকেটস্থ করার বৈধ-অবৈধ কলা-কৌশল তারা প্রয়োগ করে। এই ইয়াহূদী জাতির রক্তে মিশ্রিত হয়ে আছে নিষ্ঠুরতা, লোভ, অমানবিকতা, হিংস্রতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র। এসব কারণে সমগ্র পৃথিবীতে এরা কোথাও শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারেনি। সর্বত্রই তাদের প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে। বিতাড়িত হতে হয়েছে অথবা নির্মমভাবে নিহত হতে হয়েছে।

ইংল্যণ্ড থেকে ১২৯০ সালে ইয়াহূদীদের বিতাড়িত করা হয়। ফ্রান্স প্রথমে ইয়াহূদীদের ১৩০৬ সালে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। পুনরায় ১৩৯৪ সালে ফ্রান্স থেকে ইয়াহূদীদের বিতাড়িত করা হয়। বেলজিয়াম ১৩৭০ সালে ইয়াহূদীদের বিতাড়িত করে। চেকোশ্লোভাকিয়া ১৩৮০ সালে ইয়াহূদীদের বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়। হল্যাণ্ড ১৪৪৪ সালে ইয়াহূদীদের বিতাড়িত করে। ইটালী ১৫৪০ সালে ইয়াহূদীদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করে। জার্মানী ১৫৫১ সালে ইয়াহূদীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে। রাশিয়া ১৫১০ সালে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার প্রায় ৬০ লক্ষ ইয়াহূদীদের হত্যা করে। এভাবে হত্যা, লাঞ্ছনা-অপমান, বিতাড়ন ও নির্বাসন ইত্যাদী দুর্ভোগের কাহিনীতে ইয়াহূদী জাতির ইতিহাস কলঙ্কিত।

ইয়াহূদী ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ইয়াহূদী ধর্মের আইন-কানুন প্রণয়ন করার জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আকিবা ইবনে ইউছুফ লিখেছেন 'মিশনাহ' ও 'মাদরাস'। ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'মিশনাহ' ও 'গুমারা' একত্রিত করে লেখা হয়েছে 'তালমুদ'। ১১শ শতাব্দীতে ইসহাক আল ফার্সী লিখেছেন 'হালাখুছ'। ১২শ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসা মায়মুনী লিখেছেন 'মিশনাহ তাওরাত'।

১৪শ শতাব্দীতে ইয়াকুব ইবনে আশহার লিখেছেন 'তুর'। ১৬শ শতাব্দীতে ইউছুফ কারুর লিখেছেন 'শোলখান'। কিন্তু এসব গ্রন্থের প্রতি স্বয়ং ইয়াহূদীদেরই শ্রদ্ধা নেই। তারা তাওরাত ব্যতীত আর অন্য কিছু মানতে ইচ্ছুক নয়। ১৯০৬ সালে ইণ্ডিয়ানা পলস- এ মার্কিন ইয়াহূদী ধর্ম নেতাদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে সাধারণ ছোটখাটো ব্যাপারে ধর্মীয় বিধানের সীমানা সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করা হয়। কেননা, উল্লেখিত গ্রন্থাবলী ধর্মীয় আইনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধিমালায় পরিপূর্ণ।

হযরত মূসা (আঃ) এর ওপর মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা যে তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, সে তাওরাতের কোনো অস্তিত্ব কখনোই ইয়াহূদীদের কাছে ছিল না। তাওরাত কিতাবের বর্তমানে নাম দেয়া হয়েছে 'ওল্ডটেষ্টামেন্ট'। এই

কিতাব পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় এ কিতাব কোনো ঐশী কিতাবের মর্যাদা রাখে না। হযরত মূসা (আঃ) শেষ জীবনে হযরত ইউশা (আঃ) এর সহযোগিতায় মূল তাওরাত গ্রন্থ সংকলন করে একটি সিন্দুকে রেখে দেন। এ কথা ইহুদী ধর্মগ্রন্থই সাক্ষী দেয়। (ইস্তিসনা ৩১ : ২৪-২৭)

হযরত মূসা (আঃ) এর ইন্তেকালের পরে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট বখতে নাছার বাইতুল মাকদিসে অগ্নি সংযোগ করলে সেই পবিত্র গ্রন্থ নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই ঘটনার প্রায় ২৫০ বছর পরে হযরত উযাইর (আঃ) বনী ইসরাঈলদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় এবং আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে পুনরায় তাওরাত কিতাব সংকলন করেন। কিন্তু এই মূল কপিটিও সংরক্ষণ করা হয়নি। সম্রাট আলেকজাণ্ডারের বিশ্ব জোড়া বিজয়াভিযান কালে গ্রীক শাসনের পাশাপাশি গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্যসমূহ আরব দেশে বিস্তার লাভ করেছিল। সে সময় খৃষ্টপূর্ব ২৮০ সালে তাওরাতের যাবতীয় গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। তখন থেকেই তাওরাতের ইবরানী ভাষার মূল কপিটি পরিত্যক্ত হয় এবং গ্রীক ভাষায় অনূদিত তাওরাত চারদিকে প্রচলিত হয়।

এ কারণে বর্তমানে যে তাওরাত আছে তা যে হযরত মূসা (আঃ) এর তাওরাত নয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তার মানে এই নয় যে, বর্তমান তাওরাতে আসল তাওরাতের কোন অংশই নেই বা বর্তমান তাওরাত সম্পূর্ণরূপেই জাল। বর্তমান তাওরাতে বহু কথা মিশ্রিত হয়েছে এবং ইবরানী ভাষার অনেক মূল কথা পরিত্যাগ করা হয়েছে।

মনোযোগ দিয়ে তাওরাত পাঠ করলেই স্পষ্ট অনুভব করা যায়, তাওরাতে আল্লাহর বাণীর সাথে ইয়াহূদী আলেমদের তাফসীর, বনী ইসরাঈল ও ইয়াহূদীদের জাতীয় ইতিহাস, ইসরাঈলী ও ইয়াহূদী আইনবিদদের আইনগত পর্যালোচনাসহ আরো এমন অনেক বিষয় মিশ্রিত হয়ে গেছে। বর্তমান তাওরাত থেকে আল্লাহর বাণী খুঁজে বের করা মহাসাগরের অতল তলদেশ থেকে সূঁচ বের করার চেয়েও কঠিন। তবে একথাও অত্যন্ত সত্য যে, আল কোরআনের মতই তাওরাতও ইসলামের শিক্ষাই নিয়ে এসেছিল এবং হযরত মূসা (আঃ)ও ইসলামেরই নবী ছিলেন। বনী ইসরাঈল প্রথমে ইসলামেরই অনুসারী ছিল। কিন্তু পরে তারা মূল আদর্শে নিজেদের ইচ্ছে অনুসারে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে 'ইয়াহূদী' নামে নিজেদের এক ধর্ম বানিয়ে নেয়। বর্তমান তাওরাত হিংসা, বিদ্বেষ, রক্তপাত, দাঙ্গা, লুণ্ঠন, মারামারি, ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদীর শিক্ষা ও অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ। বর্তমানে ইয়াহূদীরা যা করছে, তা তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে মোটেও খারাপ কিছু তো নয়ই বরং ধর্মীয় নির্দেশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ্বনেতৃত্বের আসনে মুসলিম জাতি

বিশ্ব নেতৃত্বের পদ থেকে ইয়াহূদীদের অপসারণ করার পরে মুসলিম উম্মাহ্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নেতৃত্বের আসনে আসীন করেছেন। নবী করীম (সাঃ) ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করার পরে এই আন্দোলনের পতাকাতলে যারা ঐক্যবদ্ধ হলো, রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিলেন এবং সকল দিক দিয়ে তাঁরা যখন বিশ্বমানবতার নেতৃত্ব দেয়ার উপযোগী হলেন, তখনই তাঁদেরকে সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে আসীন করা হলো। এ পর্যায়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো, নবী করীম (সাঃ) কোন্ শ্রেণী ও স্বভাব-প্রকৃতির মানুষদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং তাঁর পবিত্র পরশে মৃতপ্রায় জনগোষ্ঠী জীবন লাভে ধন্য হয়েছিলো। এ জন্যেই কবি বলেছেন–

দুর ফেশানী নে তেরি কাত্রুঁ কো দারিয়া কার দিয়া;
দিল কো রাওশন কার দিয়া আঁখু কো বিনা কার দিয়া।
খোদ্ না থী জো রাহা প্যর গাইরুঁ কো হাদী বান্ গ্যয়ে;
কিয়া ন্যযর থী জিছ্নে মারদুঁ কো মাসিহা কার দিয়া।

অর্থাৎ যাঁর পরশে সঙ্কীর্ণতা উদার হলো, অর্গলবদ্ধ অন্ধকার হৃদয় আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, শুভ ও কল্যাণ দৃষ্টি উন্মোচিত হলো, পথহারা ভ্রান্তরা হলো পথ প্রদর্শক আর মৃতরা হয়ে গেলো অন্যদের ত্রাণকর্তা।

নবী করীম (সাঃ) এর আগমনের পূর্বে সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোনো জাতিগোষ্ঠী দৃষ্টিগোচর হতো না, যাদেরকে সুরুচিসম্পন্ন বলা যায়। তদানীন্তন যুগে উচ্চতর মূল্যবোধের ধারক বাহক কোনো সমাজ ছিলো না, এমন কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থাও ছিলো না, যার ভিত্তি প্রেমপ্রীতি ও মানবতাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র মানবতা ভয়াবহ এক মরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিলো। পৃথিবী তার যাবতীয় সরঞ্জাম ও উপকরণ নিয়ে ভীতিকর ধ্বংস গহ্বরের গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হবার পথে অগ্রসর হচ্ছিলো। মানবতা, ন্যায়-নীতি, ইনসাফ, সততা, স্বচ্ছতা, লজ্জা শরম, মায়া মমতা ভালোবাসা মানব স্বভাব চরিত্র থেকে মুছে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলো হিংসা, বিদ্বেষ, বর্বরতা,

জিঘাংসা, শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ, নিপীড়ন, আত্মসাৎ ইত্যাদি। এমন সব মানুষে পৃথিবী পরিপূর্ণ ছিলো, যাদের নিজেদের চোখেই নিজেদের অস্তিত্ব নিতান্তই নগণ্য ও মূল্যহীন ছিলো।

গাছ পালা, বৃক্ষ তরুলতা, প্রস্তর খণ্ড, পানি, আকাশের নক্ষত্রমালা এবং নিষ্প্রাণ জড় বস্তু ছিলো যাদের পূজ্য দেবতা। মানুষগুলোর জ্ঞানের বিকৃতি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে ছিলো যে, দৈনন্দিন জীবনের স্থূল সত্যগুলো অনুধাবনেও তারা ছিলো অক্ষম। তাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি এত বেশী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো যে, তাদের অনুভূতি তাদেরকে সতত ভ্রান্ত পথেই পরিচালিত করতো। স্থূল ও সহজবোধ্য জ্ঞানও তাদের কাছে দুর্বোধ্যতায় পরিণত হয়েছিলো। সুক্ষ্ণ ও অবোধগম্য বিষয়গুলো তাদের কাছে স্থূল ও সহজবোধ্যে পরিণত হয়েছিলো। নিশ্চিত ও অভ্রান্ত বিষয়ও তাদের কাছে সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। তাদের রুচি এত বেশী বিকৃত হয়ে পড়েছিলো যে, তিক্ত ও স্বাদহীন নীতিমালা তাদের কাছে সুস্বাদু এবং সুস্বাদু নীতিমালা তাদের কাছে তিক্ত মনে হতো। অনুভূতি এতটাই ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো যে, বন্ধু ও শুভাকাঙ্খীর সাথে তারা শত্রুতা করতো এবং শত্রুর সাথে গড়তো বন্ধুত্ব। সমাজে মানবরূপী নেকড়ে বাঘেরা নেতৃত্বের পদে সমাসীন ছিলো। দুরাচারী অপরাধীরা ছিলো সৌভাগ্যবান ও পরিতৃপ্ত এবং সদাচারী চরিত্রবান লোকজন ছিলো যন্ত্রণাক্লীষ্ট ও নির্যাতনে জর্জরিত। তাদের কাছে সচ্চরিত্র ও পবিত্রতা ছিলো অপরাধ এবং মূর্খতা। অসচ্চরিত্র, অন্যায় জুলুম নির্যাতন ছিলো যোগ্যতার মানদণ্ড।

চরিত্রহীনতা, উন্মত্ততা, দাম্ভিকতা, অহঙ্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, লুণ্ঠন, নিষ্পেষন, নির্যাতন, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, দস্যুতা, ধর্ষণ, হত্যা সুদখোরী এবং কন্যা সন্তানকে হত্যা ইত্যাদি ছিলো তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিকৃত ধর্মের নেতৃত্বের আসনে যারা বসে ছিলো তারা ধর্মের নামে মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করতো। আল্লাহপ্রদত্ত মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব পরিণত হয়েছিলো জুলুম নির্যাতনে। উদারতা ও বদান্যতা পরিণত হয়েছিলো অপব্যয় ও অপচয়ে। আত্ম মর্যাদাবোধ পরিণত হয়েছিলো জাহেলী অহমিকায়। জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি মেধা পরিণত হয়েছিলো প্রতারণা ও অপকৌশলে। তাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রয়োগ করা হতো অপরাধের নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবনে। অপরের সম্পদ লুণ্ঠন করে ভোগ বিলাসে মত্ত থাকাই ছিলো তাদের নেশা। এমনি এক অন্ধকার

পরিবেশে আগমন করে নবী করীম (সাঃ) মহামুক্তির চেরাগ প্রজ্জ্বলিত করলেন। এ চেরাগের জ্বালানি শক্তি ছিলো–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْنَ–

হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা বলো, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, সফলতা অর্জন করবে।

ঘন তমশাবৃত রজনীর গভীর নিকষ কালো অন্ধকারে নবী করীম (সাঃ) যে চেরাগ প্রজ্জ্বলিত করলেন, সে চেরাগের দিকে পতঙ্গ পালের মতোই সত্যানুসন্ধানী মানুষগুলো ঝাঁপিয়ে পড়া শুরু করলো। অপরদিকে আরবী ভাষী জাহিলী সমাজও রাসূল (সাঃ) এর আহ্বানের মর্ম অনুভবে কোনো ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হয়নি। তারা স্পষ্ট অনুভব করেছিলো, মুহাম্মাদ (সাঃ) এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তাঁর এ আহ্বান কয়েক শতাব্দীর প্রতিষ্ঠিত জাহিলী সভ্যতা- সংস্কৃতি ও যাবতীয় নিয়ম-কানুন প্রথা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বের শিকড় স্বমূলে উপ্‌ড়ে ফেলে নতুন এক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। যে জীবন ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করা যাবে না এবং শোষণ জুলুম নিষ্পেষন ও নির্যাতনের সকল দরজা তালাবদ্ধ হবে। শোষক ও জালিম পরিবারের প্রত্যেক সদস্য স্পষ্ট অনুভব করলো, তাদের বর্বর সভ্যতার প্রাসাদ চূর্ণ হয়ে যাবে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা প্রবল বিপদের সম্মুখীন। জাহিলী সমাজ নেতারা এ সত্য উপলব্ধি করে নবী করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে এক মরণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো।

নন্দিত মানুষ গড়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর স্বল্প সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম সকল প্রতিকুল পরিবেশে হিমালয়সম দৃঢ়তায় অটল অবিচল রইলেন। নিষ্ঠুর নির্মম নির্যাতনের কালো অধ্যায়ও অসীম ত্যাগ তিতিক্ষায় তাঁরা অতিক্রম করলেন। সম্পূর্ণ প্রতিকুল পরিবেশে স্বল্প সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সাঃ) এর কাছ থেকে ওহীভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন প্রশিক্ষণ লাভ করলেন যে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বকালের সর্বযুগের সকল শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হলেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁরা নিজেদের সকল সম্পদ ও বাসস্থান ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করলেন। ইতিহাসের গতিধারা, বাতাসের ঘূর্ণাবর্ত এবং নদীর প্রবল স্রোত পরিবর্তনের সকল যোগ্যতা যখন সেই স্বল্প সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের দেহ নির্গত ঘামের

মধ্য দিয়েও প্রকাশ পেলো, তখনই মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তাদেরই উদ্দেশ্য ঘোষনা এলো–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا–

এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী মানব দলে পরিণত করেছি, যেনো তোমরা পৃথিবীর অন্যান্য মানুষদের ওপর (হিদায়াতের) সাক্ষী হয়ে থাকতে পারো (এবং একইভাবে) রাসূলও তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে। (সূরা আল বাক্বারা-১৪৩)

মুসলিম জাতিকে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে আসীন করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন–

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ–

তোমরাই (হচ্ছো পৃথিবীর) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যেই তোমাদের উত্থান, (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা পৃথিবীর মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (সূরা আলে ইমরান-১১০)

সূরা বাক্বারার ১৪৩ নং আয়াতে মুসলিম জাতিকে 'উম্মতে ওয়াসাত' অর্থাৎ মধ্যপন্থী উম্মাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'উম্মতে ওয়াসাত' কথাটি এতই ব্যাপক অর্থবোধক যে, পৃথিবীতে অন্য কোনো ভাষার জগতে এমন কোনো শব্দ নেই যা দ্বারা এর সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা যেতে পারে। এই শব্দ দিয়ে কোনো মানব গোষ্ঠীর চেহারাগত সৌন্দর্য বা সুন্দর সুঠাম দেহ বৈশিষ্ট্য বুঝানো হয়নি। সর্বোন্নত স্বভাব, রুচি, নৈতিক চরিত্র, হৃদয়ের পাক-পবিত্রতা, অভ্যন্তরীণ কল্যাণকর গুণ-বৈশিষ্ট্য, বাহ্যিক সর্বশ্রেষ্ঠ আচার আচরণ, কথাবার্তায় চলাফেরায় বীরত্ব ব্যঞ্জক বিনয়ের প্রকাশ, লেনদেন ও অন্যের অধিকার রক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট সততা ও স্বচ্ছতা, আদর্শিক দৃঢ়তা, ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা, আদর্শিক প্রশ্নে আপোষহীনতা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নির্ভীকতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, সমরাঙ্গনে শত্রুবাহিনীর সম্মুখে অবিচল দৃঢ়তা, ত্যাগ তিতিক্ষায় চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়া, স্বার্থ ত্যাগে অগ্রগামী হওয়া, ভদ্রতা প্রদর্শনে অগ্রণী হওয়া, সুবিচার ও ন্যায় নীতি অনুসরণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন

করা সর্বোপরি আল্লাহভীরুতায় গগনচুম্বী উচ্চতায় পৌঁছা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সকল দিক দিয়ে উন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট মানবগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়েছে। আর এসব গুণাবলী অর্জিত হলেই সমগ্র পৃথিবীর জাতিসমূহের পথ প্রদর্শক, অগ্রনায়ক, নেতৃত্ব ও পরিচালক হওয়ার মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে, যারা সকলের সাথে সমান ও ন্যায়ভিত্তিক সম্পর্ক স্থাপিত করবে এবং অন্যায়, অবৈধ ও শোষণ জুলুমমূলক সম্পর্ক কারো সাথে থাকবে না। নবী করীম (সাঃ) প্রশিক্ষণ দিয়ে উক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানব গোষ্ঠীই তৈরী করেছিলেন।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'মুসলমানদেরকে একটি মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে, এরা পৃথিবীর সকল মানবগোষ্ঠীর সম্মুখে নন্দিত আদর্শ ইসলামকে তুলে ধরে এ আদর্শকে বিকশিত করবে। মহান আল্লাহর সম্মুখে আদালতে আখিরাতে এরা যেনো বলতে পারে, নবী করীম (সাঃ) যে আদর্শ তাঁদের কাছে পৌঁছেছিলেন, সে আদর্শ তাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর পক্ষেও মুসলিম জনগোষ্ঠী সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তিনি আমাদের কাছে যে মিশন নিয়ে আগমন করেছিলেন, তিনি তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য যথারীতি পালন করেছেন। মুসলিম জাতি যে নন্দিত আদর্শ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে লাভ করেছে, তা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। এ কল্যাণকর আদর্শ নিজেরা যেমন অনুসরণ করবে এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সেই আদর্শ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবে। যে আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে, যার প্রতি ঈমান আনা হয়েছে সেই আদর্শের সাক্ষী হিসাবে পৃথিবীর সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ নন্দিত আদর্শের সাক্ষী হিসাবে সারা পৃথিবীর মানবমণ্ডলীর সামনে নিজেকে পেশ করতে হবে এবং এটাই হলো নন্দিত মুসলিম জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এই দায়িত্ব পালনের জন্যই মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্বাচিত করেছেন। মুসলিম মিল্লাতের প্রতি এই দায়িত্ব অর্পণ করে তাদেরকে 'মধ্যমপন্থী দল' হিসাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যও এটাই। বিশ্ব ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহ্র আবির্ভাবের কারণই হলো এটা যে, তারা পৃথিবীর মানুষকে ইসলামী জীবন বিধানের দিকে আহ্বান জানাবে। এই দায়িত্ব ইতোপূর্বে অর্পণ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলীদের প্রতি। কারণ তাদের কাছে ইসলামী আদর্শ ছিল এবং এ জন্য তাদেরকে পৃথিবীর জাতিসমূহের নেতার আসনে আসীন করা হয়েছিলো। তারা পৃথিবীর মানুষকে মহান ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে এটাই ছিল উদ্দেশ্যে এবং এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে

জাতিসমূহের নেতার মর্যাদায় তাদেরকে অভিষিক্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখে অভিশপ্ত হয়েছে। মুসলিম জাতিও যতদিন উক্ত দায়িত্ব যথারীতি পালন করেছে, ততদিন বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছে মুসলিম জনগোষ্ঠী। দায়িত্বের প্রতি যখন তারা অবহেলা উদাসীনতা প্রদর্শন করতে শুরু করলো, তখন থেকেই তাদের পতনের সূচনা হলো। সে পতনের গতি বর্তমান সময় পর্যন্তও নিম্ন দিকেই ধাবমান। আর এ কারণেই সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতি অকল্পনীয় শোষণ, নিষ্পেষন এবং নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছে।

নন্দিত জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য

মুসলিম জনগোষ্ঠী যে সমাজ, দল বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবে, সেই সমাজে, দলে বা রাষ্ট্রে কোনোক্রমেই যেন সত্যের পরিপন্থী, ইনসাফের বিপরীত, মিথ্যা বা বাতিলের অনুকূলে কোনো ধরনের কাজ যেন হতে না পারে, সেদিকে সকলেই সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রাখবে। মুসলিমের জীবন হবে মহান আল্লাহর রঙে রঙিন, এই রঙের বিপরীত কোনো ধরনের রঙকে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। কারণ মহান আল্লাহর রঙ তথা ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন–

صِبْغَةَ اللّٰهِ– وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً–

শ্রেষ্ঠ রঙ হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালারই, এমন কে আছে যার রঙ তাঁর রঙের তুলনায় উৎকৃষ্ট হতে পারে? (সূরা আল বাক্বারা-১৩৮)

এখানে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোনো বাতিল মতবাদ- মতাদর্শ দেখলে বা ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির বিপরীত কোনো কাজ সংঘটিত হতে দেখলেই মুসলিমরা দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করবে। ইসলামী চেতনার বিপরীতে মিথ্যার অনুকূলে কোনো শক্তি জেগে ওঠা মাত্র মুসলিমরা তার বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য বুহ্য রচনা করে মিথ্যা শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। যে শক্তি ইসলামের বিপরীত কিছুর আমদানী করার চেষ্টা করবে, সে শক্তির উদ্ধত মস্তকে পদাঘাত করে তাকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল তলদেশে তলিয়ে দেবে। মহান আল্লাহর নাযিল করা বিধানের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের জাগরণকে তারা স্ত ব্ধ করে দিবে।

ইসলামের রঙে রঙিন মুসলিমদের মাধ্যমে একটি সমাজ বা দল অথবা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে, সেই সমাজ, দলের কর্মী বা রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি বা নাগরিককে অতিমাত্রায় সচেতন এবং দায়িত্বশীল হতে হবে। যেন সেই সমাজ, সেই দলে বা রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো ধরনের বিপর্যয় দেখা না দেয়। ঈমানী চেতনার বর্ম দ্বারা আবৃত, ইসলামী আদর্শের দেয়ালে ঘেরা রাষ্ট্রের, দলের বা সমাজের গায়ে শয়তান ছিদ্র করে সেই ছিদ্র পথে প্রবেশ করে তার ভেতরে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং দুষ্কৃতি করতে না পারে। এ জন্য ইসলামী সমাজের, দলের ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্তব্য সচেতন থেকে একে অপরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার বিধানের ওপরে সুদৃঢ় থাকার ব্যাপারে পরামর্শ দিবে। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার পথে যেসব বিপদ, মুসিবত ও দু:খ-কষ্ট আসবে, পরম ধৈর্যের সাথে তার মোকাবেলা করার জন্য ধৈর্য ধারণের নসীহত করবে। আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করার ব্যাপারে একে অপরকে উৎসাহিত করা বা পরস্পরের ভেতরে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করার কর্তব্য একাকী অথবা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে পালন করা যায় না। মহান আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি ইসলামের আহ্বান মানুষের কাছে পৌঁছানোর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, সে দায়িত্বও একাকী পালন করা যায় না।

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে বাধা-বিপত্তি ও বিপদ-মুসিবত আসে, সে অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করা অপরিহার্য। ধৈর্য ধারণের এই অনুশীলনও একাকী করা যায় না। একক কোনো ব্যক্তির ওপরে বিপদ এলে সে ব্যক্তি অস্থির হয়ে উঠতে পারে। আর বিপদ যদি সামষ্টিকভাবে আসে তাহলে একে অপরকে ধৈর্য ধারনের উপদেশ দিয়ে সে বিপদের মোকাবেলা সকলেই একত্রিত হয়ে করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন একটি সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের। মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজেই আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলবে না, এই বিধান অন্যান্য লোক যেন অনুসরণ করে, সে লক্ষ্যে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। অন্য মানুষকে আল্লাহর বিধানের দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রচেষ্টা চালাবে। এভাবে তারা প্রত্যেকটি লোককে ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীকে পরিণত করবে। মুসলিম জনগোষ্ঠী আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে আন্দোলন গড়ে তোলে সেই আন্দোলনের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন- সুন্নাহ্ বর্ণিত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন করবে, সেই অনুশীলনীই হলো ঐ সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের জীবনীশক্তি। সমাজ, দল ও রাষ্ট্রকে যে কোনো ধরনের দুষ্টক্ষত

থেকে মুক্ত রাখবে ঐ জীবনীশক্তি তথা পরস্পরকে আল্লাহর বিধানের ওপরে টিকে থাকার উৎসাহ ও উপদেশ এবং ধৈর্য ধারণের অনুপ্রেরণা।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের বলেন, তোমরাই উম্মতে ওয়াসাতা-মধ্যপন্থী উম্মত। আমি রাসূলকে যা কিছু শিখিয়েছি, তিনি তা তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। রাসূলের এই শিক্ষা তোমরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করবে এবং পৃথিবীর মানুষকে এই শিক্ষার দিকে আহ্বান জানাবে। পবিত্র কোরআনে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ–

হে ঈমানদারগণ! তোমরা (সর্বদাই) ইনসাফের ওপর (দৃঢ়ভাবে) প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং আল্লাহ তা'য়ালার জন্য সত্যের সাক্ষী হিসেবে নিজেকে পেশ করো। (সূরা নিসা-১৩৫)

পৃথিবীর সকল জাতিসমূহের সামনে মুসলমানদেরকে নন্দিত আদর্শ ইসলামের মূর্ত প্রতীক হিসাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক মুসলমানকে দেখে অন্যান্য জাতিসমূহ মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান সম্পর্কে যেন এ কথা স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহর বিধান সুন্দর ও কল্যাণকর এবং এর কোনো বিকল্প নেই। যাবতীয় দুষ্কৃতিতে আপাদ-মস্তক নিমজ্জিত হওয়া ও মহাসত্যের প্রতি বিদ্রোহ করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বনেতৃত্বের আসন থেকে ইয়াহুদীদেরকে পদচ্যুত করে নবী করীম (সা:) কর্তৃক গঠিত ঈমানদার ও সৎকর্মশীল জনগোষ্ঠী মুসলমানদেরকে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে অভিষিক্ত করেছেন। এই পদে আসীন হওয়া একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান-মর্যাদা ও বিশিষ্টতার পরিচায়ক, এই পদ মানুষকে সম্মান-মর্যাদা ও জীবনের সার্বিক সফলতা এনে দেয়। যদি এই পদের যথাযথ ব্যবহার করা যায়। অপরদিকে এই পদের যে দায়িত্ব, এই পৃথিবীর অন্য সকল দায়িত্বের মধ্যে সবথেকে কঠিন ও গুরুদায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে সামান্যতম অবহেলার পরিচয় দিলে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যেমন ভাঙ্গন ও বিপর্যয় নেমে আসবে এবং এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এসে পড়বে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত মুসলিম মিল্লাতের ওপরে। কিয়ামতের ময়দানেও মহান আল্লাহর আদালতে কঠিন জবাবদীহী করতে হবে। সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য দায়িত্বের ব্যাপারে কোনো ধরনের অযোগ্যতার পরিচয় দিলে তা তেমন ক্ষতি বয়ে আনবে না, কিন্তু এই দায়িত্ব এমনই এক কঠিন দায়িত্ব যে, বিন্দু পরিমাণ অবহেলার পরিচয় দিলে মানবতাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সেই সাথে সমগ্র সৃষ্টিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই দায়িত্ব পালন করার অর্থ হলো, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী করীম (সাঃ) যেভাবে আল্লাহভীতি, ন্যায়-পরায়ণতা, সততা, সত্যপ্রিয়তা, আদল-ইনসাফ, সুবিচার ও ন্যায়নিষ্ঠার দিক দিয়ে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য জীবন্ত আদর্শ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন, অনুরূপভাবে মুসলিম জাতিকেও সারা দুনিয়ার অন্যান্য সকল জাতির কাছে নিজেদের চরিত্র, কর্ম, আচার আচরণ, ব্যবহার, লেনদেন, চলাফেরা, ওঠাবসা, তথা সকল কিছুর মাধ্যমে জীবন্ত আদর্শ হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। এই মুসলিম মিল্লাতের চলাফেরা, আচার-আচরণ, ব্যবসার ধরন, কথাবার্তা, শিল্প-সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি দেখে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ যেন আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহকে ভয় করে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার অর্থ, সততার প্রকৃত অর্থ, সত্যবাদিতা, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার প্রকৃত তাৎপর্য কি তা যেন অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

এই দায়িত্ব অর্পণ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকল নবী-রাসূলকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোনো একজনও যদি এই দায়িত্ব পালনে সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করতেন, তাহলে তাঁকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হতো। নবী-রাসূল আগমনের ধারা নবী করীম (সাঃ) এর আগমনের মধ্য দিয়েই ইতি টানা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলিম জাতির প্রতি। সমগ্র দুনিয়াবাসীর সামনে তাদেরকে নিজেদের জীবন চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের কল্যাণকারিতা তুলে ধরতে হবে। অন্যান্য জাতিসমূহের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহর বিধানই পৃথিবীর মানবতার কল্যাণের একমাত্র উপযোগী বিধান, আর অন্যান্য যাবতীয় বিধি-বিধান মানব কল্যাণের বিপরীত।

মহান আল্লাহর মনোনীত যে বিধান তাঁর রাসূলের মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে পৌছেছে তা আল্লাহ তা'য়ালার অন্যান্য বান্দাদের কাছে পৌছাতে মুসলমানরা যদি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করে, কিয়ামতের দিন যদি মুসলিম জনগোষ্ঠী আল্লাহর দরবারে এ কথা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের ওপরে যে দায়িত্ব ছিল, তা তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাহলে অবশ্যই মুসলিমরা অপরাধির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হবে। পৃথিবীতে যাবতীয় ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের কারণে মুসলিমদেরই দায়ী করা হবে। পৃথিবীতে যে সম্মান-মর্যাদার আসন- নেতৃত্বের আসন মুসলিমদের দেয়া হয়েছিল, এই আসনই তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ধ্বংস ও ক্ষতির দিকে অগ্রসর করবে।

এই পৃথিবীতে মুসলমানদের কাছে কোরআন রয়েছে, রাসূলের সুন্নাহ্ রয়েছে-রয়েছে সাহাবা কেরামের সমগ্র জীবন চরিত। এগুলো বাস্তবে প্রয়োগ অনুসরণ না করার কারণে পৃথিবীতে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে যত প্রকার ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিবে, গোমরাহী, অসততা, পথভ্রষ্টতা, অবিচার, অন্যায়, অত্যাচার তথা মানব কল্যাণের বিরোধী ও মানবতার পক্ষে ক্ষতিকর যতো কিছু দেখা দিবে, তার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য ভ্রষ্ট চিন্তা-নায়ক, নেতা, বুদ্ধিজীবী, ইবলিস শয়তান, মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তানদের সাথে সাথে মুসলিমদেরকেও অভিযুক্ত করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য করা হবে।

নন্দিত আদর্শ বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সহকারে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। নবী রাসূলদের দাওয়াত যারা কবুল করে ধন্য হয়েছেন, তাঁদেরকে তাঁরা একতাবদ্ধ করে একটি সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করেছেন। অর্থাৎ তাঁদেরকে একই সংগঠনের পতাকা তলে সমবেত করেছেন এবং সেই সংগঠিত শক্তিকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত করেছেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁর মক্কার জীবনে ইসলামী আন্দোলন করেছেন এবং যেসব মহান ব্যক্তি তাঁর আন্দোলন কবুল করেছেন তিনি তাঁদেরকে একত্রিত করে আদর্শিক প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মক্কায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্র অনুকূল না হবার কারণে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। সেখানে অনুকূল পরিবেশ লাভ করার ফলে আদর্শিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকদের নিয়ে মহান আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই ছিলো সমগ্র পৃথিবীর মানবমণ্ডলীকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো এবং আদর্শের ভিত্তিতে তাদের জীবনকে রঙিন করা।

এই পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, সহজ-সরল কথায় যারা পথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি, তিনি তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত শক্তি প্রয়োগ করে পথ থেকে সেই বাধা অপসারিত করে আদর্শ প্রচার ও প্রসারের পথ নিষ্কন্টক করেছেন। এই কাজ নির্জনে একাকী, শুধুমাত্র মসজিদ, খান্কাহ্ বা মাদ্রাসার চার দেয়ালে নিজেদেরকে বন্দী রেখে করা সম্ভবপর নয়। এ জন্য একটি

সংগঠনের পতাকা তলে ইসলামপন্থীদের একতাবদ্ধ হয়ে বিপরীত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত করতে হয়। মানুষকে শুভ, কল্যাণকর ও সৎকাজের আদেশ দিতে হবে, ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং অকল্যাণকর সকল কাজের মূলোৎপাটন করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ- وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ভালো ও সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তারাই সাফল্য মণ্ডিত হবে। (সূরা ইমরান-১০৪)

অর্থাৎ মানবমণ্ডলীর মধ্যে এমন একটি দলের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে, যে দল পৃথিবীর মানুষকে যা সুন্দর-শুভ, কল্যাণ-মঙ্গল ও ভালোর দিকে আহ্বান জানাবে। শুধু আহ্বানই জানাবে না, যা কিছু ভালো-সৎকাজ, তা বাস্ত বায়ন করার লক্ষ্যে নির্দেশ প্রদান করবে এবং যা কিছু অসুন্দর, অশুভ, অকল্যাণকর ও মন্দ, তা থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।

আদেশ দেয়া ও আদেশ বাস্তবায়ন করা এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার কর্মসূচী অনুরোধ ও উপদেশের মাধ্যমে পৃথিবীতে কখনো হয়নি। ওয়াজ-নসিহত বা তাবিজ-কবজের মাধ্যমেও মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রেখে ভালো কাজে রত করানো যায়নি। অথবা ভালো কাজ ও মন্দ কাজের তালিকা সম্বলিত বই-পুস্তক পাঠ করিয়েও মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যায়নি।

ক্ষেতে আগাছা জন্ম নেয়ার পরে ক্ষেতের মালিক যদি ক্ষেতের পাশে সুন্দর আসন বিছিয়ে তার ওপর কোনো মাওলানা বা পীর সাহেবকে বসিয়ে আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে শ্রুতি মধুর কণ্ঠে ওয়াজ-নসিহত করে, আগাছা দূর হবে না। অথবা আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে পীর সাহেবের কাছ থেকে কয়েক ড্রাম পানি পড়ে এনে ক্ষেতে ঢেলে দিলেও আগাছা দূর না হয়ে আরো বৃদ্ধি পাবে। দেশের যাবতীয় বাহিনীকে সমবেত করে তাদের অস্ত্রসমূহ আগাছার দিকে তাক্ করে হুমকি প্রদর্শন করলেও আগাছা দূর হবে না। আগাছা দূর করতে

হলে শক্ত হাতে আগাছা দূরীকরণের অস্ত্র ধরে ক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তখন সুফল পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবলমাত্র সৎকাজসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা যেতে পারে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতীত উল্লেখিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মহান আল্লাহর এই আদেশ বাস্তবায়ন করা যায় না। আর রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে একটি শক্তিশালী সংগঠন দাঁড় করাতে হবে এবং সেই সংগঠনকে বিজয়ী করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে হবে এবং এর মাধ্যমেই আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এই কাজটিই সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাঁকে অধিষ্ঠিত করে তাঁর বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করিয়েছিলেন। পৃথিবীর মানুষকে কল্যাণের পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে, তাদেরকে যাবতীয় জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে হলে অবশ্যই নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে হবে। নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে না পারলে এ দায়িত্ব পালন করা যাবে না। আর এসবের মূলে রয়েছে একতাবদ্ধ হওয়া, নিজেদেরকে সুসংগঠিত করে একটি সংগঠনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। ইসলামের নান্দনিক সৌন্দর্য্য প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যেই মানব গোষ্ঠীর মধ্য থেকে মুসলমানদেরকে বেছে বের করে নেয়া হয়েছে- অর্থাৎ এই কাজের জন্যই তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ–

তোমরাই (হচ্ছো পৃথিবীর মধ্যে) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যেই তোমাদের উত্থান, (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা পৃথিবীর মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তোমরা নিজেরাও আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আনবে। (সূরা ইমরান-১১০)

ইসলামী জীবন বিধান অনুসারে যারা পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করার বাস্তব উদ্যোগ এবং দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাছে মহান

আল্লাহর এই বিধান প্রাণের তুলনায় অধিক প্রিয়। হাদীসেও এ কথা বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষের কাছে তার নিজের জীবন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের তুলনায় আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর আদর্শ সর্বাধিক প্রিয় না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না। এই তাগিদ অনুসারে মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামকে সকল কিছুর ওপরে স্থান দিবে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, সে যাকে সর্বাধিক ভালোবাসে তার স্বার্থ যে কোনো অবস্থায় উর্ধ্বে তুলে ধরে এবং কথা ও আচরণের মাধ্যমে সেই ভালোবাসা বা আকর্ষণের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। মুসলিম তার সকল ভালোবাসা আল্লাহ তা'য়ালা, তাঁর রাসূল এবং ইসলামের জন্য উজাড় করে দিবে- এটাই ঈমানের দাবি। পবিত্র কোরআনেও ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনের ধন-সম্পদ ও প্রাণ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ–

অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান ও তাদের মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। (সূরা আত্ তাওবা-১১১)

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম হিসেবে পৃথিবীতে থেকে বিদায় গ্রহণ করার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে, সে ব্যক্তি ইসলামকে পৃথিবীর মানুষের সামনে তুলে ধরার সাম্ভাব্য যাবতীয় পথ অবলম্বন করবে। নন্দিত আদর্শ ইসলামের সাক্ষ্য হিসাবে সে নিজেকে উপস্থাপন করবে। মানুষ যেমন তার ভালোবাসার প্রকাশ কথা ও কাজের মাধ্যমে ঘটিয়ে থাকে, অনুরূপভাবে ইসলামের পক্ষে কথা ও কাজের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করবে। পারস্পরিক কথাবার্তায় মুসলিম ব্যক্তি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য তুলে ধরবে। যেখানেই কথা বলার সুযোগ আসবে, সেখানে পরিবেশ ও প্রসঙ্গ অনুধাবন করে মহান আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও তা প্রয়োগের ফলে ব্যবহারিক জীবনে এর কল্যাণসমূহের বর্ণনা অখণ্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরবে। লেখার সুযোগ থাকলে সে সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত মতবাদ-মতাদর্শ আবিষ্কৃত হয়েছে, লেখনীর মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও ক্ষতিকর দিকসমূহ প্রকাশ করে তার তুলনায় মহান আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে হবে।

বর্তমান যুগে প্রচারের যেসব মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে, এসব মাধ্যমকে মহান আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যবহার করতে হবে। পৃথিবীর মানুষকে

মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ইসলামের সাথে পরিচিত করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রিন্টিং মিডিয়া ও ইলোক্ট্রনিক মিডিয়াসহ আধুনিক বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে যতগুলো মাধ্যম আবিষ্কার করেছে, তা কাজে লাগাতে হবে। মানুষের মন-মস্তিষ্কে এ আদর্শের মর্মবাণী পৌঁছানোর জন্য চিন্তা-গবেষণা করে প্রচার ও প্রসারে নিত্য-নতুন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ইসলামী চিন্তাবিদদের একত্রিত করে মাঝে-মধ্যে গোল টেবিল বৈঠক, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও কোরআন-হাদীসের তাফসীরের আয়োজন করতে হবে। মহান আল্লাহর বিধানের যাবতীয় দিকসমূহ যুক্তি ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচনা করে তা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, জীবনের সকল কাজের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের কাজকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে হবে।

অপরদিকে যে আদর্শের দিকে মুসলমানরা মানুষকে আহ্বান জানাবে, সেই আদর্শ বাস্তবে অনুসরণ করে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করে পৃথিবীর মানুষের সামনে এ কথাই প্রমাণ করে দিতে হবে যে, শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি সর্বোপরি কল্যাণ লাভ করতে হলে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যে আদর্শ প্রচার করা হবে, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সেই আদর্শের বাস্তব রূপ দেখতে আগ্রহী হবে। তারা জানতে চাইবে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত তথা ইসলামের প্রতি যারা ঈমান এনেছে, তাদের বাস্তব জীবনধারা কেমন। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, বিচার ব্যবস্থা, সাংবাদিকতা, শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি, বাণিজ্য নীতি, সম্পদ বন্টন নীতি তথা যাবতীয় নীতিমালা কোন্ ধরনের কল্যাণের স্বাক্ষর বহন করছে, কোন্ ধরনের সৌন্দর্য-সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে, কোন্ ধরনের আলো বিকশিত করছে তা পৃথিবীর মানুষ জানতে চাইবে।

এ প্রসঙ্গে লন্ডনের একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন অনুভব করছি। ইসলামের প্রতি অনুরাগী একজন মুসলমান সেখানের একজন খৃষ্টান নারীকে ইসলাম সম্পর্কে জানার দাওয়াত দিয়ে তাকে কোরআন পড়তে দিয়েছিলো। মাতৃ ভাষায় অনুদিত কোরআন পাঠ করে সেই নারী উক্ত মুসলমান লোকটিকে বলেছিলো, 'এবার সেই কোরআনটি দাও, যা তোমরা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে অনুসরণ করো'। মুসলমান লোকটি অবাক বিস্ময়ে খৃষ্টান নারীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, 'আমাদের কোরআন তো একটি, আপনি দ্বিতীয় কোরআনের কথা কেনো বলছেন?' খৃষ্টান নারী উপহাস

করে জবাব দিয়েছিলো, 'আমাকে যে কোরআন তুমি পড়তে দিয়েছো, সেই কোরআনের নীতিমালার সাথে তোমাদের বাস্তব জীবনধারার কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে না পেয়েই তোমাকে দ্বিতীয় কোরআনের কথা বলেছি'।

সুতরাং যে নীতিমালার দিকে মুসলমান পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহকে আহ্বান জানাবে, সেই নীতিমালা সর্বপ্রথমে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ-

তোমরা অন্য লোকদেরকে তো ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাকো, তোমরা কি বুদ্ধিকে কোনো কাজেই প্রয়োগ করো না? (সূরা বাকারা-৪৪)

সুতরাং পৃথিবীর মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের দিকে আহ্বান জানানোর যে দায়িত্ব মুসলমানদের প্রতি অর্পিত হয়েছে, সেই আদর্শ সর্বপ্রথমে নিজেদের জীবনের প্রত্যেক বিভাগে বাস্তবায়ন করে এর যাবতীয় কল্যাণ পৃথিবীর মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করতে হবে। যে কোনো অবস্থায় এবং যে কোনো স্থানে, পৃথিবীর যে কোনো ব্যক্তি, সমাজ, গোষ্ঠী ও জাতির সাথেই মুসলমানদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটবে, মুসলমান যে নীতি আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছে এবং যে আদর্শ অনুসরণ করে তারা কল্যাণ লাভ করেছে, তাদের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা, স্বস্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছে, তা যেনো সেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি বাস্তবে অবলোকন করতে সক্ষম হয়। তাহলে তারা নন্দিত আদর্শ ইসলামের প্রতি অতীতে যেভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, বর্তমানেও তেমনিভাবে আকৃষ্ট হবে।

আত্মঘাতি মুসলিম জাতি

পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের সম্মুখে ইসলামের নান্দনিক সৌন্দর্য্য তুলে ধরাই ছিলো মুসলমানদের জাতীয় কর্ম-চাঞ্চল্যের কেন্দ্র বিন্দু। এটাই ছিল তাদের সর্বাগ্রে পালনীয় দায়িত্ব। অত্যন্ত দু:খজনক হলেও এ কথা চরম সত্য যে, বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম মিল্লাত এই দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে ইতোপূর্বে বনী ইসরাঈলীরা ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছিলো বিধায় তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে

পদচ্যুত করা হয়েছে এবং তারা মহান আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়েছে। লাঞ্ছনা আর অপমান হয়েছে তাদের লালট লিখন। যে কারণে ইয়াহুদীরা নেতৃত্বের পদ থেকে পদচ্যুত হয়েছে এবং ঘৃণা ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, সেই একই কারণ যদি মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে, তাহলে ইয়াহুদীদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা যে আচরণ করেছেন, সেই একই আচরণ তিনি মুসলমানদের সাথেও করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইয়াহুদীদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে (নাউযুবিল্লাহ) এমন শত্রুতা ছিলো না যে, তিনি তাদের প্রতি অকারণে গযব চাপিয়ে দিয়েছেন। আর মুসলমানদের সাথেও মহান আল্লাহর এমন কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই যে, তারা ইয়াহুদীদের ন্যায় আচরণ করতে থাকবে আর আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন রাখবেন এবং ক্রমাগতভাবে তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেই যাবেন।

ইসলামের ব্যাপারে মুসলমানরা অতীতের সেই ইয়াহুদীদের তুলনায় মোটেও সুখকর আচরণ করছে না। ইসলামের বিপরীত যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের চরিত্রে বিকশিত হয়ে পৃথিবীময় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে যে কোনো কাজ শুরুর পূর্বে মুসলমানরা আপন রব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে স্মরণ করে শুরু করবে এবং এটাই ছিলো তাদের ঈমানী দায়িত্ব। অমুসলিম জাতিসমূহ কোনো দায়িত্ব গ্রহণকালে যে শপথ বাক্য পাঠ করে, সেখানে তারা নিজের ধ্যান-ধারণা অনুসারে স্রষ্টাকে স্মরণ করে। আমেরিকা-ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে শপথ গ্রহণকালে তারা বাইবেলের ওপরে হাত রেখে শপথ বাক্য উচ্চারণ করে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণকালে শপথ বাক্যে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় না। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের সংবিধানের কোথাও মুসলিম জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করা হয়নি।

আমি প্রথম বারের মতো যখন আমার নিজ এলাকা পিরোজপুর সদর ১ নম্বর আসন থেকে মহান আল্লাহর রহমতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে সংসদে প্রবেশ করলাম, তখন বাজেট অধিবেশনে আমি অত্যন্ত দু:খভারাক্রান্ত হৃদয়ে লক্ষ্য করলাম, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ তাদের মৃত নেতাদেরকে স্মরণ করে বক্তৃতা শুরু করছেন। মুসলিম হিসাবে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণের সৎসাহস দেখাতে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। আমার জন্য নির্ধারিত সময়ে আমি আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর

রাসূলের হাম্‌দ না'ত পাঠ করে আমার বক্তৃতার সূচনা এভাবে করলাম, 'আমি সর্বপ্রথমে স্মরণ করছি' এই কথাটুকু বলতেই আমি লক্ষ্য করলাম পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যগণ আমার দিকে সচকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। বোধহয় তারা অনুমান করেছিলেন আমি তাদেরই অনুরূপ কোনো নেতাকে স্মরণ করবো। আমি বক্তৃতার সূচনা এভাবে করলাম, 'আমি আমার হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করে, আমার সবটুকু শ্রদ্ধার শেষ রেশটুকু বিলিয়ে দিয়ে সর্বপ্রথমে স্মরণ করছি এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী ও বিশাল আকাশের মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে'।

মুসলমানরা ইসলামের স্বপক্ষে এবং নিজ আদর্শকে সর্বোচ্চে তুলে ধরার লক্ষ্যে মুখের কথা ও লেখনী ব্যবহার করা তো দূরে থাক, তারা এর বিপরীত কাজটিই অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে। মুসলমান হিসাবে নিজেকে দাবি করে, পাশাপাশি মুখের কথা, বক্তৃতা, বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করা হচ্ছে। মহান আল্লাহর বিধানকে মানুষের জীবনে অপ্রয়োজনীয়, সেকেলে, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক, অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ, জঙ্গীবাদ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম নামধারী লোকগুলো প্রিন্টেড এবং ইলোক্ট্রনিক মিডিয়াগুলোয় ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে একশ্রেণীর মুসলিম নামধারী লোকজন অসংখ্য পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল চালু করেছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয় পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলসমূহ মুসলিম স্বার্থের বিপরীত পথেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের কবিতায় ও সাহিত্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করছে। মুসলিম নামধারী কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, চিকিৎসক তথা মুসলিম মিল্লাতের অধিকাংশ লোকজন নিজেদের কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় ভিন্ন জাতির সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইসলামের বিপরীত নীতি আদর্শে প্রতিপালিত, বিপরীত পরিবেশে বর্ধিত কুফরীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন লোকগুলোর ঘৃণ্য জীবনধারার তুলনায় মুসলিম মিল্লাতের লোকজনের জীবনধারা কোনো অংশেই উৎকৃষ্ট নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তাদের তুলনায় মুসলমান দাবিদার লোকগুলোর চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য বিভৎসরূপে প্রকাশ ঘটছে। অমুসলিমদের জীবনধারায় আর মুসলিম দাবিদারদের জীবনধারায় কোনোই পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বর্তমান মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা দেখে অমুসলিম জাতিসমূহ এ কথাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে যে, উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে মুসলমানদের কাছে অনুসরণ করার মতো

কোনো আদর্শ নেই, এই জন্যই তারা আমাদের নীতি আদর্শ পরম মমতাভরে অনুসরণ করছে। ড. আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) মনের ক্ষোভে বলেছেন–

ওজে' মেঁ তুম হো নাসারা, তু তামাদ্দুন মেঁ হুনুদ
ইয়েহ্ মুসলমাঁ হ্যাঁয়! জিন্‌হে দেখ্ কে শরমায়েঁ ইয়াহুদ
এউঁ তু সাইয়্যেদ ভী হো, মির্জা ভী হো, আফগান ভী হো
তুম স্যব্‌হী কুছ হো, বাতাও তু মুসলমান ভী হো?
রীতি-নীতি তব খ্রীষ্টান সম, হিন্দু তো তুমি সভ্যতায়,
এই কি হে সেই মুসলিম যারে ইয়াহূদীও দেখে' লজ্জা পায়?
মুখে বলো তুমি মীর্জা, সাইয়্যেদ, মহা-তেজস্বী আফগান বীর পাঠান;
সব কিছু তব হওয়া সম্ভব, নহ শুধু তুমি মুসলমান!

মুসলমানদের কেনো এই দু:খজনক অবস্থা হলো, বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করার জন্য একটু পেছনের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। ইসলাম বিবর্জিত আধুনিক জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি শ্রেণী ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। ইতিহাস- যে ইতিহাস রচিত হয়েছে ইউরোপের ধর্ম বিরোধী গোষ্ঠী দ্বারা বা তাদেরই মানস সন্তানদের কলম দিয়ে, এসব ইতিহাসে তারা যখন পড়ছে যে, ইউরোপে ধর্ম ছিল প্রগতি এবং মানব কল্যাণের অন্তরায়। তখন এসব মুসলিম নামধারী ব্যক্তিগণ ইসলামকেও প্রগতির অন্তরায় মনে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ইসলাম মানেই মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ এবং এই আদর্শ মানব কল্যাণের অন্ত রায়। সুতরাং ইসলামকে সমাজ থেকে উৎখাত করতেই হবে। ইসলামী জ্ঞান না থাকার কারণে এই মুসলিম নামধারী পণ্ডিতরা ইসলামকে পাদ্রীদের পোপতন্ত্রের ন্যায় প্রগতি বিরোধী বলে ধারণা করছে, আবার কেউ জেনে বুঝে নিজের কলম এবং মাথা ইসলামের শত্রুদের কাছে বিক্রি করে উচ্ছিষ্টের লোভে ইসলামের বিরোধিতা করছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

প্রথমত: মুসলমানদের মধ্যে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করছেন বা করেছেন, তাদের ভেতরে অধিকাংশ পণ্ডিতই ইসলাম সম্পর্কে বহু অমুসলিম চিন্তা নায়কের তুলনায় ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে পিছিয়ে আছেন। পৃথিবীর বিখ্যাত চিন্তাবিদ- যারা অমুসলিম, তারা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করে ইসলামের

সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানেও করছেন, ঠিক এ সময়ে তথাকথিত মুসলিম চিন্তাবিদগণ ভ্রান্ত মতবাদ-মতাদর্শ নিয়ে গবেষণায় বিভোর হয়ে আছেন। এই শ্রেণীর মুসলিম নামধারী চিন্তা-নায়করা পরিত্যক্ত আদর্শ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার অঢেল সময় পান, কিন্তু তারা সময় পান না ইসলামকে নিয়ে একটু মাথা ঘামানো বা চিন্তা-গবেষণা করার। তারা নিজের ঘরে গিলাফে মোড়া কোরআন খুলে দেখার সময় পান না।

অপরদিকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা কোরআন-হাদীস নিয়ে চর্চা করছেন, ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করছেন, তাদের অধিকাংশই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত নন। তারা বিজ্ঞান চর্চা করেন না। হযরত আদম (আঃ) বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। সৃষ্টির শুরুতেই বিজ্ঞান, সৃষ্টির প্রথম মানুষ একজন বিজ্ঞানী। কোন্ উচ্চ পর্যায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী তা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। হযরত আদম (আঃ) নবী ছিলেন, রাসূল ছিলেন, পৃথিবীতে আসার পূর্বে তাকে নবুয়াত দান করা হয়েছিল না পরে দান করা হয়েছিল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এক শ্রেণীর আলেম সমাজ গবেষণা ও বিতর্ক করেন। কিন্তু আফসোস, তিনি যে বিজ্ঞানী ছিলেন তা নিয়ে গবেষণা করেন না। এ সম্পর্কে গবেষণা তো করেনই না, যারা বিজ্ঞান গবেষণা করেন এবং চর্চা করেন তাদেরকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করেন। তাঁরা কেনো এমন করেন, এরও যুক্তিসম্মত কারণ রয়েছে। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী ইংরেজ জাতি। ভারতীয় উপমহাদেশেও তারা দস্যুর মত আক্রমন করে প্রায় দুই শত বছর শাসন করেছে। তারা জানতো, তারা চিরদিন এই দেশে থাকতে পারবে না। সুতরাং এদেশ ছেড়ে চলে যাবার পরেও যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী মুসলমানগণ তাদের রাজনৈতিক গোলামী না করলেও যেন অন্যান্য সকল দিক ও বিভাগে গোলামী করে সেই ব্যবস্থা তারা পাকাপোক্ত করে রেখে যায়।

পরিকল্পনার ভিত্তিতে তারা তাই করেছে। মুসলমানদেরকে তারা প্রকৃত ইসলাম বুঝতে দেয়নি। ইসলামকে তারা বুঝতে দিবে না এ কারণে শিক্ষাকে তারা দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল। একভাগের শ্রুতি মধুর এবং আকর্ষণীয় নাম নিউ স্কীম দেয়া হলো। আরেক ভাগের শ্রুতিকটু এবং অবহেলিত নাম ওল্ড স্কীম দেয়া হলো। অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষার নাম দেয়া হলো ওল্ড স্কীম। এই নামটি এমন যে, তা শুনতে শ্রুতিকটু এবং এই শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আকর্ষণ মানুষের মনে সৃষ্টি হয় না। মুসলিম বিদ্বেষী ইংরেজদের ষড়যন্ত্র এখানেই থেমে থাকেনি। কোরআন

হাদীসকে বিকৃত করা এবং কোরআনের প্রকৃত শিক্ষাকে আড়াল করার লক্ষ্যে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অমুসলিম প্রিন্সিপাল নিয়োগ করলো। এভাবে বছরের পর বছর ধরে ২৬ জন অমুসলিম প্রিন্সিপাল সে মাদ্রাসায় কর্মরত থাকলো। সে মাদ্রাসা থেকে যারা শিক্ষা গ্রহণ করলো, তাঁরা কোরআন হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছে কিনা, তাদের কার্যকলাপই তা প্রমাণ করে দিল। স্বামী-স্ত্রীর বিভেদের ফতোয়া দেয়া আর মিলাদ পড়া ব্যতীত তেমন কোনো যোগ্যতাই তাদের মধ্যে ইংরেজগণ সৃষ্টি হতে দেয়নি।

ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সমরনীতি কিছুই তারা জানতে পারলো না। ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান এই কথাটিও তারা জানতে পারলো না, অথচ তারাই হলো ইসলামের শিক্ষক এবং মুসলমানদের ধর্মগুরু। এই শিক্ষার প্রতি এতটাই ঘৃণা সৃষ্টি করা হলো যে, কোনো একটি ধনীর সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়ানো হত না, মাতা-পিতার মেধাবী সন্তানকে মাদ্রাসায় দেয়া হত না। কানা, খোঁড়া, ল্যাংড়া, ডানপিটে সন্তানদেরকে মাতা-পিতা মাদ্রাসায় দিতে থাকলেন। এরাই আলেম নামে পরিচিতি পেল। ফল যা হবার তাই হলো। মুসলিম সমাজ ধ্বংসের অতলে তলিয়ে গেল।

ইসলামকে যারা সত্যই ভালোবাসতো, তাঁরা বাধ্য হয়েই আরেক ধরনের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করলেন। তার নাম দেয়া হলো কওমী মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসায় সরকার কোনো অনুদান দিল না। ফলে সাধারণ মুসলমানদের দানের ওপরে এই মাদ্রাসা পরিচালিত হতে থাকলো। মাদ্রাসা টিকিয়ে রাখার জন্য মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক সাহায্য চাইতে রাস্তায় নেমে এলেন। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেতে তাঁরা বাধ্য হলেন। ফলে তাদের মধ্য থেকে আত্মমর্যাদা বোধ হারিয়ে গেল। সমাজে তাদের সম্মান-মর্যাদা রইলো না। তাদের মধ্যেও ইসলামের বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টি হলো না। আত্মভোলা মুসলিম জাতিকে তাঁরাও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে আকর্ষণ করতে পারলেন না।

মহান আল্লাহর কিছু বান্দাহ্ যখন প্রকৃত ইসলাম অনুধাবন করে মানুষকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে আহ্বান জানালেন, তখন ইংরেজদের তৈরী একশ্রেণীর আলেম নামধারী ব্যক্তি প্রবল বাধার সৃষ্টি করলো। বর্তমান সময় পর্যন্তও তাদেরই অনুসারী এবং উত্তরাধিকারী আলেম নামধারী ব্যক্তিবর্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে আসছে। ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের বই পুস্তক রচনা করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ফতোয়া দিচ্ছে।

বর্তমানেও ইসলামের নামে যে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে, সেটা পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা নয়। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আলী, খালিদ, খাব্বাব, খুবাইব, তারিক, মূসা সৃষ্টি হচ্ছে না। কারণ এদেরকে হযরত বিলালের কাহিনী পড়ানো হয়, হযরত খাব্বাবের কাহিনী পড়ানো হয়, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কিভাবে তাঁরা নির্যাতন সহ্য করেছেন, এ কাহিনী পড়ে এবং শুনে তাঁরা কেঁদে বুক ভাসায়। কিন্তু তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। তাদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়, একজন লোক কালেমা পাঠ করে এই মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে আর কাফির এসে তার ওপরে কঠিন নির্যাতন করছে, তবুও সে ইসলাম ত্যাগ করছে না।

কিন্তু তাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না যে, রাসূল তাদেরকে এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, যে প্রশিক্ষণের কারণে তাদের স্বভাব চরিত্রে ইসলামী আদর্শ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে তাঁরা এমন মজবুত ঈমানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। এ সকল বিষয় তাদেরকে শিক্ষা না দেয়ার কারণ হলো, এসব শিক্ষা লাভ করলে তাঁরা ময়দানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের মতই জান মাল বিলিয়ে দিয়ে ইসলাম বিরোধী অপশক্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

সে সময় বাংলা এবং আসামে মাদ্রাসা ছিল মাত্র একটি। সে মাদ্রাসাটি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা। ৭৭ বছর ধরে ২৬ জন খৃষ্টান প্রিন্সিপালের পরিচালনার পরে একজন মুসলমান প্রিন্সিপাল দেয়া হয়েছিল। সে প্রিন্সিপালও ছিল খৃষ্টানদের হাতে গড়া তথা তাদেরই মানস সন্তান এবং তিনি যে কেমন ধরনের মুসলমান ছিলেন তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। ১৮৫০ সালে প্রথম প্রিন্সিপাল হয়ে এসেছিল ডক্টর স্প্রেংগার। তারপর ১৯২৭ সাল পর্যন্ত শেষ প্রিন্সিপাল ছিল আলেকজান্ডার হেমিলটন হালি। এই মাদ্রাসায় বিজ্ঞান চর্চা ছিল না।

এই মাদ্রাসা থেকে যারা বের হলো তারাও বিজ্ঞান চর্চা প্রয়োজন বলে মনে করতেন না। কারণ তাদের মন মগজে প্রবেশ করানো হয়েছিল, বিজ্ঞান শিক্ষা তেমন জরুরী বিষয় নয়। হযরত আদম (আ:)কে যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে, এসব বিষয় তাদেরকে জানতে দেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, এখান থেকেই পরিকল্পিতভাবে পবিত্র কোরআনের তাফসীরে ভুল ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে। বাইবেলের বিকৃত বর্ণনা ইসলামের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। দু:খজনক হলেও সত্য যে, আজও সে বিকৃত বর্ণনা খৃষ্টানদের উচ্ছিষ্ট মুসলমানরা গলধ:করণ করছে।

এই শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম সম্প্রদায় বিজ্ঞান চর্চা করেন না এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোরআনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে বিজ্ঞান চর্চাকে তারা হারাম ফতোয়া দিয়ে বিজ্ঞান চর্চা থেকে নিজেরা বিরত রয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করছেন।

এর ফলে বস্তু জগতকে সর্বদিক দিয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিচার করতে না পারার কারণে আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম সমাজকে তাঁরা নেতৃত্ব দানে সক্ষম হচ্ছেন না। দীর্ঘ সময় ব্যাপী ইসলাম বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শাসনের ফলে ইসলামী চিন্তাধারা সম্পন্ন ও চরিত্র বিশিষ্ট নেতৃত্ব মুসলিম সমাজের প্রতিটি বিভাগ থেকে বিদূরিত হয়েছে। ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অলঙ্কারে সুসজ্জিত অথচ ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে শূন্য মুসলিম ব্যক্তিদের নেতৃত্ব মুসলিম সমাজের সকল বিভাগ ও স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ফলে পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। বর্তমানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার কথা উঠলেই ইসলামী শিক্ষাহীন এই আধুনিক শিক্ষিত নামধারী মুসলিম ব্যক্তিগণই সর্বপ্রথম বিরোধিতা করছে।

দ্বিতীয়ত: পৃথিবীর মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জ্ঞান সাধনা, তথ্যানুসন্ধান ও চিন্তা-গবেষণার ইঞ্জিনই বিশ্বের এই মানব সভ্যতা নামক গাড়িটাকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জ্ঞান সন্ধানীরা তথা বিজ্ঞানীরা এই মানব সভ্যতা নামক গাড়িটার পরিচালক। গাড়ির পরিচালকের ইচ্ছানুযায়ীই গাড়ির যাত্রীদেরকে গাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থান করে এগিয়ে যেতে হয়। ইসলামী চরিত্রসম্পন্ন মুসলিম নেতৃত্ব যতদিন এই মানব সভ্যতা নামক গাড়িটার পরিচালক ছিলেন অর্থাৎ চিন্তা-গবেষণা, জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিলো, সে সময় পর্যন্ত ইসলামী চিন্তাধারা-ই মানব জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সত্য, মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত তথা সকল কিছুর মানদণ্ড ছিল ইসলাম।

পাদ্রীদের জুলুমতন্ত্রের পরিণতি- ইউরোপের অবৈধ সন্তান ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনের ফলে নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার প্লাবনে ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত মুসলিমদের তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে যাওয়াটা আশ্চর্যজনক নয়। সুতরাং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার যে গাড়ি দুর্বার গতিতে মানব মণ্ডলীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে করে ইসলামী শিক্ষা বর্জিত মুসলিম এমনকি দাড়ি টুপি তসবীহধারী ধার্মিক বলে পরিচিত মুসলিম ব্যক্তির ভেসে যাওয়া আশ্চর্যজনক নয় বরং এটাই স্বাভাবিক।

এ জন্য মুসলমানদেরকে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের দিকে। যে দায়িত্ব তাদের ওপরে ন্যাস্ত করা হয়েছে, সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। ইতিহাস সাক্ষী, এই দায়িত্ব পালন না করার কারণেই ইয়াহুদীদেরকে নেতৃত্বের আসন থেকে পদচ্যুত করে অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তারা সামষ্টিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করেনি বরং ব্যক্তিগতভাবে যারা দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছেন, তাদের প্রতি তারা নির্মম অত্যাচার করেছে। তাদের সেই ঘৃণ্য আচরণের সাথে বর্তমান মুসলমানদের আচরণে কোনোই পার্থক্য নেই। এরাও জাতিগতভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে মহান আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন করছে না। ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে যারা এই দায়িত্ব পালন করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তাদেরকে নানাভাবে নির্যাতিত করা হচ্ছে।

ইয়াহুদীরা নবী-রাসূলদের ওপরে নির্যাতন চালিয়েছে এবং হত্যা করেছে, বর্তমান মুসলমানরা অনুরূপভাবেই ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী ইসলামী আন্দোলনের লোকদের ওপরে নির্যাতন ও হত্যা করছে, তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায় আখ্যায়িত করে কারারুদ্ধ করছে, বিচারের নামে প্রহসন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহর দ্বীনের সাথে যে ঘৃণ্য আচরণ করে ইয়াহুদীরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, সেই একই আচরণ মুসলিম নামধারী নেতৃত্ব স্থানীয় লোকগুলো নিজেরা করছে এবং সমগ্র জাতিকে করতে বাধ্য করছে। এর অনিবার্য পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। সারা পৃথিবীতে সবথেকে লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্যাতিত, অবহেলিত, নিষ্পেষিত, পদদলিত মানুষগুলোর পরিচয় হলো মুসলমান।

যতদিন মুসলিম জাতি আল্লাহর বিধানের অনুসরণ, প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব পালন করেছে, ইতিহাস সাক্ষী, ততদিন এই মুসলমানরাই ছিলো পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন। সমগ্র দুনিয়ার ওপরে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে। আর যখন থেকে তারা এ দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে, দায়িত্ব পালনে গাফলতির পরিচয় দিয়েছে, তখন থেকেই তাদের অধ:পতন শুরু হয়েছে। মুসলমানদের উন্নতি-সমৃদ্ধি ও সম্মান-মর্যাদা লাভের একমাত্র চাবিকাঠি হলো আল্লাহর কোরআন। এই কোরআনের অনুসরণই কেবলমাত্র তাদের হারানো সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারে। মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে ত্যাগ করে মুসলিম জাতি পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণ করেছে। যৌনতা নির্ভর পশ্চিমা সভ্যতা মুসলমানদেরকে কা'বা শরীফের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে

পৌত্তলিকদের মন্দিরে প্রবেশ করিয়েছে। মুসলিম দার্শনিক ড. আল্লামা ইকবাল (রাহ:) মুসলিমদের সম্পর্কে মর্ম বেদনা এভাবে প্রকাশ করেছেন–

মেস্‌লে আন্‌জুম উফুকে কাওম পেহ্‌ রওশন ভী হূয়ে
বুতে হিন্‌দী কি মুহাব্বাত মেঁ ব্রাহ্মণ ভী হূয়ে
শওকে পরওয়ায মেঁ মাহ্‌জূরে নাশীমান ভী হূয়ে
বে আমল থে হী জাওয়াঁ, দ্বীন সে বদ্‌জন ভী হূয়ে
উন কো তাহ্‌যীব নে হার বন্‌দ সে আযাদ কিয়া
লা কে কা'বে ছে সানম্‌ খানে মেঁ আবাদ কিয়া!

জাতিসংঘের দিক সীমানায় ফুটিয়াছো বটে তারকা সম,
বিগ্রহ- প্রেমের হিন্দ- মাঝেও হয়েছো তুমি দ্বিজোত্তম।
পক্ষ মেলিয়া উড়িছে বিমানে নীড়ছাড়া তব নওজোয়ান,
কর্মবিহীন ছিল এতদিন, ধর্মেও আজি সন্দিহান!
নব্য সভ্যতা বাধা বন্ধনে করিয়া সবারে মুক্তি দান;
কা'বা হতে আনি মন্দির মাঝে করিল তাদেরে প্রতিষ্ঠান।

ইউরোপীয় পশ্চিমা সভ্যতা মুসলমানদেরকে ইসলামের সকল বন্ধন থেকে স্বাধীন করে দিয়েছে। ইসলামকে পরিত্যাগ করার কারণে মূর্তিপূজকদের কাছেও এরা শ্রদ্ধাভাজনে পরিণত হয়েছে। ভোগ বিলাসে মাতোয়ারা হয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়িয়েছে, অপর দিকে তার নিজ সন্তান শিক্ষার অভাবে নিজ আদর্শ ইসলামের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। জাতিসংঘের সদস্য পদ পেয়ে এরা নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছে, অথচ এই জাতিসংঘের মাধ্যমেই ইসলামের বিপরীত সভ্যতা সংস্কৃতি মুসলিম দেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে নারী উন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন, মানবাধিকার, সংস্কৃতি ইত্যাদি যেসব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, সেসব সম্মেলনে আয়োজকরা মুসলিম দেশ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে সেই সকল ব্যক্তিবর্গকেই নির্বাচিত করে, আদমশুমারীর খাতায় যাদের নাম মুসলিম হিসেবে উল্লেখ রয়েছে বটে কিন্তু চিন্তা-চেতনায় যারা নাস্তিকতায় বিশ্বাসী এবং চরম ইসলাম বিদ্বেষী। দলিল- দস্তাবেজে এসব ব্যক্তিবর্গের দস্তখত গ্রহণ করে সাধারণ মুসলমানদের এ কথাই বুঝানো হয় যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মতিক্রমেই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

আমেরিকা এবং পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহ ইসলামকে প্রতিপক্ষ মনে করে এবং একে প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প নিয়ে আমেরিকার নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্বকে এককেন্দ্রীক ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্যে সুদূর প্রসারী ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ক্রমশঃ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জাতিসংঘ নাম হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয় ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী লোকদের মাধ্যমে। ফলে আমেরিকা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতিসংঘ নামক অনুগত এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের সহযোগী হিসেবে পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা দুনিয়াকে নিজের প্রভাবাধীনে রেখে ইসলামের উত্থানকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায় তার নাম দিয়েছে 'বিশ্বায়ন'। বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে কোনো দেশ যেনো বাধার সৃষ্টি করতে না পারে এর জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথমে কৌশলে গর্ভাচেভের মাধ্যমে রাশিয়ার পতন ঘটায়। এরপর সে সন্ত্রাস দমনের ধোঁয়া তুলে বিভিন্ন মুসলিম দেশ দখল ও মুসলিম দেশসমূহে সামরিক ঘাঁটি বানিয়ে সৈন্য সমাবেশ করে। সেই সাথে পৃথিবীর অন্য কোনো রাষ্ট্র যেনো পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হতে না পারে, সে প্রচেষ্টা বর্তমান সময় পর্যন্তও অব্যহত রেখেছে।

জাতিসংঘ এবং তার সকল শাখা প্রতিষ্ঠান ও পশ্চিমা অর্থপুষ্ট এনজিওগুলো এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলসমূহ আমেরিকার বিশ্বায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষেই কাজ করে যাচ্ছে। এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের উত্থান প্রতিরোধ করার জন্যেই বিশ্বায়ন পরিকল্পনা ও সন্ত্রাস দমনের ধোঁয়া তোলা হয়েছে। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘকে দিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের সভ্যতা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সংবিধান প্রস্তুত করে, তাতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করা যাবে না বলে উল্লেখ করে। এরপর তা বাস্তবায়নে আরেক ধাপ অগ্রসর হবার জন্যে ১৯৪৬ সালে পশ্চিমা বিশ্ব অনুগত জাতিসংঘের মাধ্যমে মহিলা কাউন্সিল গঠন করে। তারপর দুনিয়ার নানা দেশে মহিলা কাউন্সিলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে।

নারী সম্পর্কিত এ ধরনের সম্মেলন সর্বপ্রথম ১৯৭৫ সনে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিশ্বনারী সম্মেলনে বাংলাদেশকেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়ে বাংলাদেশের বাইরে নারী উন্নয়নের নামে ইসলাম বিদ্বেষীদের দ্বারা যে আন্দোলন চলছে উক্ত আন্দোলনের সাথে মুসলিম প্রধান এদেশকেও যুক্ত করা হয়। ১৯৮০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় নারী সম্মেলন। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে তৃতীয় বিশ্বনারী

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন সম্মেলন। ১৯৫৯ সালে কমনওয়েলথ জেণ্ডার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একই বছরের ৪ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর চীনের বেইজিংয়ে চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও ১৯৯৩ সালে ভিয়েতনাম এবং ১৯৯৪ সালে মিসরের রাজধানী কায়রোতে দু'টো আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর আরো পূর্বে ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) সনদ গৃহীত হয়। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ কতিপয় আপত্তিসহ এই সনদে অনুস্বাক্ষর করে।

উল্লেখ্য, যদিও ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মিলোনিয়াম সামিটের অধিবেশন বাংলাদেশ Optional Protocol on CEDAW স্বাক্ষর করে কিন্তু এ নীতিমালার ৩.১, ৩.২, ৩.৩, ৩.৫, ৩.৬, ৯.২, ৯.৫, ৯.৬, ও ৯.১৩ অনুচ্ছেদসহ অনেকগুলো অনুচ্ছেদই প্রত্যক্ষভাবে কোরআন- সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে সদস্যভূক্ত অধিকাংশ দেশ এই নীতিমালায় স্বাক্ষর করেনি।

এসব সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, তা পাঠ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পশ্চিমা দুনিয়ার প্রভাব বলয়ে আবদ্ধ জাতিসংঘ বিশ্বায়ন পরিকল্পনার আড়ালে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈনদের পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে তাদের চিন্তা- চেতনা ও বিশ্বাস অনুসারে সারা দুনিয়ার নারী-পুরুষকে উলঙ্গ সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায়। প্রণীত দুই ধারার এক নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, To take all appropriate measures including legislation to modify or abolish existing law, regulations, customs and practices which constitues discrimination against woman and to repeal all national penal provision which constitution discrimination against woman.

'ঘোষিত নীতি বাস্তবায়নের পথে যদি প্রচলিত বা পূর্বপ্রতিষ্ঠিত কোনো নিয়ম-নীতি, আইন- বিধান, সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রথা, লোক প্রথা লোকাচার বাধার সৃষ্টি করে তাহলে এসব কিছুকে সংশোধন করতে হবে অথবা বাতিল করতে হবে এবং বিচারালয়ে নারীর প্রতি পক্ষপাতমূলক যেসব ধারা রয়েছে সেগুলোও বাতিল করতে হবে'।

জাতিসংঘের সহযোগিতায় ২০০০ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, উক্ত সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবের কয়েকটি বিষয় হলো-

(১) তরুণ- তরুণীদের যৌন স্বাধীনতার প্রতি আহ্বান জানিয়ে যৌনকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং দেরিতে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে উৎসাহিত করতে হবে।

(২) পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে নারী-পুরুষকে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং পরিবার গঠনে বিয়ের ভূমিকাকে উৎখাত করতে হবে।

(৩) গর্ভপাতকে আইনগত মর্যাদা দিতে হবে।

(৪) সকলের মধ্যে পশ্চিমা আদর্শের এভাবে বিস্তার ঘটাতে হবে যে, দুইজন মানুষ হলেই পরিবার গঠিত হয়, তা দুইজন পুরুষই হোক অথবা দুইজন নারী।

(৫) সাংসারিক কাজকর্ম করলে যেহেতু পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না, এ কারণে নারীদেরকে সংসারের কাজ না করার জন্যে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

(৬) স্ত্রী যেনো স্বামীর বিরুদ্ধে অধিকার হরণের মামলা করতে পারে, এ লক্ষ্যে পারিবারিক আদালত স্থাপন করতে হবে এবং সে আদালতকে শাস্তি প্রদানের অধিকার দিতে হবে।

(৭) সমকামিতা বৈধ বলে স্বীকৃতি দিতে হবে, সেই সাথে অবাধে যৌনকর্ম ও আচরণে সকলকে উৎসাহিত করতে হবে, এসব করতে গেলে আইনগত বাধা যা আছে তা অপসারিত করতে হবে।

(৮) পশ্চিমা বিশ্বে নারীর যে সমঅধিকার রয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। নর-নারীতে সমতা বজায় রাখতে হবে, নর-নারী দুইজনকেই সংসারের কাজ, সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন করতে হবে এবং পৈতৃক সম্পদে নর-নারীকে সমান অধিকার দিতে হবে।

(৯) চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের ঘোষণা পত্রে যেসব ইসলামী দেশ আপত্তি উত্থাপন করেছিলো, তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

উল্লেখ্য বাংলাদেশও উক্ত সম্মেলনে গৃহীত কতিপয় প্রস্তাবের প্রতি অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের সাথে আপত্তি উত্থাপন করেছিলো।

অর্থাৎ পশ্চিমা বিশ্বের প্রণীত ও বিশ্বায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নীল নকশা নারী নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে কোরআন- হাদীস বাতিল করতে হবে, পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রথা নির্মূল করতে হবে, পরিবার প্রথা বিলুপ্ত করতে হবে, পুরুষে

পুরুষে ও নারীতে নারীতে বিয়ে জায়েয করতে হবে, অবাধে যৌন কর্ম করতে হবে, জারজ সন্তানকে বৈধতা দিতে হবে, দেশে প্রচলিত সকল নিয়ম-নীতি ও আইন-সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে বাদ দিয়ে অন্যান্য নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে, স্ত্রীও স্বামীকে বাদ দিয়ে অন্যান্য পুরুষদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে, আর এসব ব্যাপারে কেউ কারো প্রতি কোনো বাধা সৃষ্টি করলেই পারিবারিক আদালতে একের বিরুদ্ধে অন্যজন অধিকার হরণের মামলা করে স্বামী বা স্ত্রীকে শাস্তির মুখোমুখি করবে। এভাবেই জাতিসংঘের মাধ্যমে নন্দিত আদর্শ ইসলামী সভ্যতা ও মুসলিমদের জীবন বিধানকে যবেহ করা হচ্ছে।

দায়িত্ব পালনে অবহেলার করুণ পরিণতি

পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোয় রাস্তা-পথে যান-বাহন চলাচলে শৃংখলা রক্ষা ও সাধারণ জনগণের শান্তি-স্বস্তির সাথে পথ চলা নিশ্চিত করার জন্য ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ট্রাফিক পুলিশ যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করে অবহেলা উদাসিন্য প্রদর্শন করে, তাহলে রাস্তা-পথে চরম বিশৃংখলা দেখা দিবে। নিষিদ্ধ ও সনদবিহীন যান-বাহন পথে নেমে আসবে, তা থেকে জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর গ্যাস ও ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়বে। যানজটের কারণে সাধারণ মানুষ শান্তি ও স্বস্তির সাথে পথ চলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। যান-বাহন একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটবে, মানুষ প্রাণ হারাবে, পঙ্গুত্ববরণ করবে এবং সম্পদহানী হবে।

পৃথিবীতে মুসলমানরা হলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ। নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তারা সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক দিক ও বিভাগে শৃংখলা এবং মানব জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করবে- এটাই ছিলো তাদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। তাদের প্রতি এই দায়িত্ব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়েছে। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য যে ক্ষমতা ও পদের প্রয়োজন হয়, তা-ও মহান আল্লাহ-ই দিয়ে থাকেন। ক্ষমতা ও পদ অর্জনের জন্য বেশ কয়েকটি গুণাবলীর প্রয়োজন হয়। সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জনে ব্যর্থ হলে ক্ষমতা ও পদ কোনটিই আল্লাহ তা'য়ালা দেন না। কারণ মহান আল্লাহর নীতি হলো, তিনি অপাত্রে ক্ষমতা ও পদ দেন না।

মুসলমানদের মধ্যে অতীতকালে সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছিলো, তারা ক্ষমতা ও পদ লাভের গুণ অর্জন করেছিলেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তখন অনুগ্রহ করে মুসলমানদেরকে ক্ষমতা ও পদ দুটোই দান করেছিলেন।

যখনই তারা নিজেদের অযোগ্যতার কারণে সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা'য়ালাও ক্ষমতা ও পদ নামক নিয়ামত দুটো তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ মুসলমানরা ছিলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ, তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে মহান আল্লাহর ভাষায়–

إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ–

যদি দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসো, তাহলে পৃথিবীতে মারাত্মক ধরনের ভাঙ্গন ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (সূরা আনফাল-৭৩)

আর যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় নেমে আসবে তা থেকে সমাজের ঐ লোকগুলোও নিরাপদ থাকবে না, যারা ইসলাম বিরোধিদের চতুরমুখী আক্রমণ সাহসের সাথে মোকাবেলা না করে মসজিদ আর খান্‌কায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ নিজেরাই শুধু সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইসলামী বিধি-বিধান পালন করার চেষ্টা করেছে, জাতিকে আল্লাহ বিরোধী পথ থেকে বিরত রাখার কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিরত থেকেছে। নিজেরাই শুধু অসৎকাজ থেকে বিরত থেকেছে কিন্তু সমাজ ও দেশের বুকে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেনি। ঈমানদার যে সমাজে বাস করবে, সে সমাজে ইসলামের বিপরীত সভ্যতা সংস্কৃতি মতবাদ মতাদর্শ মাথা উঁচু করবে, ইসলামের বিপরীত কর্মকাণ্ড চলতে থাকবে, আর মুসলমান নীরবে তা সহ্য করবে এবং কোনো প্রতিবাদ করবে না, এটা স্বাভাবিক নয়।

মুসলিম দাবিদার ব্যক্তিকে বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। ইসলামের বিপরীত আদর্শের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে না, আল্লাহর রাসূল (সা:) তাদেরকে 'শয়তানুন আখরাজ অর্থাৎ বোবা শয়তান' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। হযরত দাউদ (আ:) যখন মহান আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করতেন, তখন মহান আল্লাহর কালাম শোনার জন্য নদীর মাছ কিনারায় চলে আসতো। ইয়াহুদীরা সেই মাছ ধরে ভক্ষণ করতো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই মাছ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এক শ্রেণীর ইয়াহুদী আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধ অমান্য করে সেই মাছ ধরে ভক্ষণ করতে থাকলো। আল্লাহর নিষেধ অমান্য করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা গযব নাযিল করে সত্তর হাজার ইয়াহুদীকে বাঁদরে পরিণত করে দিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা সেই

অপরাধের কথা ইয়াহুদীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পবিত্র কোরআনে তা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ-

তোমরা তো ভালো করেই তাদের জানো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারে (আল্লাহর আদেশ) লংঘন করেছে, অতপর আমি তাদের (শুধু এটুকুই) বলেছি, যাও- (এবার) তোমরা সবাই অপমানিত বানর (-এ পরিণত) হয়ে যাও । (সূরা আল বাক্বারা-৬৫)

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তা'য়ালার এই গযবে আক্রান্ত হলো, তারা সবাই আল্লাহর নিষেধ অমান্য করে মাছ ভক্ষণ করেনি। কিন্তু তারপরেও তারা গযবের আওতায় এসে গিয়েছিলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখন মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তখন বনী ইসরাঈলীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। জনতার এক অংশ নিষিদ্ধ মাছ ভক্ষণ করলো। তারা কৌশল অবলম্বন করলো এভাবে যে, শনিবারে মহান আল্লাহর কালাম শোনার জন্য মাছগুলো যখন কিনারায় আসতো, তখন এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করলো, সেই মাছগুলো বিশেষ স্থানে যেন বন্দী হয়ে পড়ে। তারপরের দিন অর্থাৎ রবিবারে তারা সেই বন্দী মাছগুলো ধরে ভক্ষণ করতো।

জনতার মধ্য থেকে আরেকটি দল এসব ঘটনা নীরবে দেখেছে। চোখের সামনে মহান আল্লাহর আইন প্রকাশ্যে লংঘিত হচ্ছে, আর তারা নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। নিজেরা অবশ্য সেই পাপ থেকে বিরত থেকেছে, কিন্তু পাপ অনুষ্ঠিত হতে দেখে তার প্রতিবাদ করেনি। হাদীস অনুসারে তারা বোবা শয়তানের ভূমিকা পালন করেছে।

তৃতীয় যে দলটি ছিলো তারা হলো প্রতিবাদকারী দল। তারা নিজেরা অপরাধমূলক কর্ম থেকে বিরত থেকেছে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। মাছ ভক্ষণকারীদের তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এভাবে মাছ ভক্ষন করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং এই কাজ থেকে বিরত থাকো। মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করো না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখন ইয়াহুদী জাতির ওপরে গযব নাযিল করলেন, তখন প্রতিবাদকারী দল ব্যতীত ঐ দুই দলকেই গযবে আক্রান্ত করলেন, যারা মাছ ভক্ষণ করেছিলো আর যারা

মাছ ভক্ষণ করেনি কিন্তু কোনো প্রতিবাদও করেনি। মহান আল্লাহর আইন অমান্য করা হচ্ছে দেখে কোনো সতর্কবাণী উচ্চারণ করেনি।

আল্লাহ তা'য়ালার কোরআনে বর্ণিত এই ঘটনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, হক কথা বলতে হবে তথা বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। কারণ অন্যায় যে করে আর যে সহে- তারা উভয়েই সমান অপরাধী। হযরত লূত (আ:) এর আমলে তাঁর অপরাধী জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা গযবের ফেরেশ্‌তাদেরকে প্রেরণ করলেন। আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদগীরণের মতো যমীনের তলদেশ থেকে লাভা উত্থিত হয়ে বিশেষ এলাকার যমীনকে উলট-পালট করে দেয়া হয়েছিলো। এই কাজে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর যেসব ফেরেশ্‌তা দল নিযুক্ত করেছিলেন, তারা কাজ সম্পাদন করতে এসে দেখলেন, সেখানে এমন একজন লোক রয়েছে, যে ব্যক্তি জীবনের ত্রিশ বছর ব্যাপী নামাজ কালামে মশগুল রয়েছে।

তাঁরা মহান আল্লাহর দরবারে আবেদন করলো, 'হে আল্লাহ! এই যমীনে তোমার এমন একজন বান্দাহ্ রয়েছে, যিনি ত্রিশ বছর ধরে তোমার উদ্দেশ্যেই নামাজ কালাম আদায় করছে'। আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ দিলেন, ঐ ব্যক্তিকেও আযাবে নিক্ষেপ করো। কারণ সমগ্র জাতি যখন পাপাচারে লিপ্ত ছিলো তখন সে নামাজ কালামে ব্যস্ত ছিলো। লোকজনকে আল্লাহ বিরোধী কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য একটি কথাও বলেনি।

সুতরাং মহান আল্লাহর গযব থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে আল্লাহর বিধানের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে, সমগ্র মানবতাও যদি আল্লাহ বিরোধী পথে ধাবিত হয়, তবুও একজন ব্যক্তিকে হলেও ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে হবে। নতুবা যে গযব আসবে, সেই গযব থেকে আল্লাহভীরু লোক বলে কথিত লোকগুলোও মুক্ত থাকবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ–

তোমরা (আল্লাহদ্রোহিতার) সেই ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো, যার ভয়াবহ শাস্তি- যারা তোমাদের মধ্যে যালিম শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না,

আরো জেনে রাখো, আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। (সূরা আনফাল-২৫)

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক, কোনো একটি বাড়ির সামনে যে ময়লা নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা নালা রয়েছে, সেখানে কুকুর বা বিড়াল মরে পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পৌরসভা কর্তৃক নিয়োজিত লোকজন তা পরিষ্কার করছে না। পথিক যারা নর্দমা নালার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছে, তারা দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য নাকে কাপড় চেপে পথ অতিক্রম করছে। বাড়ির মালিকও পথিকের অনুরূপ ভূমিকা পালন করছে। কেউ যখন তা পরিষ্কার করলো না, তখন কেবলমাত্র ঐ বাড়ির মালিক শুধু দূষিত পরিবেশের কারণে রোগে আক্রান্ত হবে না, যারা তার চারদিকে বসবাস করে এবং সেই নর্দমা নালার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে, তারাও রোগে আক্রান্ত হবে। রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য এখানে একজনকে অবশ্যই তা পরিষ্কার করার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সুতরাং অন্যায়ের উদ্ভব যেখানেই ঘটবে, সেখানেই প্রতিবাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন করতে হবে। সত্য কথা বলতে হবে এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে- আর এটাই হলো উম্মতে মুহাম্মাদীর সর্বপ্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বিশ্ব রাজনীতির নেতৃত্বের অঙ্গন থেকে মুসলমানরা যখনই অপসারিত হয়েছে, আল্লাহভীরু সচ্চরিত্রের অধিকারী লোকগুলো নেতৃত্বের আসন থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে, তখনই রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে অবিশ্বাসী দুনিয়া পূজারী ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত লোকগুলো বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে সমগ্র বিশ্বে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। একের পর এক মহাযুদ্ধের কারণে অগণিত আদম সন্তান পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। অসংখ্য মারণাস্ত্রের ব্যবহার ও চরম ক্ষতিকর গ্যাস ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ফলে পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশ অনাগত মানব জাতির জন্য যেমন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, পৃথিবী থেকে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে এবং বর্তমান মানব গোষ্ঠীও নানা ধরনের প্রাণঘাতী অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে ও পঙ্গুত্ব বরণ করছে।

রাজনীতির অসৎ নিয়ন্ত্রকরা নিজেদের হীন স্বার্থে পৃথিবীর এক দেশের সাথে আরেকটি দেশের সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি করে রাখছে। প্রয়োজনে যুদ্ধে লিপ্ত করে নিজেরাই বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নানা স্বার্থ উদ্ধার করছে। কোনো একটি দেশেও দেশ ও জাতি প্রেমিক কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত হতে দিচ্ছে না, দেশ ও জাতির স্বার্থে যারা তৎপর, প্রয়োজনে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে দেশদ্রোহী লোককে ক্ষমতায় বসাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে কয়েকটি মুসলিম দেশে একই ঘটনা ঘটিয়ে দেশ জাতি প্রেমিক ইসলামের প্রতি অনুগত বৈধ সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে। জাতীয় উন্নতির পূর্ব শর্ত হলো শান্তি ও স্থিতিশীলতা। প্রায় দেশেই তাদের অনুগত লোকদের মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে সে দেশকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের মুখাপেক্ষী করে রাখছে।

অর্থনীতির অঙ্গন থেকে আল্লাহভীরু লোকগুলো যখন বিদায় গ্রহণ করেছে, তখন চরম মুনাফাখোর-সুদখোর ও দস্যু-তস্করের দল অর্থ জগতের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে মানবতার ওপরে শোষণমূলক পুঁজিবাদ চাপিয়ে দিয়ে মানবতাকে নির্মমভাবে শোষণ করছে। ফলে পৃথিবীর মানুষগুলোকে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হতে বাধ্য করা হয়েছে, অর্থোপার্জনকে এমন কঠিন করা হয়েছে যে, 'সবথেকে দায়িত্বপূর্ণ ও মহৎ কর্ম অর্থাৎ সন্তান প্রতিপালন- আদর্শ মানব গড়ার কারিগর' নারীদেরকে সেই দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তাকেও শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জনে বাধ্য করা হয়েছে। শিশুদের অধিকার হরণ করে তাদেরকেও পেটের ভাতের জন্য শ্রম বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এতে করে তাদের সুকুমার বৃত্তিসমূহের অকাল মৃত্যু ঘটছে, দুর্ব্যবহার পাবার ফলে তাদের স্বভাব চরিত্রে নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের প্রতি যৌন নিপীড়নের পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, নীতি নৈতিকতাহীন লোকদের সাথে মেলামেশার ফলে তাদের ভেতরের সুপ্ত চেতনাসমূহ অসময়ে জাগ্রত হচ্ছে এবং তারা অপরাধ জগতের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

অর্থোপার্জনের নিয়ন্ত্রণ ও বাধা-বন্ধনহীন পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। নারীদেহ, অশ্লীলতা ও নগ্নতাকে অর্থোপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে সমাজ, দেশ ও জাতীয় স্বার্থকে পদদলিত করা হচ্ছে। যার যেমন খুশী তেমন পথে অর্থোপার্জন করছে, এতে করে দেশ ও জাতি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, দেশের পরিবেশ কতটা কলুষিত হচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার মতো মানসিকতার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন- নারীকে সেই আসন থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে এনে পণ্যদ্রব্যের লেবেলে পরিণত করা হয়েছে। নেশা জাতিয় মাদকদ্রব্যের বিস্তৃতি

ঘটিয়ে জাতির মেরুদণ্ড কিশোর, তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদেরকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেয়া হয়েছে।

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে আখিরাত প্রেমিক লোকগুলো যখন সরে এসেছে, তখন সেই জগৎ দখল করেছে বিকৃত রুচিসম্পন্ন নেশায় অভ্যস্ত যৌন উন্মাদগ্রস্ত লোকগুলো। এরা গান-বাজনার নামে অশালীন ও নগ্ন নর্তন-কুর্দনের প্রচলন ঘটিয়েছে। শ্রবণের অযোগ্য অশ্লীল যৌন আবেদনমূলক গীতমালা রচনা করে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে তা তুলে দিয়েছে। চরিত্র বিধ্বংসী ছায়া-ছবি, চলচ্চিত্র নির্মাণ করে মানবতাকে পাপ-পঙ্কিলতার পথে ঠেলে দিচ্ছে। যুদ্ধ-মারামারি, হত্যা-ধর্ষন, শ্লীলতাহানী, রাহাজানী, ছিন্‌তাই, চুরি, ডাকাতী ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটনের যাবতীয় কলা-কৌশল সম্বলিত সিনেমা প্রদর্শন করে কিশোর, তরুণ-যুবকদেরকে বিপদগামী করা হচ্ছে। পাঠের অযোগ্য কবিতা ও উপন্যাস রচনা করে কিশোর-তরুণদের সুপ্ত অনুভূতি জাগ্রত করে তাদেরকে ধর্ষনের পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীতে অপরাধিদের পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হলে দেখা যাবে, অস্বাভাবিকহারে কিশোর-তরুণরা অপরাধ জগতের দিকে পা বাড়িয়েছে। তারা এমন ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে, যা কল্পনা করলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। হত্যা-ধর্ষণ, ছিন্‌তাই এমন কোনো অপরাধ নেই, যা কিশোর-তরুণদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে না। পড়ালেখার জন্য শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক তার কিশোর ছাত্রদেরকে শাসন করছে, কিশোর ছাত্র প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে সেই শিক্ষককে হত্যা করছে। এসবই হলো বর্তমান মানবতা বিরোধী চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের বিষময় ফল।

অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্র থেকে ঈমানদার মুসলমানদের দুর্ভাগ্যজনক পশ্চাদাপসারণের ফলে মানবতার কল্যাণে অর্থ ব্যয় না হয়ে অকল্যাণে অর্থ ব্যয় হচ্ছে। পৃথিবীর অসংখ্য আদম সন্তানকে দারিদ্র সীমার নীচে জীবন-যাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অন্ন-বস্ত্র আর বাসস্থানের অভাবে শতকোটি আদম সন্তান মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। অগণিত অর্থ-সম্পদ নিছক আমোদ-ফূর্তি ও চিত্তবিনোদনের নামে ব্যয় করা হচ্ছে। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ধুমপান আর মদের পেছনে ব্যয় করা হচ্ছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে, বস্ত্র ও চিকিৎসাহীন রেখে বন্য পশু-প্রাণীর পেছনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। নিছক শখের বশে অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থ ব্যয়ের প্রতিযোগিতা চলছে।

আবিষ্কার, উদ্ভাবন তথা বিজ্ঞানের জগৎ থেকে যখন ঈমানদার মুসলিম লোকগুলো নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে, তখন পরকালের ভীতিশূন্য লোকগুলো সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে। তারা সীমা-পরিসংখ্যাহীন অর্থ এবং নিজেদের মেধা ব্যয় করে মানবতা বিধ্বংসী মারণাস্ত্র আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। হত্যা ও মানুষকে বিপন্ন করার নিত্য-নতুন উপায়-উপকরণ আবিষ্কার করা হচ্ছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে ঈমানহীন লোকগুলো যখন মানব জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, তখনই সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মহাভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এই ভাঙ্গন ও বিপর্যয়, অশান্তি-অনাচার আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের ওপরে চাপিয়ে দেননি। এগুলো মানুষের নিজের হাতেরই উপার্জন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ–

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। (সূরা রূম-৪১)

আল্লাহ ভীতিহীন লোকগুলো যখনই কোনো নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছে, তখনই সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আখিরাতের ভীতিহীন স্বৈরাচারী দুর্বৃত্ত লোকগুলো পৃথিবীর নেতৃত্বে আসীন, এদের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড হলো পৃথিবীর পরিবেশকে অশান্ত করে তোলা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ–

এরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন সে এলাকাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সেখানের মর্যাদাবান-সম্মানীত লোকগুলোকে লাঞ্ছিত করে। এটা তাদের চিরাচরিত স্বভাব। (সূরা নামল-৩৪)

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ঈমানহীন লোকগুলো মানব জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনের প্রত্যেক বিভাগে নেতৃত্বের আসন যখন দখল করেছে, তখন শুধু মানবতাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। গোটা পৃথিবীর পরিবেশই বিনষ্ট হয়েছে। এদের কর্মকাণ্ডের কারণে পৃথিবীর প্রাণীকূল ও উদ্ভিদ ধ্বংস হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। উর্ধ্বজগতে যে ওজন স্তর রয়েছে, তাতে ফাটল ধরেছে তাদেরই ভারসাম্যহীন-

কার্যকলাপের দরুন। পবিত্র কোরআন ঈমানহীন লোকগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এভাবে তুলে ধরেছে–

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ–

সে যখন শাসকের আসনে বসে তখন পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করতে সচেষ্ট হয় এবং ফসল ও প্রাণীকুলকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়। (সূরা বাক্বারা-২০৫)

ক্ষমতার দম্ভে এরা সমগ্র পৃথিবীর মানুষগুলোকে নিজের গোলামে পরিণত করতে চায়। ভিন্ন দেশের ধন-সম্পদের লোভে এরা যে কোনো অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে পারে। বিশ্ব জনমতের তোয়াক্কা এরা করে না। সাধারণ চক্ষু লজ্জা বিসর্জন দিয়ে এরা অন্য দেশে আগ্রাসন চালায়। এদের ঘৃণ্য চরিত্র আল্লাহর কোরআন এভাবে তুলে ধরেছে–

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ–

তুমি তাদের বেশীর ভাগ লোককেই দেখতে পাবে- পাপাচার, সীমালংঘন ও অবৈধ সম্পদ খাওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলেছে, এরা যা করে মূলত তা বড়ই নিকৃষ্ট কাজ। (সূরা মায়িদা-৬২)

নিজেদেরকে এরা সমগ্র দুনিয়ার মোড়ল মনে করে। ক্ষমতার গর্বে মত্ত হয়ে এরা দুর্বল জাতিসমূহের প্রতি অত্যাচারের প্লাবন বইয়ে দেয়। আল্লাহর কোরআন তাদের কর্মকাণ্ড এভাবে প্রকাশ করেছে–

فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً–

তারা পৃথিবীতে অবৈধ পন্থায় পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং বলতে থাকে যে, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আবার কে? (সূরা হামিম সিজদা-১৫)

সারা পৃথিবীতে বর্তমানে যে সামগ্রিক অরাজকতা চলছে, গরীব জাতিগুলোর ওপর নিষ্ঠুর শোষণ, লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি করা হচ্ছে, নিছক ক্ষমতার গর্বে ক্ষুধার্ত মজলুম জাতিসমূহের ন্যায্য সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করা হচ্ছে, ক্ষমতাশালী লোকগুলো দুর্বল মানুষগুলোর প্রভুর আসনে বসে আপন লোভ-লালসা ও খেয়াল-খুশীর বেদীমূলে তাদের যাবতীয় অধিকার বিসর্জন দিচ্ছে, সুবিচার ও ন্যায়-নীতির মূলোৎপাটন করে জুলুম ও অত্যাচারের

ষ্টীমরোলার চালানো হচ্ছে, সৎ ও ন্যায়-পরায়ণ লোকদেরকে কোণঠাসা করে এবং অসৎ ও নীচমনা লোকদেরকে স্বগর্বে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে, তাদের অশুভ প্রভাবে জাতিসমূহের চরিত্র ধ্বংস হচ্ছে, ন্যায়-পরায়ণতা, মহানুভবতা ও যাবতীয় সৎ গুণাবলীর উৎসসমূহ শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত করা হচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতা, অসততা, পরস্বার্থ অপহরণ, ব্যভিচার, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, নৃশংসতা, না-ইনসাফী ও যাবতীয় নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড ও অনাচারসমূহের পুঁতিগন্ধময় নালার মুখ খুলে দেয়া হয়েছে।

পৃথিবীর স্বঘোষিত মোড়লদের মনে পররাজ্য দখলের লিপ্সা উগ্র হয়ে উঠেছে, তারা দুর্বল ও অসহায় জাতিগুলোর ওপর তাদের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে। দুর্বল জাতিসমূহের স্বাধীনতা হরণ করে, নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে নিজেদের ক্ষমতার উচ্চাভিলাস পূর্ণ করার লক্ষ্যে চরম অরাজকতার সৃষ্টি করে স্বাধীন মানুষের গলায় গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর এসব কিছুর মূলে যে কারণ নিহিত রয়েছে, তাহলো পৃথিবীর মানব জীবনের প্রত্যেক বিভাগে আল্লাহভীরু মুসলিম লোকগুলোর অনুপস্থিতি। তারা যদি মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতো, তাহলে বর্তমান পৃথিবীর চেহারা এমন করুণ আকার ধারণ করতো না।

নন্দিত আদর্শ ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটানোর এবং মানব জীবনে সার্বিক ক্ষেত্রের যাবতীয় দিকসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার ট্রাফিক পুলিশের যে দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম জাতির ওপর অর্পণ করেছেন, সেই দায়িত্ব যদি তারা যথাযথভাবে পালন করতো, তাহলে সমগ্র মানবতা বর্তমানে এই করুণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত হতো না। মানুষসহ পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদরাজি তথা সার্বিক পরিবেশে. যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না। পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে ঈমানদার মুসলিম লোকগুলোর পতনে পৃথিবী এক তিক্ত পরিবেশের মোকাবেলা করছে। পৃথিবী থেকে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিদায় গ্রহণ করেছে। ক্ষুধা, দারিদ্রতা, অত্যাচার আর নির্যাতন এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একটি মাত্র পথই উন্মুক্ত রয়েছে, সেই পথটি হলো মুসলমানদের নিজ জীবনে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করা এবং পৃথিবীর মানুষদেরকে মহান আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান করা। এই দায়িত্ব আন্ত রিকভাবে পালন করতে থাকলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে পূর্বের ন্যায় আবার পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন ঈমানদার মুসলিম লোকদের হাতে

তুলে দেবেন- এটা মহান আল্লাহর ওয়াদা এবং তাঁর ওয়াদাই সবথেকে সত্য। তিনি ওয়াদা করেছেন–

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ-

তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহ তা'য়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াদা করেছেন, তিনি যমীনে তাদের অবশ্যই খেলাফত দান করবেন, যেমনিভাবে তিনি তাদের আগের লোকদের খেলাফত দান করেছিলেন, (সর্বোপরি) যে জীবন বিধান তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন তাও তাদের জন্যে (সমাজ ও রাষ্ট্রে) সুদৃঢ় করে দিবেন, তাদের (ভয়ের) অবস্থাকে (নিরাপত্তা ও) শান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন (তবে এ জন্যে শর্ত হচ্ছে); তারা শুধু আমারই দাসত্ব করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না; এরপরও যে (এবং যারা) তাঁর নিয়ামতের নাফরমানী করবে তারাই গোনাহ্গার (বলে পরিগণিত হবে)। (সূরা আন্ নূর-৫৫)

নন্দিত আদর্শের প্রতি আহ্বানকারীর গুণ- বৈশিষ্ট্য

মুসলিম জাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহকে পার্থিব কোনো বিষয়, বস্তুগত স্বার্থ এবং বিশেষ কোনো দেশ বা নেতার প্রতি আনুগত্য করার আহ্বান জানাবে না। তারা মহান আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানাবে। ইসলামের দাওয়াত যারা দিবে, তাদের দাওয়াত হবে একমাত্র মহান আল্লাহর একত্বের দিকে। অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ব্যতীত ভিন্ন কোনো জীবন বিধান অনুসরণ করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহর গোলামী, দাসত্ব, বন্দেগী, আরাধনা-উপাসনা ও আনুগত্য ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করা যাবে না। একমাত্র তাঁর আইন ব্যতীত অন্য কারো রচিত আইন মানা যাবে না। একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করা যাবে না। এই কথার দিকেই দাওয়াত দানকারী দাওয়াত দিবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ-

ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎকাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান। (সূরা হামীম সাজ্দাহ্-৩৩)

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কার সেই পরিবেশে, যে পরিবেশে মুসলমানদের ওপরে নির্মম-নিষ্ঠুর লোমহর্ষক নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালানো হচ্ছে। আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তা যখন অঙ্গারে পরিণত হয়ে প্রচণ্ড তাপ নির্গত করছে, মুসলমানদের ধরে শরীর থেকে বস্ত্র খুলে উন্মুক্ত দেহে সেই আগুনের অঙ্গারের ওপরে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপরে ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। এভাবে যাঁদের ওপরে নির্যাতন করা হয়েছে, হযরত খুবায়েব (রা:) ছিলেন তাঁদের একজন। একদিন তাঁকে হযরত উমার (রা:) উন্মুক্ত শরীরে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, তোমার পিঠে অমন গর্ত এবং কোমরটি এতো সরু কেনো? এমন পিঠ আর কোমর তো আমি কারো দেখিনি!'

হযরত খুবায়েব (রা:) বললেন, 'ভাই উমার, তোমার বোধহয় মনে নেই, ইসলাম কবুল করার অপরাধে ইসলাম বিরোধী লোকগুলো আমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে রক্তাক্ত করেছে, অনাহারে রেখে ক্ষুধা পিপাসায় কষ্ট দিয়েছে। তারপরও যখন আমি ইসলাম ত্যাগ করিনি তখন তারা আগুনের অঙ্গারের ওপরে আমাকে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপরে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। আমার শরীরের গোস্ত-চর্বি গলে আগুন নিভে গিয়েছে, তবুও তারা নির্যাতনে বিরতি দেয়নি। আগুনের অঙ্গারসমূহ আমার পিঠের মধ্যে প্রবেশ করেছিলো, তখন থেকে আমার পিঠে যে দাগ আর গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, আজো পর্যন্ত তা মুছে যায়নি'।

যখন মুসলমানদের প্রতি অবর্ণনীয় নির্যাতন চলছিলো, যে সময় মুসলমান হবার অর্থই ছিলো ব্যঘ্র-সিংহ তথা হিংস্র বন্য প্রাণীর মুখে নিজেকে সোপর্দ করা। তখন যে ব্যক্তিই মুসলমান হবার কথা প্রকাশ করতো, তখনই সহসা অনুভব করতো যেন সে হিংস্র শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করেছে আর হিংস্র প্রাণীগুলো দন্ত-নখর বিস্তার করে তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য তার দিকে ছুটে আসছে। মুসলমান হবার কারণে নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হচ্ছে, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, রাস্তা-পথে লাঞ্ছিত অপমানিত করা হচ্ছে, কোথাও

প্রাণের নিরাপত্তা থাকছে না, এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং মুসলমানরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছিলো, আমি একজন মুসলমান।

তারা হাসি মুখে যে কোনো ধরনের নির্যাতন ও নির্মম মৃত্যুকে কবুল করে এ কথা অকুতোভয়ে ঘোষণা করছে, 'যে মুসলমানদের প্রতি তোমরা নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাচ্ছো, যাদেরকে ক্ষুধা পিপাসায় কষ্ট দিচ্ছো, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছো, লাঞ্ছিত অপমানিত করছো, যাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করছো, আমি সেই মুসলমানদেরই একজন'।

'আমি একজন মুসলমান' মানুষের জন্য এর থেকে উচ্চতর স্তর আর দ্বিতীয়টি নেই। বিস্তীর্ণ এই যমীন, বিশাল ঐ আকাশ তথা সমগ্র মহাবিশ্বের যিনি অধিপতি সেই সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হলো মুসলমান, একমাত্র তাঁরাই পৃথিবীতে যাবতীয় কাজে নেতৃত্ব দিবে, তাঁরাই শাসক শ্রেণী আর সবাই শাসিত। পৃথিবীর যাবতীয় নিয়ামত তাদের জন্য এবং পরকালেও তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামতের অধিকারী হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে একমাত্র তাঁরাই কল্যাণ ও সফলতার অধিকারী। মানুষের এর থেকে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার বিষয় দ্বিতীয়টি আর নেই। সুতরাং মুসলমান হিসাবে নিজের পরিচয় পেশ করা সবথেকে গর্বের ও অহঙ্কারের বিষয়। আমি মুসলমান- মহান আল্লাহর সবথেকে ঘনিষ্ঠ একজন, এটাই আমার পরিচয়।

নিজের এই পরিচয় পেশ করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের ধন-সম্পদ, প্রাণ, সন্তান-সন্ততি তুচ্ছ জ্ঞান করে সগর্বে ঘোষণা করেছেন, 'আমি মুসলমান'। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তির কথাকে সবথেকে উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি নিজে ঈমান এনেছে, ঈমানের দাবি অনুসারে সকল কাজ সম্পন্ন করেছে এবং মহান আল্লাহর পথ অনুসরণ করার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। মানুষকে মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করার, আনুগত্য করার আহ্বান জানিয়ে এ কথা ঘোষণা করেছে যে, 'আমি আল্লাহ তা'য়ালার বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি, আমি মহান আল্লাহর আনুগত্য করছি। আমি বিশ্বলোকের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করছি, অতএব তোমরাও তাঁরই বিধান অনুসরণ করো। আমি একমাত্র তাঁরই দাসত্ব কবুল করেছি, তোমরাও একমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও বন্দেগী কবুল করো'। এই

কথার থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ, সুন্দর ও সর্বোত্তম কথা যমীনের বুকে ও আকাশের নীচে আর দ্বিতীয়টি নেই।

সুতরাং নন্দিত আদর্শ ইসলামের প্রতি আহ্বানকারীর সর্বপ্রথম গুণ হলো সে মানুষকে একমাত্র মহান আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান জানাবে এবং এই কাজের বিনিময় একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই কামনা করবে। পৃথিবীর কোনো উদ্দেশ্য মনে গোপন রেখে সে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত দিবে না। দাওয়াত দিবে যেমন একমাত্র আল্লাহরই দিকে, তেমনি একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় সে আন্দোলনের সকল কাজ আঞ্জাম দিবে।

ইসলামী আন্দোলনের কাজটি অসীম সাহসের কাজ, কোনো ভীরু, দুর্বল ও কাপুরুষের পক্ষে আন্দোলনের ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব নয়। অস্থির ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী যারা, তাদের পক্ষে মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, নিজের প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে অবর্ণনীয় নির্যাতন কবুল করে অকুতোভয়ে রাসূলের সাহবায়ে কেরাম ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা পৃথিবী থেকে যাদেরকে বিদায় করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছো, আমি সেই মুসলমানদেরই একজন'।

পৃথিবী বিখ্যাত রাজা-বাদশাহ ও শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির অধিকারী সেনাপতিদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে চোখের ওপরে চোখ রেখে নির্ভীক চিত্তে তাঁরা ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছেন। দৃঢ়পদে এবং অকম্পিত কণ্ঠে আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তদানীন্তন যুগে সমকালীন বিশ্বে ফেরাউন ও নমরুদের মতো শক্তিধর ও সামরিক শক্তির অধিকারী দ্বিতীয় কোনো শাসকের অস্তিত্ব ছিলো না। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা (আঃ) গ্রেফতারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে সেই ফেরাউনের রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে তার চোখের ওপরে চোখ রেখে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, 'তুমি জুলুম করছো, এই জুলুম ত্যাগ করে সেই আল্লাহর গোলামী করো-যিনি তোমার আমার এবং সমগ্র বিশ্বলোকের রব'।

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)ও দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নমরুদের দরবারে একই কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন। প্রত্যেক নবী-রাসূলই সমকালীন যুগের শাসকদের সম্মুখে একই ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের সাহাবায়ে কেরামও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। প্রত্যেক যুগেই মহান আল্লাহর নন্দিত বিধানের দিকে যারাই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁরা যে কোনো ধরনের ভয়-ভীতি, লোভ-

লালসা, দুর্বলতা-কাপুরুষতা, লোকলজ্জা, দোদুল্যমানতা, সিদ্ধান্তহীনতা ইত্যাদির উর্ধ্বে অবস্থান করেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

ইসলামী বিধানের সন্ধান যারা পায়নি, তারা মহাক্ষতির দিকে বিদ্যুৎ বেগে ধাবিত হচ্ছে। পবিত্র কোরআনের দাওয়াত বঞ্চিত মানুষগুলো সাগরের অথৈ জলে নিমজ্জিত, সর্বগ্রাসী হুতাশনে পরিবেষ্টিত, হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্যে বিপদগ্রস্ত, ছায়া ও খাদ্য-পানিহীন উত্তপ্ত মরুপ্রান্তরে তারা মৃতবৎ-এদেরকে এই করুণ অবস্থা থেকে উদ্ধার করার মানেই হলো তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো। মহাসাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ মালায় নিমজ্জিত লোকগুলোর প্রাণ বাঁচানোর প্রচেষ্টাকারীকে উত্তাল তরঙ্গের সাথে লড়াই করেই ডুবন্ত মানুষের প্রাণ বাঁচাতে হয়। সর্বগ্রাসী অগ্নি শিখায় পরিবেষ্টিত মানুষগুলোকে যারা উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়, প্রজ্জ্বলিত অনলের প্রচণ্ড তাপকে অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে যেতে হয়। ঘন তমসাবৃত যামিনী দুর্গম গিরি কান্তার মরুর যাত্রীদের দৃষ্টিপথে অন্তরায় সৃষ্টি করে কিন্তু অগ্রসরমান যাত্রী তার যাত্রা ক্ষণিকের জন্যও স্থগিত করে না। কারণ অন্ধকার পথের পথিকের জানা থাকে যে, অন্ধকার যতো বেশী গভীর হবে পূর্ব দিগন্তে নবারুণের আগমনী বার্তা ততোই জোরে ঘোষিত হতে থাকবে।

অন্ধকারের সূচীভেদ্য আবরণ ভেদ করে সাহসী যাত্রীরা সম্মুখপানে অগ্রসর হলে পূর্ব নীলিমায় তরুণ তপন উদিত হয়ে সমগ্র ধরণীকে যখন আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে তখন তমসাবৃত যামিনীর তেজোদীপ্ত দুর্বিনীত যাত্রীদের পথের যাবতীয় বাধা স্বাভাবিকভাবেই অপ:সৃত হয়। পথিক তার গন্তব্যস্থলে পৌছতে পথিমধ্যে বাধার অলংঘনীয় বিন্ধ্যাচলের দিকে হাতাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই সে তার লক্ষ্যস্থলে পৌছতে ব্যর্থ হবে। লক্ষ্যস্থল যদি যোজন যোজন দূরে অবস্থিত হয় আর পথের দূরত্বের দুর্ভাবনায় পথিক যদি যাত্রা পথে কদম উঠানোর পূর্বেই মনের ক্লান্তিতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে সে পথিক তার কাংখিত স্থানে পৌছতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি হিমশীতল শুভ্র তুষার আবৃত পর্বতের গগনচুম্বী শৃঙ্গ বিজয় আকাংখায় যারা মনস্থির করেছেন তারা শৃঙ্গ আরোহন পথে প্রতি পদক্ষেপে নিষ্ঠুর মৃত্যুর শীতল হাতছানিকে নির্মম পায়ে পদদলিত করেই তাদের লক্ষ্যস্থলে দৃঢ়পদে পৌছতে সক্ষম হন।

সূর্যের প্রচন্ড কিরণে উত্তপ্ত মরুপ্রান্তর যাদেরকে অতিক্রম করতে হবে, মরুভূমির বিশালতা দেখে ঘাবড়ালে তা অতিক্রম করা যাবে না। ভয়াল জলধির উত্তাল উর্মিমালার হিংস্র কিরীটে পদাঘাত করে যারা যাত্রা আরম্ভ

করেছেন, তারাই কেবল পৃথিবীর দেশ-মহাদেশের অবস্থান নিরূপন করতে সক্ষম হয়েছেন। পৃথিবীব্যাপী মিথ্যার বিজয় ভেরীর উচ্চ নিনাদে যারা কর্ণকুহরে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে মসজিদ ও খানকার চার দেয়ালের মধ্যে আত্মরক্ষা করে তাদের পক্ষে মহাসত্যের দুন্দুভী বাজানো অসম্ভব। গাজী অথবা শাহাদাতের দুর্দমনীয় উগ্র কামনা হৃদয়ে যারা পোষণ করে তারাই কেবল মহাসত্যের দুন্দুভীতে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে সক্ষম। সুতরাং ইসলামী জীবন বিধানের যারা আহ্বান জানাবেন তাদেরকে দুঃসাহসী হতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের কাজকে যারা নিজের হাত-পায়ের শৃংখল ও কণ্ঠের জিঞ্জির মনে করে, সত্য প্রকাশের কাজের মধ্যে যারা নিজের ধন-সম্পদ ও প্রাণের ক্ষতি দেখতে পায়, তাদের পক্ষে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দেয়া সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, এ আন্দোলনের কাজ কোনো ভীরু-কাপুরুষের কাজ নয়, দুর্বল চিত্ত ও ক্ষণে ক্ষণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনকারী লোকদের কাজ নয়, কুকুরের চিৎকারেই যাদের হৃদকম্পন শুরু হয়, এ কাজ তাদেরও নয়। এ কাজ কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই করা সম্ভব, যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজের ধন-সম্পদ, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি সর্বপরি নিজের প্রাণকেও বাজি রাখতে প্রস্তুত। যে ব্যক্তি সংখ্যাধিক্যের পরোয়া করে না এবং একা হলেও অকম্পিত কণ্ঠে সত্য উচ্চারণ করার মতো হিম্মত রাখে।

দৈহিক নির্যাতন, সামাজিকভাবে অপদস্থ হওয়া, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করা, জান-মালের ক্ষতি স্বীকারে যারা প্রস্তুত রয়েছে, কারাগারের অন্ধকার কুঠরী ও ফাঁসীর মঞ্চকে স্বাগত জানাতে যারা দণ্ডায়মান, কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয়ভাবে ময়দানে ভূমিকা রাখা এবং সত্য উচ্চারণ করা সম্ভব। কারো রক্তচক্ষু, গর্জন আর নির্মম চাবুকের নৃত্য দেখে এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে এ আন্দোলনের কাজের কৌশল পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু এই কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কোনো সুযোগ নেই। এ আন্দোলনের দাওয়াত দানকারীকে এ কথা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণে রাখতে হবে যে, সমগ্র বিশ্বলোকের রাজাধিরাজ সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। দাওয়াত দানকারী ময়দানে একা-নিঃসঙ্গ নন। মহান আল্লাহ বলেন–

لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى–

তোমরা ভয় পেয়ো না, শঙ্কিত হয়ো না, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। আমি শুনছি এবং দেখছি। (সূরা ত্বা-হা-৪৬)

ইসলামের দাওয়াত যিনি দেন, মহান আল্লাহ তার সাথে থাকেন এবং তিনি তার সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তিনি যখন সাহায্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিবেন তখনই তিনি সাহায্য প্রেরণ করবেন। অতএব কোনো শক্তির পরোয়া না করে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশে নির্ভীক চিত্তে দাওয়াতী কাজ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ)কে এভাবে আদেশ দিয়েছিলেন–

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ- إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ- الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ-

হে নবী! আপনাকে যে বিষয়ের আদেশ দেয়া হচ্ছে তা সরবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন এবং শির্ককারীদের মোটেও পরোয়া করবেন না। যেসব বিদ্রুপকারী আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও ইলাহ বলে গণ্য করে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের ব্যবস্থা করার জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরা আল হিজর-৯৪-৯৬)

ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে ব্যক্তিত্বহীন লোকজন অচল মুদ্রার অনুরূপ। এদের পক্ষে কোনো ব্যাপারেই দৃঢ়তা প্রদর্শন করা, দৃঢ় এবং অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, প্রতিকূল ময়দানে দৃঢ়পদে অবস্থান করা, বিরোধিদের আক্রমনের মোকাবেলায় উপস্থিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যাবতীয় লোভ-লালসা প্রত্যাখ্যান করে নিজ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অনমনীয় থাকা সম্ভব নয়। কারণ এই ধরনের লোকগুলো সাধারণ মানুষের কাছে নিজ চরিত্রে বাহ্যিক ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করলেও এদের ব্যক্তিত্বের থলে প্রকৃতপক্ষে শূন্য এবং এই শূন্যতা বিরোধিদের পক্ষের চতুর লোকদের কাছে অস্পষ্ট থাকে না। তারা এ কথা ভালো করে বোঝে, লোকটি মুখে যা দাবি করে সে দাবির সাথে তার অন্তরে দৃঢ়তা নেই। ভয়-ভীতি বা পার্থিব লোভ-লালসার কাছে সে লোকটি নিজেকে সোপর্দ করে দিবে। ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীকে বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং অনমনীয় হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لاَ يُوقِنُونَ-

যারা বিশ্বাস করে না তারা যেন কখনোই তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে। (সূরা আর রূম-৬০)

বিরোধী পক্ষ বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করলো অথবা নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদ প্রচার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলো, নিন্দা আর অপবাদের ঝড় তুললো, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে থাকলো, এ অবস্থায় মনোবল ও উৎসাহ-উদ্দীপনা হারিয়ে ময়দান ত্যাগ করা কাপুরুষের কাজ। ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য বিরোধিরা নানা ধরনের লোভ-লালসা প্রদর্শন করবে, উচ্চপদ, সম্মান-মর্যাদা, পার্থিব দিক থেকে অঢেল সম্পদে পরিপূর্ণ করে দিতে চাইবে। জাতীয় সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে সাময়িকের জন্য হলেও আপোষের পথে পরিচালিত হবার অনুরোধ করবে, এসব কিছুর মাথায় পদাঘাত করে আন্দোলনের কাজ অব্যাহত গতিতে চালাতে হবে। নিজেদেরকে উদ্দেশ্য সচেতন হতে হবে, লক্ষ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। নিজেদের বিশ্বাস ও ঈমানে সর্বাধিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে। সঙ্কল্পে দৃঢ়চেতা হতে হবে এবং আল্লাহভীরুতার বর্মে নিজ চরিত্র দুর্ভেদ্যভাবে পরিবেষ্টিত করতে হবে।

বিরোধী পক্ষ যেন এ কথা অনুভব করতে পারে এদেরকে ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা প্রদর্শন ও প্রতারণা-প্রবঞ্চনার কূটজালে বন্দী করে এদের মূল লক্ষ্যের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় করা যাবে না। দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবতে ফেলে, ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় কারাবদ্ধ করে, সংবাদ মাধ্যমে এদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এদেরকে বিরত রাখা যাবে না। প্রয়োজনে এরা ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু মচ্কাবে না। এরা আপোষের চোরাগলিতে হারিয়ে যায় না। পৃথিবীর মানুষের কাছে এরা বিনিময় আশা করে না। ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত বিক্রয় যোগ্য কোনো পণ্যের নাম নয়। এই কাজ করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে। প্রত্যেক নবী-রাসূল যখন ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন তখন তাঁরা জাতিকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন−

يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ−

হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে দাওয়াতের কোনো বিনিময় কামনা করি না। আমার কাজের বিনিময় আমার আল্লাহর কাছে রয়েছে- যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা কি বুঝতে পারো না? (সূরা হূদ-৫১)

নান্দনিক পরিবর্তন ও আদর্শের প্রভাব

মুসলিম দাবি করার প্রকৃত অর্থই হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তাঁর রাসূল, পরকাল ও আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাবের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন এবং মানুষের গোলামীর জিঞ্জির চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মহান আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার, পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতার পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার বিশাল ক্ষেত্রে উত্তরণ এবং মনগড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদ, মতাদর্শ, নিয়ম-প্রথা ও পদ্ধতি পরিহার করে সত্য-সনাতন অভ্রান্ত দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা। ইসলামের স্পর্শে আসার শুভ পরিণতি ও প্রভাব হলো, ইসলাম নিস্প্রাণ-নিবীর্য মানুষের মধ্যে নবজীবনের সূচনা এবং মৃতপ্রায় মানুষকে পুনর্জীবন দান করেছে। শোষিতের অথর্ব দেহে শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তি-সাহস সঞ্চার করেছে। জালিমের সম্মুখে সত্য প্রকাশের হিম্মত যুগিয়েছে। ভীতগ্রস্তকে করেছে অসীম সাহসী বীর, হতাশাবাদীকে করেছে আশাবাদী। শঙ্কিত ব্যক্তিকে করেছে শঙ্কা মুক্ত। লোভীকে করেছে নির্লোভী আর কৃপণকে করেছে দানবীর। চরিত্রহীনকে করেছে চরিত্রবান, নীতিহীনকে করেছে নীতিবান। মূর্খকে করেছে উচ্চ শিক্ষিত, বিবেকহীনকে করেছে বিবেকবান। খুনী-ডাকাতকে করেছে মানুষের জান-মালের অতন্দ্র প্রহরী। ইসলাম মানুষের মধ্যে নবতর প্রাণের উদ্বোধন করে মানুষের মধ্যে নিহিত স্বভাবগত সুপ্তশক্তি ও সামর্থ নতুন করে জাগিয়ে দিয়েছে। মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রবলভাবে সক্রিয় করে দিয়েছে।

ইসলাম মানুষের সমগ্র স্বভাব- চরিত্রের ওপর তার কিরণ, চাকচিক্য ও সজীবতার আবরণ বিছিয়ে দিয়েছে। ফলে প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তীব্র সচেতন হয়ে উঠেছে। সমগ্র বিশ্ব তাদের বিস্ময়কর ও অতি আশ্চর্যজনক কর্মকাণ্ড অবলোকন করে স্তম্ভিত হয়েছে। মুসলিমের কর্মক্ষেত্র জীবনের বিশেষ একটি গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, জীবনের সকল বিভাগে ব্যাপক কর্মতৎপরতার সূচনা করেছে। নবী করীম (সা:) এর যুগে একজন মানুষও ইসলামের ছায়াতলে এসে পৃথিবীর কোলাহল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্জনে মুদিত নয়নে ধ্যানস্থ হননি। নিজেকে একমাত্র মহান আল্লাহর গোলাম হিসেবে গড়ার কঠোর অনুশীলন করেছেন এবং হাতে অস্ত্র ধারণ পূর্বক ইসলাম বিরোধী শক্তির মূলোৎপাটন করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তাঁরা ইসলামের স্পর্শে আসার পূর্বে ছিলেন নিষ্প্রাণ-নিস্পন্দ প্রস্তর বা আবর্জনা পরিবেষ্টিত বৃক্ষ বিশেষ। নন্দিত আদর্শের কিরণচ্ছটায় তারা সহসাই যেন ক্রমবৃদ্ধিমান এক বিশাল উদ্ভিদে পরিণত হয়েছেন। ইসলাম তাদেরকে দায়িত্ব সচেতন ও পরিণামদর্শী সজাগ মানুষে পরিণত করেছে। বর্বরতা, মূর্খতা, অজ্ঞতা ও পাশবিকতার প্রবল চাপে যারা ছিল মৃতপ্রায়, পবিত্র কোরআন তাদেরকে মুহূর্তে ইচ্ছা ও তৎপরতাপূর্ণ এক জীবন্ত মানুষে পরিণত করেছে। যারা ছিল পথভ্রষ্ট অন্ধ, সত্য পথের সন্ধান যাদের জানা ছিল না, ইসলাম তাদেরকে মুহূর্তে শুধু দৃষ্টিমানই বানায়নি, চোখের পলকে তাদেরকে বানিয়েছে পথপ্রদর্শক, পথভ্রান্তদেরকে প্রকৃত সত্য পথের দিকে পরিচালনাকারী। তাদের জীবন ও কর্ম কিয়ামত পর্যন্ত অগণিত মানুষকে পথপ্রদর্শন করে সজাগ ও সচেতন হিসেবে গড়বে।

নবী করীম (সাঃ) আরবের ঐ বর্বর লোকগুলোকে পরশ মণিতে পরিণত করেছিলেন। মানুষ হিসাবে নিজের পরিচয় কি- তিনি তা তাদের কাছে স্পষ্ট করেছিলেন। অপরের প্রতি নির্ভরতা ত্যাগ করে এক আল্লাহর আনুগত্য করে তাঁরই ওপরে নির্ভর করতে শিখিয়ে ছিলেন। আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন, 'ব্যক্তি তখনই ব্যক্তি হয় যখন সে নিজেকে চিনতে শেখে, জাতি তখনই জাতি হয় যখন পরের ওপর নির্ভর করা ছেড়ে দেয়। মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ (সাঃ) এর কথা স্মরণে রেখো, আল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রভুর আনুগত্য থেকে মুক্ত হও'।

ইসলামের প্রভাবে তারা নিজেদের পরিচয় জেনে ছিল যে, তারা মহান আল্লাহর গোলাম এবং তিনিই তাদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী। ইসলামের কারণেই তাঁরা সমগ্র বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ইতিহাসের ধারায় তারা এক বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত করেছিলেন- যা ছিল অভূতপূর্ব-অদৃষ্টপূর্ব ও সম্পূর্ণ অভিনব। আদর্শের প্রভাবে তারা ইতিহাসের ধারাকেই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

ইসলামের স্পর্শে আসার পূর্বে হযরত উমার (রাঃ) তৎকালীন সমাজে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলেন না, ছিলেন উটের রাখাল এবং কুরাইশদের মধ্যে মধ্যম মানের একজন ব্যক্তি। তাঁর সম্পর্কে মানুষের মনে এমন ধারণা ছিল না যে তিনি দেশ- জাতির জন্য অবদান রাখতে সক্ষম। কিন্তু ইসলাম তাঁর মধ্যে কি ধরনের অনুপম গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দিয়েছিল, পৃথিবীবাসী তা অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করেছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্তও তাঁকে নিয়ে গবেষকগণ গবেষণা করছেন। ইসলাম তাঁর সুপ্ত প্রতিভা, নেতৃত্ব ও

সাংগঠনিক যোগ্যতাকে এমনভাবে বিকশিত করেছে যে, সমগ্র দুনিয়াবাসীকে তা স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

ইসলাম তাঁর মধ্যে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় ন্যায়- পরায়ণতা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, বিশাল সাম্রাজ্যের কর্ণধার হয়েও তিনি সর্বত্যাগী জীবন-যাপন করেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্মুখে পারস্য ও রোম সম্রাট কম্পমান থেকেছে, পরিশেষে রোম ও পারস্যের সিংহাসন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নন্দিত আদর্শ ইসলাম। শোষিত নিপীড়িত জনগণ মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করেছে। এ আদর্শ হযরত উমার (রাঃ) কে এমন উচ্চ স্তরে উপনীত করেছিল যে, নবী করীম (সাঃ) তাঁর সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার পরে আর কেউ নবী হবে না, যদি কেউ নবী হতো তাহলে উমার অবশ্যই আল্লাহর নবী হতো'। ইসলামের স্পর্শ তাঁকে এমন এক ন্যায়-পরায়ণ ও সুদক্ষ শাসকে পরিণত করেছিল যে, আল্লাহর নবীর অবর্তমানে তাঁর মতো দক্ষ শাসক আকাশের নীচে যমীনের বুকে পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে সমাসীন হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্তও হবে না।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) কে মদীনার উকায বাজারে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁকে ক্রয় করে আল্লাহর রাসূলকে উপহার দিয়েছিলেন। এই দাস যখন ইসলামের স্পর্শ লাভ করেছিলেন, তিনি এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। মুতার যুদ্ধে তিনি মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধানের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন, সে বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আল্লাহর নবীর চাচাত ভাই হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) ও হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) এর মতো বিখ্যাত সামরিক বিশেষজ্ঞগণ। নবী করীম (সাঃ) এর সেবক হযরত যায়েদ (রাঃ) এর সন্তান হযরত উসামা (রাঃ) সেই বাহিনীর সেনাপ্রধানের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন, যে বাহিনীতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ) এর মতো মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ শামিল ছিলেন।

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্উদ, হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবুযার গিফারী, হযরত উবাই ইবনে কায়াব, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামকে ইসলাম উচ্চতর জ্ঞানী, পণ্ডিত ও পথপ্রদর্শনের যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে পরিণত করেছিল

যে, কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালালেও তাঁদের অনুরূপ একজন মানুষও গড়তে সক্ষম হবে না। হযরত বিলাল (রাঃ) এর মতো একজন হাবশী গোলামকেও ইসলাম এমন এক স্তরে উপনীত করেছিল যে, হযরত উমার (রাঃ) এর মতো পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তিত্বও তাঁকে 'সাইয়েদ' বা নেতা হিসাবে সম্বোধন করতেন।

হযরত উমার (রাঃ) একদিন কোনো কারণ বশতঃ হযরত বিলাল (রাঃ)কে 'কালো মায়ের সন্তান' বলেছিলেন। হযরত বিলাল এতে মনোক্ষুন্ন হলেন। হযরত উমারের মনে অনুশোচনা এলো। তিনি মাসজিদে নববীর প্রবেশ পথে শায়িত হয়ে বললেন, 'আমি যে মুখ দিয়ে বিলালকে ঐ কথা বলেছি, সেই মুখের উপরে পা দিয়ে বিলাল মসজিদে প্রবেশ করবে, তারপর আমি উঠবো'।

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) কুরাইশদের মধ্যে একজন অশ্বারোহী যুবক ছিলেন মাত্র। সঙ্কীর্ণ গোত্রীয় কোন্দলে তিনি ছিলেন একজন দুঃসাহসী যোদ্ধা। গোত্রীয় যুদ্ধের সময় গোত্রপতিরা তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করতো। কারণ তিনি সাহসিকতা ও বীরত্বের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করতেন। আরব উপদ্বীপের লোকজন তাঁর নামও জানতো না। ইসলাম তাঁকে এমন এক স্তরে উপনীত করেছিল যে, নবী করীম (সাঃ) তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন, 'আল্লাহর তরবারী'। এ আদর্শ তাঁকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জেনারেল-এ পরিণত করেছে। তাঁর ন্যায় সমরবিশারদ বর্তমান সময় পর্যন্তও কোনো মা জন্ম দিতে সক্ষম হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নাম ইতিহাসে দেদীপ্যমান থাকবে।

হযরত আবু হুযাইফা (রাঃ) এর মুক্ত করা গোলাম সালেম (রাঃ)কে ইসলাম এমন সম্মান-মর্যাদা ও যোগ্যতার আসনে আসীন করেছিল যে, তাঁর ইন্তে কালের পরে হযরত উমার (রাঃ) মন্তব্য করেছিলেন, 'তিনি যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁকে আমি রাষ্ট্রের খলীফা বানাতাম'। পারস্যের অজপাড়া গাঁয়ের মুবিযান নামক লোকের সন্তান ছিলেন হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)। আরব উপদ্বীপে তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। প্রায় দশজন মনিবের দাসত্ব করার শেষ পর্যায়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে এলেন। ইসলাম তাঁর মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিল যে, পরবর্তী কালে তাঁকেই পারস্য সম্রাটের রাজধানী মাদায়েনের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়েছিল। যিনি ছিলেন দাস, অবর্ণনীয় কষ্টে যাঁর জীবন গড়ে উঠেছে, কখনো বিলাসিতা বা সুখ-সম্ভোগের মুখ দর্শন করেননি। তিনিই পারস্যের রাজধানী মাদায়েনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার পরও নিজের হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন এবং সেই অর্থে তিনি জীবিকা

নির্বাহ করতেন। বাস করতেন সামান্য একটি কুঁড়ে ঘরে, অন্যের বোঝা তিনি মাথায় বহন করে গন্তব্যে পৌছে দিতেন।

হযরত আবু উবাইদা (রাঃ) আরব সমাজে একজন বিচক্ষণ আমানতদার, জনদরদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। গোত্র ভিত্তিক খণ্ড যুদ্ধে ছোট্ট ছোট্ট বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। ইসলাম তাঁকে শ্রেষ্ঠ জেনারেল ও অতুলনীয় সমরবিশারদে পরিণত করে দিল। তিনিই হেরাক্লিয়াসের সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সেখানে কায়েম করেছিলেন নন্দিত আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু ইসলাম তাঁকে বিশ্বের স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করে দিল। ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপের কৃতিত্বের তিনিই দাবিদার। পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়ের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। তাঁর হাতেই ন্যস্ত হয়েছিল মাদায়েনের চাবিকাঠি এবং কিসরার দরবার কক্ষ তাঁর জন্য মহান আল্লাহকে সিজদা দেয়ার স্থান- মসজিদে পরিণত হয়েছিল।

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) কুরাইশ সমাজে একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইসলাম তাঁকে মুসলিমদের সেনাপতি বানিয়েছিল এবং তিনিই মিসর বিজয় করেন। পরবর্তীকালে তিনিই ছিলেন মিসরের শাসনকর্তা। এ সকল ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকেই মানব জাতির পথপ্রদর্শক হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবেন। ইসলাম তাদের মুখ ও কর্মকে জ্ঞানের সমুদ্র সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা যে জ্ঞানসমৃদ্ধ বাণী মানব জাতির জন্য রেখে গিয়েছেন, সেই বাণীর অনুরূপ একটি বাণীও কিয়ামত পর্যন্ত কেউ দিতে পারবে না।

হারিয়ে গেল বন্য প্রাণীর হিংস্রতা

স্বর্ণ যুগের মুসলিমগণ যখন কোনো কথা বলতেন, তা শোনার জন্য সময়ের স্রোত যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতো। তাঁদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজই ইতিহাস রচনা করার জন্য যথেষ্ট। তাঁরা যখন পথ চলতেন, তখন সমস্ত প্রকৃতি যেন তাঁদেরকে আপন করে নেয়ার জন্য তাদের দিকে ঝুঁকে পড়তো। অরণ্যের হিংস্র প্রাণীও তাদের আনুগত্য করতো।

হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এর নেতৃত্বে তাওহীদের বাহিনী কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছুটে গেলেন আফ্রীকার দিকে। শ্বাপদ সঙ্কুল

হিংস্র জানোয়ারে পরিপূর্ণ আফ্রীকার ঘন অরণ্যের সন্নিকটে তাওহীদের বাহিনী শিবির স্থাপন করলো। সে এলাকার বিশাল দেহী কালো মানুষগুলো অবাক বিস্ময়ে মুসলমানদের এই বিপজ্জনক এলাকায় শিবির স্থাপন করতে দেখে ভাবলো, আগত রাতেই এই লোকগুলো হিংস্র জানোয়ারের খোরাকে পরিণত হবে। সেনাপতি হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বিষয়টি অনুধাবন করলেন। তিনি জঙ্গলের পাশে উঁচু মঞ্চ নির্মাণ করে সে মঞ্চের ওপরে আরোহণ করে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে হিংস্র পশু-প্রাণীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে হিংস্র প্রাণীর দল! আমরা আল্লাহর রাসূলের সাহাবী, আমরা এসেছি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। এই রাতের জন্য আমাদের নিরাপত্তার স্বার্থে তোমরা এখান থেকে সরে যাও। আর যদি না যাও তাহলে আমাদের তরবারীসমূহ তোমাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত'।

আফ্রীকার কালো মানুষগুলো হযরত সায়াদ (রাঃ) এর কর্ম দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো। কিন্তু তারা বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে দেখলো, প্রত্যেকটি পশু সুশৃংখলভাবে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলো। ইসলাম তাঁদেরকে এই স্তরেই উপনীত করেছিল। ইসলাম কবুল করে ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়েই তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন ইস্পাত-কঠিন, দুর্দমনীয় অজেয়। যা ছিল অসম্ভব এবং মানুষের কল্পনার অতীত, ইসলাম তা করেছিল সম্ভব এবং বাস্তবে পরিণত করেছিলো। অসাধ্যকে তাঁরা সাধন করে বিশ্বের ইতিহাসে চির অম্লান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। আল্লাহর রাসূলের মহাপবিত্র স্পর্শে তারা ইসলাম নামক নিয়ামত গ্রহণ করে অনুপম গুণ- বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূলের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে তাঁরা সুসংবদ্ধ আত্ম প্রত্যয়ী শক্তি হিসাবে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মস্তক উন্নত করে চারদিকের পূঞ্জীভূত অজ্ঞানতা, পাশবিকতা, মূর্খতা আর বর্বরতার ধারক-বাহকদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। ঈমান তাঁদেরকে এমন কঠিন আত্মসম্মান দান করেছিল যে, রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনে তাঁরা ঘৃণাভরে পদাঘাত করেছেন, প্রয়োজনে নিজের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে রাজী হয়েছেন কিন্তু আত্মসম্মান বিসর্জন দেননি। কবির ভাষায়–

পুশতে পাজান তাকতে কায়কাউসরা
সার বেদেহ আজ্ কাফ মাদেহ নামুস-রা।

কায়কাউসের সিংহাসনে পদাঘাত করো, নিজের মস্তক দান করো কিন্তু আত্মসম্মান কখনও বর্জন করো না।

ইসলাম তাঁদের মধ্যে এমন উন্নত যোগ্যতা সৃষ্টি করেছিল যে, তাঁরা লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত ক্ষুধায় জর্জরিত মানবতার ওপর শান্তি, স্বস্তি ও সমৃদ্ধির পর্দা বিস্তার করেছিলেন। মানব সমাজের সর্বত্র তাঁরা প্রেম-ভালোবাসা, শান্তি ও নিরাপত্তা বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ইসলাম তাঁদেরকে বিশ্ব মানবতার জন্য করুণার মূর্ত প্রতীকে পরিণত করেছিল। ইসলামের কারণেই তাঁরা যে কোনো ধরনের বিপরীত প্রতিরোধক শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে দিয়েছেন। তাঁরা জয় করেছেন দেশের পর দেশ, জনপদের পর বিস্তীর্ণ জনপদ। অগণিত মানুষকে মুক্ত করেছেন শক্তিমান মানুষের গোলামী থেকে। চূর্ণ করেছেন দাসত্বের ঘৃণ্য শৃঙ্খল। ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন অসাম্য আর শোষণের কূটজাল। পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাঁদের অগ্রযাত্রাকে সামান্যতম ব্যাহত করতে সক্ষম হয়নি।

যে শক্তিই তাদের সামনে বাধার বিন্ধ্যাচল দাঁড় করেছে, প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে, সে-ই তৃণ খণ্ডের মতোই উড়ে গিয়েছে। ইসলাম তাদের মধ্যে এমনই এক সর্বপ্লাবী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, সমগ্র পৃথিবীই সে প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের পরে তারা বর্তমানের মুসলমানদের অনুরূপ মাটির গর্তে পোকার মতো লুকিয়ে থাকেননি। মহাশূন্যে উড্ডীন পাখির মতোই তারা পক্ষ বিস্তার করেছেন। নিজের ভাগ্য গড়ার জন্য বর্তমানের মুসলমানদের অনুরূপ তারা কোরআন ত্যাগ করে ভিন্ন জাতির পদলেহন করেননি, তাঁরা কোরআনকে চুম্বন করে যাবতীয় কর্মের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে একমাত্র কোরআনকেই গ্রহণ করেছেন।

বর্তমানের এই লাঞ্ছিত, অপমানিত, ক্লান্ত, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে আল্লামা ইকবাল (রাহ:) বলেন, 'তুমি ওড়ার জন্য কখনো পক্ষ বিস্তার করোনি। পোকার অনুরূপ তুমি মাটিতেই পড়ে আছো। কোরআন ত্যাগ করেই তুমি এতা নীচে নেমেছো, আর তোমার দু:খ-দুর্দশার জন্য ভাগ্যকে অপবাদ দিচ্ছো। হে মানব! শিশির বিন্দুর মতো তুমি মাটিতে পড়ে আছো বটে কিন্তু তোমার হাতে আছে জীবন সুধা মহাগ্রন্থ আল কোরআন। কতকাল আর এই মাটিতে পড়ে থাকবে? এবার সব ছেড়ে আকাশের পথের পথিক হও- জীবন তোমার স্বার্থক হবে'।

সে যুগের প্রত্যেক মুসলিমই ছিলো ইসলামের একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক এবং মহান আল্লাহর অকৃত্রিম আনুগত্যের বাস্তব প্রতীক। ইসলাম তাঁদের মাথা করেছিল উন্নত আর বাতিল শক্তির সামনে করেছিল দুর্বিনীত, দুর্জয় ও অজেয়। বাতিল শক্তির সম্মুখে বুক টান করে দাঁড়াতে ইসলামই তাদেরকে

অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা, মলিনতা ও কলুষতা বিদূরিত করেছিল। সৃষ্টি করেছিল তাদের মধ্যে শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার। কারণ ইসলামই ছিল তাদের আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু ও প্রেরণার একমাত্র মৌল উৎস। ইসলামের দাবি অনুসারেই তাঁরা নিজেদের জীবনকে গড়েছিলেন। ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে মাথানত না করার মতো অদম্য সাহস, তাঁর আইন ব্যতীত অন্য কারো রচিত আইন মেনে না নেয়ার মতো দুর্জয় মানসিক শক্তি ও মানুষের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করার মতো দুর্বিনীত মনোবল। ইসলাম তাদেরকে আল্লাহর অপছন্দনীয় যাবতীয় শক্তির প্রতি বিপ্লবী, বিদ্রোহী করে গড়েছিল। দিবারাত্রি অহর্নিশি তাদের মধ্যে ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে এমন এক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকতো, যে আগুন তাদেরকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছিল।

ইসলামের ছায়াতলে এসে তাঁরা নিজেদেরকে এমনভাবে গড়ে ছিলেন যে, তাঁদের ভয়ে মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ ও আইন-কানুনের ধারক-বাহকরা আতঙ্কে কম্পমান হয়ে উঠেছিল। মুসলিমদের এই দল যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন সকল কিছুই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। মানব সভ্যতা এক নতুন রূপে সজ্জিত হয়েছিল। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মহান আল্লাহর বিধানের এক ব্যাপক ও অপ্রতিরোধ্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার, শোষণ-জুলুম, নিপীড়ন-নির্যাতন, মিথ্যা, অসততা, নীতিহীনতা, কুসংস্কার, বাতুলতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা, নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা ইত্যাদি যমীন ছেড়ে অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্ধকার গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

মুসলিম শক্তিকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে যেসব শক্তি মাথা উঁচু করার চেষ্টা করেছে, সেসব শক্তির মস্তক নিমিষেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সকল শক্তি অবনত হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসলামের শক্তির সামনে। তাদের এই অগ্রগতির মূলে নিহিত ছিল ঈমান নামক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। ঈমানদাররা সংখ্যায় কখনোই প্রতিপক্ষের তুলনায় অধিক ছিল না। কিন্তু তাঁরা বাস্তব ক্ষেত্রেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ঈমানী শক্তির সামনে বাতিলের সংখ্যাধিক্য তৃণ খণ্ডের মতোই উড়ে যায়। এই ঈমানই তাদেরকে বানিয়েছিল বীর ও অসীম সাহসী দুর্জয় দু:সাহসী। ফলে তাঁরা তদানীন্তন গণমানুষের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঈমানই তাঁদেরকে সুসংবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল এবং সক্ষম করেছিল বিশ্বের বুকে এক নবতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে।

ধূষর রুক্ষ মরুপ্রান্তর থেকে শুরু করে বিশাল বিস্তীর্ণ জনপদের ওপর ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করতে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন একমাত্র ঈমানের কারণেই। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে ঈমানই তাদেরকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী সঞ্চিত বর্ণবাদী প্রথা, মানুষে মানুষে পার্থক্যবোধ, গোত্রে-বংশে বিরোধ ও পার্থক্যের ঘন পর্দা ছিন্ন করে দিয়েছিল ইসলাম। নির্বিশেষে সকল মানব সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল মানবীয় ঐক্য ও একত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে। সম্মান ও মর্যাদার পার্থক্যের মানদণ্ড হিসাবে নির্ণিত হয়েছিল একমাত্র আল্লাহভীতি ও যোগ্যতা। যাদের আপাদ-মস্তক পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত, হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতা যাদের রক্ত-মজ্জায় প্রবাহিত, পরসম্পদ লুণ্ঠন আর শোষণের চিন্তায় যাদের মন-মস্তিষ্ক আবৃত, সভ্যতার দাবিদার সেই পশ্চিমা জগতে বর্তমানেও বর্ণবাদী প্রথা উৎকট দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কালো মানুষদেরকে আজো সেখানে ঘৃণা করা হয় এবং মানবীয় মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

ইতিহাস কথা বলে, একমাত্র ইসলামই মানুষের মধ্য থেকে বর্ণবাদের পার্থক্যের দেয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন, 'তোমরা জাতি, বর্ণের উর্ধ্বে এবং গোত্রের উর্ধ্বে। তার মধ্যে এক যোগ্য কৃষ্ণকায়ের মূল্য শত শ্বেতকায়ের মূল্যের চেয়ে বেশী। কামবরের (একজন কৃষ্ণকায় ঈমানদার মুসলিমের নাম ছিল কামবর) একবিন্দু ওযুর পানির মূল্য এক রোম সম্রাটের রক্তের চেয়ে বেশী। তুমি বংশ ও গোত্রের উর্ধ্বে ওঠো, সালমান ফারসীর মতো তুমিও বলো, আমি ইসলামের সন্তান'।

কালো দেহে সুধাকরের কিরণচ্ছটা

মুসলিম মধুচক্রের দিকে তাকিয়ে দেখে, মৌমাছি নানা রঙের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে কিন্তু মধুর মধ্যে কোনো বর্ণভেদ নেই। হযরত উবাদা ইবনুস্ সামিত (রাঃ) ছিলেন আফ্রীকার একজন ঘন কৃষ্ণবর্ণের মানুষ। ঘোর অন্ধকারের অনুরূপ ছিল তাঁর দেহের রঙ এবং দেহ ছিল বিশাল আকৃতির। তাঁর গায়ের রঙ এবং বিশাল আকৃতির দেহের কারণে প্রথম দর্শনেই ভয়ে আতঙ্কে হৃদয় চমকে উঠতো। ইসলাম তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করেছিল। তিনি ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের দূত। আরবের বাইরে প্রেরিত অধিকাংশ প্রতিনিধি দলে তাঁকেই নেতা নির্বাচিত করা হতো।

মিসর সম্রাট মুকাউকাসের দরবারে যে মুসলিম প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়েছিল, হযরত উবাদা ইবনুস্ সামিত (রাঃ)কে সেই দলের নেতা হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল।

মিসর সম্রাট মুকাউকাস সেই বিশাল দেহী কৃষ্ণবর্ণের মুসলিমকে দেখে এতই আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে, তিনি থর থর করে কাঁপতে ছিলেন। কম্পিত কণ্ঠে তিনি আর্তচিৎকার করে বলেছিলেন, 'এই ব্যক্তিকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে এসো'। হযরত উবাদা ইবনুস্ সামিত (রাঃ) এর সঙ্গী-সাথীগণ সম্রাট মুকাউকাসকে জানিয়ে দিলেন, 'আমরা তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে পেশ করতে পারি না। কারণ তিনিই আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম অভিমত দানকারী। জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিতে তিনিই আমাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, অগ্রবর্তী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি'।

মিসর সম্রাট তখন বাধ্য হয়ে তাঁর বক্তব্যই শোনার জন্য প্রস্তুত হলেন। হযরত উবাদা দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রশংসা করে বক্তব্যে বললেন, হে মিসরের শাসক! আমি আপনার কথা শুনেছি এবং আপনার সামনে আমি আমার এক সহস্র সঙ্গী-সাথীর প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলছি। যাঁরা আমার পশ্চাতে রয়ে গিয়েছে তাঁরা আমার থেকেও বিশাল দেহী এবং কালো। দেখতে আমার থেকেও অধিক ভয়াবহ। আপনি তাদেরকে দেখে বেশী আতঙ্কিত হবেন। আপনার সাথে কথা বলার ব্যাপারে আমাকেই মুখপাত্র বানানো হয়েছে। আমার সাথে যারা রয়েছেন, তাদের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আমার প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, আমার শত্রু পক্ষের এক শতজনকেও আমি বিন্দুমাত্র ভয় পাইনা। আমার সাথীগণও আমার অনুরূপই নির্ভীক। এর কারণ হলো আমরা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করি এবং ঈমানের দাবি হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, তাদের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত শত্রুতা অনুভব করি না। বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে বা দেশের সীমানা বৃদ্ধির জন্য আমরা যুদ্ধ করি না। আমরা ততটুকুই করি যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য বৈধ করেছেন। আমরা যদি স্বর্ণের অসংখ্য স্তূপও লাভ করি, তা সবই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ব্যয় করি।

হযরত উবাদার জলদগম্ভীর কণ্ঠে প্রাণস্পর্শী ভাষণ শুনে মিসর সম্রাট মুকাউকাস কম্পিত হলেন। দরবারের লোকদেরকে উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, এই লোকটি যা বললো, এমন কথা কি তোমরা কখনো শুনেছো? আমি তো এই লোকটির বিশাল দেহ আর শরীরের ঘনকালো রঙ দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর কথাগুলো তো তাঁর চেহরার থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর! আমি এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই লোকগুলো অতিদ্রুত সমগ্র পৃথিবী পদানত করবে।

এ কথা বলে মিসর সম্রাট মুকাউকাস সিংহাসন থেকে নেমে হযরত উবাদার দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মহান ব্যক্তি! আমি আপনার কথা যেমন শুনেছি এবং আপনি আপনার সাথীদের সম্পর্কে যা বললেন, সে সম্পর্কেও শুনেছি। আমি শপথ করে বলছি! আপনারা যতটা অগ্রসর হয়েছেন তা শুধু এ জন্য যে, আপনি যাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। আর আপনারা যাদের ওপরে বিজয়ী হয়েছেন তা এই জন্য যে, তারা ছিল পৃথিবী পূজারী। কিন্তু আমি আপনাদের ব্যাপারে এ জন্য আতঙ্ক অনুভব করছি যে, আপনারা রোমানদের মতো এক বিশাল শক্তির সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন। কারণ তারা সংখ্যায় অগণিত, তাদের বীরত্ব, সাহসীকতা ও শক্তিমত্তা আপনাদের তুলনায় অনেক বেশী। আমার বিশ্বাস, আপনারা তাদের ওপরে কোনোক্রমেই বিজয়ী হবেন না। আপনারা নিজেদের দুর্বলতা ও সংখ্যাল্পতার কারণে পরাজিত হবেন। আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে আপনাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে প্রস্তুত এই শর্তে যে, আমরা আপনাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে দুইটি করে স্বর্ণ মুদ্রা দিবো এবং আপনাদের খলীফার জন্য সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিবো। আপনারা আমাদের শর্ত মেনে নিন এবং যে শক্তির মোকাবেলা করতে আপনারা সক্ষম হবেন না, সেই শক্তির কবলে নিপতীত হবার পূর্বেই এখান থেকে নিজের দেশে চলে যান।

মিসর সম্রাটের এই অর্থহীন বক্তৃতা শোনার মতো মানসিকতা হযরত উবাদার ছিল না। তবুও তিনি সৌজন্যতার খাতিরে ধৈর্য ধরে তার কথা শুনে বললেন, হে শাসক আপনি শুনুন! আপনি এবং আপনার দরবারের লোকগুলো আত্মপ্রতারিত। রোমানদের বিশাল বাহিনীর কথা শুনিয়ে আপনি আমাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করলেন। আপনি বললেন, তারা আমাদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। আমি ঐ আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যাঁর মুষ্ঠিতে আমাদের প্রাণ! এসব কথা বলে আপনি আমাদের মধ্যে

যেমন ভীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না, তেমনি আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের লোভও জাগাতে পারবেন না।

আপনি রোমানদের সম্পর্কে যা বললেন, তা যদি সত্য হয় তাহলে আমরা যুদ্ধ করতে আরো অধিক আগ্রহী। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধে যদি নিহত হই, তাহলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবো, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তিনি আমাদেরকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত দান করবেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তুলনায় আমাদের কাছে অধিক প্রিয় আর কিছু নেই। আপনাদের সাথে যুদ্ধে দুইটির যে কোনো একটি পরিণতিই সম্ভব। হয় আমরা বিজয়ী হবো নতুবা শাহাদাত বরণ করবো। এই উভয় পরিণতিই আমাদের জন্য সর্বাধিক উত্তম। যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহলে পৃথিবীর বিশাল ধন-ভাণ্ডার আমাদের হস্তগত হবে। আর যদি আপনারা বিজয়ী হন আমরা শাহাদাত বরণ করি, তাহলে আদালতে আখিরাতে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত আমরা লাভ করবো।

এই দুটোর যে কোনো একটি লাভ করার জন্য আমরা মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধ করি। আমরা প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর দরবারে শাহাদাতের জন্য ফরিয়াদ করি। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের দেশ ও পরিবারের কাছ থেকে বের হয়েছি। মহান আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে পুনরায় তাদের মধ্যে ফিরিয়ে না নেন। আমরা আমাদের পরিবারের সকল সদস্যকে তাঁরই কাছে আমানত রেখে এসেছি। আমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হলো, আমরা কিভাবে তাঁর পথে সামনের দিকে অগ্রসর হবো। আমাদের মন-মানসিকতা যে ধরনের, আপনাদের বর্তমান অবস্থার কারণে আপনাদের মন-মানসিকতা আমাদের অনুরূপ হবে না।

এর নাম মুসলিম ও ঈমান, আর এই ঈমানই মানুষকে অজেয় করতে সক্ষম এবং ঈমানই মানুষের চরিত্রে নিহিত অপরিসীম শক্তির রহস্য উদ্ঘাটন করেছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান দেখিয়ে দিয়েছে এই অপরিসীম শক্তি মানুষের দেহে নয়, মানুষের আত্মায় নিহিত রয়েছে। শারীরিক শক্তির দিক দিয়ে মানুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেনো, সংখ্যায় অধিক সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করা তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হতে পারে না। পক্ষান্তরে সংখ্যায় অল্প লোকজন যদি ঈমানী শক্তিতে শক্তিশালী হতে পারে, তাহলে সমগ্র পৃথিবীকে পদানত করা তাদের জন্য কোনো কঠিন বিষয় নয়। আল্লামা ইকবাল (রাহ:) বলেন–

টল্‌না ছাকতে থে আগার জং মে আড় যাতে থে

পাওঁ শোরোঁ কি ভি ময়দান ছে উখাড় যাতে থে।
তুঝছে ছরকাশ হুয়া কোই তো বিগাড় যাতে থে
তেগ কেয়া চীজ হ্যায়? হাম তোপছে লড় যাতে থে।
নকশে তাওহীদকা হর দিল পা বয়ঠায়া হাম নে
জেরে খঞ্জর ভি ইয়ে পায়গাম ছুনায়া হাম নে।

সমরাঙ্গনে আমরা (ঈমানদারগণ) প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছি, তখন কোনো অবস্থাতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিনি। সিংহসম প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুও আমাদের ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হয়েছে। হে আল্লাহ! তোমার প্রতি কাউকে বিমুখ হতে দেখলে আমরা উন্মাদ হয়ে যেতাম, তখন তরবারী তো তুচ্ছ কথা ভীষণ তোপের মুখেও আমরা নিজের বক্ষদেশকে উপস্থাপন করেছি। তারপর সবার বুকে তোমার তাওহীদের পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করে দিয়েছি। তাদেরকে নির্ভয়ে আমরা তোমার একত্বের বাণীতে দীক্ষা দিয়েছি।

মুসলিম ও অন্যান্য জাতির আচরণগত পার্থক্য

মহান ইসলামী আদর্শ পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেয়ার উদ্দেশ্যে যে মানুষগুলো গড়েছিলো, তাদের বাস্তব জীবনধারা, অবলম্বিত নীতি, তাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র কেমন ছিলো, তা সংক্ষেপে তুলে ধরার পূর্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ পূজাড়িদের দৃষ্টি উন্মোচনের লক্ষ্যে পাশ্চাত্য সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন। বর্তমানে পাশ্চাত্যের ওরিয়েন্টালিস্টরা পৃথিবীর নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে নানা পদ্ধতিতে নির্মমভাবে হত্যা করে সভ্যতা, সংস্কৃতি, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র শিক্ষা দিচ্ছে। অপরদিকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নন্দিত আদর্শ ইসলামকে জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থী, মধ্যযুগীয়, অসহিষ্ণু, মানবতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক হিসেবে প্রচার করছে।

পাশ্চাত্যের জ্ঞানপাপী নেতৃত্ব মাত্র ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মানবাধিকার আইন পাস করেছে। অপরদিকে নবী করীম (সাঃ) ৬১০ সালে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। তিনি শুধু ঘোষণাই দেননি, তাঁর এ ঘোষণা তিনি তাঁর নন্দিত যুগে এবং সাহাবায়ে কেরামের খিলাফতে রাশেদার যুগেও বাস্তবায়িত হয়েছিলো। পরবর্তীকালে খিলাফত ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে যে সকল মুসলিম শাসকগণ দেশ পরিচালনা করেছেন,

তাঁরাও মানবাধিকারের সর্বোত্তম নীতি অবলম্বন করেছিলেন। ইসলাম বিদ্বেষে অন্ধ ওরিয়েন্টালিস্টরা বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সম্পর্কিত আইন বিধিবদ্ধ করেছে, কিন্তু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নেতা নবী করীম (সাঃ) ৬২৪ সালে যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সম্পর্কিত বিধি বিধান দান করে ঘোষণা করেন যে, যারা বিজয়ী হয়েছে তারা নিজেরা প্রয়োজনে অনাহারে থেকেও যুদ্ধবন্দীদের আহার করাবে।

আব্রাহাম লিঙ্কনের শাসনামলে ১৮৬৩ সালে আমেরিকায় দাস প্রথা রহিত হয়। এই দাস প্রথা রহিত করতে গিয়ে যে যুদ্ধের সূচনা হয়, এ যুদ্ধে প্রায় সোয়া ছয় লক্ষ মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়। স্বয়ং আব্রাহাম লিঙ্কনও আততায়ীর হাতে নিহত হন। অপরদিকে নবী করীম (সাঃ) প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বেই দাস প্রথা বিলুপ্তির সূচনা করেন এবং দাসগণ মুক্তি পেতে থাকে। ইসলাম দাসদের সম্পর্কে এ বিধান জারি করে যে, একজন দাস দাসত্ব থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার যাবতীয় ভরণ পোষণ তার মালিকের সমপর্যায়ের হবে। পবিত্র কোরআনের প্রথম ওহীর প্রথম শব্দই 'ইক্বরা' অর্থাৎ পড়ো। আর এ কারণেই ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই নারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে। অপরদিকে ১৮৩৫ সালে আমেরিকায় মেয়েরা প্রথম স্কুলে যাবার সুযোগ পেয়েছে। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই নারীকে তাঁর পিতা, স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়ের সম্পত্তিতে তার অধিকার সুনির্দিষ্ট করে দেয়। আর আমেরিকায় ১৮৪৮ সালে মেয়েরা সম্পত্তি ভোগের অধিকার লাভ করে। মুসলিম নারীরা নবী করীম (সাঃ) এর স্বর্ণযুগেই রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে। আমেরিকায় নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে ১৯২০ সালে।

এটাই যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার বাস্তব অবস্থা, সেই পাশ্চাত্যের জ্ঞানপাপীরা মুসলিম জাতিকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে মানবাধিকার, গণতন্ত্র আর সভ্যতা শিখানোর অশুভ চেষ্টা করছে।

পাশ্চাত্যের মুসলিম বিদ্বেষী অন্ধ সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃত সত্য গোপন করার কারণেই সেসব দেশের সাধারণ নাগরিকগণ প্রকৃত সত্য জানতে পারে না। পাশ্চাত্যের জ্ঞানপাপী গবেষকগণ আন্তর্জাতিক আইন রচনার ইতিহাস শুরু করেছে গ্রীসের নগররাষ্ট্র দিয়ে। এরপর রোমান সভ্যতার বর্ণনা দিয়ে মাঝে মানব সভ্যতায় ইসলামের অবদানের বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন করে আধুনিক যুগের বর্ণনা শুরু করেছে। অর্থাৎ মানব সভ্যতা বিনির্মাণে ইসলাম ও মুসলিমদের যে বিশাল অকল্পনীয় অবদান, তা তারা মানবজাতিকে জানতে দিতে সম্পূর্ণ

অনিচ্ছুক। ইসলাম সম্পর্কে মানবজাতিকে অন্ধকারে রাখতে তারা বদ্ধপরিকর এবং সে লক্ষ্য বাস্তবায়নেই তারা সকল ক্ষেত্রে সত্য গোপন করে। ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষেত্রে সত্য গোপন করার কাজে তারা ইলেট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়া ব্যবহার করছে এবং মুসলিম দেশসমূহের মিডিয়ার মালিকদের যে কোনো কিছুর বিনিময়েই হোক এ ঘৃণ্য কাজে ব্যবহার করছে।

ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তি মাত্রই অবগত রয়েছেন যে, গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় ইসলামের মতো নন্দিত আন্তর্জাতিক আইনের গণতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিলো না। পাশ্চাত্যের এই সাম্প্রদায়িক প্রচারণা এবং মুসলিম দেশসমূহে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুপস্থিতির কারণে মুসলিম হিসেবে পরিচিত এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকজনও ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার শিকার হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) যে নন্দিত শাসননীতি ও শাসন কার্য্যক্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারই একনিষ্ঠ উত্তরাধিকার হলো সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত নীতি তথা খেলাফতে রাশেদা। রাসূল (সাঃ) এর শাসনে মানবজাতির ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির লক্ষাভিসারী জীবন নীতি ও শাসন ব্যবস্থার যে শশাঙ্ক উদিত হয়েছিলো, খিলাফতে রাশেদার শাসনে সে শশাঙ্ক পূর্ণীমার পূর্ণ শশধর রূপে মধ্য গগণে উপনীত হয়ে স্নিগ্ধ কিরণচ্ছটা বিকিরণ করছিলো।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অধিকারকে শাসন কার্য্যক্রমের একটি মূল বিষয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন রাষ্ট্রের ওপর নাগরিকদের অধিকার এবং নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রের অধিকার। যে কোনো রাষ্ট্রে বিদ্রোহীসহ বিভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকে। রাষ্ট্রের ওপর তাদের কি অধিকার থাকবে এবং তাদের ওপর রাষ্ট্রের কি অধিকার থাকবে, এসবও শাসন কার্য্যক্রমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ ছাড়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিকালীন ও যুদ্ধাবস্থায় পারস্পরিক কি অধিকার থাকবে সেটাও রাষ্ট্রের শাসন নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসব নানাবিধ অধিকারের ভিত্তিতেই একটি রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করে থাকে।

মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ইসলামে এই অধিকারসমূহ ও আইনের উৎস কোনো শাসক বা সরকার নয়। মহাগ্রন্থ আল কোরআন ও নবী করীম (সাঃ) এর সুন্নাতই হলো এসব অধিকার নির্ধারণ ও আইনগত মূলনীতির একমাত্র উৎস। অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার, আইন রচনা করার অধিকার কোনো মানুষকে প্রদান করা হয়নি। সাহাবায়ে কেরামের

শাসননীতি ও শাসন কার্যক্রমের মূল উৎস ছিলো পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ। আইনের উৎস যা-ই হোক বা আইন যত কল্যাণধর্মীই হোক না কেনো, সে আইন যদি যথাযথভাবে প্রয়োগ না হয়, তাহলে কল্যাণ লাভ করা যায় না। কারণ আইনের অনুসরণ ও প্রয়োগের ওপরই মানুষের অধিকারসমূহের সংরক্ষণ নির্ভর করে। সে আইনের অনুসরণ ও প্রয়োগ নির্ভর করে স্বচ্ছ জবাবদীহীতার ওপর। এ সকল দিকে ইসলামের নন্দিত রাষ্ট্র ও মুসলিমরা সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

কারণ ওহীভিত্তিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদীহীতার শানিত অনুভূতি এবং আখিরাতে আল্লাহর আদালতে বিচারের ভয় মুসলমানদেরকে আইনের অনুসরণ ও প্রয়োগে যথাযথ পথে পরিচালিত করে। ধর্মের ছদ্মাবরণে আবৃত, ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ লোকজনের এ অনুভূতি নেই বিধায় আইন প্রণয়ন, অনুসরণ ও প্রয়োগে তারা সীমাহীন স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকে। ইসলামী বিধানভিত্তিক রাষ্ট্রের কল্যাণধর্মী হওয়া ও ইসলামের বিপরীত আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রের নিপীড়নমুখী হওয়ার এটাও একটি মৌলিক কারণ। ইসলামী বিধানভিত্তিক রাষ্ট্র তথা খিলাফতে রাশেদা ছিলো ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। এ কারণে সে রাষ্ট্রের সীমানায় নাগরিক- অনাগরিক, মুসলিম- অমুসলিম ও শত্রু- মিত্র নির্বিশেষে সকলেই অন্যান্য অধিকারসহ মানবাধিকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভোগ করেছে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ প্রয়োজনে যোগ্যতা ও সুযোগের অসমতার কারণে মানুষের মধ্যে ধনী-গরীব ও শাসক- শাসিতে পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু মানুষ হিসেবে তার মৌলিক অধিকারসমূহ পাওয়া এবং সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ লাভ করা সকল মানুষের অলঙ্ঘনীয় অধিকার। আর নন্দিত আদর্শ ইসলাম সকল মানুষের এই অধিকার নিশ্চিত করে তা বাস্তবায়ন করেও দেখিয়েছে।

মানুষের জন্ম ও পরিচয়ের দিকটি সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট করে একশ্রেণীর লোকজন মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করে আসছে। এরই ভিত্তিতে পাশ্চাত্য দেশসমূহে ও ভারতে জন্ম, বর্ণ, ভাষা ও দেশভিত্তিক কৌলিন্য কাউকে বড়, কাউকে ছোট, কাউকে শাসক ও কাউকে শাসিতে পরিণত করে রেখেছে। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে এ বৈষম্য প্রকট। এসব দেশ থেকে কাগজে কলমে বর্ণবাদ উৎখাত ঘটলেও তাদের মন-মানসিকতা বর্ণবাদের বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। পক্ষান্তরে নবী করীম (সা:) সূচনাতেই ভাষা, বর্ণ, জন্ম ও দেশভিত্তিক কৌলিন্য উৎখাত করেছেন। ইসলামের প্রথম খলীফা- খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর (রা:) এর প্রথম

সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব একজন ক্রীতদাস পুত্রের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন এবং তাঁরই অধীনে হযরত উমার (রা:) একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন।

ইসলাম কারো বংশীয় পরিচয় বিলোপ করেনি। কারণ ইসলাম মানুষের সামাজিক কাঠামোতে আত্মীয়তা ও পারিবারিক বন্ধনকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। আর এ বন্ধনকে পাশ্চাত্যে বিলোপ সাধন করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে জাতিগত কৌলিন্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। জাতিগত এই অহমিকা সহাবস্থানের প্রবল অন্তরায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো জাতিগত অহংবোধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার অহমিকা থেকে। বর্তমানেও পাশ্চাত্য দুনিয়া সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে নিজেদের জাতিগত অহমিকাকে প্রভুত্বের আসনে আসীন করার লক্ষ্যে নির্লজ্জ তৎপরতা চালিয়ে অগণিত আদম সন্তানের প্রাণহানী করছে। পাশ্চাত্যবাসীর ইতিহাসের সূচনা থেকেই এই অহমিকা তাদের মধ্যে জন্মলাভ করেছে। গ্রীক সভ্যতা ঘোষণা করেছিলো, 'গ্রীকদের বাইরের লোকজন গ্রীকদের ক্রীতদাস হবে এটাই প্রকৃতির ইচ্ছা'। রোমকদেরও ধারণা ছিলো, 'শুধু মাত্র তারাই সমগ্র পৃথিবীর মালিক এবং পৃথিবীর সকল সম্পদে কেবলমাত্র তাদেরই অধিকার বর্তাবে'। গ্রীকরা নিজেদেরকে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রভু হিসেবে পরিচয় দিতো।

আধুনিক পাশ্চাত্যের পরম সুহৃদ ইয়াহূদীদের ঘোষণা হলো, 'তোমার পূজনীয় প্রভু যখন কোনো দেশকে তোমার অধীন করে দিবেন তখন সে দেশের প্রত্যেক পুরুষকে শাণিত তরবারী দ্বারা নিধন করো এবং শত্রুর সকল কিছু তুমি ভোগ করো'। এ ক্ষেত্রে ইসলামের নান্দনিক দিক হলো, অন্যান্য সকল জাতির প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার আদায় করতে হবে এবং তাদের সাথে সহাবস্থান করতে হবে। শত্রু হলেও সে মানুষ এবং মানুষ হিসেবে তার প্রাপ্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। একান্ত বাধ্য হয়ে মুসলিম বাহিনীকে যখন কোনো শত্রুদেশে প্রেরণ করা হয়েছে, তখন রাষ্ট্র প্রধানগণ তাদেরকে ইসলামের আদেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে নির্দেশ জারি করেছেন, 'নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করবে না এবং তাদের সতীত্ব সম্ভ্রমের সংরক্ষণ করবে। নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করবে না। কারো কোনো কিছু অপহরণ করবে না। কারো সাথে প্রতারণা করবে না এবং কারো সম্পদ বিনষ্ট করবে না। বৃক্ষ তরুলতা ধ্বংস করবে না। ফলবান বৃক্ষ ধ্বংস করবে না। ফসলে আগুন দিবে না। কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মগ্রন্থ ধ্বংস করবে না। গৃহপালিত পশু ধ্বংস করবে না। যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন করবে না এবং বিজয়ী হলে বাড়াবাড়ি করবে না। কারো অঙ্গচ্ছেদ করবে না। যুদ্ধের সময় বৃদ্ধ ও শিশুদের রক্ষা করার চেষ্টা করবে'।

সমগ্র দুনিয়া ইসলামে মানবিকতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাশ্চাত্যসহ অন্যান্য জাতিসমূহের পশুসুলভ পৈশাচিকতার ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছে এবং করছে। ক্রুসেডের যুদ্ধে মুসলিমরা যখন জেরুসালেম অধিকার করলো তখন একজন খৃষ্টান ও ইয়াহূদীর গায়ে হাত তোলেনি। কিন্তু পাশ্চাত্যের খৃষ্টান বাহিনী জেরুসালেম দখল করে প্রায় লক্ষাধিক মুসলিম নারী, পুরুষ শিশু বৃদ্ধদের জবেহ করেছিলো। তাদের ঘোড়ার পা গুলো মুসলমানদের রক্তে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিলো। তাদের অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ইরাক ও আফগানিস্থানে গণহত্যা চালিয়ে অগণিত মুসলিমকে হত্যা করেছে এবং এখন পর্যন্ত প্রতিদিন মুসলমানদের রক্তে তাদের হাত রঞ্জিত হচ্ছে। মুসলিম নারী, যুবতী ও কিশোরীদের ধর্ষণ করে নির্মমভাবে হত্যা করছে। পাশ্চাত্যের সৈন্যবাহিনী নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে স্বগৌরবে ঘোষণাও করছে, 'আমরা মুসলিমদের মানুষ মনে করি না'।

পৃথিবীতে একমাত্র মুসলিমরাই পরমত ও পরধর্ম সহিষ্ণু জাতি এবং মুসলমানদের আদর্শ ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা হলো সহনশীলতা ও সহাবস্থানের দেদিপ্যমান ইতিহাস। গ্রীক ও রোমান সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহকে দাস বানানোর নির্দেশ দিয়েছে, অপরদিকে হযরত উমার (রাঃ) এর শাসনামলে সিরিয়ার একজন খৃষ্টান ধর্মযাজক তাঁর ইউরোপীয় এক বন্ধুকে পত্রে লিখেছিলেন, 'ঈশ্বর আরবদেরকে এ যুগে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন, এ জন্যে তাঁরা আমাদেরও প্রভু। তাঁরা আমাদের প্রভু হলেও আমাদের ধর্মের সাথে তাঁরা কখনো সংঘর্ষে লিপ্ত হন না বরং আমাদের ধর্ম পালনের অধিকার রক্ষা করেন। আমাদের ধর্মস্থান ও ধর্মযাজকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন'। (Robert Brifault. The Making of Humanity)

হযরত উমার (রাঃ) খেলাফতে আসীন থাকাকালে বিজিত দেশে তিনি একটি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। তাঁর কাছে অভিযোগ করা হয়েছিলো উক্ত মসজিদ যে স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে সে স্থানটির মালিক একজন অমুসলিম। খলীফার নির্দেশে মসজিদ ভেঙ্গে অমুসলিমকে তার ভূমি ফেরৎ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভারত ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে মসজিদ, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোরআন নিরাপদ নয়। ভারতে বাবরী মসজিদসহ বহু মসজিদ ভেঙ্গে ধূলায় মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বহু মসজিদ তালাবদ্ধ ও অথবা গুদামে পরিণত করেছে। সাম্প্রতিকালে বৃটেন ও আমেরিকায় অনেক মসজিদে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। গ্রীক ও রোমানরা কোনো দেশ দখল করলে সে দেশের মানুষকে দাসে পরিণত

করে তাদের সকল কিছুকে ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করেছে। একই ধারাবাহিকতায় আধুনিক পাশ্চাত্যও প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেই একই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং বর্তমানেও বিভিন্ন দেশ দখলের মাধ্যমে করছে।

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ইয়াহূদী নেতৃত্ব মুসলিম দেশ আফগানিস্থান দখল করে অগণিত মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। জনপদ ঘেরাও করে তারা নারীদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে জীবিত রেখে তাদেরই সামনে তাদের স্বামী, ভাই ও সন্তানকে নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করেছে। দৃষ্টির সম্মুখে আপনজনদের লোমহর্ষক মৃত্যু দেখে মুসলিম নারীরা যখন আর্তনাদ করেছে, রাশিয়ার শ্বেত ভাল্লুকের দল তখন বুলড্রেজার দিয়ে লাশগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে উপহাস করে বলেছে, 'কেঁদো না, আগামী বছর এখানে আলুর ফলন ভালো হবে'। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা প্রদান করেছিলো। বিজয় অর্জনের পরে তারা পাকবাহিনীর অস্ত্রসমূহ, সাঁজোয়াযান এবং বাংলাদেশের মিল কল- কারখানাগুলোর যন্ত্রাংশ লুট করে ভারতে নিয়ে গিয়েছে। তাদের এই লুণ্ঠন কাজে সর্বপ্রথম বাধা সৃষ্টি করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের কমাণ্ডার মরহুম মেজর জলিল, আর এ জন্যে তাঁকে কারাবন্দীও হতে হয়েছিলো।

বৈষম্যহীন মানবাধিকার

মুসলিমরা যখন বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিলো তখন বিজিত দেশসমূহের মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখেছে এবং তাদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করেছে। খিলাফতে রাশেদার যুগে নতুন কোনো এলাকা মুসলিমদের পদানত হলে সেখানকার অধিবাসীদের শত্রুর দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। তাদেরকে এক বছর সময় দিয়ে জানিয়ে দেয়া হতো যে, তারা মুসলিম দেশের নাগরিক হিসেবে বসবাস করবে না ভিন্ন কোনো দেশে চলে যাবে। খিলাফতে রাশেদার অধীনে রাষ্ট্রের অনেক বড় বড় পদে যোগ্যতার ভিত্তিতে অমুসলিমদের নিয়োগ করা হয়েছিলো। পশ্চিমা দুনিয়ায় তাদের নীতি আদর্শের প্রতি অবিশ্বাসী কোনো লোককে রাষ্ট্র ও প্রশাসনে স্থান দেয়া হয়না। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে কেনো অকমিউনিষ্টকে সরকারী চাকরীর সুযোগ দেয়া হয়না।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমগণ জিজিয়া কর দিতে বাধ্য, এ অভিযোগ তুলে অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছে, এতে করে অমুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। তাদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন

এবং মিথ্যা। কারণ জিজিয়া কর কোনো বৈষম্যমূলক বা নিপীড়নমূলক ট্যাক্স নয়। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতাধীনে অমুসলিমরা যুদ্ধে যোগ না দেয়ার বিনিময়ে জিজিয়া নামক নিরাপত্তা ট্যাক্স দিয়ে থাকেন। মুসলিমগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রাণ হারানোর ও সম্পদ বিনষ্টের ঝুঁকি গ্রহণ করেন, সে তুলনায় অমুসলিমদের জিজিয়া কর প্রদান তেমন কিছুই নয়। মুসলিম বাহিনী বিজয়ী বেশে যে দেশে প্রবেশ করে সে দেশের অমুসলিমদের সম্পদ স্পর্শ করে না। তাদের ওপর যে জিজিয়া কর ধার্য্য করা হয় সেটাও তাদের সাধ্যানুসারে আদায় করা হয়। অমুসলিম নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করা হয় না।

ইসলামী রাষ্ট্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য যে, অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে রাষ্ট্র অপারগ হলে রাষ্ট্র আদায়কৃত জিজিয়া কর ফেরৎ দিয়েছে। মুসলিম বাহিনী হেমস শহর নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পরে সেখানকার অমুসলিমদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করেছিলো। পরবর্তীকালে সামরিক প্রয়োজনে হেমস শহর থেকে মুসলিমগণ চলে আসার সময় মুসলিম সেনাপতি অমুসলিমদের জিজিয়া কর ফেরৎ দিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দিবো এ ওয়াদা দিয়েছিলাম। এখন আমরা এ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি বিধায় তোমাদের অর্থের ওপর আমাদের আর কোনো অধিকার নেই'। অধীনস্থ দেশের অধিবাসীদের অধিকারের প্রতি এমন মর্যাদা প্রদানের এবং তাদের সহায়-সম্পদ ও আদায়কৃত অর্থ ফেরৎ দেয়ার একটি দৃষ্টান্তও অমুসলিমদের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না।

বরং এরা যে দেশ দখল করেছে, সেই দেশে ব্যাপক লুঠতরাজ ও দস্যুবৃত্তি প্রদর্শন করেছে। অমুসলিম বাহিনী যে দেশ থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে, সেই দেশে তারা ব্যাপক ধ্বংস যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করেছে। রাশিয়া কর্তৃক এই ধ্বংস যজ্ঞ দেখেই জার্মান বাহিনী পরাজয়ে বাধ্য হয়েছিলো। আমেরিকাও ভিয়েতনামে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করেছিলো। ইরাক দখল করার পরে আমেরিকা ইরাকে নির্লজ্জের মতো লুণ্ঠন কার্য্য অনুষ্ঠিত করেছে। ইংরেজরা বণিকের বেশে ভারতবর্ষে আগমণ করে এ দেশ দখল করেছিলো। তারপর এমনভাবে এদেশের মুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলো যে, উইলিয়াম হান্টারের বর্ণনানুযায়ী সমগ্র ভারতে একটি স্বচ্ছল মুসলিম পরিবারের অস্তিত্ব ছিলো না। মূল্যবান পাথর লুণ্ঠিত কোহিনুর ও অন্যান্য মূলবান সম্পদ নিয়ে ইংরেজরা এখনো লজ্জাষ্করভাবে গর্ব করে।

যুদ্ধবন্দীদের অধিকার প্রদানে নবী করীম (সাঃ) যে নন্দিত নীতিমালা ঘোষণা এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, মানবেতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা যাবে না, এ ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে, তাদেরকে পর্যাপ্ত সুখাদ্য দিতে হবে এবং তাদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করতে হবে। তারা কষ্টানুভব করলে তা দ্রুততার সাথে দূরিভূত করতে হবে। বন্দীদের মধ্যে পরস্পর কেউ আত্মীয় থাকলে তাদেরকে পৃথক করা যাবে না। যুদ্ধবন্দী মায়ের কাছ থেকে তার সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তারা অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যুদ্ধবন্দীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে কথা বলা যাবে না এবং তাদের ব্যক্তিগত মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। তাদের দিয়ে জোরপূর্বক কোনো কাজ আদায় করা যাবে না।

যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত নবী করীম (সা:) এর উল্লেখিত ঘোষণা শুধু ঘোষণাকারেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, মুসলিমরা নিজে অনাহারে থেকেও যুদ্ধবন্দীদের আহার করিয়েছেন। নিজেরা শীতে কষ্ট পেলেও তাদেরকে গরম পোশাক দিয়েছেন। যুদ্ধবন্দীদের জন্য প্রযোজ্য যে নীতিমালা ইসলাম পেশ করে বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছে, এ ধরনের নীতি আদর্শ পাশ্চাত্য পৃথিবী এখন পর্যন্ত রচনা করতেও ব্যর্থ হয়েছে। বিশ শতকের মাঝামাঝি জাতিসংঘ যুদ্ধবন্দীদের অধিকার রক্ষায় যে আইন রচনা করেছে, তা ইসলামী আইনের মানবিক দিকের ধারে কাছে পৌছারও যোগ্যতা রাখে না। যে আইন তারা রচনা করেছে সে আইনও তারা মেনে চলে না।

আমেরিকা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে যখন আফগানিস্থান দখল করলো, তখন সেখানে যে সকল স্বাধীনতাকামী মুসলিম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো, তাদেরকে গ্রেফতার করে কালা-ই জাহাঙ্গীর নামক দুর্গে- দুর্গের ধারণ ক্ষমতার অধিক মুসলিমকে আটক রাখা হয়। তারপর শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এমনভাবে বন্দীদের হত্যা করা হয় যে, অগণিত মানুষের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে বাতাসে উড়তে থাকে এবং দুর্গের নর্দমাগুলোয় রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়। কোথাও হাজার হাজার মুসলিমকে পানির ট্যাঙ্কে ঢুকিয়ে হোস্ পাইপের মাধ্যমে গরম পানি দিয়ে হত্যা করেছে। কোথাও পণ্যবাহী কন্টেইনারে ঢুকিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে এবং পাহাড়ী এলাকায় গভীর গুহায় নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে। ইরাকের আবু গারিব কারাগারে বন্দী নির্দোষ মুসলিমদের ওপরে হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দিয়ে দেহ থেকে গোস্ত খুব্লে তুলে নেয়া হয়েছে। মুসলিম বন্দীদের গলায় কুকুরের বেল্ট পরিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বন্দীদের উলঙ্গ করে একজনের ওপর আরেকজনকে শুইয়ে দিয়ে পিরামিড বানিয়ে আনন্দ উল্লাস করেছে। ক্যারিবিয়ান সাগরের 'গুয়ান্তানামো বে' কারাগারেও মুসলিমদের সাথে আমেরিকা একই আচরণ

করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমেরিকার গোপন কারাগারগুলোয় বন্দীদের সাথে পশুসুলভ আচরণ করছে।

নির্যাতনের এসব ভয়াবহ লোমহর্ষক দৃশ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্ববাসী অশ্রুভেজা নয়নে অবলোকন করেছে। সেভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বন্দী শিবিরগুলো গুয়ান্তানামো বে কারাগার থেকে অনেক ভালো ছিলো। ইরাকের লৌহমানব সাদ্দাম হোসেনের সন্তান ও কিশোর বয়সের নাতীকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে মুসলমানদের পবিত্র ঈদের দিনে সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করিয়েছে আমেরিকা। লিবিয়ার শাসক কর্ণেল মুয়াম্মার গাদ্দাফীকে বিচারের সম্মুখীন না করে তারাই অনুচরদের মাধ্যমে নির্মমভাবে হত্যা করিয়েছে। ওসামা বিন লাদেনকেও আইন আদালতের সম্মুখে হাজির না করে আমেরিকা অবৈধভাবে পাকিস্তানের ওবেটাবাদে প্রবেশ করে হত্যা করেছে। নির্মম নির্যাতনের ক্ষেত্রে আমেরিকা গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের লেবাস পরিধান করে রাশিয়ার স্বৈরাচারী নিপীড়ক স্ট্যালিনকেও হার মানিয়েছে। আধুনিক বিশ্বে সভ্যতাগর্বী আমেরিকার পশুসুলভ আচরণ ইউরোপের রোমানদের মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও ম্লান করে দিয়েছে।

দুশমনদের ক্ষেত্রে আচরণের দিক দিয়ে কিছু নীতি আছে এবং দুশমনদেরও কিছু অধিকার রয়েছে, এ বিষয়টি ইসলামই সর্বপ্রথম পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছে। নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, 'চিকিৎসা সম্পূর্ণ মানবিক সেবা। চিকিৎসক এবং মানুষের সেবাদানকারীর ক্ষতি করা যাবে না'। তাঁর জীবদ্দশায় যে সকল অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে খিলাফতে রাশেদা যে সকল যুদ্ধাভিযান পারিচালনা করেছেন, সে সকল বাহিনীতে চিকিৎসক থাকতেন। তারা প্রয়োজনে অমুসলিমদেরও চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন। ক্রুসেড যুদ্ধে সুলতান সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবী (রাহঃ) ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রতিপক্ষ খৃষ্টান নেতা রিচার্ডকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন।

প্রাণের দুশমনদের সহায়-সম্পদকেও পবিত্র আমানত হিসেবে ঘোষণা করেছে ইসলাম। সঙ্গত কারণ ও বিচার বহির্ভূতভাবে শত্রুর ধন-সম্পদ বিনষ্ট করাকে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে ইসলাম। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈধ অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রের কোনো কর্মচারী অথবা রাষ্ট্র প্রধানও যদি শত্রু দেশ বা শত্রুপক্ষের জান মালের ক্ষতি করে, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। নবী করীম (সাঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান থাকাকালে শত্রু পক্ষের একটি গোত্রের জান মালের ক্ষতি হয়েছিলো। সরকার প্রধান হিসেবে এ বিষয়টি তাঁর পবিত্র কর্ণগোচর হবার

সাথে সাথে তিনি উক্ত গোত্রের প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির জীবনের বিনিময়ে যুদ্ধপণ দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। এমনকি সে গোত্রের যে কুকুরটি নিহত হয়েছিলো, তার জন্যেও ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলো।

সুদূর অতীতকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত মানবেতিহাসে কোনো জাতি এমন নন্দিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। আফগানিস্থান, পাকিস্তান, ইরাক, সুদান, লিবিয়া, ইয়েমেনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে আমেরিকা সন্ত্রাস দমনের অযুহাতে বিমান হামলা চালায় অথবা মনুষ্যবিহীন ড্রোন হামলা করে অগণিত নির্দোষ লোকদের হত্যা এবং সম্পদ বিনষ্ট করছে। ক্ষেত্র বিশেষে তারা বলছে, 'ঘটনা ভুলক্রমে সংঘটিত হয়েছে'। এ কথা বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেয়ার কল্পনাও করছে না। ইসলামী জীবন বিধান অনুসারে যুদ্ধরত অবস্থাতেও শত্রুর কাছ থেকে গ্রহণ করা ঋণ ও তাদের আমানত রক্ষা করতে হবে এবং ঋণও পরিশোধ করতে হবে। ইসলাম তার বিঘোষিত নীতি বাস্তবায়ন করেও দেখিয়েছে। তদানীন্তনকালে সমগ্র বিশ্বের সুপার পাওয়ার ইসলামী সরকার শত্রু ও পরাজিত শত্রুর সকল পাওনা পরিশোধ করেছে। অপরদিকে আমেরিকা ও তার মিত্ররা নিজেদের সংজ্ঞানুযায়ী যে সকল ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রকে শত্রু হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছে, তাদের গচ্ছিত সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করছে। ইরাক ও ইরানের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করেছে আমেরিকা। সাউদী আরবের সম্পদও বাজেয়াপ্তের হুমকি দিয়েছে তারা।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় দেশের রাষ্ট্র প্রধান ও সাধারণ একজন নিরক্ষর ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। শাসন বিভাগ যেনো কোনোভাবেই বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করতে না পারে, এ জন্যে প্রথম থেকেই শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক রাখা হয়েছে। রাষ্ট্র প্রধান বিচারপতিদের নিয়োগ করলেও তাঁরা বিচার কাজে রাষ্ট্র প্রধান বা গভর্ণরদের অধীন হতেন না। রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মকর্তা, গভর্ণর এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্র প্রধানও অভিযুক্ত হলে সাধারণ আসামীদের অনুরূপ তাঁরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারের সম্মুখীন হতেন। বহু মামলায় সাক্ষীর অপ্রতুলতায় স্বয়ং রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে রায় ঘোষিত হয়েছে এবং রায় তারা সানন্দে গ্রহণ করেছেন। ইসলাম ও মুসলিম শাসকদের ইতিহাস এমন ঘটনার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। ইসলামের মানবাধিকার আইনে দেশের সাধারণ নাগরিক ও রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে পার্থক্য নেই। তাঁরা সাধারণ নাগরিকদের কাছেও জবাবদীহী করতে বাধ্য হন। অর্ধ পৃথিবীর

শাসক হযরত উমার (রাঃ) এবং অন্যান্যরা সাধারণ নাগরিকদের কাছে জবাবদীহী করেছেন।

পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রে রাষ্ট্র প্রধান তার পদে অধিষ্ঠিত থাকা পর্যন্ত তার বিচার করা যাবে না। এ গণতন্ত্রের অধীন রাষ্ট্রে মন্ত্রী পরিষদের কোনো সদস্য দূরে থাক, পার্লামেন্টের একজন মেম্বারও গর্হিত অপরাধ সংঘটিত করলে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতারে উচ্চপর্যায়ের সম্মতির প্রয়োজন হয়। আইন এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে না। এই গণতন্ত্রে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জনগণের তুলনায় অনেক বেশী অধিকার ভোগ করে। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বাদী, বিবাদী ও বিচারক একই অবস্থানের হতে পারবে না। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের দাবীদাররা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় বাদী, তদন্ত কর্মকর্তা ও বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তারপর আদর্শিক বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আসামী বানিয়ে তার বিরুদ্ধে তদন্ত নাটক সাজিয়ে দোষী সাব্যস্ত করে বিচারকের আসন থেকে দণ্ড ঘোষণা ও কার্যকর করে।

অর্থাৎ পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রে বাদী হয় সরকার, আসামীও নির্বাচন করে সরকার, বিচারকও সরকার এবং নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় সময়ে দণ্ড তারাই ঘোষণা করে দণ্ড কার্যকরও করে সরকার। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নিজ স্বার্থ রক্ষায় যে কোনো মুহূর্তে প্রবল সাম্প্রদায়িক ও স্বৈরাচারী এবং হত্যাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। আর এ ব্যাপারে গণতন্ত্রের অনুসারীরা কোনোরূপ লজ্জাবোধ করে না। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত রেখেছে আমেরিকা। তাদের সরকার পরিচালনার ব্যবস্থাকে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের জন্যে প্রযোজ্য বলে এবং এর ব্যতিক্রমকে তারা গণতন্ত্র পরিপন্থী বলেও ঘোষণা করেছে। এশিয়ার দেশগুলোর প্রতিনিধিগণ দাবি করেছিলো, 'গণতন্ত্রের মৌলিক ব্যবস্থার আওতাধীনে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণের অধিকার দেশগুলোর রয়েছে'। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব ব্যাংকক বৈঠকে এশিয়ান দেশগুলোর এ দাবি গ্রহণ করেনি।

পক্ষান্তরে ইসলাম এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করেছে। ইসলাম রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাকে পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থার ওপর স্থাপন করে সকল বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকেই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করেছে। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা পরিচালিত মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আওতাধীনে সরকার ব্যবস্থা পরামর্শভিত্তিক হবার পর সরকার গঠন প্রণালী, পরিবেশ ও মানব সমাজের পার্থক্যের কারণে এবং স্থান কাল

ভেদে পৃথক হতে পারে। ইসলামী বিধানসমূহের প্রয়োগ পদ্ধতিতেও পার্থক্য ঘটতে পারে। মানুষের এই অধিকারকে ইসলাম অটল বাস্তবতা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর পরবর্তী চারজন খলীফার সরকার গঠনমূলক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করলে উল্লেখিত এ সত্যই স্পষ্ট হয়ে যায়। দেশ পরিচালনায় সরকারের যাবতীয় আইন কানুনের উৎস পবিত্র কোরআন- সুন্নাহ এবং সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশভাবে মহান আল্লাহর, এ মূলনীতিতে অবিচল থেকে আইন বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশে পার্থক্য হবে এটাই স্বাভাবিক এবং এ বিষয়কে ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে।

মুসলিম জাতির কতিপয় স্বর্ণালী চিত্র

নবী করীম (সাঃ) মহান আল্লাহর নির্দেশে ওহীভিত্তিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে এক সর্বোত্তম মানবগোষ্ঠী প্রস্তুত করে তাঁদের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নন্দিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শুভ, কল্যাণ ও মানবিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ নান্দনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা আকাশের নীচে এবং যমীনের বুকে ইতোপূর্বে কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী লেখক, গবেষক ও চিন্তাবিদগণ মানবেতিহাসের এ স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়টিকে অত্যন্ত কৌশলে এড়িয়ে যান। মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামী আদর্শের কল্যাণকর দিক মানবজাতির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে মানব রচিত আদর্শসমূহ মরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করবে, এ চিন্তা তাড়িত হয়েই তারা ইতিহাসের অমোঘ সত্য এড়িয়ে যান। কিন্তু তারা জানে না, ইসলাম এমন এক আলোকচ্ছটা এবং উজ্জ্বল সূর্য, যাকে কৃষ্ণ কালো মেঘের শত কোটি স্তর দিয়েও আবৃত রাখা যায় না। যায় না বলেই অমুসলিম দেশসমূহে ইসলামকে জানার ও গ্রহণের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন বহু অমুসলিম সৃষ্টি করেছেন যারা প্রকৃতই সত্যের সন্ধানী। এসব অমুসলিম প্রকৃত সত্যকে জানতে গিয়ে ইসলামের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করছেন এবং ইসলামী আদর্শভিত্তিক এমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করেছেন, যা অন্যান্য মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করছে। সেই সাথে ইসলামী চিন্তানায়কদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং রচিত সাহিত্যসমূহ সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষের দৃষ্টি উন্মোচন করছে। অমুসলিম দুনিয়ায় অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায়

বর্তমানে ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাধিক অপপ্রচার করা হচ্ছে। কেনো বিশেষ একটি ধর্ম ও জাতির বিরুদ্ধে মিডিয়াসমূহের এই প্রচারযুদ্ধ, এ প্রশ্ন যাদের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে তারাই ইসলামকে জানার পথে অগ্রসর হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে তাদের চোখে ইসলামের নান্দনিক সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়ে উঠছে।

পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত এমন কোনো আদর্শ আইন কানুন ও মতবাদের অস্তিত্ব নেই, যা মানুষকে একান্ত গোপনে নির্জনে করা নিজের অপরাধ প্রকাশ করে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ দূরে থাক অপরাধ প্রকাশ পেলে কিছু দিনের জন্যে কারাগারে যেতে হবে, এ আতঙ্ক তাড়িত হয়ে অপরাধী তার অপরাধ গোপন করার সকল চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামী সমাজের চিত্র এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। নন্দিত আদর্শ ইসলাম তার একনিষ্ঠ অনুসারীর হৃদয়ে আত্মজিজ্ঞাসা ও বিবেকের দংশন এমনভাবে সৃষ্টি করেছিলো যে, অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড জেনেও সে শাস্তি গ্রহণ করে পরকালে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় আল্লাহর আদালতে দণ্ডায়মান হবার আকুতি নিয়ে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসেছিলো।

হযরত মা'ইয ইবনে মালিক (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে অনুতাপ মিশ্রিত কণ্ঠে জানালেন, 'আমি অবৈধ পন্থায় যৌনক্রিয়া করেছি, আমার প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করুন। আল্লাহর রাসূল তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও'। লোকটি চলে গেলো কিন্তু মনে স্বস্তি পেলো না। তাঁর জীবনে শান্তি যেন তিরোহিত হয়ে গিয়েছে। বিবেক তাঁকে ভর্ৎসনা করছে, কিয়ামতের দিনের সেই আযাব তো সে সহ্য করতে পারবে না। পুনরায় লোকটি রাসূলের কাছে সেই পূর্বের অনুরূপ আবেদন জানালো। রাসূল তাঁকে আবার ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে তিনবার লোকটিকে ফিরিয়ে দেয়ার পরে চতুর্থবার লোকটি এসে যখন সেই একই আবেদন জানালো, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই লোকটি উন্মাদ নয় তো?'

লোকেরা বললো, 'না, লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ'। রাসূল আবার জানতে চাইলেন, 'লোকটি কোনো ধরনের নেশা করেনি তো?' লোকজন জানালো, 'না, লোকটি কোনো নেশা করেনি'। এরপর লোকটির আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে জানা হলো। এরপর লোকটির ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা হলো অর্থাৎ লোকটিকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা মা'ইয ইবনে

মালিকের জন্য মাগফিরাত কামনা করো। কারণ সে এমন তাওবা করেছে যে, তাঁর তাওবা সমস্ত মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলে তাই যথেষ্ট হতো'।

ইজ্‌দ গোত্রের একজন ঈমানদার নারী নফসের ধোকায় পড়ে অবৈধ পন্থায় যৌনক্রিয়া করেছিল। সম্বিত ফিরে পাওয়ামাত্র আল্লাহর ভয়ে সেই নারী থর থর করে কেঁপে উঠলো। আহার নিদ্রা সব তার বন্ধ হয়ে গেলো। কিয়ামতের ময়দানে আপন রব আল্লাহর সামনে সে কোন্ মুখ নিয়ে উঠে দাঁড়াবে? ছুটে এলো আল্লাহর রাসূলের কাছে। অকপটে সে নিজের অপরাধের স্বীকৃতি দিলো। রাসূল (সাঃ) তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু সেই নারী তাঁর প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করার জন্য বার বার আবেদন জানাতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সেই নারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে তুমি কি গর্ভবতী হয়েছো?' অনুতাপের সাথে নারী জানালো সে গর্ভবতী হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) অনুতাপের অনলে নিঃশেষে জ্বলে খাঁটি সোনায় পরিণত হওয়া সেই নারীকে জানালেন, 'গর্ভের সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে'।

আক্ষেপ করতে করতে সেই নারী চলে গেলো। তাঁকে প্রহরা দেয়ার জন্য কোনো প্রহরাদার বা গোয়েন্দা নিয়োগ করা হলো না। দশমাস পরে সন্তান প্রসব হলো কিন্তু সেই নারীর মন থেকে অনুতাপের আগুন একটুও নির্বাপিত হয়নি বা অনুশোচনার তাপের মাত্রা হ্রাস হয়নি। সন্তান কোলে সেই নারী পুনরায় আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে দণ্ড প্রয়োগের আবেদন জানালেন। রাসূল (সাঃ) নারীকে জানালেন, 'তোমার দুধে ঐ সন্তানের দুই বছর হক রয়েছে। সেই হক তুমি আদায় করবে এবং সন্তান অন্য কিছু আহার না করা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে'।

সেই নারীর দুই গণ্ড বেয়ে অনুতাপের অশ্রু বেয়ে পড়ছে। চলে গেলো সেই নারী এবং নির্দিষ্ট সময়ে সন্তানকে রুটি খাওয়া অবস্থায় এনে রাসূলকে দেখিয়ে আবেদন জানালো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার সন্তান দুধ পান ত্যাগ করেছে, এই দেখুন সে রুটি খাচ্ছে'। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, এই সন্তানকে লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে?' একজন দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূল (সাঃ) ঐ লোকটির দায়িত্বে সন্তানকে দিয়ে আবক্ষ মাটিতে সেই নারীকে গেড়ে তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন।

মহিলার প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করা হচ্ছে। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রাঃ) মহিলার কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় একটি পাথরের আঘাত করলেন। মস্তক ফেটে মগজ আর রক্ত ছিটকে এসে হযরত খালিদের দেহ স্পর্শ করলো। তিনি মহিলার প্রতি ভর্ৎসনা করলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তা শুনে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'তোমরা যদি পৃথিবীতে কোনো জান্নাতী নারী দেখতে চাও, তাহলে এই নারীকে দেখে নাও। কারণ সে এমনভাবে আল্লাহর দরবারে তওবা করেছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন'।

অপ্রত্যাশিত উদারতা ও ক্ষমা

উমায়ের ইবনে ওয়াহাব ছিল আল্লাহর রাসূলের প্রাণের দুশমন। তার বেশ কয়েকজন আত্মীয় বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য সে ছিল উন্মাদ। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া অর্থের বিনিময়ে লোকটিকে মদীনায় প্রেরণ করেছিল, যেন সে আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করে। তরবারীতে প্রাণ হরণকারী বিষ মাখিয়ে সে মদীনায় উপস্থিত হলো। তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরী আল্লাহর রাসূলের সাহাবায়ে কেরামের সতর্ক দৃষ্টিকে লোকটি এড়িয়ে যেতে পারলো না। গ্রেফতার হয়ে লোকটি রাসূল (সাঃ) এর কাছে আসতে বাধ্য হলো। হযরত উমার (রাঃ) লোকটির প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করার অনুমতি কামনা করলেন।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) অনুমতি দিলেন না, বরং সহানুভূতির সাথে লোকটির সাথে কথা বলতে থাকলেন। কথা প্রসঙ্গে লোকটির গোপন উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়লো। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। লোকটি এই অপ্রত্যাশিত উদারতা, ক্ষমা আর নমনীয়তা দেখে হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র কদম মোবারকে লোকটি আছড়ে পড়ে ইসলাম কবুল করে ফিলে এলো মক্কায়। মক্কার ঘরে ঘরে সে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলো।

বিচারকের অপূর্ব ফায়সালা

আবু দাউদ শরীফে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর জীবন সঙ্গিনী হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, দুই জন লোক মীরাসী সম্পত্তি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো। উভয়ই সেই সম্পদে নিজের দাবিতে অটল রইলো। অবশেষে তারা নবী করীম (সাঃ) এর কাছে বিষয়টি মীমাংসার জন্য

পেশ করলো। তিনি উভয়ের বক্তব্য শুনে বললেন, শোনো, আমিও তোমাদের অনুরূপ একজন মানুষ বৈকি। তোমরা যে বিষয়ে বিতর্ক করছো, তা মীমাংসার ব্যাপারে আমার কাছে এসেছো। তোমাদের একজন হয়তঃ অন্যের তুলনায় অধিক বাকপটু এবং যুক্তি প্রদর্শনের ব্যাপারে দক্ষতাসম্পন্ন। আমি যদি তার বাকপটুতা ও যুক্তি প্রদর্শনের কারণে তার ভাইয়ের অধিকার তাকেই দিয়ে দেই, সে যেন তার একবিন্দুও গ্রহণ না করে। কারণ সে তা গ্রহণ করলে জাহান্নামেরই একটি টুকরা গ্রহণ করা হবে।

বিতর্কে লিপ্ত ঈমানদার ব্যক্তিদ্বয় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কথা শুনে ভয়ে আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠলো। দু'জনের চোখ থেকে অশ্রুধারা ঝরতে থাকলো। কান্না জড়িত কণ্ঠে তারা উভয়ে একে অপরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো, আমার সম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই, আমার হকও আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম।

নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা যা করলে তা যখন করেই ফেললে তখন তোমরা দু'জনে পরস্পর সম্পদ ভাগ করে নাও এবং প্রত্যেকের পাওনার পরিমাণ অনুমান করো, এভাবে তোমরা একে অপরের হক হালাল করে নাও।

মুসলিম শরীফে উলেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিল। জমি ক্রয়কারী ব্যক্তি জমির দখল নিয়ে যখন তা ব্যবহার করতে থাকলো, তখন সেই জমির তলদেশ থেকে স্বর্ণ ভর্তি একটি পাত্র পেয়ে গেলো। জমি ক্রয়কারী ব্যক্তি তখন স্বর্ণ ভর্তি সেই পাত্র নিয়ে উপস্থিত হলো, যার কাছ থেকে সে জমি ক্রয় করেছিল। তাকে সে বললো, 'ভাই, আমি তোমার কাছ থেকে যে জমি কিনে ছিলাম, সেই জমির মাটি খনন করার সময় এটা পেয়েছি। আমি তোমার কাছ থেকে জমি কিনেছি, কিন্তু জমির ভেতরে অবস্থিত এই স্বর্ণ পাত্র কিনিনি। সুতরাং এটা তোমার, তুমি এটা গ্রহণ করো'।

জমি বিক্রেতা বিনয়ের সাথে জানালো, 'ভাই, আমি তোমার কাছে শুধু জমিই বিক্রি করিনি, জমির ভেতরে যা কিছু রয়েছে তা সবই বিক্রি করে দিয়েছি। সুতরাং এখন তুমি জমির ভেতরে যা কিছুই পাবে, তা তোমারই হবে এবং ঐ স্বর্ণ ভর্তি পাত্রের ওপর আমার কোন অধিকার নেই'।

জমি ক্রয়কারী ব্যক্তি স্বর্ণ ভর্তি পাত্র গ্রহণ করতে রাজী নয়, সে তা জমির পূর্বতন মালিককে ফেরৎ দেবেই। উক্ত লোকটিও তা গ্রহণ করবে না। এভাবেই তারা উভয়ে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়লো। অবশেষে তারা বিষয়টি

মীমাংসা করে দেয়ার জন্য একজনকে বিচারক নিযুক্ত করলো। বিচারক উভয়ের কথা শুনে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমাদের কি ছেলে মেয়ে আছে?' একজন বললো, 'আমার একটি ছেলে আছে'। অন্যজন বললো, 'আমার একটি মেয়ে আছে'। এবার বিচারক রায় দিলো, 'তাহলে তো বিষয়টি মীমাংসা করা খুবই সহজ। তোমরা পরস্পরে একের ছেলের সাথে অন্যের মেয়ের বিয়ে দাও এবং এই স্বর্ণ ভর্তি পাত্র উভয়ের জন্য ব্যয় করো ও ভাগ করে দাও'।

পক্ষপাতিত্ব নয়, সকলেই সমান

বনী মাখজুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা ফাতিমা বিনতে আছাদ চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে আনীত হলো। লোকজন মহিলার আভিজাত্য আর সম্ভ্রান্তের দিকে দৃষ্টি দিয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো এ কারণে যে, সাধারণ লোকদের মতো এই সম্ভ্রান্ত নারীরও হাতকাটার নির্দেশ দেয়া হয় কিনা। হযরত উসামা ইবনে জায়িদ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এর অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। তাঁর শৈশব কৈশোর কেটেছে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র কোল মোবারকে। লোকজন তাঁকেই গিয়ে ধরলো তিনি যেন রাসূল (সাঃ) এর কাছে সেই সম্ভ্রান্ত নারীর জন্য সুপারিশ করেন।

হযরত উসামা ইবনে জায়িদ (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছে গিয়ে সুপারিশ করলেন। বিশ্বনবী (সাঃ) দৃঢ়কণ্ঠে তাঁরই স্নেহাস্পদ উসামার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা গরীব ও নীচু শ্রেণীর লোকদের ওপরে শাস্তি প্রয়োগ করতো আর সম্ভ্রান্ত লোকদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে অভিযোগ থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখতো, এ কারণেই তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমার প্রাণ যাঁর হাতে, সেই আল্লাহর শপথ! আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করতো তাহলে তাঁরও হাত আমি কেটে দিতাম। (বুখারী, ইবনে মাজাহ্)

আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ঈমানী পরীক্ষা

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ) বলেন, মক্কায় ইসলাম বিরোধিদের নির্মম অত্যাচারে আমরা ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়লাম। এ সময় একদিন আমি

দেখলাম, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের ছায়ায় বসে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন। তাঁকে দেখে আমি কাছে গিয়ে নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না?' আমার এ কথা শোনার সাথে সাথে আল্লাহর রাসূলের চেহারা মোবারক আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিম আভা ধারণ করলো। তিনি আমাকে বললেন, 'তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাঁরা এর থেকেও অধিক নির্যাতিত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে আবক্ষ গেড়ে তারপর মাথা করাত দিয়ে চিরে দুই টুকরো করা হয়েছে। কারো কারো দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো হতো। ঈমান ত্যাগ করার জন্য তাদের ওপরে এভাবে নির্যাতন করা হতো। আমি মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, তা অবশ্যই সফল হবে এবং একজন ব্যক্তি একাকী নিঃশঙ্ক চিত্তে সান'আ থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত যাতায়াত করবে, তখন তার মনে একমাত্র মহান আল্লাহর ভয় ব্যতীত অন্য কোনো ভয় থাকবে না'।

অর্থাৎ মানুষকে সকল প্রকার দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার ও যাবতীয় শোষণ, নির্যাতন, অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার ও ভীতি থেকে মুক্ত করে একটি শোষণহীন নিরাপত্তাপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী ভীতিহীন কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, পৃথিবীর সকল কুফরী মতবাদ ও মতাদর্শের ওপর কোরআনকে বিজয়ী করার জন্য। সেই উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হবে- তবে এর জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এই ত্যাগ শুধু তোমাদেরই স্বীকার করতে হচ্ছে না। তোমাদের পূর্বে যারা এ কাজ করেছে, তাদেরকেও তোমাদের তুলনায় অধিক মূল্য দিতে হয়েছে। সুতরাং ধৈর্যহারা হয়ো না। সফলতা ইন্‌শাআল্লাহ আসবেই এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাহাবায়ে কেরাম কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তারপর এমন এক সমাজ ও রাষ্ট্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, মানুষের মনে একমাত্র আল্লাহর ভয় ব্যতীত আর অন্য কোনো ভয় অবশিষ্ট ছিল না। যে সমাজে মানুষের জান-মালের কোনো নিরাপত্তা ছিল না, কথায় কথায় যুদ্ধ নামক সন্ত্রাস মানব সমাজকে গ্রাস করতো। পথে প্রান্তরে নারী ধর্ষিতা হতো। শক্তি প্রয়োগ করে অপরের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হতো এবং নারী ও শিশুদেরকে ধরে নিয়ে দাস-দাসী হিসাবে বিক্রি করা হতো। সেই বর্বর সমাজের লোকগুলো ঈমানের স্পর্শে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হলো। যাদের স্বভাব ছিল আগ্রাসী, তারা

জমাট বাঁধা বরফের মতোই শান্ত হয়ে গেলো। অপরের সম্পদ লুণ্ঠন করাই ছিল যাদের কাজ, তারা হয়ে গেলো অপরের সম্পদের প্রহরাদার। নারীর কোমল দেহকে যারা খুবলে খেতো, তারাই হয়ে গেলো নারীর সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষাকারী জানবাজ সৈনিক।

একজন সুন্দরী তম্বি তরুণী ষোড়শী যুবতী মূল্যবান বস্ত্রে আর অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে দিবাবসানে গোধূলী লগ্নে নির্জন পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে একাকী আত্মীয় বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো। সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় ছেয়ে যাচ্ছে। যুবতী দ্রুত গতিতে তার গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ বেশ দূরে এক সুন্দর সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। যুবক তার দিকেই ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। যুবতী আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। চারদিকে সে তাকিয়ে দেখলো, তাকে সাহায্য করার মতো কেউ কোথাও নেই। আত্মরক্ষা করার মতোও কোনো স্থান নেই।

যুবতীর মনে ধারণা এলো, এই যুবকের হাতে তার মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি যেমন লুণ্ঠিত হবে, তেমনি সে এই যুবক কর্তৃক নির্জন পাহাড়ের পাদদেশে ধর্ষিতা হবে। ভয়ে যুবতীর চেহরা থেকে রক্ত সরে গেলো। আসন্ন বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে যুবতী রাস্তার ওপরেই বসে পড়লো। যুবক ধীর পায়ে যুবতীর দিকে এগিয়ে এসে তাঁর ভয়বিহ্বলা চোখের ওপরে চোখ রেখে মমতা সিক্ত কণ্ঠে বললো, 'মা, তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি কোথায় যাবে বলো- আমি নিরাপত্তার সাথে প্রহরা দিয়ে তোমাকে তোমার গন্তব্য স্থলে পৌছে দিয়ে আসবো। আমার দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, আমার পরিচয় শোনো-আমি একজন মুসলমান'।

মূল্যহীন যেথায় রক্তের বন্ধন

বদরের রণপ্রান্তরে হযরত আবু উবাইদা (রাঃ) প্রবল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ইসলামের দুশমনদের ওপরে এমনভাবে আঘাত হানছেন, তাঁর আঘাতে দুশমনদের প্রতিরক্ষা বুহ্য ভেঙ্গে তছনছ হয়ে পড়ছে। তিনি বার বার তীব্র আক্রমণ করে তাদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। দুশমনরা আবু উবাইদার হামলা থেকে বাঁচার জন্যে এমন এক কৌশল অবলম্বন করলো, যে কৌশলের কারণে তিনি ঈমান রক্ষার ভয়ঙ্কর পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। ইসলামের দুশমনদের পক্ষে যুদ্ধরত আবু উবাইদার পিতাকে তাঁর সামনে এনে বার বার দাঁড় করিয়ে দিতে লাগলো। হযরত আবু উবাইদা (রাঃ) যখনই ইসলামের

শত্রুদের ওপরে আক্রমণ করার লক্ষ্যে শত্রু বাহিনীর সামনে এগিয়ে যান তখনই তাঁর পিতা এসে শত্রু সৈন্য ও তাঁর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। আবু উবাইদা (রা:) এক মহাপরীক্ষার মুখোমুখি হলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি ইসলাম কবুল করে দুশমনদের লোমহর্ষক নির্যাতনের মুখেও নিজ আদর্শের উপরে অবিচল অটল ছিলেন। সকল পরীক্ষাতে তিনি মজবুত ঈমানের কারণে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু আজ সব পরীক্ষার বড় পরীক্ষার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে। একদিকে তাঁর ঈমান রক্ষা, অপরদিকে তাঁর পিতার জীবন রক্ষা। আল্লাহর দুশমন পিতাকে যদি তিনি আঘাত না করেন তাহলে ইসলামী বাহিনী বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে।

হযরত আবু উবাইদা (রা:) কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এবার যদি পিতা এসে তাঁর সামনে যুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলে সে পিতারূপী আল্লাহর দুশমন, কুফুরী শক্তির প্রতিমূর্তি শোষকের প্রতিচ্ছবি পিতাকে আর ছেড়ে দিবেন না। তিনি যদি তার পিতাকে এ অবস্থা সৃষ্টি করার সুযোগ দিয়ে ইসলামী বাহিনীর বিপর্যয় ডেকে আনেন, তাহলে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। আল্লাহু আকবর বলে হযরত আবু উবাইদা (রা:) সিংহের মতো গর্জন করে প্রচণ্ড গতিতে যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে গেলেন। তাঁর পিতাও পুনরায় সামনে এসে তাঁকে দুশমনদের প্রতি হামলা করা থেকে বিরত রাখার জন্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো। সঙ্গে সঙ্গে আবু উবাইদা (রা:) তরবারীর আঘাতে পিতার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তিনি প্রমাণ করলেন ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রতিভূ সে যতো প্রিয়জনই হোক না কেনো তার সাথে ইসলামী আদর্শের মোকাবেলায় কোনো আপোষ নেই।

বদরের প্রান্তরে যখন মুসলমানরা বিজয়ী হলো তখন মদীনার একজন আনসার মুসলমান হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা:) এর আপন সহোদর আবু আযীয ইবনে উমায়েরকে গ্রেফতার করে রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে ছিলেন। এই দৃশ্য হযরত মুসআবের চোখে পড়লে তিনি মদীনার আনসারকে উৎসাহিত করে উচ্চ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'ওকে খুবই শক্ত করে বাঁধো, ওর মা বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারিণী। ওকে মুক্ত করার জন্য ওর মা বিরাট অঙ্কের বিনিময় মূল্য দিবে'।

আপন ভাইয়ের মুখে এ কথা শুনে আবু আযীয অবাক কণ্ঠে হযরত মুসআব (রা:) কে লক্ষ্য করে বলেছিলো, 'তুমি তো আমার আপন ভাই, তুমি কেমন করে এমন কথা বলতে পারছো!' ইসলামের দুশমন ভাইয়ের কথার জবাবে হযরত মুসআব (রা:) বললেন, 'বর্তমানে তুমি আমার ভাই নও, এখন আমার ভাই হলো মদীনার ঐ আনসার, যে তোমাকে রশি দিয়ে বাঁধছে'।

আদর্শিক আকর্ষণ ও মায়ের ভালোবাসা

হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর মদীনায় হিজরতের প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। নবী করীম (সাঃ) যখন নবুয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন সে সময় হযরত সায়াদ প্রাণ উচ্ছল তরুণ। তাঁর বয়স ছিল ১৭ মতান্তরে ১৯ বছর। স্বভাবের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অতি উত্তম প্রকৃতির। তাওহীদের আওয়াজ তার কানে পৌঁছা মাত্র তিনি ইসলাম কবুল করেন। প্রথমে যারা ইসলাম কবুল করেন তাদেরকে সাবিকুনাল আওয়ালিন বলা হয়। তিনি ছিলেন সাবিকুনাল আওয়ালিন। পুরুষদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা তাকে দিয়ে তিনজন হয়েছিল। হযরত সায়াদ (রাঃ) অত্যন্ত মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন। তার মা হামনা ছিলেন একনিষ্ঠ মূর্তি পূজারী। তিনি যখন শুনলেন তার সন্তান সায়াদ মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়েছে তখন তিনি শপথ করলেন, 'সায়াদ ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি খাদ্য গ্রহণ ও পানি পান করবো না। রোদে বসে থাকবো। মুহাম্মাদ (সাঃ)ও তো মাতাপিতার আদেশ মান্য করতে বলেন। অতএব সায়াদ তাঁর আদেশ অনুযায়ীই মাতা হিসেবে আমার কথা মেনে নিয়ে ইসলাম ত্যাগ করুক'।

হযরত সায়াদ (রাঃ) মা'কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। জীবনের এক কঠিন পরীক্ষায় তিনি নিপতিত হলেন। তাঁর মা তিন দিন যাবৎ খাদ্য, পানীয় গ্রহণ করলো না। রোদ থেকে উঠলো না, অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লো তাঁর মা। হযরত সায়াদ (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেন, 'আমার মা ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হয়ে জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন। আমার ভাই আমার মায়ের মুখ হা করিয়ে মুখে খাবার দিত'। এ অবস্থায় তিনি মা'কে বললেন, 'মা, তুমি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তোমার দেহে যদি এক হাজার প্রাণ থাকে এবং সেই প্রাণ একটি একটি করে বের হয়ে যায় তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না'।

শাহাদাতের অদম্য আকর্ষণ

নবী করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন, 'সেই মহান আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আজ যে ব্যক্তি কাফিরদের সাথে ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে যুদ্ধ করবে এবং শুধু সামনের দিকেই অগ্রসর হতে থাকবে, কোনো অবস্থাতেই পিছে সরে আসবে না, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন'। কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন–

قُوْمُوْا اِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ-

'ওঠো এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত জান্নাতের দিকে এগিয়ে চলো। যে জান্নাত নির্মিত হয়েছে এবং নির্বাচিত করা হয়েছে, আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য'।

বনী সালামা গোত্রের উমাইয়া ইবনে হুমাম (রাঃ) বয়সে ছিলেন একেবারে তরুণ। তাঁর চেহারায় তারুণ্যের উজ্জ্বলতা পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মতই যেন দ্যুতি ছড়িয়ে দিচ্ছিল বদরের প্রান্তরে। তারুণ্যের সন্ধিক্ষণে শরীর থেকে তাঁর সুষমার দিপ্তী বদরের প্রান্তর যেন আলোকিত করেছিল। তিনি বসে খেজুরের ছড়া থেকে খেজুর খাচ্ছিলেন। প্রিয় নবীর কথা তাঁর কর্ণকুহরে যেন মধু বর্ষণ করলো। তাঁর মুখ থেকে আনন্দসূচক ধ্বনি 'বাখ্ বাখ্' নির্গত হলো। বাখ্ বাখ্ শব্দ আরবী আঞ্চলিক ভাষার। আরবী অভিধানে এ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'আয় মা আ'যামাহু আয় মা আহ্‌ছানাহু'। অর্থাৎ অপূর্ব সুন্দর! কতই না চিত্তাকর্ষক! মহা মূল্যবান! মর্যাদা আর সৌন্দর্য্যরাশি যেখানে অফুরন্ত!

নবী করীম (সাঃ) সেই তরুণ সাহাবীর মুখে আনন্দসূচক ধ্বনি শুনে তাঁর দিকে পবিত্র আঙ্গুলের ইশারা দিয়ে বললেন-

اِنَّكَ مِنْ اَهْلِهَا-

'জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে তুমি একজন'।

নবী করীম (সাঃ) এর মুখে এ কথা শুনে তরুণ সাহাবী উমাইয়েরের হৃদয়ে যেন খুশীর প্লাবন প্রবাহিত হলো। তিনি খেজুরগুলো দূরে নিক্ষেপ করে উচ্চকণ্ঠে বললেন, হাতে এত খেজুর! এগুলো খেয়ে শেষ করতে তো অনেক সময়ের প্রয়োজন! এত সময় ধরে খেজুর খেতে থাকলে জান্নাতে যেতে দেরী হয়ে যাবে।

এ কথা বলে তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন শত্রুর বুহ্যের দিকে। প্রচণ্ড বেগে তরবারী চালিয়ে এক সময় নিজে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে আল্লাহর জান্নাতে চলে গেলেন। যুদ্ধাবসানে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর এই তরুণ সাহাবীর লাশের পাশে দাঁড়িয়ে পবিত্র আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে বললেন, তুমি আল্লাহর জান্নাতে যাবার জন্য খোরমা খাবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তা ব্যয় করোনি, হাতের খোরমা ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়েছো, আমি আল্লাহর রাসূল সাক্ষী দিচ্ছি, অবশ্যই সে জান্নাত তোমার জন্য অবধারিত।

দৃষ্টান্তহীন বিনয়

ইসলামী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রাঃ), বিশাল মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র ক্ষমতা তাঁরই হাতে। তিনি পারস্য বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য কাদেসিয়ার প্রান্তরে মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেছেন। যুদ্ধের কোনো সংবাদ না পেয়ে খলীফা অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে আছেন। প্রতিদিন ফজরের নামায আদায় করে তিনি মদীনা নগরীর বাইরে মরুপ্রান্তরে এসে এক খেজুর গাছের নিচে সংবাদ বাহকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান তিনি, সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমর শক্তির অধিকারী পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে। কাদেসিয়ার প্রান্তরে রক্তক্ষয়ি যুদ্ধ চলছে। সমরাঙ্গনের কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না, ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা বড়ই অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করছেন।

সংবাদ সংগ্রহকারীদের তিনি মদীনায় প্রবেশের পথে বসিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু তা না করে স্বয়ং নির্বাহী প্রধান সংবাদ জানার জন্য মদীনার প্রবেশ পথে এসে অপেক্ষা করতে থাকেন, ইসলাম এমন অপূর্ব বিনয় সৃষ্টি করেছিল বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী খলীফা হযরত উমার (রাঃ) এর মধ্যে।

যাঁর নাম শুনলে তদানীন্তন পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রপতিদের হৃদকম্পন শুরু হতো, সেই উমার (রাঃ) মদীনার বাইরে এসে মরুভূমির খেজুর গাছের নিচে ক্লান্ত আঁখি মেলে মরুপথের দিকে চেয়ে আছেন। অনেক দূরে তিনি লক্ষ্য করলেন, উষ্ট্রারোহী একজন লোক মরুপথ ধরে মদীনার দিকে এগিয়ে আসছে। খলীফা নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি উত্তপ্ত কঙ্করময় পথের ওপর দিয়ে ছুটে গেলেন উষ্ট্রারোহীর কাছে এবং ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি মুসলিম বাহিনীর প্রেরিত দুত কিনা। খলীফার চেহারা দুত চিনে না। চলন্ত অবস্থাতেই সে জানালো, খলীফাকে সে যুদ্ধের সংবাদ জানানোর জন্য যাচ্ছে।

হযরত উমার (রাঃ) উষ্ট্রারোহী দুতের পাশে পাশে দৌড়াচ্ছেন আর যুদ্ধের সংবাদ শুনছেন। উষ্ট্রারোহী দুত মদীনায় যখন প্রবেশ করলো, তখন জনগণ উটের পাশে যে লোকটি দৌড়িয়ে আসছে তাঁকে আমিরুল মুমেনীন বলে সম্বোধন করে সালাম জানালো। দুত উটের লাগাম টেনে ধরে লজ্জিত দৃষ্টিতে খলীফার দিকে তাকিয়ে কুন্ঠিত কণ্ঠে বললো, "হে আমিরুল মুমেনীন! প্রথমেই আপনি আপনার পরিচয় দিলে আমি এই বেয়াদবি থেকে রক্ষা পেতাম'।

হযরত উমার (রাঃ) বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললেন, 'ওসব কথা বলে সময় নষ্ট করো না। মুসলিম বাহিনীর অবস্থা কি, একে একে বলে যাও'। দূতকে তিনি উটের পিঠ থেকে নামতে দিলেন না, উটের পিঠে বসিয়েই তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধের সংবাদ গ্রহণ করলেন।

বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েও হযরত উমার (রাঃ) নিজে পানির পাত্র বহন করে আনতেন। তিনি নিজ পরিবারের জন্য পানির পাত্র বহন করে আনছেন, পথিমধ্যে তাঁর সন্তান এই দৃশ্য দেখে বলে উঠলো, 'আপনি এ কি করছেন?'

স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত ইসলামী সাম্রাজ্যের কর্ণধার সন্তানকে বললেন, 'আমার নফস আমার মধ্যে আত্মগৌরব ও অহঙ্কার সৃষ্টির লক্ষ্যে ধোকা দিতে চাচ্ছিলো। তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্যই আমি এমন করছি'।

সুবিচারের অনুপম দৃষ্টান্ত

ইসলামী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রাঃ) যাঁকে দেখে খোদ শয়তানও ভয় পেতো। তাঁরই সন্তান আবু শাহমা মদ পানের অভিযোগে গ্রেফতার হলো। প্রতাপশালী রাষ্ট্রপতির সন্তানকে একজন সাধারণ আসামীর মতোই গ্রেফতার করা হলো। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতির প্রয়োজন বা রাষ্ট্রপতির অনুমতিরও প্রয়োজন হলো না। সাধারণ আসামীর অনুরূপ তাকেও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। আদালতে অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার পরে তার ওপরে দণ্ড আরোপ করা হলো ৮০ টি বেত্রাঘাত।

এই দণ্ড প্রয়োগ করার জন্য নির্দিষ্ট লোক ছিল। হযরত উমার (রাঃ) চিন্তা করলেন, দণ্ড কার্যকর সময় দণ্ড প্রয়োগকারীর মনে এই চিন্তার উদ্রেক হতে পারে যে, আসামী স্বয়ং খলীফার সন্তান। এ কারণে সে দণ্ড প্রদানে শিথিলতা প্রদর্শন করতে পারে। সাধারণ আসামীদের প্রতি যতটা শক্তি প্রয়োগ করে বেত্রাঘাত করা হয়, আসামী খলীফার সন্তান- সে জন্য ততটা শক্তি লোকটি প্রয়োগ না-ও করতে পারে। এই আশঙ্কায় খলীফা স্বয়ং দণ্ডকার্যকর করলেন। নিজের হাতে বেত্রাঘাত করতে থাকলেন কলিজার টুকরা সন্তানের দেহে। প্রতিটি আঘাতে দেহ থেকে রক্ত আর গোস্ত ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে, আদরের সন্তান 'আব্বা–আব্বা' বলে করুণ স্বরে আর্তনাদ করছে। পিতা খলীফার কর্ণ কুহরে সন্তানের সে আর্তনাদ প্রবেশ করছে না। কিয়ামতের ময়দানে মহান

আল্লাহর দরবারে জবাবদীহীর ভয়ে পিতা নিষ্ঠুর নির্মম হাতে সন্তানের দেহে একের পর এক আঘাত হেনেই যাচ্ছেন।

নির্মম আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এক সময় আপন কলিজার টুকরা সন্তানের করুণ আর্তনাদ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলো। পিতা দণ্ড পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিরত হলেন না। চোখের সামনে সন্তান নেতিয়ে পড়লো। আদরের সন্তান অপরাধের দণ্ড সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলো।

ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা হযরত উমার (রাঃ) বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক, সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে তাঁর নাম শোনামাত্র অপরাধীর কলিজা থর থর করে কেঁপে ওঠে। তাঁর শাসনাধীন সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি নাগরিক রাতে গভীর সুসুপ্তিতে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। অভাবহীন অবস্থায় নিরাপত্তার সাথে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। আর স্বয়ং খলীফা নির্ঘুম যামিনী অতিবাহিত করেন। কোনো একটি নাগরিকও যদি সামান্যতম অসুবিধা অনুভব করে, তাহলে তাঁকেই কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে কঠিন জবাবদীহী করতে হবে। তিনি দেশের অবস্থা জানার জন্য শুধু পর্যবেক্ষণ দলের রিপোর্টের ওপরই নির্ভর করেন না। স্বয়ং তিনি রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে দেশের নাগরিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে থাকেন। গভীর রাতে তিনি মদীনার এক এলাকা অতিক্রম করছিলেন। একটি বাড়ি থেকে গভীর রাতে কথাবার্তার মৃদু শব্দ তাঁর কানে প্রবেশ করলো। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। শুনতে পেলেন, মা তার মেয়েকে ডেকে বলছে, 'মা, দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করো, তাহলে অধিক পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে'। মেয়ে জবাবে বললো, 'এটা সম্ভব নয় মা। কারণ খলীফা আদেশ দিয়েছেন, দুধে কেউ পানি মেশাতে পারবে না'।

মা বললেন, 'খলীফা আদেশ দিয়েছে তো কি হয়েছে? এখানে তো আর কেউ দেখতে আসছে না'। মেয়ে মায়ের কথার প্রতিবাদ করে বললো, 'একজন মুসলমান হিসেবে খলীফার আদেশ অনুসরণ করা অবশ্যই উচিত মা। তা ছাড়া এখানে কেউ না দেখলেও তো মহান আল্লাহ দেখছেন। তাঁর চোখে কোনো কিছুই গোপন থাকবে না। আমি দুধে পানি মেশাতে পারবো না'। খলীফা স্বয়ং মা ও মেয়ের এসব কথোপকথন নিজ কানে শুনলেন এবং মেয়েটিকে পুরস্কৃত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। পরদিন সেই মা ও মেয়েকে তিনি ডেকে পাঠালেন। তারা ভয়কম্পিত পদে এসে খলীফার দরবারে উপস্থিত হলো। খলীফা নিজ সন্তানদেরকে ডেকে তাঁর

নিজের কানে শোনা মা ও মেয়ের কথোপকথন ছেলেদেরকে শুনিয়ে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে রাজী আছো এই মেয়েকে বধু হিসেবে বরণ করে নেয়ার জন্য। কারণ আমি এই মেয়ের তুলনায় তোমাদের জন্য আর উপযুক্ত পাত্রী দেখছি না'। খলীফার ছেলের সাথে মেয়েটির বিয়ে হলো।

আসামীর কাঠগড়ায় শাসকবৃন্দ

মিসরের গভর্ণর হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) এর সন্তান আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে খলীফার দরবারে অভিযোগ এলো, তিনি এক ব্যক্তিকে প্রহার করেছেন। খলীফা সেই প্রহৃত ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, 'তোমাকে তোমার দেহের যেখানে যতটা শক্তি প্রয়োগ করে যত বার আঘাত করা হয়েছে, এই চাবুক দিয়ে তুমিও গভর্ণরের সন্তান প্রহারকারী আব্দুল্লাহর দেহে সেই শক্তি প্রয়োগ করে আঘাত করো'। তাঁর আদেশ বাস্তবায়িত হলো। শুধু তাই নয়, স্বয়ং গভর্ণর হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলো যে, তিনি প্রভুত সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছেন।

খলীফা হযরত উমার (রাঃ) গভর্ণরের কাছে পত্রে লিখলেন, 'গভর্ণর হবার পূর্বে তো তোমার এত ধন-সম্পদ ছিল না। বর্তমানে এত সম্পদ কোত্থেকে এলো?' গভর্ণর পত্রের জবাবে খলীফাকে জানালেন, 'আমার এলাকা স্বর্ণপ্রস্ববিনী। আমি যা বেতন পাই তা থেকে অনেক উদ্বৃত্ত থাকে'। গভর্ণরের জবাবে খলীফা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে মুহাম্মদ ইবনে মুসলেমাকে গভর্ণরের সম্পদ পরীক্ষা করে দেখার জন্যে মিসরে প্রেরণ করলেন। সমস্ত সম্পদ হিসাবে করে গভর্ণর হবার পূর্বে তার যা সম্পদ ছিল, তার অতিরিক্ত সম্পদ তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করলেন, আর প্রতাপশালী গভর্ণর তা নীরবে অসহায়ের মতো প্রত্যক্ষ করলেন, প্রতিবাদের কোনো শব্দ তাঁর কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হলো না।

ইরাকের বসরার শাসনকর্তা হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে খলীফা হযরত উমার (রাঃ) এর কাছে অভিযোগ এলো, মুগিরার সাথে বসরার একজন নারীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি অভিযোগ শোনামাত্র তদন্ত দলের প্রধান হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন, 'এই মুহূর্তে বসরায় চলে যাও, সেখানে নাকি শয়তানের মজলিশ বসেছে। সেখানের শাসনকার্য কেমন চলছে দেখে এসো এবং শাসনকর্তা মুগিরাকে সাক্ষীসহ

আমার কাছে নিয়ে এসো'। যথারীতি তাঁর আদেশ পালিত হলো। বিচারে বসরার শাসনকর্তা নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। খলীফা হযরত উমার বসরার শাসনকর্তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার আদেশ দিতাম'।

হযরত মুগিরা (রা:) ছিলেন নবী করীম (সা:) এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহাবী। তিনি নীতি নির্ধারকদের একজন ছিলেন। সে সময় যে চারজন দক্ষ ও খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ ছিলেন, হযরত মুগিরা ছিলেন তাদেরই একজন। শুধু তাই নয়, তিনি একজন খ্যাতিমান সমরবিদ-জেনারেলও ছিলেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় বড় কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর এসব কৃতিত্ব, বড় দায়িত্ব, পদমর্যাদা ও খ্যাতি কোনটিই তাঁকে অভিযোগ থেকে রেহাই দিতে পারেনি। এরই নাম ইনসাফ এবং সুবিচার। একজন সাধারণ আসামীর অনুরূপ তাঁকেও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা:) এর শাসনামলে একজন ইয়াহুদী হযরত আলী (রা:) এর বিরুদ্ধে খলীফার দরবারে ফরিয়াদ করেছিল। ফরিয়াদীর বক্তব্য শোনার সময় খলীফা হযরত উমার (রা:) হযরত আলী (রা:) কে তাঁর নাম উল্লেখপূর্বক আহ্বান না জানিয়ে তাঁর ছেলের নাম জড়িত করে তাঁকে ডেকে বললেন, 'হে আবুল হাসান! (হে হাসানের পিতা) আপনি আপনার প্রতিপক্ষের পাশে আসন গ্রহণ করুন'।

হযরত আলী (রা:) প্রতিপক্ষের পাশে আসন গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর চেহারায় কেমন যেন এক অস্বস্তি ও সংকোচের ভাব ফুটে উঠলো। বিচার শেষে খলীফা উমার (রা:) হযরত আলী (রা:) এর দিকে স্মিতহাস্যে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, 'আপনাকে আপনার প্রতিপক্ষের সমান আসনে বসতে বলায় আপনি মনোক্ষুণ্ন হননি তো?'

হযরত আলী (রা:) জবাবে বললেন, 'না, বিষয়টি সেটা নয়। কিন্তু আপনি আমাকে আমার নাম উল্লেখ না করে আমার ছেলের নামের সাথে জড়িত করে আমাকে আহ্বান করলেন। এতে করে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। ফলে আপনি আমার ও আমার বিরুদ্ধে ফরিয়াদকারীর মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করেননি। এ কারণে আমার মনে এই আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল যে, ইয়াহুদী লোকটি হয়ত ধারণা করবে যে, মুসলমানদের নিরপেক্ষকা, সুবিচার, ইনসাফ, সমতা ও ন্যায়পরায়ণতা বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছে'।

শাসক ও শাসিতে নেই ভেদাভেদ

হযরত আলী (রা:) খেলাফতে আসীন। তিনি দেশের সাধারণ জনগণ ও নিজের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্যই সহ্য করতেন না। জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান এবং বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কিনা তা জানার জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংগ্রহকারীদের ওপর নির্ভর না করে স্বয়ং নিজে অনুসন্ধান করতেন। একদিন তিনি বাজারে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে একজন লোক খলীফাকে দেখে থেমে গেলো এবং তাঁর পেছনে পেছনে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলো। বিষয়টি খলীফার দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি লোকটিকে বললেন, 'আপনি আমার পাশে পাশে না হেঁটে পেছনে কেনো হেঁটে আসছেন?'

লোকটি জবাব দিলো, 'হে আমিরুল মুমেনীন! আপনি খলীফা, আপনার সম্মান ও মর্যাদার কারণেই আমি আপনার পেছনে পেছনে হাঁটছি'। হযরত আলী (রা:) লোকটিকে বললেন, 'উচ্চ পদে আসীন কোনো ব্যক্তিকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের এই পদ্ধতি ঠিক নয়। এই পদ্ধতি শাসকদের মনে অহঙ্কার সৃষ্টি করতে পারে এবং মুমিনদের জন্য চরম অপমানকর। এসো, আমার পাশে পাশে হাঁটবে'। এ কথা বলে তিনি লোকটিকে নিজের পাশে পাশে হাঁটতে বাধ্য করলেন।

খলীফা হযরত আলী (রা:) এর ঢাল সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে যাওয়ার সময় হারিয়ে গেল। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পরে সেই ঢালটি রাজধানীর জনৈক ইয়াহুদীর কাছে পাওয়া গেল। তিনি ইয়াহুদীর কাছে সেই বর্ম ফেরৎ চাইলেন। লোকটি জানালো এ ঢাল তারই। খলীফা নিশ্চিত যে, ইয়াহুদী মিথ্যা বলছে এবং সেটিই তার হারানো ঢাল। তিনি বিচারপতি শোরাইহের আদালতে ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে যিনি আসীন, তিনি মামলা দায়েরের পরিবর্তে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেই ইয়াহুদীর কাছ থেকে ঢালটি আদায় করতে পারতেন এবং ইয়াহুদীকেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি ইসলামের ইনসাফমূলক নীতি অনুসারে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি আদালতে উপস্থিত হলেন। অভিযুক্ত ইয়াহুদীও আদালতে উপস্থিত হলো।

আদালত কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান হিসাবে মামলার বাদী হযরত আলীর প্রতি সামান্যতম অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন না। রাষ্ট্রের সামান্য একজন নাগরিক হিসাবে আসামী ইয়াহুদীর প্রতিও আদালত যে আচরণ

করলো, হযরত আলীর প্রতিও সেই একই আচরণ করা হলো। বাদী স্বয়ং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতাপশালী খলীফা এ কারণে আদালত প্রাঙ্গনে তাঁর উপস্থিতির সাথে সাথে বিচারক তার আসন ত্যাগ করে রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন না। বসার জন্য মর্যাদাপূর্ণ আসনও তাঁর দিকে এগিয়ে দেয়া হলো না। অভিযুক্ত ইয়াহুদী যেভাবে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রইলো, বাদী রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানও সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিচারক দেখারও প্রয়োজন অনুভব করলেন না, কে বাদী আর কে আসামী। এর নামই হলো ইনসাফ।

বিচারক হযরত আলীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্বভাব সুলভ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যার বিরুদ্ধে ঢাল চুরির অভিযোগ করেছেন, সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিই যে আপনার ঢাল চুরি করেছে এবং ঢালটি যে আপনার তার প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?' হযরত আলী (রাঃ) বিনয়ের সাথে বললেন, 'আমার ভৃত্য এবং সন্তান হাসান এর সাক্ষী'। আদালত ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফার মামলা এ কথা বলে খারিজ করে দিলেন যে, 'পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়'।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে যে ব্যক্তি আসীন, সেই ব্যক্তি বিচারকের রায় মেনে নিয়ে নীরবে আদালত প্রাঙ্গন ত্যাগ করলেন। অভিযুক্ত ইয়াহুদী ইসলামের এই ইনসাফমূলক নীতি এবং ইসলামের অনুপম চারিত্রিক সৌন্দর্য অবলোকন করে ছুটে গিয়ে হযরত আলীর সামনে কান্না ভেজা কণ্ঠে নিজের দোষ স্বীকার করে বললো, 'যে ইসলামের বিধান এতটা ইনসাফমূলক এবং যে ইসলাম এমন নান্দনিক মানুষ তৈরী করেছে, আমি সেই ইসলাম গ্রহণ করলাম। ঢালটি আপনার, আমাকে ক্ষমা করে দিন'।

শহিদী মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের স্বাদ খুঁজে ফিরি

ইয়ারমুকে যুদ্ধের ময়দানে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রধান সেনাপতি মাহানের অধীনে কয়েক লক্ষ সৈন্য সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে মুসলিম শিবিরে সংবাদ প্রেরণ করা হলো, সেনাপতি মাহান মুসলিম দুতের সাথে কথা বলতে আগ্রহী। প্রধান সেনাপতি হযরত আবু উবাইদা (রাঃ) এর নির্দেশে হযরত খালিদ (রাঃ) একশত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নিরুদ্বিগ্নে কয়েক লক্ষ রোমক সৈন্যের ভেতর দিয়ে রোম সেনাপতি মাহানের তাঁবুতে উপস্থিত হলেন।

রোম সেনাপতি মাহান স্বর্ণ-রৌপ্য ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী দিয়ে তার দরবার সজ্জিত করেছিল। হযরত খালিদ জৌলুশপূর্ণ দরবার দেখে অনুধাবন করলেন, নিজেদের শান-শওকত প্রদর্শন করে এই লোকটি মুসলমানদের মানসিকভাবে দুর্বল করতে চায়। তিনি স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত বস্ত্রার আসনগুলো সরিয়ে রেখে সাথীদের নিয়ে মেঝেয় আসন গ্রহণ করলেন। রোম সেনাপতি মাহান যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য হযরত খালিদকে নানা ধরনের লোভ-লালসা দেখাতে থাকলো। তিনি সকল প্রলোভন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'হয় জিজিয়া দিতে হবে নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে'।

রোম সেনাপতি মাহান অহঙ্কার প্রদর্শন করে বললো, 'আমার প্রস্তাবে যখন তোমরা রাজি না, তাহলে তোমাদের সাথে আমাদের তরবারীই যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে'।

হযরত খালিদও অহঙ্কারীর চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'যুদ্ধের আকাংখা তোমাদের থেকে আমাদেরই বেশী। কারণ আমরা নিহত হলে হবো শহীদ আর জীবিত থাকলে হবো গাজী। আমরা আল্লাহর রহমতে অবশ্যই তোমাদেরকে পরাজিত করবো এবং বন্দী করে আমাদের খলীফার দরবারে হাজির করবো'।

হযরত খালিদের কথাগুলো যেন রোম সেনাপতি মাহানের শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দিলো। লোকটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললো, 'তোমরা তাকিয়ে দেখো, এখনই তোমাদের পাঁচজনকে আমি হত্যার আদেশ দিচ্ছি'।

হযরত খালিদ সিংহ বিক্রমে গর্জন করে উঠলেন, 'তুমি আমাদেরকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছো? অথচ শহিদী মৃত্যুকে আমরা খুঁজে বেড়াই। ঈমানদারের জীবন মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয়। কিন্তু তুমিও শুনে রাখো, আমাদের কোনো একজন লোকের শরীরেও যদি তুমি হাত উঠাও, তাহলে তোমাকেসহ তোমার প্রতিটি সৈন্যকে আমরা হত্যা করবো। সংখ্যাধিক্যের পরোয়া আমরা করি না'।

হযরত খালিদের নির্ভীক কণ্ঠ শুনে রোম সেনাপতি কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো। বিস্ময় ঘোর কেটে যেতেই সে তরবারী বের করার প্রস্তুতি নিতেই হযরত খালিদ চোখের পলকে ছুটে গিয়ে তার বুকে তরবারীর অগ্রভাগ ঠেকিয়ে গর্জন করে উঠলেন, 'সাবধান! তোমার প্রতিটি লোককে অস্ত্র ফেলে দিতে বলো, কেউ যেন বাধা দিতে না আসে সে নির্দেশ দাও। তা না হলে

এখানে রক্তাক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে'। অহঙ্কারী জালিম ভীতগ্রস্ত হয়ে নিজ সৈন্যদেরকে অস্ত্র ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিতে বাধ্য হলো। হযরত খালিদ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে অগণিত রোমক সৈন্যদের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের শিবিরে ফিরে এলেন। ঈমানদার মুসলিমরা অহঙ্কারী জালিমদের গর্বিত মস্তক এভাবেই ধূলায় মিশিয়ে দেয়।

দামেস্ক নগরী তখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অধীনে। তার প্রধান সেনাপতি ক্লিভাস অগণিত সৈন্য নিয়ে দামেস্কের দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থান করছে। লোকটি অগণিত সৈন্য সংখ্যার অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। লোকটির ধারণা কয়েক মুহূর্তের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী তৃণবৎ উড়ে যাবে। সে সময়ের প্রথানুসারে সেনাপতি ক্লিভাস মুসলিম শিবিরে সংবাদ প্রেরণ করলো, তিনি মুসলিম সেনাপতির সাথে কথা বলতে আগ্রহী। হযরত খালিদ সাথীদের নিয়ে সেনাপতি ক্লিভাসের সাথে কথা বলতে গেলেন। ক্লিভাস তার দোভাষী জারজিসের মাধ্যমে হযরত খালিদকে ভীতি প্রদর্শন শুরু করলো।

দোভাষীর কথা শুনে পৃথিবীর বিস্ময়কর জেনারেল আল্লাহর তরবারী হযরত খালিদ (রা:) সংকোচহীন কণ্ঠে রোম সেনাপতি ক্লিভাসের অহঙ্কারে মদমত্ত চোখে চোখ রেখে দোভাষী জারজিসকে বললেন, 'আমি সেই মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের এই বিশাল বাহিনীকে আমরা সেসব ক্ষুদ্র পাখির ঝাঁকের সাথেই তুলনা করি, শিকারীরা যাদেরকে জাল পেতে ধরে খায়। শিকারী কখনো পাখির বিশাল ঝাঁক দেখে ভয় পায় না, বরং আনন্দিত হয় এবং পাখির বিশাল ঝাঁককে চারদিকে জাল বিছিয়ে অতি সহজেই ধরে। হে জারজিস! তুমি শুনে রাখো, আমরা আল্লাহর পথে জিহাদে নেমেছি। যুদ্ধের ময়দানে নিহত হওয়াকে আমরা আল্লাহর নিয়ামত হিসাবে গণ্য করি। সেই নিয়ামতের জন্য আমরা কতটা ব্যাকুল তা একটু পরেই তোমরা নিজের চোখে দেখতে পাবে। আমরা শহিদী মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের স্বাদ খুঁজে ফিরি। শহীদ হওয়ার সিদ্ধান্ত যারা গ্রহণ করেছে, বেঁচে থাকা তাদের কাছে অর্থহীন। তুমি তোমার সেনাপতি ও সম্রাটকে আমার কথাগুলো জানিয়ে দাও'।

মুসলিম সত্য প্রকাশে নির্ভীক

ঈমানদার মুসলিম কখনো জালিমের সামনে সত্য কথা বলতে ভয় পায় না। জালিমের সামনে সে কখনো নিজের আদর্শে পরিবর্তনও আনে না। মোগল সম্রাট আকবরের সন্তান জাহাঙ্গীর তখন সিংহাসনে। একদিন তিনি আল্লাহর

কোরআনের সিপাহ্সালার হযরত শায়খ আহ্মদ সরহিন্দী- যিনি মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী (রাহঃ) নামে পরিচিত, তাঁকে তার দরবারে ডেকে পাঠালেন। দ্বীনে ইলাহির প্রবর্তক সম্রাট আকবর প্রথা চালু করেছিলো, সম্রাটের সামনে মাথানত করে অর্থাৎ সিজ্দার ভঙ্গিতে কুর্ণিশ জানাতে হবে। সেই প্রথা তখন পর্যন্ত বলবৎ ছিল। মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী দরবারে আগমন করে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী সালাম জানালেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর আল-ফেসানী (রাহঃ) এর এই আচরণ দেখে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আপনার সাহস তো কম নয়? আপনি দরবারের বিধি অনুসারে মাথানত করে কুর্ণিশ করলেন না, সালাম জানালেন। কেনো আপনি দরবারের বিধি লংঘন করলেন?'

স্মিতহাস্যে নির্ভীক কণ্ঠে আল্লাহর সৈনিক হযরত মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী উত্তর দিলেন, 'হে সম্রাট! যে মাথা প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার সকল সম্রাটের সম্রাট আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে নত হয়, সেই মাথা পৃথিবীর কারো সামনে নত হতে পারে না- তা তিনি যত বড় শক্তিশালীই হোন না কেনো'।

এরই নাম ঈমান এবং ঈমান এভাবেই নির্ভীক কণ্ঠে অন্যায় আর জুলুমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে তারা সত্য প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। সুলতান আলাউদ্দিন খালজী তাঁর প্রধান বিচারপতিকে দরবারে ডেকে আনলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারীদেরকে হাত-পা কেটে বিকলাঙ্গ করে শাস্তি দেয়া বৈধ কিনা'। বিচারপতি জানিয়ে দিলেন, 'না, এভাবে শাস্তি দেয়া আল্লাহ হারাম করেছেন'। সুলতান তার প্রধান বিচারপতির ওপরে অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি পুনরায় তাকে প্রশ্ন করলেন, 'দেবগিরি থেকে আমি যে ধন-সম্পদ পেয়েছি, তা আমার না জনগণের প্রাপ্য?'

প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'মুসলিম সৈন্যবল দিয়ে তা অর্জন করা হয়েছে। সে সম্পদ আপনার প্রাপ্য হতে পারে না। আপনি তা অবিলম্বে জনগণের কোষাগারে জমা দিয়ে দিন'।

সুলতান আলাউদ্দিন খালজী নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করলেন, 'জনগণের কোষাগারে আমার ও আমার আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকার কি পরিমাণ?'

নির্ভীক কণ্ঠে বিচারপতি জানালেন, 'একজন সাধারণ সৈনিকের যতটুকু অংশ, ঠিক অনুরূপ অংশই আপনার ও আপনার আত্মীয়-স্বজনের। আপনি নিজের

ইচ্ছানুসারে জনগণের সম্পদ ব্যয় করতে পারেন না। যদি করেন তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে আপনাকে জবাবদীহী করতে হবে'।

জবাব শুনে সুলতান গর্জন করে উঠলেন এবং বিচারপতিকে চরম শাস্তি দিবেন বলে হুমকি দিলেন। ভয়হীন চিত্তে মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে বিচারপতি সুলতানকে জানিয়ে দিলেন, 'আপনি আমাকে ফাঁসিই দিন বা আপনার ইচ্ছানুসারে যে কোনো শাস্তিই দিন না কেনো, যা সত্য আমি তা প্রকাশ করবোই'। সুলতান আলাউদ্দিন খালজীর সত্য গ্রহণ ও সত্য শোনার সৎসাহস ছিল, তিনি বিচারপতির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার অনুপম দৃষ্টান্ত

বলখের সুলতান আযীয খানের সাথে মোগল সম্রাট শাহাজানের ঘটনাক্রমে যুদ্ধ বেধে গেলো। আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিমে এক পর্বতময় মালভূমি-যা বলখ ও বাদাখশানের সীমান্ত সন্নিহিত একটি স্থান। মুসলমানের সাথে মুসলমানের যুদ্ধ- ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ। মোগল বাহিনী পরিচালিত করছেন মোগল শাহজাদা আওরঙ্গজেব। অপরদিকে বলখের সুলতান আযীন খান স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করছেন।

প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে- যুহরের নামাযের ওয়াক্ত সমাগত। আওরঙ্গজেব যুদ্ধসাজে সজ্জিত। চেহারায় হতাশার কোনো চিহ্ন নেই। মহান আল্লাহর প্রতি আশাবাদের দৃঢ় প্রত্যয় চেহারা থেকে দ্যুতি বিকিরণ করছে। তিনি মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দেখলেন সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে। আপন রব মহান আল্লাহর গোলামীর স্বীকৃতি দেয়ার অপরিহার্য কর্তব্যের চিহ্ন তাঁর চেহারায় প্রস্ফুটিত হলো। সাথে সাথে তিনি হাতের অস্ত্র যমীনের দিকে ছুড়ে দিলেন। ঘোড়া থেকে নির্ভীক চিত্তে অবতরণ করে কমরবন্ধ খুলে যমীনে রেখে দিয়ে কেবলা মুখী হয়ে মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সিজদা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

চারদিকে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। বৃষ্টির মতোই মারণাস্ত্র ছুটে আসছে। যে কোনো মুহূর্তে শত্রুপক্ষের অস্ত্র তাঁর বক্ষ ভেদ করে যেতে পারে। তাঁর চেহারায় ভীতির কোনো চিহ্ন নেই। তিনি আল্লাহর গোলাম এবং এই গোলামীর স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে নামায আদায় করতে হবে। যে আল্লাহকে তিনি সিজ্‌দা দিচ্ছেন, সেই আল্লাহর প্রতিই তাঁর নির্ভরতা। তিনিই তাঁকে হেফাজত করবেন। গভীর মনোযোগের সাথে তিনি যুহরের নামায আদায়

করছেন এমন এক স্থানে, যার দিকে প্রাণ সংহারী মারণাস্ত্র বাতাসে শীস কেটে ছুটে যাচ্ছে। আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন–

আগিয়া আয়ন লড়াইমে আগার ওয়াক্তে নামাজ

কেবলা রু হোকে জমিঁ বাছ হুয়ি কাউমে হিজাজ।

ভীষণ যুদ্ধের সময়ও নামাজের সময় হলে হেজাজের বীর সন্তানগণ সবাই কা'বামুখী হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতো।

প্রতিপক্ষ আব্দুল আযীন খানের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান মোগল শাহজাদা আওরঙ্গজেবের প্রতি। হৃদয় তার মোচড় দিয়ে উঠলো, তিনি কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন! তিনি এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমতের ওপর গভীরভাবে আস্থাশীল। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি এতটা আশাবাদী, তার সাথে যুদ্ধ করে কোনোভাবেই বিজয়ী হওয়া যাবে না। সাথে সাথে তিনি চিৎকার করে তার বাহিনীকে আদেশ দিলেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। ঈমানদার এভাবেই সর্বাবস্থায় মহান আল্লার প্রতি আশাবাদী হবে, দুশ্চিন্তা মুক্ত থেকে নিজ কর্তব্য পালন করে যাবে এবং এটাই ঈমানের দাবি।

প্রকৃত ঈমানদার কখনো হতাশ হয় না। ভয়ঙ্কর বিপদের সময়েও তারা মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে শঙ্কামুক্ত মনে নিজের কর্তব্য স্থির করেন। সে সময় স্পেন ছিল মুসলিম শাসক হাকামের শাসনের অধীনে। অমুসলিম শক্তির উস্কানিতে কর্ডোভায় বিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহীরা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতোই রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছিল। হাকাম ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে আদেশ দিলেন বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করার জন্য। তাঁর প্রেরিত বাহিনী বিদ্রোহীদের প্রবল আক্রমণের মুখে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে রাজধানীতে ফিরে এলো। তাদের পেছনে বিদ্রোহী দলও রাজধানী দখল করার জন্য ছুটে আসছে। হাকামের দেহরক্ষী দল আতঙ্কিত হয়ে পড়লো, কিন্তু আতঙ্ক নেই স্বয়ং হাকামের চেহারায়। চারদিকে প্রচণ্ড আতঙ্ক আর ভীতি কিন্তু তিনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর নির্ভর করে স্থির চিত্তে নিজের কর্তব্য কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি তার মন্ত্রী পরিষদের সামনেই নিজেকে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত করে পোষাক ও দাড়ি-চুলে সুগন্ধি মাখছেন। মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্য প্রবল আতঙ্কের মধ্যে শাসক হাকামের এই নির্লিপ্ত ভাব দেখে অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ সহচর নিজেকে আর স্থির

রাখতে পারলো না। সে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললো, 'জাহাঁপনা! আমার বেয়াদবি আপনি ক্ষমা করবেন। নিজেকে সজ্জিত করার আর সুগন্ধচর্চিত করার এক আশ্চর্য সময় আপনি বেছে নিয়েছেন। চারদিকে বিপদের ঘনঘটা, শত্রুপক্ষ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ছুটে আসছে। একটু পরেই আমরা সবাই নিহত হবো, আমাদের প্রাসাদসমূহ লুণ্ঠিত হবে। আর আপনি নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে সজ্জিত করছেন?'

শাসক হাকামের মুখে মৃদু্য হাসি দেখা দিলো। তিনি শান্ত কণ্ঠে তার সহচরকে বললেন, 'তুমি একটি বোকা, আমি যদি নিজেকে ভিন্ন পোষাকে সজ্জিত না করি এবং আমার দেহ থেকে সুগন্ধ না ছড়ায়, তাহলে বিদ্রোহীরা অগণিত মানুষের ভেতর থেকে আমাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করবে কেমন করে?'

এরপর তিনি ধির স্থিরভাবে নিজেকে অস্ত্রে সজ্জিত করে নিজের সেনাবাহিনী পরিদর্শন করে মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করে বাহিনী সাথে নিয়ে বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করলেন। মহান আল্লাহর অসীম রহমতে বিদ্রোহীরা পরাজিত হলো, মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার বাস্তব ফলাফল স্পেন শাসক হাকাম নগদ লাভ করলেন।

ন্যায় পরায়ণ সম্রাট মাহ্মুদ

সম্রাট মাহ্মুদের দরবারে একজন লোক এসে সম্রাটের আপন ভাইয়ের যুবক ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো যে, সম্রাটের ভাতিজা প্রায় রাতেই তার বাড়িতে গিয়ে তাকে প্রহার করে ঘর থেকে বের করে দিয়ে তার সুন্দরী স্ত্রীর ওপর অত্যাচার চালায়। অভিযোগ শোনা মাত্র সম্রাট চম্‌কে উঠলেন। অশ্রুধারায় তার চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। তিনি অভিযোগকারীকে বললেন, 'আমার ভাতিজা আবার যখন তোমার বাড়িতে যাবে, তখনই তুমি এসে আমাকে জানাবে'। লোকটি চলে গেলো এবং তিনদিন পরে সে এক রাতে ছুটে এসে সম্রাটকে জানালো, তাঁর ভাতিজা হীন উদ্দেশ্যে পুনরায় তার বাড়িতে প্রবেশ করেছে।

সম্রাট একাই দ্রুত লোকটির সাথে সেখানে পৌছালেন। তিনি দেখলেন, একজন যুবক অভিযোগকারী লোকটির স্ত্রীর বিছানায় শায়িত। সম্রাট লোকটিকে বললেন আলো নিভিয়ে দেয়ার জন্য। লোকটি আলো নিভিয়ে দেয়ার সাথে সাথে সম্রাট স্বয়ং ঘরে প্রবেশ করে বিছানায় শায়িত যুবকটির

মাথা তরবারীর আঘাতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। তারপর তিনি পুনরায় আলো জ্বালাতে বললেন, লোকটি আলো জ্বালানোর পরে সম্রাট আল্লাহর শোকর আদায় করে লোকটির কাছে পান করার জন্য পানি চাইলেন। লোকটি অবাক বিস্ময়ে সম্রাটের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। এবার সে জানতে চাইলো, সম্রাট কেনোই বা আলো নিভিয়ে দিতে বললেন এবং অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে পানি পান করলেন কেনো।

সম্রাট মাহমুদ বললেন, 'আমার ভাতিজাকে আমি অত্যধিক স্নেহ করতাম। আমার ভয় হচ্ছিলো, আলো জ্বালানো থাকলে তার চেহারার ওপরে আমার দৃষ্টি পড়লে মমতার কারণে আমি বোধহয় অপরাধীকে শাস্তি দিতে অপারগ হতাম এবং তোমার সাথে ইনসাফ করতে পারতাম না। এ কারণে আমি তোমাকে আলো নিভিয়ে দিতে বলেছিলাম। আর তুমি যেদিন আমার কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলে, আমি প্রতীজ্ঞা করেছিলাম অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে কোনো কিছু আহার করবো না। তিনদিন যাবৎ আমি অনাহারে রয়েছি। এ কারণে আমি শাস্তি দিয়েই তোমার কাছে পান করার জন্য পানি চেয়েছিলাম'। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ওপর ঈমানই সম্রাট মাহ্মুদকে এভাবে স্বজন প্রীতির উর্ধ্বে উঠিয়ে দেশের একজন সাধারণ প্রজার প্রতি ইনসাফ করতে বাধ্য করেছিল।

সততা স্বচ্ছতার বিজয়

ভারত বর্ষে ইংরেজ শাসনামলের প্রথম দিকের ঘটনা। মুজাফ্ফর নগর জেলার কান্দেহালা নামক এক স্থানে একটি ছোট্ট ভূ-খণ্ড নিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা বাধার উপক্রম হলো। হিন্দুদের দাবি হলো, স্থানটি তাদের মন্দিরের। আর মুসলমানদের দাবি হলো, স্থানটি তাদের মসজিদের। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালো। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর কয়েকজন মুসলমানকে একান্তে ডেকে তাদের কাছে জানতে চাইলেন, হিন্দুদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি কি রয়েছে, যে ব্যক্তি আপনাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য, যার সততার প্রতি আপনাদের আস্থা রয়েছে এবং তিনি যা সিদ্ধান্ত দিবেন তা আপনারা মেনে নিবেন?

মুসলমানরা স্পষ্ট জানিয়ে দিলো, হিন্দুদের মধ্যে তাদের দৃষ্টিতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার সততার প্রতি তারা আস্থা রাখতে পারে। এরপর ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কয়েকজন হিন্দু নেতৃবৃন্দকে একান্তে ডেকে বললেন, বিষয়টি

সাম্প্রদায়ীক স্বার্থের সাথে জড়িত। সিদ্ধান্তে সামান্য ভুল হলেই সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। তোমাদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি কি রয়েছে, যার প্রতি তোমরা আস্থা রাখতে পারো এবং তিনি সত্য কথা বলবেন বলে তোমরা মনে করো?

হিন্দুরা জানালো, এমন একজন ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তিনি তো কোনো ইংরেজের মুখ দর্শন করেন না। সুতরাং তিনি আপনার সামনে এসে কোনো সিদ্ধান্ত দিবেন বলে মনে হয় না।

এই ঈমানদার লোকটি ছিলেন হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয দেহলভী (রাহ:) এর অন্যতম অনুসারী বালাকোটের শহীদ ইসলামী আন্দোলনের সিপাহ্সালার সাইয়েদ আহ্মদ ব্রেলভী শহীদ (রাহ:) এর খলীফা হযরত মুফতী ইলাহী বখ্শ (রাহ:) এর বংশের একজন। তাঁকে ইংরেজ বিচারক ডেকে পাঠালেন কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, যে ইংরেজরা মুসলমানদের সর্বনাশ করেছে, আমি তাদের মুখ দর্শন করবো না বলে শপথ করেছি।

ইংরেজ বিচারক খবর পাঠালো, আমাদের মুখ দেখার প্রয়োজন নেই। আপনি এসে শুধু একটি সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিন। আপনার সিদ্ধান্তের ওপরে সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতি নির্ভর করছে। আপনি অনুগ্রহ করে আসুন।

অবশেষে তিনি আদালতে উপস্থিত হয়ে ইংরেজ বিচারকের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিচারক তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, অমুক জায়গা সম্পর্কে মুসলমানরা দাবি করছে যে, সেটা তাদের মসজিদের স্থান আর হিন্দুরা দাবি করছে যে, সেটা তাদের মন্দিরের স্থান। আমি শুনেছি, উক্ত স্থানটির প্রকৃত মালিকানা কার, সে সম্পর্কে আপনি অবগত রয়েছেন। এখন আপনি সিদ্ধান্ত দিন, স্থানটি হিন্দুদের না মুসলমানদের।

হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজনের দৃষ্টি সেই ঈমানদার ব্যক্তিটির প্রতি নিবদ্ধ। তিনি কি বলেন, তা জানার জন্য সবাই উদ্গ্রীব। তিনি পিন্ পতন নীরবতার মধ্যে ঘোষণা করলেন, প্রকৃতপক্ষে স্থানটি হিন্দুদের। এই স্থানের সাথে মুসলমানদের দূরতম সম্পর্কও নেই। স্থানটি হিন্দুরেই প্রাপ্য।

তাঁর কথার ওপরে নির্ভর করে বিচারক হিন্দুদের পক্ষে রায় দিলো। মুসলমানরা মনোক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে গেলো আর হিন্দুদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো। মামলায় মুসলমানরা পরাজিত হলো বটে, কিন্তু সেখানে ইসলামের নৈতিক বিজয় সূচিত হলো। ইসলামী চরিত্র হিন্দুদের মন-মস্তিষ্ক

জয় করে নিলো। তাঁর সততার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেদিনই বহু হিন্দু সেই ঈমানদার ব্যক্তির হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করলো। সামান্য কয়েক হাত মাটি হারিয়ে ইসলাম অসংখ্য অমুসলিমের হৃদয়-মন এভাবেই জয় করেছিলো। ঈমান এভাবেই নিজের স্বার্থের মোকাবেলায় সততাকে অক্ষুণ্ন রাখতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

মানবজাতির ওপর নন্দিত জাতির প্রভাব

পৃথিবীতে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি বিকশিত হবার পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের অবস্থা ছিলো বড়ই করুণ। অন্যান্য জাতির অধিকাংশ মানুষ নীতি ও নৈতিকতার সাথে পরিচিত ছিলো না। বৈধ অবৈধের সীমারেখা জানা ছিলো না। পাক পবিত্রতার ধারণাও তাদের ছিলো না। মানুষ হিসেবে আরেকজন মানুষের প্রতি দায়িত্ব, পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ জাতিই ছিলো অন্ধকারে। জ্ঞানচর্চার সুত্রগুলোও তাদের কাছে অজানা অচেনা ছিলো। মানবাধিকার ও নারীর অধিকার এবং নারীর মর্যাদা সম্পর্কে তারা ক্ষেত্র বিশেষে অন্ধকারে ছিলো আবার ক্ষেত্র বিশেষে বাড়াবাড়ির চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো। বিয়ে ও পরিবার সম্পর্কে কোথাও নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত ছিলো, আবার কোথাও ইতিবাচক ধারণা প্রচলিত থাকলেও স্ত্রীর নূন্যতম অধিকারও স্বীকার করতো না। মানবীয় সুকুমার বৃত্তিসমূহ বিকশিত হবার কোনো পরিবেশ কোথাও ছিলো না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী মানবতা অধঃপতন ও অবনতির দিকে ধাবিত হয়ে ধ্বংসের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছিলো।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তার পরিপূর্ণ রূপসহ আবির্ভাব এবং ইসলামের নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছিলো সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সমাজনীতির পরিমণ্ডলে এক সম্পূর্ণ নতুন অবস্থা। মদীনায় নগরভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে নন্দিত মিল্লাত মুসলিমদের উত্থানে সমগ্র আরব ভূখণ্ডের সভ্যতার গতিধারায় পরিবর্তন সূচীত হয় এবং এ পরিবর্তনের বাতাস পাশ্চাত্যের দেশসমূহেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। সর্বোন্নত আদর্শভিত্তিক দল মুসলিমদের উত্থানে জাহিলিয়াত তথা মানব রচিত জীবন ব্যবস্থাসমূহ এক কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়। এ প্রতিযোগিতার একদিকে ছিলো এমন একটি অভ্রান্ত যুক্তিভিত্তিক, বুদ্ধিগ্রাহ্য, কল্যাণকর ও পালনোপযোগী জীবন ব্যবস্থা, অপরদিকে ছিলো

জুলুম ও শোষণমূলক, কষ্টকল্পনা নির্ভর মানবরচিত মতবাদসমূহ। মুসলিমদের উত্থানে ক্রমশঃ ভ্রান্ত মতবাদসমূহের অন্তর্নিহিত ভুলত্রুটি ও দুবর্লতাসমূহ সকল শ্রেণীর মানুষের সম্মুখে দৃশ্যমান হয়ে উঠছিলো। প্রতিভাত হয়ে উঠছিলো এর অসারতাসমূহ।

কারণ মুসলিমদের জীবন বিধানের ভিত্তি ছিলো ওহীভিত্তিক, অনড় অটল এবং এর মূলনীতিসমূহ অপরিবর্তনীয়। মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, একমাত্র তিনি ও তাঁর রাসূলের প্রতি সর্বাঙ্গিন আনুগত্য, আল্লাহভীতি, সজাগ সচেতনতা এবং বিশ্বস্ততা এ জীবন বিধানের সকল রীতিনীতি ও বিধিমালায় সক্রিয়। এ জীবন বিধানের বৃত্ত ও পরিধির মধ্যে মানুষে মানুষে সাম্য ছিলো এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের একমাত্র মানদণ্ড ছিলো সর্বোন্নত চরিত্র। মুসলিম দলের প্রত্যেক সদস্যের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো আখিরাত, আর এ কারণেই তাদের স্বভাব চরিত্রে ছিলো গভীর প্রশান্তি আর হৃদয়ে ছিলো পরিতুষ্টি। জীবন ধারণে পার্থিব প্রয়োজন নিয়ে তাদের মধ্যে কোনে প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো না।

অন্যদিকে মানবরচিত ব্যবস্থাসমূহের আওতাধীনে সকল কিছুই ছিলো বিশৃঙ্খল, গোলযোগপূর্ণ এবং সংঘাতমুখর অস্থিরতা। সবল শক্তিমানরা দুর্বলদের গ্রাস করতো। তারা নিজেদের আরাম- আয়েশ ও ভোগবিলাসের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো এবং অন্যের অধিকার হরণে সমগ্র পৃথিবীকে এক রক্তক্ষয়ী রণক্ষেত্রে পরিণত করেছিলো। এ অবস্থায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তার শাসনাধীন সকল মানুষের প্রতি একই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতো এবং শক্তিমানের কাছ থেকে দুর্বলের অধিকার আদায় করে দিতো। মানুষ তার ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে যেমন যোগ্যতানুযায়ী নিরাপত্তার আয়োজন করে, ইসলামের নন্দিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাও সকল শ্রেণীর মানুষের ধন-সম্পদ, প্রাণ, ইজ্জত-আবরু এবং নৈতিক চরিত্র রক্ষায় দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো। নবী করীম (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগে সকল পর্যায়ের শাসকবৃন্দ ছিলেন সর্বোত্তম গুণাবলীতে বিভূষিত। আরেম আয়েশ ও ভোগবিলাসের সকল উপকরণ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও সহজলভ্য হবার পরও তাঁরা নিজেদের যে কোনো অনাধিকার চর্চা থেকে বিরত রেখেছেন এবং মহান আল্লাহর কাছে জবাবদীহীর ভয়ে সর্বক্ষণিক আতঙ্কিত থেকেছেন। মুসলিমদের এ উন্নত অবস্থা দেখে নিজেদের শাসকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে দুনিয়ার নিপীড়িত জাতিসমূহের মনে ক্ষোভের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো।

নন্দিত মিল্লাত মুসলিমদের বিপরীতে মানবরচিত জীবন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রতিষ্ঠিত ছিলো ভোগবিলাস ও জুলুম নির্যাতন নিপীড়নের অবাধ রাজত্ব। নিজেদের আরাম আয়েশের পথ নিষ্কণ্টক করতে শাসকশ্রেণী ও তাদের কর্মকর্তাবৃন্দ সাধারণ নাগরিকদের সহায়- সম্পদ আত্মসাৎ করতে গিয়ে চরম জুলুম নির্যাতনের আশ্রয় নিতো। সরকারী কর্মকর্তাগণ দেশের নাগরিকদের সম্ভ্রমহানী ঘটাতে, সম্পদ ছিনিয়ে নিতে, নারীর সতীত্বহানীতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে রক্তাক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো এবং জনগণের সম্মুখে নিজেদের অসৎ চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনগণেরও চরিত্র হনন করতো। মানবরচিত মতবাদভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতাধীনে সবথেকে নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী ছিলো দেশের শাসকবৃন্দ ও সরকারী কর্মকর্তাগণ। তাদের জীবনধারা ছিলো জৌলুশ ও আড়ম্বরপূর্ণ। নানা ধরনের পশুপ্রাণী তারা পরম যত্নে প্রতিপালিত করলেও দেশের মানুষ ছিলো ক্ষুধার্ত। মণি মুক্তা স্বর্ণখচিত মহামূল্যবান পোশাকে নিজেদের দেহ আবৃত রাখলেও দেশের মানুষ অভাবের তাড়নায় নগ্ন থাকতে বাধ্য হত।

জুলুম নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার, শোষণ, অভাব, অধিকারহরণ ইত্যাদিতে জর্জরিত পৃথিবীর বৃহৎ এই শ্রেণীর মানুষের সম্মুখে মুসলিমদের জীবনাদর্শ ও নিজ দেশের শাসক ও ধনিকশ্রেণীর জীবনাচারে পার্থক্য দেখে তারা কল্যাণ ও অকল্যাণমূলক ব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা অঙ্কন করেছিলো। আর ঠিক এসব কারণেই পূর্ব প্রতিষ্ঠিত মানবরচিত জাহিলি ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কোনো কারণই তাদের কাছে আর অবশিষ্ট ছিলো না। মহাকল্যাণের নন্দিত আদর্শ ইসলাম গ্রহণের পথেও তাদের সম্মুখে আর কোনো বাধা ছিলো না। কারণ তাদের কাছে প্রাণ ব্যতীত হারানোর আর কিছুই ছিলো না। আর তাদের এ প্রাণটিও ছিলো দেশের শাসকমণ্ডলীর মুষ্ঠিতে। শাসকবৃন্দ কর্তৃক নিজেদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করলে অথবা শোষণমূলক অতিরিক্ত করের বোঝা বহনে অপারগতা প্রকাশ করলেই রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে জনগণের অভাব ও রোগাক্লিষ্ট দেহ ছিন্নভিন্ন করতো। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা প্রাণের মমতাও বিসর্জন দিয়েছিলো। এভাবেই মুসলিম মিল্লাত দেশে শোষিত মানুষগুলোর ওপর এক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

মানবরচিত আইন কানুনে শাসিত বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষগুলো ইসলাম গ্রহণ করে সর্বপ্রথম নগদ যে লাভের সন্ধান তারা পেয়েছিলো, তা ছিলো ঈমান। ঈমানের অপূর্ব অভূতপূর্ব স্বাদ তাদের হৃদয় থেকে যাবতীয় অস্থিরতা দূরীভূত

করেছিলো এবং তাদের বিশৃঙ্খল চিন্তাসমূহ এককেন্দ্রিক করে জীবনকে করেছিলো প্রবলভাবে আখেরাতমুখী। প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে তাঁরা সকল ব্যাপারে একমাত্র মহান আল্লাহর প্রতিই নির্ভর করার আত্ম প্রত্যয় অর্জন করেছিলো। ইসলাম তাদের মধ্যে সুপ্ত ও মৃতপ্রায় শক্তি-সামর্থ্য, বলবীর্য ও বীরত্বে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিলো। সেই সাথে তাঁরা নিজেদেরকে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও নিরাপত্তা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখছিলো। অথচ ইতোপূর্বে রাষ্ট্র কর্তৃক খুব্‌লে খাওয়ার অভিজ্ঞতাও তাদের ছিলো। নিজেদের চারদিকে তাঁরা এমন আদর্শিক বন্ধু, ভাইবোন ও সাহায্যকারীর দল পেয়েছিলো, যাঁরা তাদের জন্যে প্রয়োজনে নিজের ধন-সম্পদ ও প্রাণ বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলো। ফলে এক সময়ের শোষিত নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষগুলো ইসলামী জীবন বিধানের সার্বিক কল্যাণকর রূপ দেখে নিজেরাই এ নন্দিত আদর্শ প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিলো।

ক্রমশঃ মানবরচিত মতবাদ তথা জাহিলিয়াত সঙ্কুচিত হতে থাকলো এবং ইসলামী সাম্রাজ্য থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হলো। যারা ছিলো জাহিলিয়াতের বাস্তব প্রতীভূ, তারা নন্দিত আদর্শের সাগরে অবগাহন করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করলো। মুসলিম উম্মাহ্‌র উত্থানের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ছিলো সুদূর প্রসারী। এ উম্মাহর উত্থান মানবেতিহাসে প্রবল বজ্র নিনাদ ও প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের ন্যায় ছিলো, যা মানবরচিত আইন কানুন ও এর রক্ষাকারী শোষক শ্রেণী কর্তৃক প্রবর্তিত সকল প্রকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়েছিলো। এক সময় যে পরিবেশ মহান আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো, সেই পরিবেশ ইসলামের রঙে রঙিন হয়ে ইসলামের বিপরীত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিলো। যেখানে প্রকাশ্যে গর্বিত ভঙ্গীতে পাপাচার, অশালীন অশ্লীল, অনাচার ও নগ্নতার দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো হতো, সেখানে গোপন ও নির্জনেও গর্হিত কর্মকাণ্ড করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

ইসলামের বিঘোষিত নীতি 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' বাস্তবায়নে মুসলিম মিল্লাত প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থ্য অর্জন করার পরে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে গর্হিত কাজের প্রতি প্রবল ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হলো। মানুষের স্বভাব-চরিত্রে কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতা ও কোমলতা সৃষ্টি হলো। আত্মসাতের প্রবণতার স্থলে আত্ম ত্যাগের প্রবণতা জাগলো এবং অপরের অধিকার খর্ব করার পরিবর্তে সংরক্ষণের সঙ্কল্প সৃষ্টি হলো। ইসলামী আদর্শের মৌলনীতিসমূহ মানুষের মন-মস্তিষ্কে যতই প্রবিষ্ট হতে

থাকলো, ততই তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন হলো। যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাকর বলে বিবেচনা করা হত, তা পরিণত হলো বর্জনীয় বিষয়ে। আর যেসব বিষয় গৌণ ও মূল্যহীন ছিলো তা অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়ে পরিণত হলো।

আদর্শের ছোঁয়ায় পরিবর্তিত মানুষগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার কারণে তাদের প্রভাবে পৃথিবী ক্রমশঃ ইসলামের সাথে পরিচিত হতে থাকলো। মানুষ নিজের অজান্তেই নন্দিত আদর্শের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে থাকলো। তদানীন্তনকালে প্রচলিত রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা, সভ্যতা সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন কোনো কিছুই ইসলামের প্রভাবমুক্ত ছিলো না। সে যুগের অমুসলিমদের বিবেক ও হৃদয় এসব প্রভাবের সাক্ষ্য দিতো এবং তাদের সুকুমার বৃত্তিসমূহে এর প্রকাশ ঘটতো। মুসলিম মিল্লাতের পতনের পরও বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সকল সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিলো, সেসব আন্দোলনও ছিলো ইসলামের প্রভাবের অনিবার্য ফল। মুসলিম মিল্লাত মহান আল্লাহর একত্ববাদের আওয়াজ সর্বত্র পৌঁছে ছিলো এবং এর প্রভাবে বহু মানুষের মন-মানসিকতা ধর্মীয় ক্ষেত্রে বহুত্ববাদের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো। আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন–

মাগরিবকে ওয়াদীওঁমে গুর্জি আযান হামারী
থামতা না থা কিছিছে সায়লে রওয়াঁ হামারা।

বেগবান বন্যার ন্যায় আমাদের অব্যাহত গতি কেউ রোধ করতে পারেনি, সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত আমাদের আযানের ধ্বনি পৌঁছেছে।

মুসলিমদের প্রভাবে অগণিত মূর্তি পূজকের কাছে মূর্তি হয়ে পড়ে নিন্দিত, হেয় ও অবজ্ঞেয় এবং তারা নিজেদের এর থেকে মুক্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করতো। কেউ কেউ নিজের ধর্মের শির্কমূলক আকিদা বিশ্বাসের ভিন্নতর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তাদের ধর্ম যে একত্ববাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা প্রমাণের চেষ্টা করতো। এ সময় খৃষ্টানদের মধ্যে একটি উপদলের উৎপত্তি ঘটলো, যারা হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ) এর খোদা হওয়া অস্বীকার করলো এবং ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসকে একত্ববাদের মোড়কে ব্যাখা বিশ্লেষণ করতো। তাদের মধ্যে এমন সব ধর্মীয় সংস্কারক জন্ম হলো, যারা পোপ ও পাদ্রীদেরকে মানুষ এবং স্রষ্টার মাধ্যম মেনে নিতে অস্বীকার করলো। খৃষ্ট ধর্মের পাদ্রীদের পৃথক মর্যাদা ও অধিকারকে তারা অগ্রাহ্য করলো। অষ্টম শতাব্দীদে ইউরোপে খৃষ্টানদের মধ্যে এমন একটি উপদলের আবির্ভাব হলো, যারা পাদ্রীদের

সম্মুখে নিজেদের পাপের স্বীকৃতি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে অন্যদেরকে আহ্বান জানাতো, 'একমাত্র স্রষ্টার কাছেই নিজেদের পাপের ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে, তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে হবে, এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই'। এসবই ছিলো মুসলিমদের একত্ববাদ প্রচারের অনিবার্য ফলশ্রুতি।

ইউরোপের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ইউরোপে ছবি ও মূর্তি বিরোধী একটি আন্দোলন প্রবলভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতো, ছবি ও মূর্তি দুটোই ধর্ম বিরোধী কাজ এবং এর মধ্যে পবিত্রতার কিছুই নেই। এ আন্দোলন এত বেশী শক্তিশালী ছিলো যে, প্রবল প্রতাপান্বিত রোমক সম্রাটরা আন্দোলন সমর্থন করে এর পৃষ্ঠপোষকতা করতে বাধ্য হয়েছিলো। তৃতীয় লুই, কনস্টাইন পঞ্চম ও চতুর্থ লুই এর সমর্থক ছিলেন। কোথাও কোথাও রাজকীয় ফরমান জারি করে চিত্র ও মূর্তির প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সে সময় খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই যিশু খৃষ্টের মূর্তি ভেঙ্গে ক্রুশ দণ্ডেও অগ্নিসংযোগ করে। নিজেদের ধর্মীয় নেতৃত্বের চিত্র, ক্রুশ দণ্ড ও মূর্তি চূর্ণ করা অবশ্যই ইসলামের একত্ববাদের প্রভাব এবং ইউরোপের ধর্মীয় ইতিহাস ও গির্জার কাহিনী গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে ইসলামের বুদ্ধিভিত্তিক প্রভাবের বহু দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে।

খৃষ্টান গবেষক রবার্ট ব্রিফল্ট এ সত্য অস্বীকার না করে তিনি তার লিখিত The Making of Humanity নামক গ্রন্থে তা এভাবে প্রকাশ করেছেন-
For although, there is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic civilization is not traceable nowhere is it so clear and momentous as in the genesis of that power which constitutes the permanent distinctive force of the modern world and the supreme source of its victory- natural science and scientific spirit. (p. 190)

অর্থাৎ ইউরোপের অগ্রগতি ও উন্নতির এমন কোনো শাখা প্রশাখা অথবা এর কোনো একটি দিকই এমন নেই যেখানে ইসলামী সভ্যতা তার প্রভাব না রেখেছে অথবা কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার না করেছে, উল্লেখযোগ্য ও স্পষ্টতর কোনো স্মৃতি না রেখেছে। ইউরোপীয় জীবনের ওপর ইসলাম এক বিশাল প্রভাব বিস্তার করেছে।

ঐ একই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি মুসলিম গবেষক ও চিন্তানায়কদের অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন- Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world. It was not science only which brought Europe back to life. Other and manifold influences from the civilization of Islam communicated its first glow to European life.

অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই ইউরোপে জীবন সঞ্চারের কৃতিত্বের অধিকারী নয়, বরং ইসলামী সভ্যতা ইউরোপের জীবনের ওপর অনেক বড় ও নানামুখী প্রভাব বিস্তার করেছে। আর এ প্রভাব বিস্তারের সূচনা সে সময়ই হয়েছে যখন ইসলামী সভ্যতা- সংস্কৃতির প্রথম কিরণচ্ছটা ইউরোপের ওপর পতিত হয়েছে।

এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত ভারতীয় উপমহাদেশও নন্দিত আদর্শ ইসলামের প্রভাব মুক্ত থাকেনি। এসব দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের স্বভাব-চরিত্র, আচার, ব্যবহার, লেনদেন, কথাবার্তা, পারিবারিক ও সামাজিক বিধি বিধানে মুসলিমের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। দেশের আইন কানুন রচনায়ও ইসলামী দণ্ডবিধির প্রভাব দেখা যায়। সহমরণ প্রথা রহিতকরণে, বিধবা বিয়ের ক্ষেত্রে, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধে, মানবীয় অধিকারসমূহে, শ্রেণী বৈষম্য উৎখাতে, দল উপদলে সাম্য বিধানে, জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে, আত্মীয়তার বন্ধনে, পিতামাতার সেবাযত্নে, অঙ্গীকার পালনে, পারস্পরিক সম্পর্কে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব স্পষ্ট। এক কথায় পৃথিবীর সকল জাতিসমূহ কোনো না কোনোভাবে নবী করীম (সা:) এর আদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেনি। মুসলিম উম্মাহর উত্থানের যুগে পৃথিবীর যেখানেই মুসলিমরা গিয়েছেন, সেখানের সভ্যতা সংস্কৃতি তাদেরকে গ্রাস করতে পারেনি, বরং তাঁরাই মুসলিম সভ্যতায় অন্যদেরকে আকৃষ্ট করেছে। সে যুগের মুসলিমরা মিথ্যার কাছে কখনো মাথা নত করেনি। ডক্টর আল্লাম ইকবাল (রাহ:) বলেন-

বাতিলছে দাবানেওয়ালে আয় আছমাঁ নেহি হাম

সওবার কার চুকা হ্যায় তু ইমতেহাঁ হামারা।

হে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা! মিথ্যার কাছে আমরা কখনো পরাজয় স্বীকার করি না, তুমি বহুবার তা পরীক্ষা করে দেখেছো।

বিশ্বের নেতৃত্বের আসন থেকে মুসলমানদের পতনের প্রায় ১২ শত বছর পরেও বর্তমান কুফর ও ধর্মহীনতার আধিপত্য ও প্রাধান্যের এ যুগেও

ইসলামী শিক্ষা বিবর্জিত মুসলিম পরিচয় দানকারী লোকদের মধ্যে ইসলামের প্রভাব স্পষ্ট। এরা মিথ্যা বলে, ওয়াদা ভঙ্গ ও আত্মসাৎ করে, অন্যের অধিকার হরণ করে, জুলুম নির্যাতন ও ধর্ষণ করে, দুর্নীতি, মদপান ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য গ্রহণ এবং হারাম উপার্জন করে, এসবই সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এসব হারাম জেনেই করে এবং এটি ইসলামেরই প্রভাব। অনেক মুসলিম রয়েছে যারা নামাজ-রোজা, হজ্জ ও যাকাতের তাৎপর্য এবং শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তবুও তারা এসব আদায় করে এবং কোরআনের অর্থ না বুঝলেও কোরআন তিলাওয়াৎ করে। এসবও ইসলামের প্রভাবের কারণেই করে। সকল দিক থেকে মুসলমানদের পতন ঘটলেও এদের অধিকাংশের চিন্তার জগৎ মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রভাবমুক্ত নয়। যুব বয়সে নামাজ রোজা ও হজ্জের ধারে কাছে না এলেও প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সে এরা মসজিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। এসবও ইসলামের প্রভাবের বাস্তব প্রকাশ।

ইসলামের প্রভাব এসব মুসলিম পরিচয় দানকারী ইসলামী শিক্ষাহীন লোকগুলোর মধ্যে কতটা কার্যকর রয়েছে তার বাস্তব প্রমাণ হলো, নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে কেউ কোনো মিথ্যে অভিযোগ তুললে এরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণে ও গরীব রোগীর চিকিৎসায় এরা মুক্ত হস্তে দান করে। পবিত্র কোরআন তাফসীর মাহফিলের আয়োজনে এরা অকাতরে অর্থ প্রদান করে। দলে দলে অগণিত মানুষ মাহফিলে যোগ দিয়ে মোনাজাতে অঝরধারায় কাঁদে। মানবরচিত মতবাদে বিশ্বাসী কোনো রাজনৈতিক দলের সভাসমাবেশের আয়োজন করে শ্রোতার উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্যে অর্থ ব্যয় করে লোক আনতে হয়। কিন্তু কোরআন তাফসীর মাহফিলে শ্রোতা বৃদ্ধির জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় না, কোরআনের আকর্ষণেই মুসলিম অমুসলিম জনগণ জমায়েত হতে থাকে। এসবই নন্দিত আদর্শ ইসলামী প্রভাবের বাস্তব দৃষ্টান্ত।

নন্দিত জাতির পতনের সূচনা

মানবেতিহাসে নন্দিত এ মুসলিম জাতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধমূলক নীতিভিত্তিক একটি নির্বাচিত দল ছিলো, এ দায়িত্বানুভূতি মন থেকে হারিয়ে গেলো এবং তারা যখন নিজেদেরকে অন্যান্য জাতির অনুরূপ নিজেরাও শুধুমাত্র একটি জাতি হিসেবে

মনে করতে শুরু করলো তখনই এদের পতনের সূচনা হয়েছে। পতনের এ ধারা ক্রমশঃ নিম্ন দিকেই ধাবিত হতে হতে বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম নামে পরিচিত মানুষগুলো পাশ্চাত্য জাতিসমূহের যৌনতা নির্ভর সভ্যতা সমুদ্রে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়েছে, এদেরকে মুসলিম হিসেবে চেনার কোনো চিহ্ন অবিশষ্ট নেই। একজন গবেষক অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর একটি কথা বলেছেন, 'প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন দু'টি বিষয় রয়েছে যার সঠিক মুহূর্তটি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কেউ কিছুই বলতে পারে না। এর একটির সম্পর্ক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে। আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক মানুষের জাতিয় জীবনের সাথে। ব্যক্তিগত জীবনের সাথে মানুষের নিদ্রার সম্পর্ক এমন যে, সে কোন্ মুহূর্তে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে গভীর ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেলো, সে মুহূর্তটির কথা নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারে না। জাতিগতভাবে মানুষের পতনের সূচনা ঠিক কোন্ মুহূর্তে ঘটে, সে মুহূর্তের কথাটিও কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। বলতে পারে তখনি, যখন জাতি পতনের চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হয়।

মুসলিম মিল্লাতের উত্থান ও পতন সম্পর্কে গবেষক, চিন্তাবিদ ও ইতিহাসবেত্তাগণ যার যার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গবেষণা, চিন্তা-ভাবনা ও ইতিহাস রচনা করেছেন। সম্পূর্ণ বিষয়টিকে নানাজনে ভিন্ন ভিন্নভাবে চিত্রিত করেছেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ সময়কালকে পতনের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ খেলাফত পরিবর্তী রাজতন্ত্র ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মুসলিম শাসকদের আরাম প্রিয়তা ও ভোগবিলাসে মত্ত হওয়ার সময়কালকে মুসলিম জাতির পতনের যুগ বলে মন্তব্য করেছেন। তবে আমরা যদি মুসলিম উম্মাহর উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহন ও পতনের মাঝের সময়কালকে চিহ্নিত করতে উদ্যোগী হই, তাহলে খোলাফায়ে রাশেদীন কোন্ অবস্থায় রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হলো সে সময়টিকে পার্থক্যকারী সীমারেখা হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সে সময় এমন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো, যে নেতৃত্ব স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) প্রশিক্ষণ দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর জীবন্ত মু'জিযা। ওহীভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে এমন এক ছাঁচে ঢেলে তৈরী করেছিলেন যে, একমাত্র তাঁদের দেহ আকৃতি ব্যতীত নিজ অতীতের সাথে তাঁদের কোনো কিছুরই সাদৃশ্য ছিলো না। ইসলাম গ্রহণপূর্ব অতীতের স্বভাব-চরিত্র, চলাফেরা, রুচি, মন-মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা, ঝোঁক প্রবণতা, প্রবৃত্তি, কর্মপন্থা, কথাবার্তা, আচার আচরণ, ব্যবহার ইত্যাদির কোনো চিহ্ন তাঁদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিলো

না। নন্দিত আদর্শ ইসলামের গর্ভে তাঁদের নবজন্ম হয়েছিলো এবং এ আদর্শের সকল দিক পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য সহকারে তাঁদের মধ্যে বিকশিত হয়েছিলো। তাঁরা প্রত্যেকেই ইসলামের পরিপূর্ণ জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

তাঁরা একাধারে রাষ্ট্রপতি, নামাজের ইমাম, পবিত্র কোরআন হাদীসের ভাষ্যকার, মসজিদের খতীব, বক্তা, প্রজ্ঞাবান বিচারক, জনগণের সম্পদের আমানতদার, জনগণের জান-মালের প্রহরাদার, যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতি, জন-জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থাপক, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বন্টনকারী, মত পার্থক্যের মীমাংসাকারী, নিপুণ রাজনীতিক, কুশলী ও অভিজ্ঞ প্রশাসক, উদ্ভূত সমস্যা নিরসনকারী, প্রকৃত সত্য অন্বেষণে দূরদৃষ্টি সত্যভাষণে অকপট ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রের দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাঁরা আখিরাত ও দুনিয়ার জীবনের মাঝে পার্থক্য রেখা অঙ্কন করে জীবন পরিচালনা করেননি। সকল ক্ষেত্রে আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়েই জীবনের সকল দিক ও বিভাগ পরিচালনা করেছেন। প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পদক্ষেপের পূর্বে তাঁরা আখিরাতে জবাবদীহীর বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

উল্লেখিত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফার চারপাশে যাঁরা অবস্থান করতেন, তাঁরা সকলেই নবী করীম (সা:) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা শয়নে স্বপনে জাগরণে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে নিজ নাফসের বিরুদ্ধে যেমন জিহাদে লিপ্ত থাকতেন তেমনি প্রয়োজনে ময়দানেও অস্ত্রধারণ করেছেন। তাঁদের সকলেরই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো, পৃথিবীতে করণীয় কাজের মাধ্যমে মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করা। এর বাইরে তাঁরা একটি মুহূর্তের জন্যেও অন্য কিছুর চিন্তায় মস্তিষ্কের শক্তি ব্যয়ে অভ্যস্থ ছিলেন না। ইসলাম গ্রহণের পরে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে, এ চিন্তা তাড়িত হয়ে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত তাঁরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যয় করেছেন। পার্থিব স্বার্থ সম্পর্কিত ভিন্ন কোনো চিন্তায় তাড়িত হবার পূর্বে তাঁরা মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করেছেন। একটি ধর্মীয় জীবন অপরটি পার্থিব জীবন, এভাবে জীবনকে তাঁরা মুহূর্তকালের জন্যেও দুইভাগে বিভক্ত করেননি। পার্থিব জীবনকে তাঁরা আখিরাতের শস্য ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে এখানে বীজ বপন করেছেন এবং আখিরাতের জীবনে শুভ ফসল লাভে ভয় ও শঙ্কা মিশ্রিত আশা পোষণ করেছেন।

ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির সর্বোন্নত গুণ-বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত এসব মহামানব দলের স্থলে এমন লোকজনের যখন প্রাধান্য দেখা দিলো, যাঁরা সকল দিকে তাঁদেরই অনুরূপ ছিলেন না। তখনই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কাঠামোগত পর্যায়ে ক্রমশ: ছিদ্র সৃষ্টি হলো এবং সে ছিদ্র পথেই পতন

নামক দানব মুখ ব্যদন করে প্রবেশ করলো। এ পতন খেলাফত ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্রে উপনীত করলো এবং গোত্র, বংশ ও জাতিভিত্তিক জাহিলী জাতিয়তাবাদের কঙ্কালে রক্ত ও মাংস সংযোজন করে পুনর্জীবন দান করা হলো। এভাবে নবী করীম (সা:) এর কবরস্থ করা জাহিলিয়াতকে কবর থেকে উঠিয়ে মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করা হলো। এ পৃথিবীতে মুসলিমদের প্রধান দায়িত্ব 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' এ দায়িত্ব থেকে শাসকগণ অব্যাহতি গ্রহণ করলেন। নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রকে তাঁরা উত্তরাধিকার সুত্রে লব্ধ সম্পদ বলে বিবেচনা করলো এবং অনেকের ব্যক্তি চরিত্রে পচন ধরে তা দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকলো।

ক্ষেত্র বিশেষে এমন অযোগ্য লোকজন শাসক হিসেবে মুসলিমদের ওপরে চেপে বসলো, নন্দিত আদর্শ ইসলাম ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনায় যাদের যোগ্যতার অভাব ছিলো। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁরা নিজ মস্তিষ্ককেই প্রাধান্য দিলো এবং পরিবেশ পরিস্থিতির দাবি অনুসারে যখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখনই তাঁরা ইসলামী জ্ঞানে সজ্জিত আল্লাহভীরু আলেম ওলামাদের নিজ দরবারে আহ্বান করেছেন। বিশেষজ্ঞ আলেম ওলামা তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু শাসকবৃন্দ তাদের পরামর্শ নিজ স্বার্থের অনুকূলে থাকলে গ্রহণ করেছেন, প্রতিকূলে থাকলে বর্জন করেছেন। এভাবেই রাষ্ট্রনীতি ইসলামের তত্ত্বাবধান থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হলো। এ অবস্থায় ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী আলেম ওলামা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। (১) বৈষয়িক স্বার্থে শাসকদের অনুগত হয়ে তাদের অনুকূলে পরামর্শ দিতেন। (২) শাসকদের অন্যায় সিদ্ধান্ত ও কাজে প্রবল বিরোধিতা করতেন। (৩) রাষ্ট্র ও রাজনীতির ময়দান থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন ও চলমান ঘটনাবলী থেকে চোখ বন্ধ রেখে নিজ পরিমণ্ডলে আত্মশুদ্ধি ও ব্যক্তির সংশোধনে আত্মনিয়োগ করলেন।

আলেম ওলামার মধ্যে তিনটি দলের মধ্যে যারা শাসকদের অন্যায় কাজের বিরোধী ছিলেন, শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ দেখে অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে আর্তনাদ করতেন। মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করে নিজ জীবনের মায়া-মমতা ত্যাগ করে ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করতেন। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা ছিলেন অসহায়, কার্যকরী ক্ষমতা তাঁদের হাতে ছিলো না। সাধারণ মানুষকে সজাগ সচেতন করা ব্যতীত তাঁদের আর কিছুই করার ছিলো না। ওদিকে মুসলিমদের

পতনের ধারার নিম্নমুখী গতি ক্ষণিকের জন্যেও থেমে থাকেনি, পানির মতো ক্রমশ: নীচের দিকেই প্রবাহিত হচ্ছিলো। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামকে শক্তিহীন, প্রভাবশূন্য ও নিষ্প্রভ করা হলো আর রাষ্ট্রনীতিকে ইসলামের বন্ধনমুক্ত করে এক নিয়ন্ত্রণহীন স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থায় পরিণত করা হলো। একশ্রেণীর আলেম ওলামা বৈষয়িক স্বার্থে অন্ধ হয়ে স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্র ব্যবস্থার গায়ে ইসলামের লেবাস পরিয়ে দিতে লাগলো। আর যে সকল আলেম ওলামা স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের বিরোধী ছিলেন, তাদেরকে 'রাষ্ট্র বিরোধী বিদ্রোহী' হিসেবে চিহ্নিত করতে ঐ শ্রেণীর আলেম ওলামা ফতোয়ার শক্তি প্রয়োগ করলো।

স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে বহু সংখ্যক আলেমকে শাহাদাতবরণ করতে হয়েছে। ইসলাম বিরোধী ব্যবস্থার আনুগত্য করার তুলনায় তাঁরা শাহাদাতের মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞান করেছেন। স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আনুগত্য না করার সঙ্কল্পধারায় নিষ্ঠুর কারবালার ময়দানে হযরত হুসাইন (রা:) থেকে শাহাদাতবরণের যে সূচনা হয়েছে, বর্তমানকাল পর্যন্তও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। পৃথিবী লয় না হওয়া পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহতই থাকবে। একদল সত্যপন্থী আলেম ওলামা স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে সত্য উচ্চারণ করে জেল, জুলম ও নির্যাতনের শিকার হবেন এবং ফাঁসির রশি কণ্ঠে ধারণ করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করবেন, আরেক দল আলেম ওলামা স্বৈরাচারী সরকারের স্বপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে পার্থিব জীবনে আরাম আয়েশ ভোগ করবেন। উচ্ছিষ্ট আহারকারী এ দলের অস্তিত্ব সকল যুগেই ছিলো এবং থাকবে।

স্বৈরাচারী শাসকের আনুগত্য না করার কারণে যারা নির্মম অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং শাহাদাতবরণ করেছেন, সেসব সম্মানীত সাহাবায়ে কেরাম, আলেম ওলামা ও ঈমানদার মুসলিমের সংখ্যা বিপুল। তাঁদের সকলের তালিকা একত্রিত করলে বিশাল এক গ্রন্থ রচিত হবে। এখানে সুপরিচিত কতিপয় ইসলামী চিন্তানায়ক সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

স্বাগতম কারাগার, স্বাগতম শাহাদাত

হাফিয ইবনে তাইমিয়া (রাহ:) তাঁর মিনহাজুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, 'খিলাফত ব্যবস্থা যখন অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় উপনীত হলো তখন তা রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হলো। হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা:)

এ ব্যবস্থাকে নিজের অনুগ্রহ, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাখলেন। খোলাফায়ে রাশেদার পরে ইসলামের ইতিহাসে আমির মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে উত্তম কোনো বাদশাহ দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি নিঃসন্দেহে সকল মুসলিম বাদশাহের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন। তাঁর চরিত্র পরবর্তীতে আগমনকারী বাদশাহদের চরিত্র থেকে সর্বাধিক উন্নত ছিলো'। এ সম্পর্কে আল্লামা সাঈদ আহমাদ আকবরাবাদী লিখেছেন, 'নিঃসন্দেহে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সর্বোত্তম চরিত্র বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন। সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য থাকার পরও ইসলামের সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিমাপ করলে তাঁর কর্মপদ্ধতিতে যে প্রকার শাসনতন্ত্রের কাঠামো রচিত হলো তাতে ইসলামের সামগ্রিক আইন কানুনের জীবনীশক্তির খুবই ক্ষতি হলো। শাসনতন্ত্র পরামর্শভিত্তিক গণতন্ত্রের পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গেল। আর ইসলামের যে সার্বিক কল্যাণ ঐ সর্বোত্তম শাসনতন্ত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলো এখন তার সম্পর্ক বাদশাহর ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গেল। আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত কল্যাণকামী ছিলেন। এ জন্যে শাসনপদ্ধতির এই পরিবর্তন প্রথমত জনগণ অনুভব করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু দূরদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ বিষয়টির গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতেন ঠিকই, তবে প্রকাশ্যে কিছুই বলতে পারতেন না। আর বলাও সমীচীন ছিলো না এ কারণে যে, মুসলিম উম্মাহকে আরেকটি বিপদের পথে এগিয়ে দেয়া। কিন্তু তাঁরা হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করতেন। আর সুযোগ বুঝে এর প্রকাশও ঘটাতেন। কাদেসীয়া বিজয়ী বীর হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এমনভাবে অভিবাদন জানালেন, যেভাবে অনারবরা বাদশাহকে অভিবাদন জানায়। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) স্মিত হেসে বললেন, 'আপনি যদি আমাকে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করতেন তাহলে আপনার কি ক্ষতি হতো?' হযরত সা'দ (রাঃ) জবাবে বললেন, ' যেভাবে আপনি খেলাফত অর্জন করেছেন যদি আমার এমন সুযোগ হতো তাহলে আমি কখনো তা গ্রহণ করতাম না'।

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর পরে তাঁর সন্তান ইয়াজিদ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হলো। তিনি যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হলেন তা খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুরূপ প্রক্রিয়া ছিলো না বিধায় বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম তা

গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁরা স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন খেলাফত ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র তথা স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবস্থায় পরিবর্তন করা হলো। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এ ব্যবস্থা হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) মেনে নিতে পারলেন না। পরিণতিতে কারবালার ময়দানে তিনি পরিবার পরিজন ও সঙ্গী সাথীসহ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন। স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে কারবালার ময়দানে এ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটেনি। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) এ আন্দোলনের পতাকা হাতে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর পিতার নাম ছিলো হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ)। তাঁর দাদা আওয়াম বিন খুয়াইলিদ এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা (রাঃ) আপন ভাই বোন ছিলেন। তাঁর পিতা হযরত যুবাইর ছিলেন হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) এর সন্তান। আর ছুফিয়া (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এর ফুফু ছিলেন। এভাবে হযরত আব্দুল্লাহর পিতা রাসূল (সাঃ) এর ফুফাতো ভাই ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ) ছিলেন তাঁর আপন খালা। সকল দিক থেকেই তাঁর বংশ রাসূল (সাঃ) এর পাদ-প্রদীপ ছিলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এর পবিত্র মাতা ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বড় মেয়ে হযরত আসমা (রাঃ)- যাকে নবী করীম (সাঃ) যাতুন নিতাকাইন বা দুই ফিতার অধিকারিণী উপাধি দিয়েছিলেন। মদীনায় হিজরতের পরে দীর্ঘ দিন মক্কার মুহাজিরদের কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়ায় মদীনার ইয়াহূদীরা প্রচারণা শুরু করেছিলো যে, যাদু করার ফলে মুসলমানদের বংশ বিস্তার রোধ করা হয়েছে। এ অবস্থায় প্রথম হিজরীতেই হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করলেন এবং এ আনন্দে মুসলমানরা তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) নবজাতককে পবিত্র কোলে নিয়ে তাঁর মুখে নিজে খুরমা চিবিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আয়িশা (রাঃ) এর কোনো সন্তান না থাকায় তিনি আপন বোন হযরত আসমা (রাঃ) এর সন্তান হযরত আব্দুল্লাহকে নিজের সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে পারেননি। আন্দোলনের পতাকা হাতে তিনি ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে শাহাদাতবরণ করেছেন এবং তাঁর পবিত্র লাশ সাতদিন যাবৎ ইয়াহূদীদের কবরস্থানে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিলো।

হযরত যায়েদ ইবনে আলী হযরত জয়নুল আবেদীন বিন হুসাইন (রা:) এর পুত্র এবং হযরত হুসাইন হযরত আলী (রা:) এর সন্তান। হযরত যায়েদ (রা:) এর সন্তান হযরত ইয়াহিয়া (রাহ:)। পিতাপুত্র উভয়েই স্বৈরাচারী ব্যবস্থার কাছে মাথানত করেননি। ফলে উভয়কেই শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে হয়েছে। শাহাদাতবরণের পরে হযরত যায়েদ (রা:) এর লাশ প্রথমে প্রবাহিত পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। তারপর লাশ পানি থেকে উত্তোলন করে স্বৈরাচারী শক্তি দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দামেস্‌ক নগরীর প্রধান দরজায় মাথা টাঙিয়ে রাখা হয়। আর দেহটিকে উলঙ্গ করে কুনাসা নামক স্থানে ১৪ মাস যাবৎ টাঙিয়ে রেখে তারপর কঙ্কাল আগুনে জ্বালিয়ে ছাই নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। তাঁর সন্তান ইয়াহিয়া (রাহ:) কে শহীদ করে তাঁর লাশও টাঙিয়ে রাখা হয়েছিলো। এভাবে স্বৈরাচারী জালিম শাসকগোষ্ঠী প্রতিবাদী মুসলিমদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা করেছে।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রা:) এর পবিত্র বংশধর ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ নফসে যাকিয়া (রাহ:) ও হযরত ইবরাহীম (রাহ:), তাঁরা উভয়ে আপন সহোদর ছিলেন। তাঁরাও ইসলামের বিকৃতি সহ্য করেননি ও স্বৈরাচারী জালিমদের সাথে আপোষ করেননি। বিপুল সংখ্যক জনগণকে সাথে নিয়ে তাঁরা আন্দোলন করেছেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে জিহাদের ময়দানে তাঁরা দুই ভাই শাহাদাতবরণ করেছেন। তাঁদের দেহ থেকেও মস্তক বিচ্ছিন্ন করে লাশের অবমাননা করা হয়েছে।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রা:) খেলাফত ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। আন্দোনকারীদের তিনি অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। সমকালীন জনগণের ওপর তাঁর ব্যাপক প্রভাব ছিলো। এ কারণে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী তাঁকে নিজেদের সহযোগিতাকারী হিসেবে পাবার জন্যে বার বার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। হযরত ইমাম আবু হানিফার (রা:) মতো ব্যক্তিত্ব শাসকগোষ্ঠীর অনুকূলে থাকলে সাধারণ জনগণ স্বৈরাচারী শাসকদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করবে, এ লক্ষ্যেই তারা হযরত আবু হানিফার প্রভাবকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। স্বৈরশাসক তাঁকে রাজদরবারে ডেকে নিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করার প্রস্তাব দিলেন। আবু হানিফা (রাহ:) নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে জানিয়ে দিলেন, তিনি এ পদের যোগ্য নন। বাদশাহ তাঁকে বললেন, 'আপনি মিথ্যা কথা

বলছেন'। সাথে সাথে ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, 'তাহলে যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে সে কখনো প্রধান বিচারপতির যোগ্য নয়'।

বাদশাহ ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর কথায় কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লো। তারপর তিনি অনুগতদের আদেশ দিলেন ইমামকে কারাগারে নিক্ষেপ করার জন্যে। কারাঅভ্যন্তরে হযরত আবু হানিফা (রাঃ) এর গর্ভধারিণী মা'কে এনে মায়ের সামনেই ইমামকে নির্যাতন করা হতো। কিন্তু তিনি স্বৈরাচারের সহযোগী হতে রাজী হননি। দীর্ঘ আট বছর তিনি কারাবন্ধ ছিলেন এবং কারাগারেই খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাঁকে খাওয়ানো হয়। ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) শাহাদাতবরণ করেন।

হযরত ইমাম মালেক (রাহঃ) স্বৈরাচারী শাসকদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেননি। কঠিন ভাষায় তিনি শাসকগোষ্ঠীর সমালোচনা করেছেন। শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ জারী করা হলো তিনি যেনো নীরবে নিভৃতে মদীনায় বসবাস করেন এবং নিজের মতামত পেশ করা থেকে বিরত থাকেন। শহীদী কাফেলার অকুতোভয় যাত্রী হযরত ইমাম মালেক (রাহঃ) নীরবতা পালন করলেন না। 'জালিম শাসকের সম্মুখে সত্য কথন শ্রেষ্ঠ জিহাদ' এ হাদীস তাঁকে সত্য প্রকাশে নির্ভীক করে তুললো। জালিম গোষ্ঠী তাঁকে গ্রেফতার করে তাঁর দেহ থেকে পোশাক খুলে দু'হাত পিছে নিয়ে বাঁধা হলো। এরপর তাঁর উন্মুক্ত দেহে চললো প্রচণ্ড নির্যাতন। চাবুকের আঘাতে তাঁকে রক্তাক্ত করা হলো। জনগণের সম্মুখে অপমান করার জন্য তাঁকে মৃতপ্রায় অবস্থায় উটের পিঠে বসিয়ে অপরাধী সাজিয়ে মদীনা শহরে ঘুরানো হলো। এ অবস্থায়ও তিনি নীরবতা অবলম্বন করেননি। নির্যাতনে মুমূর্ষ ক্লান্ত কণ্ঠে তিনি স্বৈরাচারী শাসকদের প্রতিকূলেই নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ), তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ এবং পিতার নাম ইদরিস। দাদার নাম আব্বাস এবং পর দাদার নাম উসমান ও দাদার দাদার নাম শাফে' ছিলো। এই সম্পৃক্ততার কারণেই তিনি পৃথিবীতে শাফেয়ী নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি লেখনী ও বক্তৃতায় স্বৈরাচারী শাসকদের শাসননীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। জনগণের সম্মুখে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। ফলে তাঁকেও গ্রেফতার হয়ে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

হযরত ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল (রাহঃ), তাঁর প্রকৃত নাম আহ্মাদ, পিতার নাম মুহাম্মাদ এবং দাদার নাম হাম্বল বিন হেলাল। পর পর তিনজন বাদশাহ্র শাসনকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এবং তিন বাদশাহ্-ই তাঁকে স্বেচ্ছাচারীতার অনুগত সহযোগী হিসেবে পেতে চেয়েছে। অন্যায় আনুগত্য স্বীকার না করার কারণে তাঁর ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে। কারাগারে হাত দু'টো পেছনে নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বেঁধে রাখা হতো, ফলে তাঁর কাঁধের সন্ধিস্থল পৃথক হয়ে গিয়েছিলো। কখনো তাঁর হাত ও পায়ে লোহার ভারী শিকল পরিয়ে রাখা হতো। তাঁর দেহ থেকে পোশাক খুলে চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত করা হতো। কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে একাকীত্বের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তিনি। তাঁকে আতঙ্কিত করার জন্যে হাতে পায়ে শিকল বেঁধে রাজদরবারে নিয়ে তাঁর সম্মুখে বাদশাহের আদেশে জল্লাদ অনেকের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করতো। নির্যাতনের সকল নিষ্ঠুর পদ্ধতি তাঁর ওপর প্রয়োগ করেও তাঁকে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী নিজেদের অনুকূলে নিতে পারেনি।

খেলাফত ব্যবস্থা রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হলো এবং ইসলামী সাম্রাজ্য নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়ে অনেকে পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষেও নিজেদের শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করলো। অথচ এ শক্তি ইসলামের প্রচার প্রসার ও বিঘোষিত নীতি, 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' এ কাজে ব্যয় করার কথা ছিলো। এখন পর্যন্ত কতক স্থানে রাজতন্ত্র জীবিত রাখা হয়েছে এবং কতক স্থানে গণতন্ত্রের নামে প্রবল স্বৈরাচারী ব্যবস্থা বলবৎ করা হয়েছে। ইসলামের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী এসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে মুসলিম নামে পরিচিত রাষ্ট্রসমূহে সেই কারবালা থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত শহীদী মিছিলে অগণিত প্রতিবাদী মুসলিম শামিল হয়েছেন এবং হচ্ছেন, কারানির্যাতন ভোগ ও পঙ্গুত্ব বরণ করছেন, সহায়-সম্পদ হারাচ্ছেন এবং অকল্পনীয় বিপদ মুসিবতের মোকাবেলা করছেন। প্রতিবাদের এ ধারা মুহূর্তকালের জন্যেও ইন্শাআল্লাহ্ নীরব নিস্তব্ধ হবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক ভিত্তি

অনেকেই ধারণা করে মুসলমানদের পতনের পরে পাশ্চাত্য সভ্যতা আধুনিককালে জন্মগ্রহণ করেছে অথবা বিগত কয়েক শতাব্দী অতিক্রম করে পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। প্রকৃত সত্য হলো এ সভ্যতার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরনো এবং গ্রীক ও রোমক সভ্যতার সাথে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান। গ্রীক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের ওপর রোমক সভ্যতার প্রাসাদ নির্মিত হয় এবং এ দুই সভ্যতার গর্ভজাত সন্তান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আধুনিক রূপ দেয়া হয়েছে মাত্র। এ সভ্যতার দু'টি পা গ্রীক ও রোমক সভ্যতা এবং এ দুয়ের ওপর ভিত্তি করেই পাশ্চাত্য সভ্যতা দাঁড়িয়েছে। পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ শতাব্দীর পর শতাব্দী এই দুই সভ্যতার সকল বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেছে এবং উক্ত বৈশিষ্ট্যের দেহে উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন চাকচিক্যময় পোশাক পরিয়ে দুনিয়াবাসীকে সেদিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রীক ও রোমক সভ্যতার সার্বিক দিক পর্যালোচনা করলে যে চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয় তা জানা থাকলে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বুঝতে অসুবিধা হবে না।

গ্রীক ও রোমক সভ্যতার সর্বপ্রথম দিক হলো, 'যে সকল বিষয় মানব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় অর্থাৎ যা কিছু স্পষ্ট অনুভব করা যায় না, সে সকল বিষয় সন্দেহপূর্ণ এবং এসব বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হওয়া। দ্বিতীয় দিক হলো, উক্ত দুই সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে বা অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় অনুভূতির দৈন্যতা প্রকট। এ সভ্যতা দ্বয়ে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের অবস্থান উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। তৃতীয় দিক হলো, পার্থিব জীবন ধারণে আরাম আয়েশ, ভোগবিলাস ও জীবনকে সকল দিক দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ করার অদম্য আকর্ষণ। চতুর্থ দিক হলো, জাতি ও দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন করা। অর্থাৎ যা কিছু চোখে দেখা যায় না বা অনুভবও করা যায় না, তাকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। আধ্যাত্মিকতা অর্জন তথা ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত রাখতে গিয়ে জীবনকে অতৃপ্ত রাখা যুক্তি সঙ্গত নয়। জীবন মাত্র একটি এবং তা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নি:শেষ হয়ে যায়। সুতরাং এ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে হবে। আর জীবনকে ভোগ করতে গিয়ে এর জন্যে যে উপকরণ প্রয়োজন তা যোগাড়

করতে গিয়ে যে কোনো সীমা অতিক্রম করা যাবে। পরদেশ দখল এবং অন্যান্য জাতির সম্পদ লুণ্ঠনে লজ্জিত হওয়া যাবে না।

উল্লেখিত চারটি দিক সম্মুখে রাখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় গ্রীক ও রোমক সভ্যতার মূল বৃক্ষ সুশোভিত হয়েছে নিরেট বস্তুবাদের ওপর। এ দুই সভ্যতার সকল কিছু এমনকি তাদের রচিত ধর্ম পর্যন্ত বস্তুবাদী ধ্যান ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। স্রষ্টার যে সকল গুণ-বৈশিষ্টে তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করতো, তারা উক্ত গুণ-বৈশিষ্টের আকৃতিতেই দেবতা নির্মাণ ও উপাসনালয় বানিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পন্থায় দেরতাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। মৃত্যু যেহেতু ভয়ঙ্কর, সেহেতু মৃত্যুর দেবতাকে ভয়ঙ্কর দর্শন কল্পনা করে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে বিষয়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। প্রেম প্রীতি ভালোবাসার দেবতাকে নমনীয় কমনীয় মোহনীয় ও আকর্ষণীয় কল্পনা করে দেবতার মূর্তিতে সে রূপেরই প্রকাশ ঘটিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা হয়েছে। নানা দেব দেবতা নির্মাণ করে সেগুলো বস্তুগত দেহের সকল বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্কযুক্ত বিষয় সম্পর্কিত করা হয়েছে, এরপর সে সকল দেব দেবীর চতুস্পার্শ্বে বিভিন্ন ধরনের কল্পিত কাহিনীর জাল বিছানো হয়েছে। এরা অঙ্গবিহীন আবেগ অনুভূতিকে পর্যন্ত দৈহিক ও আঙ্গিক কাঠামোরূপে উপস্থাপিত করেছে। এভাবে রচিত ধর্মের সকল কিছুকেই বস্তুবাদের ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো হয়েছে। আর পাশ্চাত্য জাতিসমূহ গ্রীক ও রোমক সভ্যতাকে ভিত্তি হিসেবে ধরে এর ওপরেই তাদের সকল নীতিমালা রচিত করেছে।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহ যে শিক্ষা ব্যবস্থা রচনা করেছে, এ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকসমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এমন সকল কিছুর প্রতি সন্দেহ সংশয় প্রকাশ অথবা অস্বীকার করে। তাদের স্বভাব চরিত্রে ধর্মের প্রভাব প্রায় শূন্যের কোঠায় অবস্থান করছে। গীর্জাসমূহে লোক সমাগম নেই বিধায় অগণিত গীর্জা কর্তৃপক্ষ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। ভোগবাদ তাদেরকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছে যে, পারিবারিক বোঝা তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বিয়ে ও সন্তান সন্ততি প্রতিপালনে অনীহা, সামাজিক বন্ধন নেই এবং বৃদ্ধ পিতামাতার সংবাদও তারা রাখেনা। নিজস্ব পরিমণ্ডলে তারা অসহায়ের মতো মৃত্যুবরণ করছে এবং মৃত্যুর অনেক পরে গলিত লাশ উদ্ধার হচ্ছে। জাতিয় নিরাপত্তার ধোয়া তুলে তারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে হামলা করে অগণিত মানুষের প্রাণহরণ ও সম্পদ বিনষ্ট করছে এবং অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে। গ্রীক ও রোমক সভ্যতার মূলনীতিসমূহ তাদেরকে এ অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আসছে। এ বিষয়টিকে অস্বীকার নয়, বরং স্বগৌরবে তারা প্রকাশও করেছে।

পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা গবেষক জেনেভায় What is European Civilization শীর্ষক এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন, 'আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মভূমি ছিলো প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা এবং এ সভ্যতার দৃষ্টিতে মূল বিষয় হলো মানুষের সকল শক্তির সুসমন্বিত বিকাশ এবং সবথেকে বড় আদর্শ হলো সুন্দর, সুঠাম দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী মানুষ। কারণ এমন ধরনের মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধ, খেলাধুলা, নৃত্য, শিকার ও অন্যান্য বিষয়ের উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়। গ্রীসের ধর্মে আধ্যাত্মিকতার কোনো উপাদান নেই এবং ধর্মতত্ত্বেরও কোনো গুরুত্ব নেই'। (The conflict of east and west in Turkey by Halide Edib, P. 226)

পাশ্চাত্যের বহু গবেষকগণ গ্রীকদের ধর্মীয় দুর্বলতা, তাদের কর্মজীবনের ওপর ধর্মের প্রভাবহীনতা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে গুরুত্বহীনতা এবং নানাবিধ খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠানের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। History of European Morals এর লেখক Lecky উল্লেখ করেছেন, The Greek spirit was essentially rationalistic and eclect, the Egyptian spirit was essentially mystical and devotional. The Egyptian deities were chiefly honoured by lamentations the Greek divinities by dance. অর্থাৎ গ্রীকদের স্পিরিট ছিলো সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও মস্তিষ্ক নির্ভর, অপরদিকে মিসরীয়দের সম্পূর্ণটাই ছিলো আধ্যাত্মিক ও আত্মিক। মিসরীয় দেবতারা সম্মানীত ও সন্তুষ্ট হয় অনুতাপ ও কান্নাকাটিতে আর গ্রীক দেবতারা খুশী হয় নৃত্যে।

গ্রীক ও রোমে ধর্মের মর্যাদাগত তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। History of European Morals গ্রন্থে গ্রন্থকার লিখেছেন, রোমকরা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দৃঢ় ছিলো না। কারণ ধর্মের নামে যেসব কুসংস্কার সেখানে প্রচলিত ছিলো সেগুলো দৃঢ় বিশ্বাসের উপযোগী ছিলো না। তারা সূচনাতেই এ সিদ্ধান্তে অটল ছিলো যে, দেব দেবী রাজনৈতিক ও পার্থিব বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন। তাদের আনন্দ ফূর্তির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্য গীতের মধ্যে যখন উল্লেখ করা হতো, 'দেব দেবীর জাগতিক বিষয়াদিতে কোনো ভূমিকা নেই' তখন দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আনন্দে হাত তালি দিতো। যেসব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মন্দিরে দেব দেবীর পূজা করতো, তারাই আনন্দ ফূর্তির অনুষ্ঠানে তাদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতো। রোমে প্রচলিত ধর্ম তাদের অনুসারীদের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম ছিলো না। ধর্মীয়

আবেগ উচ্ছ্বাস এতটাই শিথিল ছিলো যে, সাধারণ লোকজন ক্রোধান্বিত হয়ে যে কোনো দেব দেবীকে অশালীন ভাষায় গালি দিতে দ্বিধাবোধ করতো না। ধর্মের নৈতিক প্রভাব প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। জার্মানিকাস মৃত্যুবরণ করার পরে লোকজন এতই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলো যে, তারা মন্দিরে গিয়ে দেবতার ওপর পাথর নিক্ষেপ করেছিলো। অগাস্টাস এর নৌবহর সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর সে ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে সমুদ্র দেবতা নেপচুনের মূর্তি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিলো। এটাই ছিলো রোমকদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার বাস্তব দৃষ্টান্ত। রোমক জাতির নৈতিক চরিত্র, দৈনন্দিন আচার আচরণ, ব্যবহার, তাদের অনুভূতিতে ও প্রবণতায়, পরিবারে সমাজে ও রাজনীতিতে ধর্মের কোনো প্রভাব অবশিষ্ট ছিলো না। কারণ ধর্মের নামে যা কিছু প্রচলিত ছিলো, তার মধ্যে গভীরতা, শক্তি সামর্থ্য ও আধ্যাত্মিকতা ছিলো না। ফলে তা মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ছিলো না। কিন্তু শাসকদের প্রয়োজনে নামসর্বস্ব হলেও ধর্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা হয়েছিলো। (History of European Morals. P. 178)

সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে উক্ত লেখক আরো উল্লেখ করেছেন, The Roman religion was purely selfish. It was simply a method of obtaining prosperity, averting calamity and reading the future. Ancient Rome produced many heroes but no saints. Its self-sacrifice was patriotic, not religious. Its religion was neither an independent teacher nor a source of inspiration. (History of European Morals. P. 179)

অর্থাৎ রোমক ধর্ম ছিলো স্বার্থপরতা সর্বস্ব এবং আত্মকেন্দ্রিক। এ ধর্মের মূল লক্ষ্য ছিলো কিভাবে প্রাচুর্যতা অর্জন করা যায়, বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। রোম বহু বীর পুরুষের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু আত্মত্যাগী সাধক পুরুষ একজনও জন্ম দিতে সক্ষম হয়নি। এখানে আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের সর্বোচ্চ যে দৃষ্টান্ত দেখা যায় সেটাও ধর্মের প্রভাব ও প্রেরণা নয়, বরং নিজ দেশপ্রেমের প্রেরণায়। এ ধর্ম স্বাধীন নয় এবং প্রেরণাও উৎস নয়।

ইয়াহূদী ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণকারী আল্লামা মুহাম্মাদ আসাদ (রাহঃ) লিখেছেন, 'রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে যে চেতনা প্রতিষ্ঠিত ছিলো তা শুধুই ক্ষমতা অর্জনের এক অদম্য ইচ্ছা, রাজ্য ও রাজত্ব দখল, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতিসমূহকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে স্বদেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও

সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটানো। রোমের শাসকগোষ্ঠী, কর্তৃত্ব পরায়ণ লোক এবং সকল পর্যায়ের নেতৃবর্গ এবং উচ্চশ্রেণীর লোকজন নিজেদের বিলাসীতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এর উপকরণ সংগ্রহের জন্য যে কোনো নিষ্ঠুর আচরণকে নিন্দনীয় মনে করতো না। রোমকদের ন্যায় বিচার ও ইনসাফের যে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তা নির্দিষ্ট ছিলো শুধু রোমকদের জন্যেই আর এর উৎসমূলে ছিলো তাদের সঙ্কীর্ণ জাতিয়তাবাদী অনুপ্রেরণা'। (Islam at the cross road)

বর্তমান পাশ্চাত্যের সকল দেশসমূহের রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি, বিচার ব্যবস্থার দণ্ডবিধি, সভ্যতা সংস্কৃতিক নীতিমালা, শিক্ষানীতি, পররাষ্ট্র নীতি, যুদ্ধনীতি, মানবাধিকার নীতি এবং অন্যান্য সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এসব কিছুর ভিত্তি তারা স্থাপন করেছে গ্রীক ও রোমক সভ্যতার নীতিমালাসমূহের ওপর এবং এটাই পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক ভিত্তি।

ধর্ম বিরোধিতা ও ধর্মহীনতার ঐতিহাসিক কারণ

পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মানুষ ধর্মের প্রতি সন্দেহ, সংশয় পোষণ করে অথবা ধর্মের বিরোধিতা করে। অনেকে ধর্ম পালনও করে না এবং প্রকাশ্যে ধর্মের বিরুদ্ধে কথাও বলে না, ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে। ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধর্মের প্রতি অনীহার কারণে তাদের গীর্জাসমূহ বিক্রি করতে তারা বাধ্য হচ্ছে। এর ঐতিহাসিক কারণ হলো, খৃষ্ট ধর্মের বিকৃতি, পোপ পাদ্রীদের মনগড়া নীতি এবং তাদের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার। ধর্মের প্রতি অনীহা প্রদর্শন ও সন্দেহ সংশয় পোষণ করার তরঙ্গমালা মুসলিমদের প্রতিও আছড়ে পড়েছে। ঐতিহাসিকভাবে প্রকৃত অপরাধী পোপ, পাদ্রী ও যাজকগণ এবং এ সত্য পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। খৃষ্টিয় পোপ, পাদ্রী ও যাজকদের মনগড়া বিধান ও অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী ইউরোপের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে এবং এসব ইতিহাস তারা তাদের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ধর্মীয় মোড়কে পাদ্রীদের ভোগবিলাস, সাধারণ মানুষের ওপর জঘন্য অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন, কৃচ্ছতা সাধন, আত্মনিপীড়ন ইত্যাদির কারণে যে ঘৃণা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, পরবর্তীতে তা ভুক্তভোগী মানুষদের বিদ্রোহী করে তুলেছে। আর এসবেরই গর্ভে পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ

মতবাদ, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। কিন্তু মূল বিষয় হলো, ইতিহাসের কোনো একটি পর্যায়েও এর সাথে ইসলাম বা একজন সাধারণ মুসলমানেরও সম্পৃক্ততা ছিলো না। সমগ্র পৃথিবীর একজন চিন্তাবিদ ও গবেষকও ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পৃক্ততা আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন না। পোপ পাদ্রী ও যাজকদের অপকর্মের সাথে ইসলামকেও সম্পৃক্ত করে ইসলামের বিরুদ্ধেও সেইভাবেই অবস্থান নেয়া হয়েছে, যেভাবে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে সে যুগে অবস্থান নেয়া হয়েছিলো। ধর্মের প্রতি সন্দেহ সংশয় ও বিরোধিতার মূল কারণ জানতে হলে খৃষ্ট ধর্ম ও এর ইতিহাস জানা একান্তই প্রয়োজন।

খৃষ্টিয় ধর্ম বলতে হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম নয় বরং ঈসা (আঃ) এর ধর্ম বলে যা মনে করা হয় তাই খৃষ্টধর্ম। বর্তমান খৃষ্টবাদের শিক্ষা হযরত ঈসা (আঃ) দেননি সে সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তিনি মানব জাতির কাছে সেই ইসলামই উপস্থাপন করেছিলেন যা তাঁর পূর্বে সকল নবী- রাসূল করেছিলেন এবং তাঁর পরে নবী করীম (সাঃ) উপস্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে খৃষ্ট ধর্ম হিসাবে যা উপস্থিত রয়েছে তা হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রচারিত জীবন ব্যবস্থা নয় বরং তাঁর নামে পাদ্রীদের মনগড়া মতবাদ। ষষ্ঠ শতাব্দীতে খৃষ্টান জাতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল এবং হযরত ঈসা (আঃ) এর আদর্শ পাদ্রীদর দ্বারা বিকৃত হয়ে পড়েছিল।

হযরত ঈসার প্রচারিত আদর্শকে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ত্রিতত্ত্ববাদে পরিণত করেছিল। তিনি এসেছিলেন মূর্তি ধ্বংস করার জন্য, খৃষ্টানরা সেই ঈসার মূর্তি বানিয়ে পূজা করছে। সেই সাথে তাঁর মা মেরীও ঈশ্বরের এক তৃতীয়াংশরূপে সর্বত্র পূজিত হচ্ছে। সেন্টপল ও পিটারের মূর্তি বানিয়েও পূজা করছে। সমগ্র জীবনকালে যে যত পাপই করুক না কেনো ত্রাণকর্তা যিশুকে একবার পূজা করলেই সকল পাপ ধুয়ে মুছে যাবে, এই বিশ্বাস খৃষ্টানদের মন-মগজে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এরপর Holy Roman Empire নামে পৃথক খৃষ্টান জগৎ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। রোমের পোপের হাতে খৃষ্টানদের যাবতীয় ধর্ম সংক্রান্ত অপরাধের বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এরপর ধর্মের দোহাই দিয়ে পোপ-পাদ্রীগণ যে বীভৎস লীলাখেলা শুরু করেছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা সে সব ঘৃণ্য ঘটনায় আজও কলঙ্কিত হয়ে আছে।

পোপ-পাদ্রীগণ ঘোষনা করেছিল, বেহেশতের চাবী একমাত্র তাদেরই হাতে। যে যত বড় পাপই করুক না কেন, পোপকে উপযুক্ত মূল্যদান করলে তাঁর কোনো ভয় থাকবে না, সে বেহেশতে যাবে। এই ঘোষনার ফলে সমগ্র খৃষ্টান

জগতে পাপ অন্যায় অনাচারের যে প্লাবন প্রবাহিত হয়েছিল অন্য জাতির ইতিহাসে তার উপমা নেই। ঐ ঘৃণ্য ঘোষনার ফলে আজও সমগ্র খৃষ্ট পৃথিবী পাপ পঙ্কিলতার অতল তলে নিমজ্জিত হয়ে আছে। প্রকৃত অর্থে তাদের কাছে ধর্ম বলতে যা আছে তা হযরত ঈসা (আ:) এর শিক্ষা নয়।

বর্তমানে ইঞ্জিল বা বাইবেল তা প্রধানত চারটি গ্রন্থের সমষ্টি। লুক, মার্ক, মথি ও যোহন। কিন্তু এই চারটি কিতাবের কোনটিই ঈসা (আ:) এর নয়। তাঁর প্রতি নাজিলকৃত ওহী একত্রে পাওয়া যায় না। তাঁর ভ্রমণকালে বিভিন্ন স্থানে যে সকল উপদেশ দিয়েছেন সেগুলো স্বয়ং তাঁর ভাষা নয়। বর্তমানে যা আছে তা যেমন আল্লাহর বাণী নয় তেমনি ঈসা (আ:) এর বাণীও নয়। এগুলো তাঁর শিষ্যদের বরং তস্য শিষ্যদের লিখিত গ্রন্থ। তারা তাদের জ্ঞানের পরিধি অনুসারে ঈসা (আ:) এর জীবনী, ইতিহাস এবং বাণীসমূহ লিখেছেন। মথি নামে যে গ্রন্থ রয়েছে তা স্বয়ং মথির লেখা যে নয়, তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। মথির আসল গ্রন্থ লেজিয়া বহু পূর্বেই বিলীন হয়েছে। মথির নামে যে পুস্তক আছে তার রচয়িতা যে কে তা জানার উপায় পাদ্রীরা রাখেনি। স্বয়ং মথির নামের জায়গায় একজন অপিরিচিত লোকের নামের মত উল্লেখ করা হয়েছে। মথি নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'ইয়াসু সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে মথি নামক একজন ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন'। মথি গ্রন্থের রচয়িতা যদি স্বয়ং মথি হতেন তাহলে তিনি এভাবে নিজের নাম উল্লেখ করতেন না। মথির গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায়, তা মারকাস গ্রন্থ থেকে ধার করা। কারণ মারকাস গ্রন্থের মোট আয়াতের সংখ্যা ১০৬৮ টি। এর মধ্যে ৪৭০টি আয়াতের সাথে মারকাসের বাইবেলের আয়াতের সাদৃশ্য রয়েছে।

মথির রচয়িতা যদি স্বয়ং মথি হতেন বা হযরত ঈসা (আ:) এর সঙ্গী হতেন তাহলে অন্য কারো লেখা বই থেকে তিনি সঙ্কলন করতেন না। খৃষ্টান গবেষকদের ধারণা, এই গ্রন্থটি ঈসার ৪১ বছর পরে ৭০ খৃষ্টাব্দে লেখা। আবার কারো ধারণা এটা ৯০ খৃষ্টাব্দে লেখা। যোহন নামে যে বাইবেল রয়েছে তা-ও হযরত ঈসা (আ:) এর সঙ্গী যে যোহন সে যোহনের লেখা নয় তা বর্তমানে খৃষ্টান গবেষকগণই স্বীকৃতি দিয়েছেন। যোহন নামে অন্য লোক যোহন কিতাব বানিয়েছে। এই কিতাব ৯০ খৃষ্টাব্দে বা তারও অনেক পরে রচনা করা হয়েছে। খৃষ্টান গবেষক হ্যারিং বলেছেন এটা ১১০ সালে রচিত।

মার্ক নামে যে বাইবেল রয়েছে তা মারকাসের লিখিত বাইবেল বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু মারকাস কখনো ঈসা (আ:) এর সাথে দেখা করেননি এবং তাঁর সঙ্গীও ছিলেন না। কেউ বলেছেন, এই মারকাস যিশুকে ক্রশে বিদ্ধ

করার সময় দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিল। কিন্তু এ কথার ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। মারকাস হলো সেন্ট পিটার নামক শিষ্যের শিষ্য এবং তার কাছ থেকে তিনি যা শুনেছেন তা তিনি গ্রীক ভাষায় লিখেছিলেন। এ কারণে খৃষ্টান ধর্ম বিশারদগণ তাকে সেন্ট পিটারের বাণীর ব্যাখ্যাতা বলে দাবী করেন। ৬৩ সালে বা ৭০ সালে এই মার্ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। লুক যে বাইবেল লিখেছেন তার মধ্যেও মারাত্মক বিভ্রান্তি রয়েছে। এই লুক নামক ধর্ম নেতা যে কখনো ঈসা (আ:) কে দেখেননি এবং তাঁর কথাও শোনেননি তা খৃষ্ট ধর্ম নেতারা একবাক্যে স্বীকার করেন। লুক ছিলেন সেন্ট পলের শিষ্য এবং তার সাথেই তিনি থাকতেন। লুক যা লিখেছেন তা সেন্ট পলের বাণী। স্বয়ং সেন্ট পল বলতেন, 'লুক যে বাইবেল রচনা করেছে তা আমার'।

সেন্ট পলও হযরত ঈসা (আ:) এর সাহচর্য লাভ করেননি। তিনি যিশু খৃষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হবার ৬০ বছর পরে খৃষ্ট ধর্মে দিক্ষীত হন। লুক নামক লোকটি হযরত ঈসা (আ:) এর বাণী কোত্থেকে জোটালো তা গবেষকদের কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। তারপর লুকের বাইবেল ইতিহাসের কোন্ সময় রচিত হয়েছে তা এখন পর্যন্ত নির্ণয় করা যায়নি। কেউ বলেছেন, লুক রচিত হয়েছে ৫৭ সালে আবার কেউ বলেছেন ৭৪ সালে। খৃষ্টান গবেষক পোমার, ম্যাকগিফটিং ও হ্যারিং-এর মত বিখ্যাত ব্যক্তিগণ বলেছেন ৮০ সালের পূর্ব পর্যন্ত লুক বাইবেল রচিত হয়নি। অতএব বর্তমান চারটি বাইবেলের একটিও হযরত ঈসা (আ:) পর্যন্ত পৌঁছে না। সুতরাং আজ জানারও উপায় নেই, হযরত ঈসা (আ:) এর বাণী কি ছিলো। এই চারটি গ্রন্থের বর্ণনার মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। ঈসা (আ:) এর নীতি ও আদর্শের যা প্রধানভিত্তি সেই পর্বতোপরি উপদেশসমূহ মথি, মারকাস ও লুক তিনজনে তিনভাবে পরস্পর বিরোধী পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। প্রতিটি গ্রন্থেই লেখকের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও মনোভাব সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

এসব পাঠ করলে মনে হয় যেন মথির প্রতিপক্ষ একজন ইয়াহূদী এবং সে তার বিতর্কে বিজয় লাভ করতে উদগ্রীব। মারকাসের প্রতিপক্ষ যেন একজন রোমক এবং তাকে তিনি ইসরাঈলী ইতিবৃত্ত শোনাতে চান। আর লুক যেন সেন্ট পলের উকিল এবং অন্যান্য শিষ্যদের বিরুদ্ধে তার দাবী সমর্থন করতে চান। আর যোহন যেন খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষের দিকে খৃষ্টানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া দার্শনিক সুফিবাদী তত্ত্ব কথা দ্বারা প্রভাবিত। এভাবে বাইবেলগুলোর মধ্যে তত্ত্বগত মতভেদ শাব্দিক বিরোধের চেয়েও বেশী হয়েছে।

ওদিকে ইঞ্জিলগুলো লিপিবদ্ধ করার কোনো চেষ্টাই খৃষ্টিয় দ্বিতীয় দশকের আগে করা হয়নি। ১৫০ সাল পর্যন্ত এই ধরণের ধারণা প্রচলিত ছিল যে, লেখার থেকে মৌখিক বর্ণনা অধিকতর ফলদায়ক। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে যা লিখা শুরু হলো সেগুলোকে নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নেয়া হলো না। নিউটেষ্টামেন্টের প্রথম প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপিটি ৩৯৭ সালে অনুষ্ঠিত কর্টোজেনা কাউন্সিলে অনুমোদন দেয়া হয়। চারটি বাইবেলই প্রথমে গ্রীক ভাষায় লিখিত হয়েছিল। অথচ হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সকল শিষ্যের ভাষা ছিল সুরিয়ানী। এভাবে ভাষার পরিবর্তনের কারণে চিন্তাধারা ও বক্তব্য বিষয়ের পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইঞ্জিলের যে প্রাচীনতম কপিটি বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত তা খৃষ্টিয় চতুর্থ শতকের। দ্বিতীয় লিপিটি পঞ্চম শতকের। আর তৃতীয় যে অসম্পূর্ণ লিপিটি রোমের পোপের লাইব্রেরীতে আছে, সেটাও চতুর্থ শতাব্দীর চেয়ে বেশী প্রাচীন নয়। সুতরাং প্রথম তিন শতাব্দীতে যে বাইবেল প্রচলিত ছিল তার সাথে বর্তমান বাইবেল কতটা সংগতিপূর্ণ তা বলা কতটা কঠিন, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

সে যুগে বাইবেলকে কোরআনের মত মুখস্থ করার চেষ্টাই করা হয়নি। প্রথম দিকে এর প্রচার ও প্রসার সম্পূর্ণরূপে মর্মগত বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল ছিল। বাইবেলের শব্দ নয়, এর বিষয় বস্তু প্রচার করা হতো। এতে স্মৃতির ত্রুটি বিচ্যুতি এবং বর্ণনাকারকদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। পরে যখন লিপিবদ্ধের কাজ শুরু হয় তখন তা নির্ভরশীল ছিল লিপিকারকদের কৃপার ওপর। লিপিকরণের সময় যে জিনিষ লিপিকারকের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ও বিশ্বাসের পরিপন্থী তা কাটছাট করে নিজের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ বিশ্বাস অনুপ্রবিষ্ট করাটা অসম্ভবের কিছুই নয়। সুতরাং খৃষ্টানদের কাছে তাদের ধর্মের অবস্থা তখন যেমন ছিল বর্তমানে তার চেয়ে উন্নত তো নয়ই অবনতিই ঘটেছে।

নবী করীম (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর জাতিকে সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন এবং তাঁর নাম পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা আস্ সফ্-এ বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) নিজ জাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার জন্য আমার সদৃশ্য এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে। কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে। যথা, আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আওয়াজ পুনর্বার

শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব আর আমি তাহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব'। (ধর্মপুস্তক দ্বিতীয় বিবরণ অধ্যায় ১৮ : শ্লোক ১৫ হইতে ১৯)।

এটি তাওরাতের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী নবী করীম (সাঃ) ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য হয় না। এতে হযরত মূসা নিজের জাতির জনগণকে আল্লাহর এই বাণী শুনিয়েছেন যে, আমি তোমার জন্য তোমার ভাইদের মধ্য থেকে একজন নবী বানাবো। এই কথা সবার কাছেই স্পষ্ট যে, কোনো জাতির 'ভাই' কথার অর্থ সেই জাতিরই কোনো গোত্র বা বংশ পরিবার বুঝানো হয়নি, বরং এর অর্থ অপর এমন কোনো জাতি যার সাথে তার নিকটবর্তী বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে। স্বয়ং বনী-ইসরাঈলের কোনো নবীর আগমন সম্পর্কেই যদি এই সুসংবাদ হতো, তাহলে বলা হতো, 'আমি তোমাদের জন্য স্বয়ং তোমাদের মধ্য হইতে একজন নবী প্রতিষ্ঠিত করিব'। কিন্তু এখানে তা বলা হয়নি। বলা হয়েছে, 'উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে'। অতএব বনী-ইসরাঈলীদের 'ভাই' বনী-ইসরাঈলই হতে পারে। হযরত ইবরাহীমের বংশধর হওয়ার কারণে এদের সাথে তাদের বংশীয় সম্পর্ক বিদ্যমান। উপরন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী বনী-ইসরাঈলের অপর কোনো নবী সম্পর্কে প্রয়োজ্য হতে পারে না এই কারণেও যে, হযরত মূসার পর বনী ইসরাঈল বংশে এক দুইজন নয়, বহু সংখ্যক নবী এসেছেন। বাইবেলে তাদের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এই সুসংবাদে দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে, 'যে নবী পাঠানো হবে তিনি হযরত মূসার মত হবেন'। কিন্তু আকার-আকৃতি, চেহারা ও জীবন-অবস্থার দিক দিয়ে সাদৃশ্যের কথা যে এটা নয়, তা তো সুস্পষ্ট। কেননা এই সব দিক দিয়ে দুনিয়ার কোনো দুই ব্যক্তিই একই রকম হয় না। নিছক নবুয়্যাত সংক্রান্ত গুণাবলীর সাদৃশ্যও এই কথার উদ্দেশ্য নয়। কেননা হযরত মূসার পরে আগত সকল নবীই এই ব্যাপারে অভিন্ন। সুতরাং কোনো একজন নবীর এমন বিশেষত্ব থাকতে পারে না, যে দিক দিয়ে তিনি তার মত হবেন। এই দুইটি দিকের সাদৃশ্যের কথা বাদ দিলে তৃতীয় কোনো সাদৃশ্যের বিষয় হতে পারে এবং সেই দিকের বিশেষত্বে তাঁর অনন্য হওয়ার কথা বোধগম্য। আর তা

একমাত্র এটাই হতে পারে যে, সেই নবী এক নবতর স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ শরীয়াতের বিধান নিয়ে আগমনের ব্যাপারে তিনি হযরত মূসার মত হবেন। আর এই বিশেষত্ব নবী করীম (সা:) ছাড়া আর কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। কেননা তাঁর পূর্বে বনী-ইসরাঈলীদের মধ্যে যত নবীই এসেছেন তাঁরা সকলেই হযরত মূসার আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তাঁদের কেউ-ই স্বতন্ত্র আদর্শ নিয়ে আগমন করেননি।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগুলো থেকে উপরে দেয়া ব্যাখ্যা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। 'কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে' যথা, আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আওয়াজ পুনর্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, ইহারা ভালই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উপৎন্ন করিব, তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন'।

তাওরাতের এই বাণীতে 'হোরেব' অর্থ সেই পাহাড়, যেখানে হযরত মূসা (আ:)কে সর্বপ্রথম ইসলামের বিধান দেয়া হয়েছিল। আর বনী ইসরাঈলীদের যে প্রার্থনার কথা তাওরাতে উল্লেখিত হয়েছে তার অর্থ এই যে, 'ভবিষ্যতে আমাদিগকে শরীয়াত দেওয়া হইলে তাহা যেন সেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দেওয়া না হয়, যাহা হোরেব পর্বতের পাদদেশে শরীয়াত দেওয়ার সময় উদ্ভব করা হইয়াছিল'। (বাইবেলের যাত্রা পুস্তক ১৯ : ১৭ ও ১৮ দ্রষ্টব্য)।

এর জওয়াবে হযরত মূসা বনী ইসরাঈলীদের বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এই প্রার্থনা কবুল করে বলেছেন, 'আমি তাহাদের জন্য এমন এক নবী প্রেরণ করিব, যাহার মুখে আমি আমার বাক্য দিব'। অর্থাৎ ভবিষ্যতে শরীয়াত দেওয়ার সময় সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হবে না, যা হোরেব পাহাড়ের পাদদেশে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এরপর যে নবী এই পদে অধিষ্ঠিত হবেন তার মুখে শুধু আল্লাহর কালাম দেয়া হবে আর তিনি তা সর্বসাধারণে শুনিয়ে দিবেন।

এই স্পষ্ট কথাগুলো চিন্তা বিবেচনা করার পর এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না যে, এই নবী- যার কথা এই প্রার্থনা ও জবাবে বলা হয়েছে, তিনি নবী করীম (সা:) ছাড়া আর কেউ-ই হতে পারেন না। হযরত মূসার পর স্বতন্ত্র স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বা শরীয়াত কেবল তাঁকেই দেয়া হয়েছে।

তা দেয়ার সময় হোরেব পর্বতের পাদদেশে বনী-ইসরাঈলীদের যে সমাবেশ হয়েছিল তেমন কোনো জনসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি এবং শরীয়াতের বিধান দেয়ার সময় অনুরূপ পরিস্থিতিরও উদ্ভব করা হয়নি।

যোহন ইঞ্জীল সাক্ষ্য দেয়, হযরত ঈসার আগমনকালে বনী ইসরাঈলীরা তিন ব্যক্তির আগমনের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব ছিল। একজন হযরত ঈসা, দ্বিতীয় ইলিয়া (হযরত ইলিয়াসের পুনরাগমন) আর তৃতীয় সেই নবী যাঁর প্রস্তাব উক্ত বাণীতে করা হয়েছে। ইঞ্জীল যোহনের ভাষা হলো, 'আর যোহনের (হযরত ইয়াহ্ইয়া) এর সাক্ষ্য এই, যখন ইয়াহুদীগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া যিরুশালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, 'আপনি কে? তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না; তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খৃষ্ট নই। তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন, না। তখন তাঁহারা তাহাকে কহিল, আপনি কে? যাঁহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন? তিনি কহিলেন, আমি 'প্রান্তরে এক জনের রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ স্মরণ কর' যেমন যিশাইয় ভাববাদী বলিয়াছিলেন তাহারা ফরাশীগণের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। আর তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খৃষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন? (১ম অধ্যায়ঃ ১৯ হইতে ২৫ স্তোত্র)

বাইবেলের এই বক্তব্য থেকেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাঈলীরা হযরত ঈসা মসীহ ও হযরত ইলিয়াস ছাড়া আরও একজন নবীর প্রতীক্ষমান ছিল। তিনি হযরত ইয়াহইয়াও নন। এই 'ভাববাদী' বা নবীর আগমন সংক্রান্ত বিশ্বাস বনী-ইসরাঈলীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত ও সর্বজন বিদিত ছিল যে, 'সেই নবী' বলতে তাঁর দিকে ইংগিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। সেই সঙ্গে 'যার আগমন সংবাদ তাওরাতে দেয়া হয়েছে' বলার প্রয়োজনই হতো না। সুতরাং এ কথাও জানা গেল যে, যে নবীর প্রতি তারা ইংগিত করতো তাঁর আগমন অকাট্যভাবে প্রমাণিত ছিল।

যোহন লিখিত সুমাচার গ্রন্থের ১৪ অধ্যায় হইতে ১৬ অধ্যায় পর্যন্ত ক্রামগতভাবে যে ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষিত ও উদ্ধৃত হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। সেখানে বলা হয়েছে, 'আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের আত্ম; জগৎ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা

সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিত করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবে'। (১৪: ১৬ ও ১৭ স্তোত্র)

'তোমাদের নিকট থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন'। (১৪: ২৫ ও ২৬ স্তোত্র)

'যাহাকে পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিবেন, যখন সেই সহায় আসিবেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন'। (১৪: ২৬ স্তোত্র)

'তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবে না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাহাকে পাঠাইয়া দিব'। (১৬: ৭ স্তোত্র)।

'তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। কিন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার তিনি তাহাই লইয়া থাকেন ও তোমাদিগকে জানাইবেন। (১৬ : ১২ হতে ১৫ স্তোত্র)

এই উদ্ধৃতিসমূহের অর্থ নির্ধারণ করার জন্য সর্বপ্রথম জানতে হবে হযরত ঈসা (আ:) এবং তাঁর সমসাময়িক ফিলিস্তীনবাসীদের সাধারণ ভাষা ছিল আরামীয় ভাষার সেই কথন, যাকে 'সুরিয়ানী' প্রাচীন সিরিয়ার ভাষা বলা হয়। হযরত ঈসার জন্মের দুই শত থেকে আড়াই শত বৎসর পূর্বেই সালুকী শাসন আমলের এ অঞ্চল থেকে হিব্রু ভাষা বিদায় নিয়েছিল এবং সুরিয়ানী ভাষা তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। যদিও সালুকী এবং পরে রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবে গ্রীক ভাষা এ অঞ্চলে পৌছেছিল, কিন্তু তা কেবল সেই লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যারা সরকারী দরবারে স্থান লাভ বা স্থান পাওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রীকপন্থী হয়েছিল। ফিলিস্তিনের সাধারণ অধিবাসীরা সুরিয়ানী ভাষার একটি বিশেষ বাচন ব্যবহার করতো যার স্বর, উচ্চারণ ভঙ্গী ও কথন দামেশক

এলাকায় ব্যবহৃত সুরিয়ানী ভাষা থেকে ভিন্নতর ছিল। এই দেশের জনগণ গ্রীক ভাষা জানতো না। ৭০ খৃষ্টাব্দে যেরুশালিম দখল করার পর রোমীয় সেনাধ্যক্ষ টিটাস যেরুশালিমবাসীদের সম্মুখে গ্রীক ভাষায় ভাষণ দিলে তখন সুরিয়ানী ভাষায় তার তরজমা করতে হয়েছিল। এ ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ:) তাঁর সাথীদের যা কিছু বলেছেন তা অবশ্যই 'সুরিয়ানী' ভাষায় বলে থাকবেন।

বাইবেল-এর চারটি ইঞ্জিলই গ্রীকভাষী খৃষ্টান কর্তৃক লিখিত হয়েছিল, যারা হযরত ইসা (আ:) এর অনেক পরে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ:) এর কথা ও কাজ-কর্মের বিবরণ সুরিয়ানী ভাষী খৃষ্টানদের মাধ্যমে লিখিত আকারে নয় মৌখিক বর্ণনারূপে পৌঁছেছিল। আর তারা এই সুরিয়ানী বর্ণনাসমূহ নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে সন্নিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করেছিল। ৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে একটি ইঞ্জিলও লিখিত হয়নি আর 'যোহন লিখিত সুসমাচার' তো হযরত ঈসা (আ:) এর এক শতাব্দী পরে সম্ভবত এশিয়া মাইনরের এফ্‌সুস শহরে লিখা হয়েছিল। এই ইঞ্জিলসমূহেরও কোনো কপি-যা গ্রীক ভাষায় সর্বপ্রথম লিখিত হয়েছে সেটা কোথায়ও রক্ষিত নেই। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্বে গ্রীক ভাষায় লিখিত যত পাণ্ডুলিপি নানা স্থান থেকে অনুসন্ধান করে একত্রিত করা হয়েছিল, এর মধ্যে একটিও চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বের নয়। সুতরাং তিন শত বছরের মধ্যে তাতে কতটা পরিবর্তন হয়ে থাকবে তা বলা কঠিন। একটি বিশেষ কারণে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে যায় তাহলো, খৃষ্টানরা নিজেদের ইঞ্জীল ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্ধন-পরিবর্তন করা সম্পূর্ণ বৈধ ও সংগত মনে করতো। ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা ১৯৪৬ সনের সংস্করণ-এর 'বাইবেল' শীর্ষক প্রবন্ধ রচয়িতা লিখেছেন–

'বর্তমানে ইঞ্জীলসমূহে সচেতনভাবে এমন সব সুস্পষ্ট পরিবর্তন করা হয়েছে, যা স্থান বিশেষ সকল কথাই অন্য এক উৎস থেকে নিয়ে মূল গ্রন্থে শামিল করা হয়েছে। এসব পরিবর্তন স্পষ্টভাবে এমন কিছু লোক ইচ্ছাপূর্বক করেছে যারা কোথাও থেকে কিছু তথ্য পেয়ে মূল গ্রন্থকে উন্নত ও অধিক কল্যাণকর বানানোর জন্য নিজদেরকে এই কাজের অধিকারপ্রাপ্ত মনে করে তাতে নিজের পক্ষ থেকে ঐ তথ্যসমূহ শামিল করে দিত। দ্বিতীয় শতকেই বহু অতিরিক্ত বিষয় সংযোজিত হয়েছে কিন্তু সেগুলোর উৎস কি ছিল তা জানা যায়নি'।

এ অবস্থায় ইঞ্জীলসমূহে হযরত ঈসা (আ:) এর যেসব বাণী আমরা বর্তমানে দেখতে পাই, তা যথাযথ উদ্ধৃত হয়েছে এবং তাতে রদ-বদল হয়নি এমন কথা বলা কঠিন। মুসলিম বিজয়ের পরও প্রায় তিন শত বছর পর্যন্ত ফিলিস্তি

নের খৃষ্টান অধিবাসীদের ভাষা সুরিয়ানীই ছিল। খৃষ্টিয় নবম শতাব্দীতে আরবী ভাষা এর স্থান দখল করে। এসব সুরিয়ানী ভাষাভাষী ফিলিস্তিনীদের মাধ্যমে খৃষ্টান রীতিনীতি ও ঐতিহ্য বা ধর্মাচরণ ইতিহাস সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রাথমিক তিন শত বছরের মুসলিম মনীষীগণ পেয়েছেন, তা সেসব লোকের লব্ধ তথ্যের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য হওয়াই স্বাভাবিক যারা 'সুরিয়ান' থেকে গ্রীক এবং পরে গ্রীক থেকে ল্যাটিন ভাষাসমূহে অনুবাদের পর এসব তথ্য জানতে পেরেছেন। কেননা হযরত মসীহর মুখ-নি:সৃত আসল সুরিয়ানী শব্দসমূহ মুসলিম মনীষীদের কাছে সুরক্ষিত থাকার সম্ভাবনাই অধিক।

এসব তত্ত্ব ও তথ্য অনস্বীকার্য এবং এ থেকে অকাট্যভাবে জানা যায় যে, 'যোহন সুসমাচারে' উপরোদ্ধৃত উক্তির মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ:) তাঁর পরে আগমনকারী একজন নবীর আগাম সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে বলছেন, 'তিনি জগতে অধিপতি (বিশ্বশ্রেষ্ঠ) হইবেন, তিনি চিরকাল তোমাদের সাথে থাকিবেন, পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন, তিনি আমার (অর্থাৎ হযরত ঈসার) বিষয় সাক্ষ্য দিবেন'। 'যোহন সুসমাচারের' এসব বাক্যের সাথে 'সত্যের আত্মা' 'পবিত্র আত্মা' প্রভৃতি বাক্যাংশ যোগ করে মূল বক্তব্য ঘোলাটে করার যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব কথা গভীর চিন্তা-বিচেনা সহকারের পাঠ করলে স্পষ্ট জানা যায়, যে আগমনকারী সম্পর্কে আগাম সংবাদ দেয়া হচ্ছে, তিনি কোনো আত্মা নন, কোনো বিশেষ ব্যক্তিই হবেন। যার উপস্থাপিত শিক্ষা ও আদর্শ সার্বজনীন, বিশ্বব্যাপক ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে। সেই বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য বাইবেলের বাংলা অনুবাদে 'সহায়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর আসলে যোহন ইঞ্জীলে গ্রীক ভাষায় যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল, সে বিষয়ে খৃষ্টানদের দাবি হলো, সেই শব্দটি Paracletis ছিল। কিন্তু এ শব্দের সঠিক অর্থ নির্ধারণে খোদ খৃষ্টানদের বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মূল গ্রীক ভাষায় Paraclet শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে, কোন স্থানের দিকে ডাকা, সাহায্যের জন্য ডাক দেয়া, ভয় প্রদর্শন, সতর্কীকরণ, উৎসাহ দান, অনুপ্রাণিত করা, আবেদন-নিবেদন করা, দেয়া, চাওয়া প্রভৃতি। গ্রীক বাগবিধি অনুসারে এই শব্দটি এসব অর্থ দেয়, সান্ত্বনা দান, শান্তি বর্ষণ, সাহস বৃদ্ধিকরণ। বাইবেলের যেসব স্থানে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেসব স্থানে এর কোনো একটি অর্থও যথার্থভাবে বসে না। Origen কোথায়ও অনুবাদ করেছেন Consolator কোথাও Deprecator। কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যাকাররা এই দুইটি অনুবাদকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা একে তো গ্রীক

ব্যকারণের দৃষ্টিতে তা যথার্থ ও সঠিক নয়। যে সকল স্থানে এই শব্দটি এসেছে সেসব স্থানে এই অর্থ গ্রহণ করা চলে না। অপর কয়েকজন অনুবাদক এর অনুবাদ করেছেন Teacher বা শিক্ষক। কিন্তু গ্রীক ভাষার ব্যবহার রীতি অনুসারে এই অর্থের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। তরতোলিয়ান ও আগস্টাইন Advocate শব্দটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অন্য কিছু লোক Assistant, Comforter, Consoler প্রভৃতি শব্দ গ্রহণ করেছে। (ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিক্যাল লিটারেচার, Paracletus শব্দ দ্রষ্টব্য)

গ্রীক ভাষায়ই আর একটি শব্দ রয়েছে Periclytos, এর অর্থ প্রশংসিত, যার প্রশংসা করা হয়েছে। এই শব্দটি পরিপূর্ণভাবে 'মুহাম্মাদ' শব্দের সমার্থবোধক। আর এই দুই মূল গ্রীক শব্দে Parcletus, Periclytos এর উচ্চারণে খুবই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান। যেসব খৃষ্টান পণ্ডিত নিজেদের ধর্মগ্রন্থে ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী এক বিন্দু দ্বিধা-সংকোচ ব্যতীতই পরিবর্তন করতে অভ্যস্ত, তারা যদি যোহন সুসমাচারের উপরোদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীর এই শব্দটিকে নিজেদের মনগড়া ধর্ম বিশ্বাসের বিপরীত দেখে এর বানানে সামান্য পরিবর্তন করে থাকেন, তবে তা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তুলনা করে দেখার জন্য যোহন লিখিত সুসমাচারের প্রাথমিক দিকের গ্রীক গ্রন্থ পৃথিবীতে কোথায়ও নেই। মূল গ্রন্থে দুইটি শব্দের মধ্যে আসলে কোন্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা খোঁজ করে দেখার কোনই উপায় নেই।

যোহন গ্রীক ভাষার কোন্ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তা নির্ধারণের উপর এই বিষয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা নির্ভরশীল নয়। কেননা এও আসলে অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত ঈসার ভাষা ছিল ফিলিস্তীনী সুরিয়ানী এবং তিনি তাঁর সুসংবাদ ভাষণে যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা অবশ্যই সুরিয়ানী ভাষার শব্দ হবে। সৌভাগ্য বশতঃ সেই প্রকৃত সুরিয়ানী ভাষার শব্দটি ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম লিখিত সীরাত গ্রন্থে পাওয়া গিয়েছে। সেই সঙ্গে উক্ত শব্দের সমার্থক গ্রীক ভাষার শব্দটি যে কি তাও সেই কিতাব থেকে থেকে জানা যায়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সুত্রে ইবনে হিশাম ইউহান্নাস, ইউহান্না তথা যোহন লিখিত ইঞ্জীলের ১৫ অধ্যায়ের ২৩ থেকে ২৭ স্তোত্র ও ১৬ শ অধ্যায়ের স্তোত্র সমূহের অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন এবং তাতে গ্রীক ভাষায় 'ফারবেলীত' এর স্থলে সুরিয়ানী ভাষার শব্দ 'মুনহামান্না' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। এরপর ইবনে ইসহাক বা ইবনে

হিশাম এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, 'মুনহামান্না' শব্দের সুরিয়ানী ভাষায় অর্থ হলো 'মুহাম্মাদ'। আর গ্রীক ভাষায় এর অর্থ 'বারক্লিটুস'।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে ফিলিস্তীনের সাধারণ খৃষ্টানদের ভাষা খৃষ্টিয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত সুরিয়ানী ছিল। এ এলাকা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে ইসলাম বিজিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইবনে ইসহাক ৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এবং হিশাম ৮২৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। এর অর্থ, এ দু'জন ঐতিহাসিকের জীবদ্দশায় ফিলিস্তীনের খৃষ্টানরা সুরিয়ানী ভাষায় কথা বলতো এবং তাদের দু'জনের পক্ষে নিজেদের দেশীয় খৃষ্টান প্রজা সাধারণের সাথে যোগাযোগ করা কিছু মাত্র কঠিন ছিল না। সে যুগের গ্রীক ভাষাভাষী খৃষ্টানও লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ইসলাম অধিকৃত অঞ্চলে বসবাস করতো। এ কারণে সুরিয়ানী ভাষার কোন্ শব্দটির সমার্থবোধক গ্রীক ভাষার শব্দ কোন্‌টি, তা জেনে নেয়া কিছুমাত্র অসুবিধাজনক ছিল না। ইবনে ইসহাক কর্তৃক উদ্ধৃত অনুবাদে সুরিয়ানী শব্দ মুনহামান্না ব্যবহৃত হয়ে থাকলে এবং ইবনে ইসহাক কিংবা ইবনে হিশাম আরবী ভাষায় এর সমার্থক শব্দ মুহাম্মাদ ও গ্রীক ভাষার সমার্থক শব্দ বারক্লিটুস বলে ঘোষণা করে থাকলে এর সত্যতা ও যথার্থতার কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। আর এ থেকেই সন্দোহাতীতভাবে জানা গেল যে, হযরত ঈসা (আ:) নবী করীম (সা:) এর পবিত্র নাম নিয়ে তাঁর শুভাগমনের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে এ কথাও জানা যায় যে, যোহন লিখিত গ্রীক ভাষার ইঞ্জীলে মূল শব্দ কোনো এক সময় Periclytos ব্যবহৃত হয়েছে আর খৃষ্টানরা পরবর্তীকালে কোনো এক সময় এ শব্দটি পরিবর্তন করে সেখানে Parcletus ব্যবহার শুরু করেছে।

এর থেকেও অধিক প্রাচীন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ও প্রমাণ হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) এর একটি বর্ণনা। তিনি বলেছেন, আবিসিনীয়াগামী মুসলিম মুহাজিরগণকে নাজ্জাশী নিজের দরবারে ডাকলেন এবং হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা:) এর কাছ থেকে নবী করমী (সা:) এর উপস্থাপিত শিক্ষা ও আদর্শ জানতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, 'তোমাদেরকে স্বাগত জানাই এবং তাকেও যাঁর কাছ থেকে তোমরা এসেছো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনিই সেই সত্তা যার উল্লেখ আমরা ইঞ্জীলে পাই এবং তিনিই সেই নবী ও রাসূল যাঁর আগমন সম্পর্কে ঈসা ইবনে মরিয়াম আগাম সুসংবাদ দিয়েছেন'। (মুসনাদে আহমাদ)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে নাজ্জাশী জানতো যে, হযরত ঈসা (আ:) একজন নবীর আগমণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে

গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ইঞ্জীল গ্রন্থেও সেই নবীর সম্পর্কে উল্লেখ ছিল বলেই নাজ্জাশী এই কথা ঘোষণা করতে এক বিন্দু দ্বিধাবোধ করলেন না যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সেই নবী। তবে নাজ্জাশী এই সুসংবাদের কথা যোহন লিখিত সুসমাচার থেকেই জানতে পেরেছেন বা অন্য কোনো সূত্রও তখন পর্যন্ত ছিলো কিনা জানা যায় না।

নবী করীম (সাঃ) এর সম্পর্কে হযরত ঈসার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহই নয় স্বয়ং হযরত ঈসার নিজের সঠিক অবস্থা ও তার প্রদত্ত প্রকৃত শিক্ষা জানার নির্ভরযোগ্য সুত্র সেই চারটি ইঞ্জীল নয়, যেগুলোকে খৃষ্টান গির্জা নির্ভরযোগ্য ও সর্বসমর্থিত ইঞ্জীল রূপে গ্রহণ করেছে। বরং তার জন্য অধিক নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাস্য উপায় হলো সেই ইঞ্জীল বারনাবাস। যাকে গীর্জা বে-আইনী, সন্দেহজনক ও অপ্রামাণিক বলে চিহ্নিত করেছে। খৃষ্টানরা এই ইঞ্জীল গোপন রাখার জন্য বহু চেষ্টা করেছে। শত শত বছর পর্যন্ত তা দুনিয়ায় অপরিচিত ও অপ্রকাশিত রয়েছে। ষষ্ঠদশ শতকে এর ইটালীয় অনুবাদের মাত্র একটি বই পোপ সিক্সটাস এর গ্রন্থাগারে পাওয়া যেতো। তা অন্য কারও পাঠ করার অনুমতি ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে সেটা জন টোলেণ্ড নামক এক ব্যক্তির হস্তগত হয় এবং বিভিন্ন হাত ঘুরে ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে তা ভিয়েনা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পৌছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ আক্সফোর্ডের ক্লেরিগুন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা প্রকাশিত হওয়ার পরই সম্ভবত খৃষ্টান জগত অনুভব করতে পারলো, যে ধর্মমতকে হযরত ঈসার নামে চালানো হচ্ছে এই বই সেই ধর্মেরই মূল শিকড় কেটে ফেলে। এ কারণে ঐ মুদ্রিত বইগুলো বিশেষ ব্যবস্থাপনায় লুকিয়ে ফেলা হয়, এরপর তা আর কখনও প্রকাশিত হতে পারেনি। অপর একটি বই ইটালীয় অনুবাদ থেকে স্পেনীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছিল, তা অষ্টাদশ শতকে পাওয়া যেতো। জর্জসেল তাঁর কুরআনের ইংরেজি অনুবাদের ভুমিকায় এর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাও কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ফলে বর্তমানে সেটাও কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না। অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত এর ইংরেজি অনুবাদের একটি ফাটোস্টেট কপি দেখার অনেকেরই সৌভাগ্য হয়েছে। এটা একটি অতি বড় নিয়ামত। খৃষ্টানরা নিছক হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে সে ইঞ্জীল থেকে নিজদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

খৃষ্টানদের বই পুস্তকে যেখানেই এই ইঞ্জীলের উল্লেখ আসে সেখানে এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, এটা জাল ইঞ্জীল। মুসলমানরা এটা রচনা করে বারনাবাস-এর নামে চালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের এ কথা ডাঁহা মিথ্যা। এই

গ্রন্থের নানা স্থানে হযরত মুহাম্মাদ (সা:) এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ আছে বলেই তারা উক্ত ইঞ্জীল সম্পর্কে এ কথা প্রচার করেছে এবং করছে। প্রথম কথা, এই ইঞ্জীল পাঠ করলেই নি:সন্দেহে ও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়, এই ইঞ্জীল কোনো মুসলমানের রচিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কোনো মুসলমানই যদি এটা লিখে থাকে, তাহলে এটা মুসলমানদের মধ্যেই বেশি চলতো এবং মুসলিম মনীষীদের রচিত গ্রন্থাবলীতে এর বিপুল উল্লেখ পাওয়া যেতো। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে এমনটি হয়নি। বরং অবস্থা হলো, জর্জসেলের ইংরেজিতে অনুদিত কুরআনের ভুমিকা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে দুনিয়ার মুসলমানরা কিছুই জানতেন না। তাবারী, ইয়াকুবী, মাসউদী, আল-বেরুনী, ইবনে হাজম ও অন্যান্য যেসব প্রখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা মুসলমান সমাজে তুলনামূলকভাবে খৃষ্টান সাহিত্য সম্পর্কে অধিক অবহিত ছিলেন তাদের একজনের রচনাতেও খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ইঞ্জীল বারনাবাস সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিতই পাওয়া যায় না। মুসলিম জাহানের গ্রন্থালয়সমূহে যেসব বই পাওয়া যেতো, ইবনে নাদীম রচিত আল-ফিহরিস্ত ও হাজী খলীফা রচিত কাশফুয্যুনূনই তার সর্বোত্তম ও ব্যাপক গ্রন্থ তালিকা। কিন্তু এই দু'টি গ্রন্থ তালিকায়ও এই ইঞ্জীলের উল্লেখ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে কোনো মুসলিম মনীষীই ইঞ্জীল বারনাবাস-এর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। খৃষ্টানদের প্রচার যে মিথ্যা তার তৃতীয় ও অকাট্য দলীল হলো, নবী করীম (সা:) এর জন্মের ৭৫ বছর পূর্বে পোপ প্রথম গেলাসিয়াস এর সময়ে খারাপ বিশ্বাস ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী গ্রন্থাবলীর যে তালিকা রচিত হয়েছিল, ইঞ্জীল বারনাবাসও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশ্ন হলো, সে সময় কোন্ মুসলমান এমন ছিল যে, এই জাল ইঞ্জীল রচনা করতে পারতো। স্বয়ং খৃষ্টান গীর্জায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত বারনাবাসের ইঞ্জীলই প্রচলিত ছিল। একে নিষিদ্ধ করা হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

এ ইঞ্জীল থেকে নবী করীম (সা:) সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ:) এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ উদ্ধৃত করার পূর্বে এই ইঞ্জীল সম্পর্কে কিছুটা জানা প্রয়োজন। তাহলে এ গ্রন্থটির গুরুত্ব জানা যাবে এবং খৃষ্টান সমাজ এই গ্রন্থটির প্রতি এতটা রোষান্বিত ও অসন্তুষ্ট কেনো সে রহস্যও উদঘাটিত হবে।

বাইবেলে যে চারটি ইঞ্জীল গ্রন্থকে আইনসম্মত ও নির্ভরযোগ্য ঘোষণা করে যুক্ত করা হয়েছে, এর মধ্যে একটি গ্রন্থের লেখকও হযরত ঈসা (আ:) এর কোনো 'সাহাবী' নন। লেখকদের একজনও এই দাবি করেননি যে, তিনি হযরত ঈসা (আ:) এর সাহাবীদের কাছ থেকে লব্ধ তত্ত্ব ও তথ্য নিজের ইঞ্জীলে যুক্ত করেছেন। তাঁরা যেসব উপায় ও সূত্র

থেকে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন তার সূত্রও তাঁরা দেননি। এর মূল বর্ণনাকারী নিজ চোখে যেসব ঘটনা দেখেছেন এবং সেসব কথা নিজের কানে শুনেছেন যা তিনি বর্ণনা করেছেন বা এক বা একাধিক সূত্রের মাধ্যমে সেই কথাগুলো তাঁর কাছে পৌঁছেছে, এ বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। এটা একটি মৌলিক ত্রুটি। কিন্তু ইঞ্জীল বারনাবাস এই দোষ ও ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই ইঞ্জীল রচয়িতা নিজেই বলেছেন, আমি নিজে হযরত ঈসা মসীহর প্রাথমিক বারো জন হাওয়ারীর একজন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি নিজে হযরত মসীহর সঙ্গে রয়েছি। আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনাবলী ও নিজের কানে শোনা কথা এবং বাণীসমূহ আমি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করছি। এটুকু লিখেই তিনি ক্ষান্ত হননি। গ্রন্থের শেষভাগে তিনি বলেছেন, 'আমার সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তা দূর করে দিও এবং যথাযথ অবস্থায় দুনিয়ার সম্মুখে উদঘাটিত করে দেয়া তোমারই দায়িত্ব'।

বারনাবাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাইবেলের 'কার্যাবলী' গ্রন্থে বারনাবাস নামক এক ব্যক্তির নাম একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। এ লোকটি ছিল ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান ধর্ম প্রচার ও ঈসা মসীহর অনুসারীদের সাহায্য সহযোগিতা করার ব্যাপারে তার অবদানের প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু সে কখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। হযরত ঈসা (আঃ) এর বারজন সাহায্যকারীর যে তালিকা তিনটি ইঞ্জীলে দেয়া হয়েছে সেখানে তাঁর নাম উল্লেখ নেই। অতএব এই ইঞ্জীলের লেখক সেই বারনাবাস বা অন্য কেউ কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। মথি ও মার্ক শীষ্যদের যে তালিকা দিয়েছেন, বারনাবাসের দেয়া তালিকার সাথে তার মাত্র দুটো নামের পার্থক্য। একজনের নাম তুমা। এর পরিবর্তে বারনাবাস নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। লুক ইঞ্জীলে এই দ্বিতীয় নামটিও রয়েছে। এ কারণে এ ধারণা করার যৌক্তিকতা আছে যে, পরবর্তী কোনো এক সময় ঈসা (আঃ) এর শীষ্যদের তালিকা থেকে বারনাবাসকে বহিষ্কৃত করার উদ্দেশ্যে তুমার নাম যুক্ত করা হয়েছে, যেন বারনাবাসের ইঞ্জীল থেকে মুক্ত থাকা যায়। আর নিজেদের ধর্ম গ্রন্থসমূহে এ ধরনের পরিবর্তন করা তাদের কাছে কখনোই অপরাধ ছিলো না তা সচেতন মহল অবগত রয়েছে।

ইঞ্জীলের এ গ্রন্থটি যদি কোনো লোক বিদ্বেষদুষ্ট মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে উন্মুক্ত মনে পাঠ করে এবং নতুন নিয়মের চারটি ইঞ্জীলের সাথে তার তুলনা করে, তাহলে এ গ্রন্থটি যে সেই চারটির তুলনায় সর্বাধিক উত্তম তা সে নি:সন্দেহে বুঝতে পারবে। এই গ্রন্থটিতে হযরত ঈসা নবীর জীবন কাহিনী অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তা এমনভাবে যে, তা পাঠ করলে স্পষ্ট মনে হয়, কোনো লোক তাঁর সাথে উপস্থিত থেকে ও সকল ঘটনা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করে বর্ণনা করেছে। সে নিজেই যেন সেসব ব্যাপারে শরীক ও জড়িত ছিল। চারটি ইঞ্জীলের অসংলগ্ন কাহিনীর তুলনায় এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক বর্ণনাবলীও অধিক সুসংবদ্ধ। এর মাধ্যমে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা সহজে বুঝা যায়। হযরত ঈসা (আ:) কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা চার ইঞ্জীলের তুলনায় এই গ্রন্থটিতেই অধিক স্পষ্ট, বিস্তারিত ও মর্মস্পর্শীরূপে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কিত শিক্ষা, শিরক খণ্ডন, আল্লাহ্‌র গুণাবলী, ইবাদাতের ভাবধারা ও উত্তমমানের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত বিষয়াদি এই গ্রন্থটিতে বলিষ্ঠ ভাষায় অকাট্য যুক্তিসহকারে ও সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। যেসব শিক্ষণীয় উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ এই বিষয়গুলো বলেছেন, তার এক দশমাংশও এই চারটি ইঞ্জীলে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর শিষ্যদের কোন্ বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, তা বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। হযরত ঈসা (আ:) এর ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী ও তাঁর স্বভাব-প্রকৃতির সাথে কেউ এক বিন্দু পরিচিত হয়ে থাকলেই সে এই ইঞ্জীলটি পাঠ করে এ কথা মেনে নিতে বাধ্য হবে যে, এটা জাল গ্রন্থ নয়। এটা পরে কল্পনা করে কেউ লিখে দেয়নি। বরং হযরত মসীহ্ তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে চারটির তুলনায় এ গ্রন্থটিতেই অধিকতর ভাস্বর হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। চারটি ইঞ্জীলে উদ্ধৃত তাঁর বহু বাণী ও কথার মধ্যে যে বিরোধ ও অসংগতি সুস্পষ্ট, এ গ্রন্থটিতে তা পাওয়া যাবে না।

এ ইঞ্জীলে হযরত ঈসা (আ:) এর জীবন ও তার শিক্ষাসমূহ একজন নবীর জীবন ও শিক্ষার অনুরূপ মনে হয়। তিনি এতে নিজেকে ঠিক একজন নবী হিসেবেই উপস্থাপিত করেছেন। তিনি অতীত নবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থসমূহকে পরম সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। এতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, প্রকৃত সত্য জ্ঞান ও শিক্ষা লাভের জন্য নবী-রাসূলগণ প্রদত্ত শিক্ষা ছাড়া আর কোনোই উপায় নেই, থাকতে পারে না। যে লোক নবী-রাসূলগণকে পরিহার করে, অনুসরণ করে না, সে আসলে আল্লাহকেই পরিত্যাগ করে। তাওহীদ, রিসালাত ও পরকালে বিশ্বাস পর্যায়ে তিনি সেই

শিক্ষাই দিয়েছেন, যা দুনিয়ার সকল নবী রাসূলই দিয়েছেন। নামায, রোযা ও যাকাতের শিক্ষা দিয়েছেন। বারনাবাস তাঁর নামায সম্পর্কে বার বার যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে বুঝা যায়, ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও তাহাজ্জুদ নামাযের সময়সমূহে তিনি নামায আদায় করেছেন। তিনি নামাযের পূর্বে অযু করতেন তারও উল্লেখ রয়েছে। হযরত দাউদ ও সুলাইমান (আ:) কে তিনি আল্লাহ্‌র নবী বলে ঘোষণা করেছেন অথচ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তাদেরকে নবীগণের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। তিনি বলেছেন, হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল (আ:)কেই যবেহ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একজন ইয়াহুদী আলিমের দ্বারাও স্বীকার করিয়েছিলেন যে, হযরত ইসমাইল-ই প্রকৃত 'যবীহ'। বনী-ইসরাঈলীরা বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে হযরত ইসহাককে 'যবীহ' মনে করে, যার মূলে কোনোই ভিত্তি নেই। পরকাল, কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে তার শিক্ষা ঠিক তা-ই যা কুরআনে বলা হয়েছে।

বারনাবাসের ইঞ্জীলের বিভিন্ন স্থানে নবী করীম (সা:) এর আগমন সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এ কারণেই খৃষ্টানরা এ গ্রন্থটির বিরোধী, এ কথাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এ ইঞ্জীল তারা প্রত্যাখান করেছিল নবী করীম (সা:) এর জন্মেরও বহু পূর্বে। ঠিক কোন্ কারণে খৃষ্টানরা এ গ্রন্থটির বিরোধী, তা বুঝার জন্য কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন। হযরত ঈসা (আ:) এর প্রথম যুগের অনুসারীরা তাঁকে একজন নবী মাত্র জানতেন এবং মূসা (আ:) কর্তৃক প্রবর্তিত শরীয়াত মেনে চলতেন। আকীদা-বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম ও ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে নিজদের অন্যান্য বনী ইসরাঈল থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন মনে করতেন না। ইয়াহুদীদের সাথে তাদের মতবিরোধ ছিল শুধু এ ব্যাপারে যে, এরা হযরত ঈসা (আ:) কে মসীহ মানতে অস্বীকার করেছিল। পরবর্তীতে যখন সেন্টপল এ দলে যুক্ত হলেন তখন তিনি রোমান, গ্রীক ও অন্যান্য অ-ইয়াহুদী ও অ-ইসরাঈলী লোকদের মধ্যেও এ মতবাদের প্রচার ও প্রসার করতে শুরু করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি নতুন মতবাদ রচনা করলেন। এ মতবাদের আকীদা-বিশ্বাস মূলনীতি ও আদেশ-নিষেধ হযরত ঈসা (আ:) এর আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এ ব্যক্তি হযরত ঈসার সাহচর্য পাননি। বরং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি তার চরম বিরোধী ছিলেন। তারপরও কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের শত্রু হয়েই ছিলেন। পরে এই দলে যুক্ত হয়ে তিনি যখন একটি নতুন ধর্মমত রচনা করতে শুরু করলেন, তখনও তিনি হযরত ঈসার কোনো কথার সনদ দেননি। তিনি ভিত্তি করেছেন নিজের মস্তিষ্কের উপর। এ

নতুন ধর্ম রূপায়ণে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ধর্ম এমন হতে হবে যা সাধারণ অ-ইয়াহুদী জগত গ্রহণ করবে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, খৃষ্টানরা ইয়াহুদী শরীয়াতের বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পানাহারের ক্ষেত্রে হালাল হারামের সব বিধি-নিষেধ তিনি শেষ করে দিয়েছিলেন। খাতনা করার নিয়মও তিনি নাকচ করে দেন। আর এটা অ-ইয়াহুদীদের কাছে অসহ্য ছিলো। এমন কি তিনি মসীহর 'ইলাহ' হওয়া, 'খোদার পুত্র' হওয়ার এবং শূল বিদ্ধ হয়ে প্রাণ দেয়া, আদম সন্তানের জন্মগত 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' হয়ে যাওয়ার বিশ্বাসও রচনা করেন। প্রাথমিক পর্যায়ের অনুসারীগণ এসব নতুন আবিষ্কারের বিরোধিতা করেন। কিন্তু সেন্টপল যে দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন, তা থেকে অন্যদের একটি বিরাট বন্যা প্রবাহ এ ধর্মে অনুপ্রবেশের সুযোগ হলো। ফলে সেন্টপল বিরোধী মুষ্টিমেয় লোক এর বিরুদ্ধে মুহূর্তের জন্যেও টিকতে পারলো না। এরপরও খৃষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত হযরত ঈসার 'ইলাহ' হওয়ার ধারণাকে অস্বীকার করে এমন বহু লোকের অস্তিত্ব ছিল। চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে নাকিয়ার কাউন্সিল সেন্টপল প্রবর্তিত মতবাদকে সর্বসম্মত খৃষ্টান ধর্মমত হিসেবে মনোনীত করলো। পরে রোমান সম্রাট ও সাম্রাজ্য নিজ থেকেই খৃষ্টান হয়ে গেল। এরপর এই ধর্মমতের বিপরীত বিশ্বাস উপস্থাপনের সকল গ্রন্থাদি পরিত্যক্ত ও বে-আইনী ঘোষিত হলো এবং এই বিশ্বাসের অনুকূল গ্রন্থসমূহ নির্ভরযোগ্য হিসেবে গৃহীত হলো। ৩৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রথমবার আথানাসিয়াস লিখিত একটি চিঠির মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও সর্বসম্মত গ্রন্থাবলীর একটি সমষ্টির ঘোষণা করা হলো। পরে ৩৮২ খৃষ্টাব্দে পোপ ডেমাসিয়াস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলন তার সত্যতা স্বীকার করে নিলো। পঞ্চম শতকের শেষে পোপ গেলাসিয়াস এ গ্রন্থ সমষ্টিকে সর্বসম্মত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে অসমর্থিত গ্রন্থাবলীরও একটি তালিকা রচনা করলো। অথচ পল প্রবর্তিত যেসব আকীদা-বিশ্বাসকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো খৃষ্টান পণ্ডিত কখনও এই দাবি করতে পারেননি যে, তার মধ্যে একটি আকীদা-বিশ্বাসও হযরত ঈসা (আ:) নিজে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বরং গ্রহণীয় কিতাবগুলোর মধ্যে যেসব ইঞ্জীল গণ্য সেগুলোয় হযরত ঈসার নিজের উক্তি বলে এসব আকাদীর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বারনাবাসের ইঞ্জীল খৃষ্টধর্মের সরকারী বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্বাস উপস্থাপন করে বিধায় একে অগ্রহণীয় ও অসমর্থিত গ্রন্থাদির মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। এর গ্রন্থকার গ্রন্থের ভূমিকায় এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেছেন, 'সেই

লোকদের মতাবলীর সংশোধন করিতে হইবে, যাহারা শয়তানের প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া ঈসা মসীহকে 'খোদার পুত্র' বলিয়া মনে করিতে শুরু করিয়াছে, খাতনা করা অপ্রয়োজনীয় মনে করে এবং হারাম খাদ্যকে হালাল মনে করে। সেন্টপল (পোলোম) এই প্রতারিত লোকদের একজন'।

গ্রন্থকার বলেন, 'হযরত ঈসা যখন দুনিয়ায় জীবিত ছিলেন তখন তাঁহার মুজিযা সমূহ দেখিয়া সর্বপ্রথম মুশরিক রোমান সৈন্যরা তাঁহাকে 'খোদা' এবং এবং কিছু লোক 'খোদার পুত্র' বলিতে শুরু করিল। পরে বনী ইসরাঈলের সাধারণ মানুষের মনেও এই ছোঁয়া লাগিয়া যায়। ইহাতে হযরত ঈসা খুবই বিব্রত হইয়া পড়েন। তিনি বার বার অত্যন্ত কঠোরতা সহকারে তাহার নিজের সম্পর্কিত এই ভুল আকীদার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং যাহারা তাহার সম্পর্কে এই ধরনের কথাবার্তা বলে তাহাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিলেন এবং এই আকীদার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। পরে তিনি তাঁহার শীষ্যবর্গকে সমগ্র ইয়াহুদীয়ায় এই আকীদার প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিলেন। অতপর তাঁহার দোয়ায় তাহার শীষ্যদের দ্বারাও সেই সব মুজিযা সংঘটিত করাইলেন যাহা স্বয়ং হযরত ঈসা কর্তৃক সংঘটিত হইতেছিল। যেন যে লোকের দ্বারা এই মুজিয়া সংঘটিত হয় সে হয় 'খোদা' নহে 'খোদার পুত্র' এই ভুল ধারণা সহজেই দূর হইয়া যায়'।

বারনাবাস এ প্রসঙ্গে হযরত ঈসার বিস্তারিত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি কঠোর ভাষায় এসব ভুল বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেছেন। এই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ার দরুন তিনি নিজে যে বিব্রত ও কাতর হয়ে পড়েছিলেন নানাস্থানে তারও বর্ণনা দিয়েছেন। এ ছাড়াও হযরত মসীহ শূলের উপর প্রাণ ত্যাগ করেছেন-সেন্টপল রচিত এই আকীদারও স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ করা হয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রন্থকার তাঁর প্রত্যক্ষ বিবরণে বলেছেন, 'ইয়াহুদ ইস্কারিউতি যখন ইয়াহুদদের সরদার পাদ্রীর নিকট হইতে ঘুষ গ্রহণ করিয়া হযরত ঈসাকে গ্রেফতার করাইবার জন্য সিপাহীদের লইয়া আসিল তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে চারজন ফেরেশতা তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া গেলেন এবং ইয়াহুদা ইস্কারিউতির আকৃতি ও কণ্ঠস্বর হযরত ঈসার মতই বানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং তাহাকেই শূলে চড়ানো হইয়াছিল, হযরত ঈসাকে নহে'। এভাবেই এই ইঞ্জীল গ্রন্থটি সেন্টপল রচিত খৃষ্টধর্মের শিকড় উৎপাটন করে দিয়েছে। সেই সাথে পবিত্র কোরআনের এ সম্পর্কিত বর্ণনার সত্যতা ও যথার্থতাও ঘোষনা করেছে। অথচ কোরআন

নাযিল হওয়ার ১১৫ বছর পূর্বে এই গ্রন্থটির এসব বর্ণনাসমূহের কারণেই খৃষ্টান পাদ্রীগণ গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করেছিল।

সুতরাং বারনাবাসের ইঞ্জীল মূলতঃ প্রচলিত চারটি ইঞ্জীলের তুলনায় অধিক বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য ইঞ্জীল। হযরত ঈসা মসীহর শিক্ষাসমূহ, জীবন রচিত ও বাণীসমূহ এই গ্রন্থেই সঠিকভাবে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এ ইঞ্জীলটির সাহায্যে নিজেদের আকীদা বিশ্বাসকে সংশোধিত ও নির্ভুলভাবে গড়ে তোলা ও হযরত ঈসার আসল শিক্ষাসমূহ জেনে নেয়ার যে মহাসুযোগ খৃষ্টানদের কাছে ছিল, কেবলমাত্র হঠকারীতার বশবর্তী হয়েই তারা তা থেকে নিজদের বঞ্চিত করে রাখলো। বারনাবাস থেকে হযরত ঈসার যেসব আগাম সুসংবাদ নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে এ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছে, এরপর আমরা তা নির্দ্ধিধায় এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। এসব সুসংবাদমূলক বাণীতে হযরত ঈসা কোথাও নবী করীম (সাঃ) এর নামের উল্লেখ করেছেন, কোথাও শুধু 'রাসুলূল্লাহ' বলেছেন, কোথায়ও স্পষ্ট ভাষায় এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা সম্পূর্ণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এর সমার্থক। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করছি।

'সমস্ত নবী-যাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন এবং যাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার তাঁহারা সকলেই অস্পষ্ট ও মোটামুটি কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমার পর সমস্ত নবী ও মহান সত্তাসমূহের 'নূর' আসিবেন। তিনি নবীগণের বলা কথার অন্ধকারের উপর আলোকপাত করিবেন। কেননা তিনি আল্লাহ্র রাসূল'। (অধ্যায়ঃ ১৭)

'ফরিশী ও লাভীয়রা বলিল, তুমি যদি মসীহ না হও, না ইলিয়াস, না অন্য কোন নবী, তাহা হইলে তুমি নূতন শিক্ষা কেন পেশ কর? এবং নিজেকে মসীহ হইতেও অধিক বানাইয়া কেন পেশ করিতেছ? ঈসু জওয়াব দিলেন, যেসব মুজিযা আল্লাহ তা'আলা আমার হাতে দেখাইতেছেন, তাহা এই কথা প্রকাশ করে যে, আমি তাহাই বলি, যাহা আল্লাহ চাহেন। নতুবা আসলে আমি নিজেকে সেই (মসীহ) হইতেও বড় গণ্য হইবার যোগ্য মনে করি না, যাঁহার কথা তোমরা বলিতেছ। আমি তো আল্লাহ্র সেই রাসূলের মোজার বাঁধন কিংবা তাঁহার জুতার ফিতা খুলিয়া দেওয়ারও যোগ্য নহি, যাঁহাকে তোমরা মসীহ বল, যাঁহাকে আমার পূর্বে বানানো হইয়াছিল এবং আমার পরে আসিবেন। তিনি সত্য ও সততার কথা লইয়া আসিবেন, যেন তাঁহার দ্বীনের কোন শেষ বা সীমা না থাকে'। (অধ্যায়ঃ ৪২)

'দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে আমি তোমাদিগকে বলি যে, যে নবীই আসিয়াছেন তিনি কেবল একটি জাতির জন্য আল্লাহ্র রহমতের চিহ্ন হইয়া জন্মিয়াছেন। এই কারণে এহেন নবীগণের বাণী সেই লোকদের ছাড়া অন্যত্র প্রচারিত হয় নাই যাহাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল যখন আসিবেন, আল্লাহ্ হয়ত তাঁহাকে নিজের হাতের 'মোহর' দিয়া দিবেন। এমনকি, দুনিয়ার যেসব জাতি তাঁহার শিক্ষা পাইবে সেই সব জাতিকে মুক্তি ও রহমত পৌঁছাইয়া দিবেন। তিনি খোদাহীন লোকদের উপর ক্ষমতা ও আধিপত্য লইয়া আসিবেন। এবং মূর্তি পূজা এমনভাবে মূলোৎপাটন করিবেন যে, শয়তান দিশাহারা হইয়া যাইবে'। 'ইহার পর শীষ্যদের সহিত এক দীর্ঘ কথোপকথনে হযরত ঈসা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, সে বনী ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত হইবে'। (অধ্যায়: ৪৩)

'এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি যে, আল্লাহ্র রাসূল সেই উজ্জ্বলতা, যাহার দ্বারা আল্লাহ্র সৃষ্টি করা প্রায় সব জিনিসই সন্তোষ লাভ করিবে। কেননা তিনি প্রবুদ্ধি, বুঝ-সমঝ, উপদেশ, বুদ্ধিমত্তা, শক্তি-সামর্থ, ভয়-ভীতি, প্রেম-ভালবাসা, তাকওয়া-পরহেযগারীর ভাবধারায় সুসজ্জিত। তিনি দানশীলতা, অনুগ্রহ, সুবিচার, ন্যায়পরতা, ভদ্রতা-সভ্যতা ও ধৈর্য সহিষ্ণুতার ভাবধারায় এমনভাবে অলংকৃত যে, তিনি আল্লাহ্র নিকট হইতে সেই সমস্ত জিনিসের তুলনায় তিনগুণ বেশী পাইয়াছেন, আল্লাহ তাঁহার সৃষ্টিকুলের মধ্যে যাহাদিগকে এই ভাবধারা দিয়াছেন। কতই না মহান সময় হইবে, যখন তিনি দুনিয়ায় আসিবেন। বিশ্বাস কর, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছি, যেমনভাবে প্রত্যেক নবীই তাঁহাকে দেখিয়াছেন। তাঁহার 'রূহ'কে দেখিয়াই আল্লাহ তাহাকে নবুয়্যাত দান করিয়াছেন। আর আমি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি, তখন আমার আত্মা পরম প্রশান্তিতে ভরিয়া গিয়াছে এই কথা বলিতে গিয়া যে, হে মুহাম্মাদ, আল্লাহ্ তোমার সঙ্গে হউন। আর তিনি আমাকে তোমার জুতার ফিতা বাঁধার যোগ্য বানাইয়া দিন। কেননা এই মর্যাদাও যদি পাই, তাহা হইলে আমি আল্লাহ্র একজন বড় নবী এবং আল্লাহ্র একজন পবিত্র সত্তা হইয়া যাইব'। (অধ্যায়: ৪৪)

'(আমার যাওয়ায়) তোমাদের দিল যেন কাতর না হয়, না তোমরা ভয় পাইবে। কেননা আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করি নাই। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই তোমাদের রক্ষাণবেক্ষণ করিবেন। আমার কথা আমি তো এখন দুনিয়ায় সেই আল্লাহ্র রাসূলের জন্য পথ বানাইবার জন্য আসিয়াছি, যিনি দুনিয়ার জন্য

মুক্তি লইয়া আসিবেন। ইন্দারিয়াস বলিল: গুরু আমাদিগকে তাঁহার লক্ষণাদি বলিয়া দিন, যেন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি। ঈসা উত্তর দিলেন: তিনি তোমাদের সময়ে আসিবেন না। তোমাদের কয়েক বৎসর পরে আসিবেন, যখন আমার ইঞ্জীল এমনভাবে বিকৃত হইয়া সারিবে যে, ৩০ জনলোকের ঈমানদার থাকাও কঠিন হইবে। সেই সময় আল্লাহ্ দুনিয়ার প্রতি 'রহম' করিবেন। এবং নিজের রাসূলকে পাঠাইবেন। তাঁহার শিরোপরে শ্বেত মেঘের ছায়া হইবে। তাহা হইতে তিনি যে আল্লাহ্র নিকট সম্মানার্থ তাহা জানা যাইবে। আর ইহারই সাহায্যে দুনিয়া আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করিবে। তিনি খোদাহীন লোকদের বিরুদ্ধে বিরাট শক্তি লইয়া আসিবেন ও পৃথিবীতে মূর্তিপূজা নির্মূল করিবেন। আর এই জন্য আমার বড়ই আনন্দ। কেননা তাহার সাহায্যে আমাদের আল্লাহ্ পরিচিত হইবেন। তাঁহার পবিত্রতা ও মহানত্ব বাস্তবায়িত হইবে। আমার সত্যতাও দুনিয়া জানিতে পারিবে। তিনি যেসব লোকের উপর প্রতিশোধ লইবেন, যাহারা আমাকে মানুষ হইতেও উর্ধ্বের কিছু গণ্য করিবে। তিনি এমন এক সত্য লইয়া আসিবেন যাহা সমস্ত নবীগণের হইয়া আসা মহাসত্য হইতেও অধিক সুস্পষ্ট হইবে'। (অধ্যায়: ৭২)

'আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি যেরূশালেমে সুলাইমানের উপাসনালয়ের অভ্যন্তরে করা হইয়াছিল। অন্য কোথায়ও নয়। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস কর, একটা সময় আসিবে, যখন আল্লাহ্ তাঁহার রহমত অপর এক শহরে নাযিল করিবেন। পরে সর্বত্র তাঁহার সঠিক ইবাদত হইতে পারিবে। আর আল্লাহ্র স্বীয় রহমতে প্রত্যেক স্থানে সত্যিকার নামাযকে কবুল করিবেন। আমি আসলে ইসরাঈলের পরিবারের প্রতি মুক্তির নবী রূপে প্রেরিত হইয়াছি। কিন্তু আমার পর মসীহ আসিবেন আল্লাহ্ প্রেরিত সমগ্র জগতের প্রতি, যাহার জন্য আল্লাহ্ এই সারা জগত সৃষ্টি করিয়াছেন। তখন সারা দুনিয়ায় আল্লাহ্র ইবাদত হইবে এবং তাঁহার রহমত নাযিল হইবে'। (অধ্যায়: ৮৩)

'(ঈসু পাদ্রী সরদারকে বলিলেন) জীবন্ত আল্লাহ্র শপথ! যাহার উদ্দেশ্যে আমার প্রাণ সম্পর্কিত, আমি সেই মসীহ নহি যাহার আগমনের জন্য আল্লাহ্র দুনিয়ার জাতিগুলি অপেক্ষা করিতেছে, আল্লাহ্ যাহার ওয়াদা আমাদের পিতা ইবরাহীমকে এই কথা বলিয়া করিয়াছিলেন: 'তোমার বংশের উসীলায় পৃথিবীর সব জাতি বরকত লাভ করিবে'। (আদি পুস্তক ২২: ১৮)

'কিন্তু আল্লাহ যখন আমাকে দুনিয়া হইতে লইয়া যাইবেন, তখন শয়তান আবার এই বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবে যে, আল্লাহ্র ভয়হীন লোকেরা আমাকে

খোদা ও খোদার পুত্র মানিবে। সেই কারণে আমার কথা ও আমার শিক্ষাবলী বিকৃত করিয়া ফেলা হইবে। এমন কি, খুব মুশকিলেই ৩০ জন ঈমানদার লোক অবশিষ্ট থাকিবে। এই সময় আল্লাহ্ দুনিয়ার উপর রহম করিবেন এবং নিজের রাসূল পাঠাইবেন, যাহার জন্য তিনি দুনিয়ার এই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি শক্তি সহকারে দক্ষিণ হইতে আসিবেন এবং মূর্তিগুলিকে মুর্তি পূজকদের সঙ্গেই ধ্বংস করিবেন। তিনি শয়তানের সেই আধিপত্য-প্রভুত্ব কাড়িয়া লইবেন যাহা সে মানুষের উপর লাভ করিয়াছে। তিনি আল্লাহ্র রহমত সঙ্গে লইয়া আসিবেন সেই লোকদের মুক্তির জন্য যাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে। আর বড়ই সৌভাগ্যবান তাহারা যাহারা তাহার কথা মানে'। (অধায়ঃ ৯৬)

'সরদার পাদ্রী জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ্র সেই রাসূলের পর অন্য নবীও আসিবেন? ঈসু জবাব দিলেন, তাহার পর আল্লাহ্র প্রেরিত সত্য নবী আসিবেন না, তবে অনেক মিথ্যা নবী আসিবে। সে জন্য আমার বড়ই দুশ্চিন্তা। কেননা আল্লাহ্র সুবিচারমূলক সিদ্ধান্তসমূহের কারণে শয়তান তাহাদের আবির্ভাব ঘটাইবে। তারা আমার এই ইঞ্জীলের আবরণে নিজদিগকে লুকাইয়া রাখিবে'। (অধ্যায়ঃ ৯৭)

'প্রধান পাদ্রী জিজ্ঞাসা করিল যে, সেই মসীহকে কি নামে ডাকা হইবে। আর কি সব নিদর্শনাদি তাঁহার আগমন প্রকাশ করিবে। ঈসু জওয়াব দিলেন, এই মসীহর নাম 'প্রশংসনীয়'। কেননা আল্লাহ্ যখন তাঁহার রূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন তাঁহার নাম তিনি নিজেই ইহা রাখিয়াছিলেন। এবং তথায় তাঁহাকে এক মালাকূতী মর্যাদায় ও জাঁকজমকে রাখা হইয়াছিল। আল্লাহ বলিলেনঃ হে মুহাম্মাদ, অপেক্ষা কর। কেননা তোমারই নিমিত্ত আমি জান্নাত, দুনিয়া ও অনেক অনেক জিনিস সৃষ্টি করিব। আর তাহা অর্ঘ্য হিসাবে তোমাকেই দিব। এমনকি যে তোমাকে মোবারকবাদ জানাইবে তাহাকে বরকত দেওয়া হইবে। আর যে তোমার উপর অভিশাপ দিবে তাহার উপর অভিশাপ দেওয়া হইবে। আমি যখন তোমাকে দুনিয়ার দিকে পাঠাইব, তখন তোমাকে আমার 'মুক্তি রাসূল' হিসাবে পাঠাইব। তোমার কথা সত্য হইবে। এমনকি, আসমান জমিন টলিয়া যাইবে। কিন্তু তোমার দ্বীন টলিবে না। এই জন্য তাঁহার পবিত্র নাম হইল মুহাম্মাদ (সাঃ)'। (অধ্যায়ঃ ৯৭)

বারনাবাস লিখেছেন, 'একবার শিষ্যদের সামনে হযরত ঈসা বললেন, 'আমারই শিষ্যবর্গের মধ্যে একজন (যে পরে ইয়াহুদা ইস্কারিউতীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে) আমাকে ৩০টি মুদ্রার বিনিময়ে শত্রুদের হাতে

বিক্রয় করিয়া দিবে'। পরে বলিলেন, ইহার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে আমাকে বিক্রয় করিবে, সে-ই আমার নামে মারা যাইবে। কেননা খোদা আমাকে পৃথিবী হইতে উর্ধ্বে তুলিয়া নিবেন এবং সেই বিশ্বাসঘাতকের আকৃতি এমন পরিবর্তন করিয়া দিবেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করিবে যে, সে আমিই। ইহা সত্ত্বেও সে যখন খারাপভাবে মরিবে, যখন দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমারই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হইতে থাকিবে। কিন্তু যখন মুহাম্মাদ (সাঃ) খোদার মহান নবী আসিবেন, তখন আমার সে দুর্ণাম অপনোদন করা হইবে। আর খোদা ইহা এইজন্য করিবেন যে, আমি সেই মসীহর সত্যতা স্বীকার করিয়াছি। তিনি আমাকে এই স্বীকৃতির এই পুরস্কার দিবেন যে, লোকেরা জানিবে, আমি জীবিত আছি। আর সেই লাঞ্ছনার মৃত্যুর সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই'। (অধ্যায়ঃ ১১৩)

'(শিষ্যবর্গকে হযরত ঈসা বলিলেন) নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে বলি যে, মূসার কিতাব হইতে সত্যতা যদি বিকৃত করা না হইত, তাহা হইলে খোদা আমাদের পিতা দাউদকে দ্বিতীয় একখানি কিতাব দিতেন না। দাউদের কিতাবে যদি বিকৃতি না করা হইত, তাহা হইলে খোদা আমাকে ইঞ্জীল দিতেন না। কেননা মহাপ্রভু আমাদের খোদা পরিবর্তন হইবার নহেন। তিনি সব মানুষকে একই বাণী দিয়াছেন। সুতরাং যখন আল্লাহর রাসূল আসিবেন, তখন তিনি এই উদ্দেশ্যে আসিবেন যে, তিনি সেই সমস্ত জিনিস পরিষ্কার করিয়া দিবেন, যাহা দ্বারা খোদাহীন লোকেরা আমার কিতাবকে মলিন ও পংকিল করিয়া দিয়াছে'। (আধ্যায়ঃ ১১৪)

নতুন ধর্মে আত্মনিপীড়ন ও বৈরাগ্যবাদ

পৃথিবীর প্রত্যেক নবী রাসূলই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রচার করেছেন এবং ইসলাম কখনোই বৈরাগ্যবাদ সমর্থন করেনি। নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই'। (মুসনাদে আহমাদ) অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'এই উম্মতের বৈরাগ্যবাদ হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জিহাদ'। (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু ইয়ালা)

অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পথ দুনিয়াকে ত্যাগ করে নয়, আল্লাহ্র পথে জিহাদই হলো সেই পথ। আল্লাহর এই পৃথিবীতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম ও আন্দোলন করা প্রয়োজন, এই প্রয়োজন পূরণ করাই হলো সেই পথ। এই উম্মত

ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তি দেখে ভয় পেয়ে জনসমাজ ত্যাগ করে বনে-জংগলে বা পাহাড়ে-পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করবে না, খানকার বা মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখবে না, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে সেই অবস্থার মোকাবেলা ও প্রতিরোধ করবে। ইসলাম বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করবে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, একজন সাহাবী বললেন, আমি সমগ্র জীবন রাতে নামায আদায় করে কাটাবো। অন্য একজন বললেন, আমি সব সময় রোযা রাখবো, কখনই রোযা ভংগ করবো না। তৃতীয় জন বললেন, আমি কখনই বিয়ে করবো না, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবো না। নবী করীম (সাঃ) নিজে এসব কথা শুনতে পান। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 'আল্লাহ্র নামের শপথ! আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অনেক বেশী ভয় করি এবং তাঁর তাকওয়া রক্ষা করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার জীবনধারা এই যে, আমি রোযাও রাখি এবং রোযা ভেঙ্গেও ফেলি। রাতে নামাযও পড়ি এবং ঘুমিয়েও থাকি। স্ত্রীলোকদের বিয়েও করি। আমার এই জীবনপন্থা যার পছন্দ নয়, তার সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই'।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলতেন, 'নিজেদের উপর কঠোরতা করো না। অন্যথায় আল্লাহই তোমাদের উপর কঠোরতা করবেন। অতীতে একদল লোক এই আত্মনির্যাতনের নীতি অবলম্বন করেছিল। পরে সে জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করলেন। তাদেরই অবশিষ্ট লোকেরা বর্তমান কালের পাদ্রীখানা ও গীর্জা ইত্যাদিতে আত্ম সমাহিত হয়ে আছে'।

হযরত ঈসা (আঃ) এর পরে দুইশত বছর পর্যন্ত খৃষ্টান গীর্জা বৈরাগ্যবাদ মুক্ত ছিল। কিন্তু সূচনা থেকেই খৃষ্টান ধর্মে বৈরাগ্যবাদের ভাবধারা ছিল। বৈরাগ্যবাদ সৃষ্টির মৌল চিন্তা-বিশ্বাস এর অভ্যন্তরে প্রকট ভাবে বিদ্যমান ছিল। সমাজকে ত্যাগ করে ও পৃথিবীর সাথে নিঃসম্পর্ক জীবন যাপনকে নৈতিক আদর্শরূপে গ্রহণ এবং বৈষয়িক জীবন ও বিয়ের তুলনায় সন্যাসী জীবনধারাকে অধিক উত্তম ও ভাল বলে মনে করাই হলো বৈরাগ্যবাদের ভিত্তি। আর নতুন খৃষ্টধর্মে এই দুইটি জিনিসই প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। বিশেষত একা ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপনকে পবিত্রতার সমপর্যায়ের মনে করার কারণে গীর্জায় ধর্মীয় কাজকর্মে নিয়োজিত লোকদের জন্য বিয়ে করা, সন্তান-সন্ততি থাকা এবং সংসারের ঝামেলায় পড়া খুবই অপসন্দনীয় ছিল। তৃতীয় শতাব্দী আগমনের

পূর্বেই ব্যাপারটি একটি বিরাট বিপর্যয়ের রূপ পরিগ্রহ করে এবং একটি সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় নতুন খৃষ্টধর্মে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক বিচারে এর তিনটি বড় বড় কারণ ছিল।

প্রথমটি হলো, প্রাচীন পৌত্তলিক সমাজে যৌন লালসা-উচ্ছৃংখলা, চরিত্রহীনতা ও দুনিয়া পূজার তীব্র স্রোত প্রবাহিত ছিলো। সে স্রোত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে খৃষ্টান পণ্ডিতগণ মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গ্রহণের পরিবর্তে চরম পন্থার নীতি গ্রহণ করে। তারা পবিত্রতার উপর এতবেশী গুরুত্ব আরোপ করেন যে, তাতে নারী পুরুষের বিয়ে ও পারিবারিক জীবনকে অপবিত্র বলে গণ্য করে। বৈষয়িকতাবাদের বিরুদ্ধে তারা মনে ঘৃণা পোষন করতে শুরু করেন। ফলে একজন দ্বীনদার লোকের পক্ষে কোন প্রকারের ধন-সম্পদের মালিক হওয়াই পাপ বলে বিবেচিত হলো এবং নিতান্ত দরিদ্র নিঃস্ব জীবন যাপন করা ও সর্বদিক দিয়ে দুনিয়া ত্যাগী হওয়াই চরিত্রের উচ্চতম মানদণ্ড হলো। অনুরূপভাবে পৌত্তলিক সমাজের সুবিধাবাদ ও স্বাদ-আস্বাদন নীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা আরেকটি চরম পন্থার আশ্রয় নিলো। সব রকমের স্বাদ-আস্বাদন পরিহার, প্রবৃত্তি ধ্বংস করা ও কামনা-বাসনা লালসার মূলোৎপাটন করা চারিত্রিক উৎকর্ষতায় পর্যবসিত হলো। বিভিন্ন প্রকারের কৃচ্ছ্রসাধনার মাধ্যমে দেহকে কষ্ট ও নির্যাতন দেওয়া আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণতা মনে করা হলো এবং এটি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গে পরিণত হলো।

দ্বিতীয়টি হলো, খৃষ্টধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণের মধ্যে প্রচারিত হতে থাকলো তখন গীর্জা নিজের ধর্মের ব্যাপকতা ও সাধারণ প্রচার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনগণের প্রিয় সব ধরনের খারাপ জিনিসকে নিজেদের মধ্যে শামিল করে নিলো। ধর্মীয় ব্যক্তিদের পূজা শুরু হলো, তারা পৌত্তলিক সমাজের দেব দেবীর স্থান অধিকার করলো। হোরস ও আইসিস এবং অন্যান্য দেবতাদের মূর্তির স্থানে যীশু ও মাতা মরিয়মের মূর্তির পূজা শুর হলো। খৃষ্টধর্মের স্যাটুরনালিয়ার স্থানে বড় দিনের পর্ব অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মোৎসব পালন হতে লাগলো। প্রাচীনকালের তাবীজ-তুমার, নানা তদবীর, ফাল গ্রহণ করা, ভবিষ্যৎ বা গায়েবী কথা বলা, জ্বিন ও ভূত-প্রেত তাড়ানোর আমল-খৃষ্টান সন্যাসীরা শুরু করলো। আর জনগণ যেহেতু সঠিক জ্ঞানের অভাবে ময়লা, অপরিচ্ছন্ন, জটাধারী ও উলঙ্গ হয়ে থাকা ব্যক্তি বা গুহায় বসবাস করা ব্যক্তিকেই কামেল বলে মনে করতো, এ কারণে খৃষ্টান গীর্জায় কামেল হওয়ার এ ধারণা একমাত্র পথ হিসেবে গৃহীত হলো। আর এ ধরনের লোকদের কল্পিত কাহিনীতে পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হলো। তথাকথিত মারেফাতের নামে

দুনিয়া ত্যাগী জীবন ধারা মুসলিম সমাজে এখান থেকেই প্রবেশ করেছে। কোরআন হাদীসের সনদবিহীন অপ্রয়োজনীয় গল্প এসব স্থান থেকেই সৃষ্টি করে ইসলামী সাহিত্যে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।

তৃতীয়টি হলো, খৃষ্টানদের কাছে ধর্মের সীমা নির্ধারণের জন্য কোনো বিস্ত ারিত শরীয়াত বিধান এবং কোনো সুস্পষ্ট আদর্শ ছিল না। হযরত মূসা (আ:) উপস্থাপিত শরীয়াত তারা ত্যাগ করেছিল আর শুধু ইঞ্জীল গ্রন্থে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান পাওয়া যেতো না। এ কারণে খৃষ্টান পণ্ডিতগণ বাইরের কিছু দর্শন ও প্রথায় প্রভাবিত হয়ে আর কিছুটা নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত ধর্মের মধ্যে নানা প্রকারের নতুনত্ব প্রবর্তন করতে থাকে। এসব নতুনত্বের মধ্যে বৈরাগ্যবাদ হলো একটি বড় নতুনত্ব। খৃষ্টান ধর্মের পণ্ডিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষু, হিন্দু যোগী-সন্যাসী ও প্রাচীন মিশরীয় সংসার ত্যাগী সন্যাসীদের, পারস্যের মানী সত্যবাদী এবং প্লেটো ও প্লাটোনীয়দের অনুসারী প্রাচ্যবিদদের কাছ থেকে এই সন্যাস দর্শন ও নিয়ম-নীতি গ্রহণ করে। আর একেই আত্মশুদ্ধির পন্থা, আধ্যাত্মিক উন্নতি উৎকর্ষের ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। এই মারাত্মক ভুল যারা করলো তারা কোনো সাধারণ লোক ছিল না। তৃতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যারা খৃষ্ট ধর্মের বিখ্যাত পণ্ডিত এবং অগ্রনেতা রূপে শ্রদ্ধেয় ছিল, তারাই এ মারাত্মক পথ অবলম্বন করেছিল। সেন্টআথান সিউয়াস, সেন্ট বাসিল, সেন্ট গ্রেগরী নাজিয়ানজীন, সেন্ট ক্রাই সুষ্টাম, সেন্ট আইমব্রুজ, সেন্ট জিরোম, সেন্ট আগস্টাইন, সেন্ট বিনিডিক্ট, গ্রেগরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উক্ত মারাত্মক ভুলের মধ্যে নিজেদের শামিল করেছিলেন। এরা সকলেই পাদ্রী পুরোহিত ও বৈরাগ্যবাদের বিখ্যাত প্রচারক ছিলেন। এদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলেই গীর্জা-ব্যবস্থায় বৈরাগ্যবাদ প্রচলিত হয়। এসব বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গই উক্ত ভ্রান্ত পথের আবিষ্কারক। তাদেরই মাধ্যমে এই মারাত্মক ও ভ্রান্ত পথের সূচনা হয়েছে। ধর্ম যেখানে মানুষ হিসেবে জীবন যাপনের সুযোগ দেয় না, মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিগত সকল চাহিদাকে অস্বীকার করে, সে ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই। ধর্মের বিরুদ্ধে এই নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে খৃষ্টানদের কারণে, কোনো মুসলিম এর জন্যে দায়ী নয় এবং ইসলাম মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিগত চাহিদাকে স্বীকৃতি দিয়ে বৈধতার পথ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে মাত্র।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, খৃষ্ট ধর্মে বৈরাগ্যবাদের সূচনা মিশর থেকে হয়েছে। সেন্ট এন্থনী ছিল বৈরাগ্যবাদী আদর্শের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা। তার জন্ম হয় ২৫০ খৃষ্টাব্দে এবং ৩৫০ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু ঘটে। তাকেই প্রথম খৃষ্টান সন্যাসী মনে করা হয়। 'কাইয়ূম' অঞ্চলে 'পাসপীর' নামক স্থানে (বর্তমানে সে স্থান দাউর-আল-মাইমুন নামে পরিচিত) সর্বপ্রথম আশ্রম স্থাপনি করে। এরপর সে দ্বিতীয় আশ্রম স্থাপন করে লোহিত সাগরের তীরে। বর্তমানে সে স্থানকে বলা হয় 'দাউর মারু-আনতুনিউস'। তারই রচনাবলী ও উপদেশাবলী থেকে বৈরাগ্যবাদের মৌল নিয়ামাদি গৃহীত হয়েছে। পরবর্তীতে সমগ্র মিসরে এই ভাবধারা বন্যার মত ছড়িয়ে পড়ে। নানাস্থানে রাতারাতি সংসার ত্যাগী পুরুষ ও নারী সন্যাসীদের জন্য আশ্রম নির্মিত হলো। এসব আশ্রমে একসাথে তিন হাজার পাদ্রী থাকতো। ৩২৫ খৃষ্টাব্দে মিসরেই 'পাখুমিউস' নামক একজন খৃষ্টান পাদ্রী আত্মপ্রকাশ করে। সবার কাছে সে অত্যন্ত কামেল হিসেবে পরিচিতি পায়। এ ব্যক্তি পুরুষ ও নারী সন্যাসীদের জন্য দশটি বড় বড় আশ্রম নির্মাণ করে। এর পর সিরিয়া, ফিলিস্তীন এবং আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রম নির্মাণের ধারা অব্যাহত থাকে। প্রথম দিক দিয়ে বৈরাগ্যবাদের ব্যাপারে গীর্জা-ব্যবস্থাকে কঠিন জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ বৈরাগ্যবাদের দৃষ্টিতে দুনিয়া ত্যাগ, সন্যাস, নি:সঙ্গ জীবন এবং দারিদ্র্য ও নি:স্বতাকে আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চ আদর্শ মনে করা হলেও 'সন্যাসীদের ন্যায় বিয়ে ও পারিবারিক জীবন এবং সহায়-সম্পত্তির মালিক হওয়াকে পাপ বলেও ঘোষনা দিতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সেন্ট আথানাসিউস, সেন্ট বাসিল, সেন্ট আগস্টাইন এবং গ্রেগরী গ্রেট এর মত লোকদের প্রভাবে বৈরাগ্যবাদের অসংখ্য নিয়ম নীতি চার্চের ব্যবস্থায় রীতিমত অনুপ্রবেশ লাভ করে।

এ বৈরাগ্যবাদের কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল। সংক্ষেপে সেগুলোর রূপ হলো, শক্ত কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা এবং নিত্য নতুন পন্থায় দেহকে নির্যাতন ও পীড়ন দেয়া। এ ব্যাপারে পাদ্রী অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিজয়ী হবার চেষ্টা করতো। খৃষ্টান সন্যাসীদের জীবন কাহিনীতে এসব লোকের যেসব অদ্ভুত অসাধারণ কার্যকলাপের বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে তা এ ধরনের যে, আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট মাকারিউস্ সর্বক্ষণ ৮০ পাউণ্ডের বোঝা নিজের দেহের উপর চাপিয়ে রাখতো। বর্তমান যুগে লাল কাপড় পরিধানকারী কিছু সংখ্যক লোক ও মাজার পূজাড়ী নিজের হাতে ও শরীরে লোহার শিকল জড়িয়ে

রাখতে দেখা যায়। আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট মাকারিউস ৬ মাস পর্যন্ত থলথলে কাদামাটির উপর শয্যা গ্রহণ করেছে। এ সময় বিষাক্ত মশা-মাছি তার উলঙ্গ দেহে দংশন করে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল। তার মুরীদ সেন্ট ইউসিবিউস তার 'গুরু' অপেক্ষাও অনেক বেশী কৃচ্ছ্রসাধনা করেছে। সে ১৫০ পাউণ্ড ওজনের বোঝা সব সময় নিজের উপর চাপিয়ে রেখে চলাফেরা করতো। ক্রমাগত তিন বছর যাবৎ সে একটি শুষ্ক কূপের মধ্যে পড়ে ছিল। সেন্ট সাবিউস্ কেবল সেই যব খাদ্য হিসেবে আহার করতো যা একমাস যাবৎ পানিতে ভিজে দুর্গন্ধময় হয়ে যেতো। সেন্ট বাইসারিউন ৪০ দিন পর্যন্ত কন্টকাকীর্ণ জংগলে পড়েছিল আর ৪০ বছর পর্যন্ত শয্যা গ্রহণ করেনি। সেন্ট পাখোমিউস ৫০ বছর পর্যন্ত শয্যা গ্রহণ করেনি। সেন্ট জান নামক একজন যাজক একাধিক্রমে তিন বছর পর্যন্ত উপাসনায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে। এ দীর্ঘ সময় সে কখনই বসেনি এবং শয়ন করেনি। বিশ্রামের জন্য সে মাত্র একটি বড় পাথরে হেলান দিত আর প্রতি রবিবার তার জন্য যে 'প্রাসাদ' আনা হতো, তাই ছিল তার একমাত্র আহার্য। সেন্ট সিমিউন স্টাইলাইট ছিল খৃষ্টানদের বড় বড় সন্যাসীদের একজন। প্রতি ইস্টারের পূর্বে সে পূর্ণ ৪০ দিন একাধারে অনাহারে কাটিয়ে দিত। একবার সে এক বছর পর্যন্ত এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। অনেক সময় সে তার আশ্রম থেকে বের হয়ে একটি কূপের মধ্যে দিন যাপন করতো। শেষ পর্যন্ত সে উত্তর সিরিয়ার সীমান দূর্গের কাছে ৬০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিল। সে স্তম্ভের উচ্চতম অংশের পরিধি ছিল মাত্র তিনফুট। এর উপর একটি 'কাঠগড়া' বানিয়েছিল। এই স্তম্ভের উপর সে ত্রিশ বছর অতিবাহিত করে। রৌদ্রের প্রখর তাপ, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম সবই তার উপর দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে কখনও স্তম্ভের ওপর থেকে নেমে আসেনি। তার শিষ্য সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে তাকে খাবার দিয়ে আসতো এবং তার ময়লা পরিষ্কার করতো। পরে সে রশি দিয়ে নিজেকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিল, যার ফলে সেই রশি দেহের মাংসের মধ্যে গেঁথে মাংস পঁচে গেল এবং ক্ষতে পোকা সৃষ্টি হয়েছিল। পোকা ক্ষত গহ্বর থেকে পড়ে গেলে তাকে উঠিয়ে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিত এবং বলতো, 'খা, খোদা তোকে যা খেতে দিয়েছেন'। খৃষ্টান জনতা দূর দূর অঞ্চল থেকে তার দর্শন লাভার্থে এসে স্তম্ভের কাছে ভিড় জমাতো। তার যখন মৃত্যু হলো তখন খৃষ্টান জনতা তাকে সন্যাসীর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বানিয়ে রাখলো।

সে যুগের খৃষ্টান সন্যাসীদের যেসব চরিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই ধরনেরই দৃষ্টান্তসমূহে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। একজন সন্যাসীর পরিচয় এভাবে

দেয়া হয়েছে যে, সে ত্রিশ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নির্বাক রয়েছে কারো সাথে কোনো কথা বলেনি। একজন সন্যাসী নিজেকে একটি প্রস্তর খণ্ডের সাথে বেঁধে রেখেছিল, একজন জংগলে দিশেহারা হয়ে ঘুরে ফিরতো এবং ঘাস ও আবর্জনা খেয়ে দিন কাটাতো। একজন ভারী দুর্বহ বোঝা সব সময়ই বহন করে ফিরতো। একজন শিকল, শক্ত রশি ইত্যাদি দিয়ে নিজের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্মমভাবে আট শাঁট করে বেঁধে রাখতো। কেউ কেউ হিংস্র জন্তুদের গুহায় বা শুষ্ক কূয়ায় অথবা পুরাতন কবর গহ্বরে বসবাস করতো, কেউ সব সময় উলঙ্গ হয়ে থাকতো ও নিজের দেহের নিম্নাংশ দেহের লম্বা লম্বা পশম দ্বারা আবৃত করে রাখতো এবং মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলতো। এ ধরনের সন্যাসী সম্পর্কে চর্চা ও আলোচনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের মৃত্যুর পর তাদের হাড়গুলো আশ্রমসমূহে সংরক্ষণ করা হতো। বর্তমানেও মিসরের সিনাই পর্বতের পাদদেশে সেন্ট ক্যাথারাইনের আশ্রমে এ ধরনের অস্থিতে ভরা একটি সুসজ্জিত 'লাইব্রেরী' রয়েছে। সেখানে খৃষ্টান সন্যাসীদের মাথার খুলি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

বৈরাগ্যবাদী ধারার দ্বিতীয় বিশেষত্ব এটা ছিল যে, তারা সব সময় ময়লা পোশাক ও পুঁতিগন্ধময় দেহে থাকতো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে তারা দূরতম সম্পর্কও রাখতো না। গোসল করা বা দেহে পানির স্পর্শ তাদের মতে সন্যাস জীবনের বিপরীত ছিল। দেহের পরিচ্ছন্নতাকে তারা মনে করতো আত্মার অপবিত্রতা। সেন্ট আথানাসিউস সেন্ট এ্যানথুনীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, সে মৃত্যু পর্যন্ত কখনও নিজের পা ধোয়নি। সেন্ট আবরাহাম যে দিন থেকে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে সে দিন থেকে দীর্ঘ ৫০ বছর মুখ ও হাত পা ধোয়নি পর্যন্ত। কুমারী সিলভিয়া নামক একজন সন্যাসী সমগ্র জীবনকালে হাত পায়ের আঙ্গুল ব্যতীত দেহের অন্য অংশে পানির স্পর্শ ঘটায়নি। একটি কনভেন্টের ১৩০ জন সন্যাসিনীর প্রশংসায় লেখা হয়েছে যে, তারা কখনও নিজেদের পা ধোয়নি। আর গোসলের নাম শুনলেই তাদের দেহে কম্পন শুরু হতো।

খৃষ্টধর্মের বৈরাগ্যবাদ বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনকে কার্যত সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে বিয়ে সম্পর্ককে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের সকল ধর্মীয় রচনাবলীতে এই মত ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, একক ও নি:সঙ্গ অবিবাহিত জীবন যাপন করা সর্বাপেক্ষা বড় নৈতিক মূল্যমান। যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা প্রকৃত পবিত্র ও সতীত্ব। নিজের প্রবৃত্তি ও নফসকে সম্পূর্ণ নির্মূল ও ধ্বংস

করা এবং দৈহিক স্বাদ-আস্বাদনের এক বিন্দু প্রবণতাও অবশিষ্ট না রাখাই হলো পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবনের চূড়ান্ত উচ্চমান। প্রবৃত্তি ও কামনা-লালসা দমন করা তাদের মতে এই জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যে, এর মাধ্যমে পাশবিকতা শক্তিশালী হয়ে উঠে। তাদের দৃষ্টিতে স্বাদ গ্রহণ করা পাপ। এমনকি মুহূর্তকালের আনন্দ-স্ফূর্তিও খোদাকে ভুলে যাওয়ার শামিল। সেন্ট বাসিল হাস্যরস ও স্মিতহাসিও নিষিদ্ধ করেছিল। এসব চিন্তা ও মতের কারণে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক বিয়ে সম্পর্কও তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপবিত্র ও অশ্লীল জঘন্য কাজ বলে বিবেচিত হতো। পাদ্রীর কর্তব্য ছিল, সে বিয়ে করা তো দূরের কথা, স্ত্রীলোকের মুখও যেন সে না দেখে। বিবাহিত হয়ে থাকলে স্ত্রীকে ত্যাগ করে ঘর হতে বের হয়ে যাওয়া তার কর্তব্য। পুরুষদের ন্যায় নারীর হৃদয়েও এ কথা বসিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তারা যদি 'স্বর্গীয় রাজত্বে' প্রবেশ করতে চায়, তা হলে তারা যেন সারা জীবন কুমারী থাকে। আর বিবাহিতা হয়ে থাকলে তারা যেন তাদের স্বামীদের থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয়ে বসবাস করে। সেন্ট জিরুম-এর ন্যায় একজন বিখ্যাত খৃষ্টান মনীষী বলেছেন, যে নারী ঈসা মসীহর খাতিরে সন্যাসিনী হয়ে সমগ্র জীবন কুমারী থাকবে, সে মসীহর কনে হবে এবং সেই স্ত্রীলোকটির মা খোদা মসীহর শাশুড়ী হওয়ার মর্যাদা লাভ করবে। অপর একস্থানে সেন্ট জিরুম বলেন, সতীত্বের কুঠার দ্বারা দাম্পত্য সম্পর্কের কাষ্ঠকে কেটে চিরে দূরে নিক্ষেপ করাই হলো আধ্যাত্ম পথের পথিকের সর্বপ্রথম কাজ।

খৃষ্ট ধর্মের বৈরাগ্যবাদের এসব শিক্ষার ফলে একজন খৃষ্টান পুরুষ বা খৃষ্টান নারীর উপর সর্বপ্রথম এ প্রভাব প্রতিফলিত হতো যে, তার সুখী দাম্পত্য জীবন চিরদিনের মতো নি:শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু খৃষ্ট ধর্মে যেহেতু তালাক ও বিচ্ছেদের পথ বন্ধ ছিল, এ জন্যে বিয়ে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকা অবস্থায়ই স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিছিন্ন হয়ে যেতো। সেন্ট নাইলাস দুটো সন্তানের পিতা ছিলেন। তিনি যখন বৈরাগ্যবাদে দীক্ষিত হলেন তখন তার স্ত্রী কাঁদতে লাগলো। এরপরও তিনি তাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। সেন্ট আম্মুন বিয়ের প্রথম রাতেই নিজ স্ত্রীকে দাম্পত্য জীবনের সম্পর্কের অপবিত্রতা ও পংকিলতার বিষয়ে কথা শুনিয়েছিলেন এবং উভয়-ই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, জীবনে বেঁচে থাকা পর্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও নি:সম্পর্ক হয়ে থাকবে। সেন্ট আবরাহাম বিয়ের প্রথম রাতেই নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যান। সেন্ট আলেকসিজও এই কাজই করেন।

গীর্জা ব্যবস্থা তিনশত বছর পর্যন্ত তার পরিবেশ-পরিধিতে এসব চরমপন্থী ধারণা-বিশ্বাসসমূহের প্রতিরোধ করতে থাকে। সেকালে কোন পাদ্রীর জন্যই অবিবাহিত হওয়া জরুরী শর্ত ছিল না। পাদ্রীর পদে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে কেউ বিবাহিত হয়ে থাকলে সে নিজের স্ত্রীর সাথে বসবাস করতে পারতো। অবশ্য পাদ্রী নিযুক্ত হওয়ার পর বিয়ে করা নিষিদ্ধ ছিল। কেউ বিধবা বা তালাক-প্রাপ্তা নারীকে বিয়ে করে থাকলে বা কারোও দু'জন স্ত্রী থাকলে বা কারো ঘরে দাসী থাকলে তাকে পাদ্রী পদে নিযুক্ত করা হতো না বা সে পাদ্রীর যোগ্য ছিল না। তবে ধীরে ধীরে চতুর্থ শতাব্দীতে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তখন এ ধারণা শীক্তশালী হয়ে উঠে, যে ব্যক্তি গীর্জায় ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে তার জন্য বিবাহিত হওয়া খুবই জঘন্য ব্যাপার। ৩৬২ খৃষ্টাব্দে গেংগড়া পরিষদের ছিল সর্বশেষ অধিবেশন। সে অধিবেশনে এ ধরনের চিন্তাধারাকে ধর্মবিরোধী গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু এর কিছু কাল পরই ৩৮৬ খৃষ্টাব্দে রোমান সীনোড সমস্ত পাদ্রীকে এই পরামর্শ দেয় যে, তারা যেন দাম্পত্য সম্পর্ক হতে দূরে সরে থাকে। আর পরবর্তী বছর পোপ সাইরিকিয়াস নির্দেশ দেয়, যে পাদ্রী বিয়ে করবে বা বিবাহিত হবার দরুন নিজের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে তাকে পদচ্যুত করা হবে। সেন্ট জিরুম, সেন্ট এ্যামব্রোজ ও সেন্ট আগস্টাইনের ন্যায় বড় বড় মনীষী বলিষ্ঠ কণ্ঠে এই সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। আর সামান্য প্রতিরোধের পর সমস্ত পশ্চিমা গীর্জাসমূহে পূর্ণ কঠোরতার সাথে এই নীতি কার্যকর হয়। পূর্ব হতে বিবাহিত লোকেরা ধর্মীয় কাজকর্মে নিযুক্ত হবার পরও নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'অবৈধ সম্পর্ক' রক্ষা করে চলেছে, এ অভিযোগ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে বহু কয়টি কাউন্সিল অধিবেশন এই সময় অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের সংশোধনের জন্য এ নিয়ম ঠিক করা হয় যে, তারা উন্মুক্ত স্থানে শয়ন করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদের সাথে কখনই নিভৃতে একত্রিত হবে না। তাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎকারে অন্তত দু'জন লোক উপস্থিত থাকতে হবে। সেন্ট গ্রেগরী একজন পাদ্রীর প্রশংসা স্বরূপ লিখেছে, সে ৪০ বছর পর্যন্ত তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এমন কি মৃত্যুকালে তার স্ত্রী তার কাছে উপস্থিত হলে সে বললো, 'স্ত্রীলোক! দূর হয়ে যা'।

বৈরাগ্যবাদের সর্বাধিক মর্মান্তিক দিক হলো, এ নীতি পিতামাতা, ভাইবোন ও সন্তান-সন্ততি থেকে ব্যক্তির সম্পর্ক ছিন্ন-বিছিন্ন করে দিয়েছে। খৃষ্টিয় সন্যাসীদের দৃষ্টিতে পুত্রের জন্য পিতামাতার ভালোবাসা, ভাইয়ের জন্য বোনের ভালোবাসা এবং পিতার জন্য সন্তানের ভালোবাসাও বড় পাপ। তাদের মতে

আধ্যাত্মিক উন্নতি উৎকর্ষের জন্য এই সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া অপরিহার্য। খৃষ্ট সন্যাসীদের জীবনেতিহাসে এমন সব ঘটনবালীর উল্লেখ করা হয়েছে, যা পাঠ করলে মর্মযন্ত্রণা অনুভূত হয়। ইভাগ্রীয়াস নামক এক পাদ্রী বছরের পর বছরব্যাপী মরুভূমিতে কৃচ্ছ্রসাধনা করছিল। একদিন সহসা তার মাতাপিতার কতগুলো চিঠি হাতে আসে। তারা দীর্ঘদিন ধরে সন্তান বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর ছিল। এই চিঠিগুলো পাঠ করে তার হৃদয়ে মানবীয় ভালবাসার হৃদয়াবেগ ও উচ্ছাস জেগে উঠতে পারে। এই আশংকায় সে সেই চিঠিগুলো না পড়েই আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। সেন্ট থিওডোরাসের মা ও বোন বহু সংখ্যক পাদ্রীর কাছ থেকে অনুরোধ সম্বলিত চিঠি নিয়ে তার আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তার পুত্রকে একটিবার দেখার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু সে মা ও বোনের সম্মুখে আসতে অস্বীকার করলো। সেন্ট মারকাসের মা তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আশ্রমে উপস্থিত হয়ে আশ্রম প্রধানের কাছে অনুনয়-বিনয় করে পুত্রকে মায়ের সম্মুখে আসার নির্দেশ দিতে তাকে রাজি করলো। কিন্তু পুত্র মায়ের সাথে সাক্ষাত করতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে আশ্রম প্রধানের নির্দেশ পালনের জন্য বেশ পরিবর্তন করে ও ছদ্মবেশ ধারণ করে মায়ের সামনে উপস্থিত হয়ে চোখ বন্ধ করে থাকলো। মা পুত্রকে চিনতে পারলেন না এবং পুত্রও মায়ের মুখ দেখলো না। সেন্ট পোয়মেন নামক একজন সন্যাসী এবং তার ৬ জন ভাই মিসরের মরু অঞ্চলে আশ্রমে বসবাস করতো। বহু বছর পর তার বৃদ্ধা মা তাদের অবস্থানের সন্ধান পেয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সেখানে উপস্থিত হলো। কিন্তু পুত্রগণ দূর থেকে মা'কে দেখেই দৌড়িয়ে নিভৃত কক্ষে আত্মগোপন করলো। মা বাইরে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে চিৎকার করে বললো, 'আমি এই বৃদ্ধ বয়সে বহু দূর থেকে তোমাদের দেখার জন্য এসেছি। আমি যদি তোমাদের মুখ দেখি তাহলে তাতে তোমাদের কি ক্ষতি হবে? আমি কি তোমাদের মা নই?' কিন্তু সন্যাসী ৭ ভাই তাদের কক্ষের দুয়ার না খুলে বললো, 'আমরা তোমার সাথে খোদার কাছে সাক্ষাৎ করবো'। সেন্ট সিমিউন স্টাইলাইটস এর কাহিনী উল্লেখিত কাহিনী অপেক্ষাও অধিক মর্মান্তিক। সে তার মা'কে ছেড়ে ২৭ বছর পর্যন্ত আত্মগোপন করে অতিবাহিত করে। পিতা তার বিচ্ছেদ বেদনায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মা বেঁচে ছিল। পুত্রের সন্যাসী হওয়ার খবর যখন ছড়িয়ে পড়লো তখন সে কোথায় অবস্থান করছে তা জেনে মা তার সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে আশ্রমে উপস্থিত হলো। কিন্তু সেখানে নারীর প্রবেশাধিকার ছিল না। মা কাকুতি মিনতি করে বললো, তার পুত্র হয় তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে যাক অথবা বাইরে এসে মা'কে নিজের মুখ দেখিয়ে দিক। কিন্তু সন্যাসী পুত্র মায়ের মুখ দেখতে অস্বীকার করলো। তিন দিন তিন রাত মা

আশ্রমের দরজায় পড়ে থেকে শেষ পর্যন্ত মা সেখানেই মারা গেল। এরপর সন্যাসী পুত্র বাইরে এসে মায়ের লাশের উপর চোখের পানি ঝেড়ে মায়ের জন্য ক্ষমার দোয়া করলো।

খৃষ্টিয় সন্যাসীগণ তাদের বোন ও সন্তানদের সাথেও নির্মম ব্যবহার করেছে। মিউটিয়াস নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত সচ্ছল অবস্থার লোক ছিল। সহসা তার মধ্যে ধর্মীয় আবেগ জাগ্রত হয় এবং তার ৮ বছর বয়স্ক এক পুত্রকে সাথে নিয়ে আশ্রমে উপস্থিত হলো। সেখানে তার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তার পুত্রের প্রতি স্নেহ মমতা মন থেকে দূর করে দেয়া জরুরী ছিল। এ জন্য প্রথমেই পুত্রকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। পরে তার সম্মুখেই এই অবোধ শিশুর উপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত নানা প্রকারের কঠোরতা ও যন্ত্রণাদায়ক আচরণ করা হয়। পিতা হয়ে সে এসব নিষ্ঠুর আচরণ নীরবে দেখতে থাকলো। পরে সেখানকার প্রধান তাকে নির্দেশ দিল, সে নিজের হাতেই যেন শিশুটিকে নদীতে নিক্ষেপ করে। পিতা যখন এই নির্দেশও পালন করতে প্রস্তুত হলো, তখন গীর্জার পাদ্রীরা মিলিত হয়ে শিশুটির প্রাণ রক্ষা করলো। এরপরই মেনে নেয়া হলো, লোকটি সত্যই সন্যাসী হয়েছে।

এ ব্যপারে খৃষ্টিয় বৈরাগ্যবাদের দৃষ্টিকোণ এমন ছিল, যে ব্যক্তি খোদার ভালোবাসা চায়, তাকে মানবীয় ভালোবাসার সেই সকল বন্ধন ছিন্ন করে দিতে হবে যা দুনিয়ায় তাকে তার পিতামাতা, ভাইবোন ও সন্তান-সন্ততির সাথে শক্ত করে বেঁধে দেয়। সেন্ট জিরুম বলেন, 'তোমার ভাইপো যদিও তোমার গলায় হাত বেঁধে তোমাকে জড়িয়ে ধরে, যদিও তোমার মা তার দুধ খাওয়ানোর দোহাই দিয়ে তোমাকে বিরত রাখে, তোমার পিতা তোমাকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে তোমার সম্মুখে লুটিয়ে পড়ে, তারপরও তুমি সব কিছু পরিত্যাগ করে, পিতার দেহ পদদলিত করে এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন ব্যতীতই ক্রুশের ঝাণ্ডার দিকে দৌড়ে যাও। এসব ব্যাপারে চরম নির্দয়তাই হচ্ছে খোদাভীতির চরম পরাকাষ্ঠা। সেন্ট গ্রেগরী লিখেছেন, একজন যুবক পাদ্রী পিতামাতার ভালোবাসা হৃদয় থেকে দূর করতে পারলো না। ফলে এক রাতে গোপনে পালিয়ে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আসে। খোদা তার এই অপরাধের এই শাস্তি দিল যে, সে আশ্রমে ফিরে এসেই মৃত্যু মুখে পতিত হলো। তার লাশ মাটিতে দাফন করা হলে মাটিও তাকে গ্রহণ করতে রাজি হলো না। লাশটি বার বার মাটিতে রাখা হতো এবং মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করতো। শেষ পর্যন্ত সেন্ট বিনেডিক্ট তার বুকের উপর 'তাবাররুক' রাখে, তারপরই মাটি তাকে গ্রহণ করে। একজন নারী পাদ্রী সম্পর্কে লিখেছে, সে মরার পর তিন দিন পর্যন্ত আযাবে নিমজ্জিত

হয়ে থাকলো শুধু এ কারণে যে, সে তার মায়ের ভালোবাসা হৃদয় থেকে দূর করতে পারে নি। একজন সন্যাসীর প্রশংসায় লিখেছে, সে তার আত্মীয় স্বজন ছাড়া আর কারো সাথে নির্মম ব্যবহার করেনি।

আপনজনদের সাথে সন্যাসীরা নির্মমতার, নির্দয়তার ও পাষাণ হৃদয়তার যে অনুশীলন করতো, ফলে তাদের হৃদয়ের সুকোমল ভাবধারার মৃত্যু ঘটতো। যাদের সাথে তাদের ধর্মীয় বিরোধিতা সৃষ্টি হতো তাদের সাথে অত্যাচার ও নিপীড়নের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতো। চতুর্থ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত খৃষ্টবাদের ৮০ থেকে ৯০টি উপদলের উদ্ভব হলো। সেন্ট আগস্টাইন তার সময় ৮৮টি উপদল গণনা করেছিল। এই উপদলগুলো পরস্পরের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করতো। পাদ্রীরাই এই ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন জোগাতো। আর বিরোধী ধর্মমতের লোকদেরকে এ আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়ার ব্যাপারে পাদ্রীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। আলেকজান্দ্রিয়া ছিল এই উপদলীয় দ্বন্দ্বের বড় কেন্দ্রস্থল। সেখানে সর্বপ্রথম এরিয়ান উপদেলের বিশপ আথানা সিউসের দলের উপর আক্রমণ চালালো। তারা আশ্রম থেকে কুমারী পাদ্রীদের টেনে বের করলো, তারপর তাদেরকে উলঙ্গ করে গাছের কাঁটাযুক্ত শাখা দিয়ে প্রহার করে দেহে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিল, যেন তারা তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ ও তওবা করে। পরে যখন মিসরে ক্যাথলিক দল প্রাধান্য লাভ করে তখন তারাও এরিয়ান উপদলের বিরুদ্ধে এ ধরণের নির্মম অত্যাচার করেছিল। এমন কি অধিকাংশ লোকের ধারণা, স্বয়ং এরিয়াসকেও বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় একবার সেন্ট সাইরির শিষ্য পাদ্রীগণ ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এমন কি বিরোধী উপদলগুলোর একজন সন্যাসিনীকে ধরে নিজেদের গীর্জায় নিয়ে তার প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করে হত্যা করলো, তার লাশ টুকরা টুকরা করে কেটে পরে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। রোমের অবস্থাও এসব চিত্র থেকে কিছু মাত্র ভিন্নতর ছিল না! ৩৬৬ খৃষ্টাব্দে পোপ লিবারিয়াস এর মৃত্যুর পর পোপ পদ দখলের জন্য দুটো দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং উভয়ের মধ্যে ব্যাপক রক্তপাত ঘটেছিল এবং একদিনেই একটি গীর্জা থেকে ১৩৭টি লাশ বের করা হয়েছিল।

দুনিয়া ত্যাগ, একক নিঃসঙ্গ ও অবিবাহিত জীবন এবং সন্যাসব্রতের সাথে সাথে ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যাপারেও কোনোরূপ লজ্জানুভূতির স্থান রাখা হয়নি। খৃষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতেই অবস্থা এমন হয়েছিল যে, রোমের বিশপ রাজা বাদশাহদের ন্যায় নিজের প্রাসাদে বসবাস করতো। সে যখন যান-বাহনে সওয়ার হয়ে শহর ভ্রমণে বের হতো, তখন তার জাঁক-জমক ও দাপট-প্রতাপ

রোম সম্রাট কাইজারের যানবাহন অপেক্ষা কম হতো না। সেন্ট জিরুম চতুর্থ শতকের শেষ যুগে অভিযোগ করে, বহু সংখ্যক বিশপের খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠানসমূহ গভর্ণরদের খাওয়ার অনুষ্ঠানের তুলনায় অনেক উচ্চমানের হতো। আশ্রমসমূহ ও উপাসনা কেন্দ্রসমূহের দিকে জাতীয় অর্থ সম্পদের এই স্রোত প্রবাহ সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে মহাপ্লাবনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তখন জনগণকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, কেউ বড় পাপ করলে কোনো না কোনো সন্যাসীর কবরে বা আশ্রমে ধন-সম্পদ দান করলে বা গীর্জায় উৎসর্গ করলেই পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়া যাবে। ফলে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ফূর্তি ও ধন-গৌরব পোপ-পাদ্রীদের জীবনে একান্ত হয়ে দেখা দিল যা চিরতরে পরিত্যাগ করাই ছিল তাদের একমাত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নীতি ও আদর্শ। দুনিয়া ত্যাগ করার নীতি প্রচার করে এর আবরণে দুনিয়া লুট করার এটা এক লজ্জাকর দৃষ্টান্ত। এই অধ:পতনের বিশেষ কারণ হলো, পাদ্রীদের অস্বাভাবিক উপাসনা-আরাধনা কৃচ্ছ্রসাধনা এবং তাদের আত্মনিগ্রহ দেখে জনসাধারণ তাদের প্রতি খুব বেশী ভক্ত ও আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তখন বহু স্বার্থন্বেষী লোক সন্যাসীর বেশ পরিধান করে পাদ্রীদের দলভূক্ত হয়। আর তারা দুনিয়া ত্যাগের আবরণে দুনিয়া লুণ্ঠনের ব্যবসা গড়ে তুলেছিল। ফলে বড় বড় দুনিয়াদার মানুষও তাদের ধন ঐশ্বর্য্যের কাছে পরাজিত হয়েছিলো।

সতীত্ব ও পবিত্রতার ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা করে বৈরাগ্যবাদ একাধিকবার আঘাত খেয়ে পরাজিত হয়েছে। পরাজয়ের আঘাত তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। আশ্রমসমূহে কৃচ্ছ্রসাধনা ও আত্ম নিগ্রহমূলক কিছু কার্যসূচী এমন ছিল যা পুরুষ ও নারী পাদ্রী একত্রিত হয়ে করতো, একই জায়গায় থাকতো এবং একই শয্যায় রাত যাপন করতো। প্রখ্যাত সেন্ট ইভাগ্রীয়াস ফিলিস্তিনের পাদ্রীদের আত্মসংযমের কাহিনী উচ্চ প্রশংসা সহকারে উল্লেখ করে বলেছেন, তারা নিজেদের হৃদয়াবেগ ও উত্তেজনা এতটা দমন করতে সক্ষম হয়েছিল যে, তারা নারীদের সাথে একত্রে স্নান করতো, পরস্পরকে দেখতো, স্পর্শ করতো এমন কি পরস্পর কোলাকুলি করতো; কিন্তু তবুও তাদের উপর তাদের দুষ্টবৃত্তি জয়ী হতে পারতো না। বৈরাগ্যবাদে গোসল ছিল অত্যন্ত অপসন্দনীয় কাজ। কিন্তু আত্মনিগ্রহের অনুশীলনের জন্য এই ধরনের গোসল করতেও তারা কুণ্ঠিত হতো না। শেষে এসব কর্মকাণ্ডের স্থান ফিলিস্তিন সম্পর্কে 'নিসা' এর সেন্ট গ্রেগরী লিখেছেন, 'ফিলিস্তিন অসৎচরিত্রতার লীলা ভূমিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে'। বস্তুত মানবীয় প্রকৃতিই এমন যে তার সাথে যুদ্ধ করলে তা প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ছাড়ে না।

বৈরাগ্যবাদ এই মানব-প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত চরিত্রহীনতার যে গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে, তার লজ্জাকর কাহিনী অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর ধর্মীয় ইতিহাসের একটি কুৎসতি কলঙ্কজনক অধ্যায়। দশম শতাব্দীর এক ইটালীয় বিশপ লিখেছেন, গীর্জায় ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পন্নকারীদের বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতার শাস্তি কার্যকর করার আইন কার্যত জারী করা হলো। শুধুমাত্র বালকদের ছাড়া এই দণ্ড থেকে কেউই রক্ষা পাবে না। অবৈধ সন্তানরা ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করতে পারবে না, এ নিয়ম কার্যকর করা হলে সম্ভবত গীর্জার সেবকদের মধ্যে একটি বালকও থাকতে পারবে না'। মধ্যযুগের গ্রন্থকারদের লিখিত গ্রন্থাবলীতে এই ধরনের কলঙ্কময় কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলা হয়েছে, নারী পাদ্রীদের আশ্রমগুলো চরিত্রহীনতার লীলাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। তাদের চার প্রাচীরের মধ্যে সদ্যজাত শিশুদের সাধারণ হত্যাযজ্ঞ নিত্য অনুষ্ঠিত হতো। পাদ্রী ও গীর্জার ধর্মীয় কর্মীরা রক্তের সম্পর্ক সম্পন্ন নারীদের সাথেও অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতো। আর আশ্রমগুলোয় অস্বাভাবিক ধরনের অপরাধ ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। গীর্জাসমূহে পাপ স্বীকারের অনুষ্ঠান চরিত্রহীনতার বড় বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পাদ্রীদের ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ

গ্রীক ও রোমক জাতির মধ্যে ধর্মভক্তের দল বিভিন্ন ধরনের কল্পিত দেব দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে পূজা পার্বন করলেও ধর্মকেও তারা বস্তুবাদের আঙ্গিকে সাজিয়ে ছিলো এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই ধর্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা হয়েছিলো। যে সকল উপাদান ধর্মে নিহিত থাকলে ধর্মের অনুসারীদের আধ্যাত্মিকতার পথে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, গ্রীক ও রোমানদের ধর্মের ঐ সকল উপাদানের অস্তিত্ব ছিলো না। বস্তুবাদের পোশাকে সজ্জিত ধর্ম সম্পূর্ণ আনন্দ ফূর্তির মাধ্যম ছিলো। কনস্টান্টাইনকে রোমের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রোমের খৃষ্টানরা তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো এবং তাদের বিপুল ত্যাগ তিতিক্ষা ও চেষ্টা-সাধনার পরে ৩০৫ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টাইন রোমের সম্রাট হিসেবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হন। এর বিনিময়ে তিনি স্বয়ং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং সাম্রাজ্য পরিচালনায় খৃষ্টানদের অংশীদার করেন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ খৃষ্টানদের অধিকারে চলে যায় এবং সমগ্র রোমে খৃষ্ট ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সম্রাট কনস্টান্টাইন স্বয়ং খৃষ্ট ধর্মের রক্ষক ও পতাকাবাহীর ভূমিকা পালন করেন। অথচ তিনি নিজেই বিকৃত খৃষ্ট ধর্মকে বিকৃতির চূড়ান্ত পর্বে উপনীত করেন।

J. W. Draper তাঁর History of the confilict between Religion and Science নামক গ্রন্থে খৃষ্ট ধর্ম ও এর বিকৃতি এবং পোপ, পাদ্রী এবং যাজকদের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। খৃষ্ট ধর্মের রক্ষক রোম সম্রাট কনস্টান্টাইন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'যাদের মাধ্যমে তিনি বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসনী হলেন সেই বিজয়ী দলের আনুগত্য যারাই করলো তাদেরকে তিনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করে সম্মানীত করলেন। তাঁর এই নীতির কারণে যেসব লোক খৃষ্ট ধর্মকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো তারাও ক্ষমতার লোভে খৃষ্ট ধর্মের উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হলো। এরা বাহ্যিকভাবে খৃষ্টান হলেও এদের চিন্তা-চেতনা ছিলো মূর্তিভিত্তিক এবং এদের প্রভাবে খৃষ্টধর্মের মধ্যে বহুত্ববাদ ও মূর্তিপূজার সংমিশ্রণ ঘটলো। সম্রাট কনস্টান্টাইনও আদর্শগত দিক দিয়ে অতীতে বহুত্ববাদ ও মূর্তির অনুসারী ছিলেন বিধায় তিনি খৃষ্টধর্মের বিকৃতি রহিতকরণে কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করেননি। নৈতিক চারিত্রিক দিক দিয়ে এ সম্রাট অধ:পতনের চূড়ান্ত পর্বে উপনীত ছিলেন, যদিও মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে গীর্জার অনুরোধে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে আনুগত্যের পরিচয় দিতেন।

রোমে খৃষ্টানদের ক্ষমতার পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছিলো এবং তারা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে যে কোনো লোককে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসিয়েছে। কিন্তু এরপরেও তারা মূর্তিপূজকদের ক্ষমতা হ্রাস করতে সক্ষম হয়নি। এর বিষময় ফল দাঁড়ালো এই যে, উভয়ের নীতি আদর্শ পরস্পরের সাথে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো যে, তা থেকে এক নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটলো। অর্থাৎ রোমের খৃষ্টানরা পৌত্তলিকতাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হলো। এ অবস্থায় সম্রাট কনস্টান্টাইন ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে মিশ্রিত ধর্মকে মেনে নিলেন এবং উভয় দলের মধ্যে সমঝোতাও সৃষ্টি করলেন।

একদিকে খৃষ্ট ধর্মের বিকৃতি, মানব প্রকৃতির চরম বিরোধী বৈরাগ্যবাদের নির্যাতন ও অন্যদিকে ধর্মের নামে শোষন, এসব কিছু মিলে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম এক ক্ষ্যাপাটে বিষয়ে পরিণত হয়েছিলো। দেশের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকজনের মনে ধর্মের প্রতি প্রবল অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হলো এবং তারা ন্যায় অন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়ে নানা পথে উপার্জন এবং ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়লো। একই সময় পাশ্চাত্য দেশসমূহে অপরাধ প্রবণতা ও নীতি নৈতিকতাহীন স্বাধীনতা এবং সন্যাস ও বৈরাগ্যবাদের দুই পরস্পর বিরোধী চিন্তা চেতনা হাত ধরাধরি করে চলছিলো। বৈরাগ্যবাদ মাঠে ময়দানে, মঠে, গীর্জা আশ্রমে নির্জনবাস করছিলো, সাধারণ নাগরিক জীবনের ওপর যার কোনো কর্তৃত্ব ছিলো না। অপরদিকে পাপাচার ও নোংড়ামীর স্রোতও প্রবাহিত হচ্ছিলো।

ইউরোপীয় গবেষক মিঃ Lecky তার History of European Morals নামক গ্রন্থে তদানীন্তন ইউরোপের সার্বিক অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'সাধারণ মানুষের নীতি নৈতিকতার মধ্যে চরম অবক্ষয়ের প্লাবন প্রবাহিত হচ্ছিলো। রাজদরবার ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের বিলাস ব্যসন ও ভোগ বিলাসিতা, ক্ষমতা লিপ্সু লোকদের রাজদরবারে গোলামীর স্বভাব এবং এর মাধ্যমে অর্থোপার্জন ও অবাধ যৌনাচারের রমরমা অবস্থা। ধর্মীয় নেতাদের নির্যাতন, পাপাচার, অনাচার, নির্লজ্জতা, কুসংস্কার এমন সমাবেশ ঘটিয়ে ছিলো যে, সাধারণ মানুষের মন থেকে পাপবোধ বিদায় গ্রহণ করেছিলো। এক সময় যারা বৈরাগ্যবাদের প্রবল সমর্থক ছিলো এবং উৎসাহের সাথে মানব প্রকৃতি বিরোধী এ মতবাদ প্রচার করতো, তারাই অবাধ ভোগ বিলাসে মগ্ন হয়ে পড়লো। যারা এক সময় নারীর মুখদর্শনকে পাপজ্ঞান করে নিজ মাতার মুখদর্শন করতো না, তারা নিত্য নতুন নারীর যৌবনসুধা পানে অভ্যস্থ হয়ে পড়লো। ধর্মভয় মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারতো, কিন্তু ধর্মীয় নেতাদের পাপাচারে লিপ্ত জীবন সাধারণ মানুষকে পাপের পথে প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। সেই সাথে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ঘোষণা ছিলো, 'যতই পাপ করো না কেনো, ধর্মীয় নেতাদের উপহার উপঢৌকন দিয়ে পাপের ক্ষমা চাইলে বেহেশতের পাসপোর্ট দেয়া হবে। এ ঘোষণা মানুষকে অধিক পাপাচারী করে তুলেছিলো'।

মিঃ Draper উল্লেখ করেছেন, 'অর্থ সম্পদের মোহে অন্ধ দুনিয়া পূজাড়ী মানুষ যেভাবে অর্থোপার্জন করতো পোপ ও পাদ্রীরা তাদের তুলনায় অর্থ সম্পদ আহরোণে অধিক পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলো। অর্থোপার্জন করতে গিয়ে তারা ধর্মের নামে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও প্রয়োজনে নির্যাতনের আশ্রয় গ্রহণ করতো। অর্থের প্রচুর্যতার কারণে তারা হয়ে পড়েছিলো অপব্যয়ী এবং অপব্যয় এতদূর পর্যন্ত পৌছে ছিলো যে, ফ্রান্সের সমগ্র রাজস্বও ঐসব ধর্মীয় নেতাদের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্যে যথেষ্ট ছিলো না। (History of the conflict between religion and science. P. 230)

ধর্মের নামে পাদ্রীরা চরিত্রহীনতার প্লাবন প্রবাহিত করেছিলো। কিশোরদের গীর্জায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনের নামে রেখে তাদের ওপর পাদ্রীরা যৌন অত্যাচার করতো এবং সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। সে যুগে বিখ্যাত পাদ্রী ও যাজকদের বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতার মারাত্মক অভিযোগ উঠেছিলো। ইতোপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আশ্রমসমূহে কিভাবে অবৈধ সন্তানের আধিক্য ছিলো। তারা নিজেরাও যেমন পাপাচারী ছিলো এবং সাধারণ মানুষকেও পাপচারে লিপ্ত হওয়ার অবাধ সনদ দিয়ে নিজেদের

সমর্থকে পরিণত করেছিলো। জনসমর্থনের কারণে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের রাজা বাদশাহদের তুলনায় অধিক ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচনা করতো। আর এ কারণেই একাদশ শতাব্দীতে গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত শুরু হয়ে তা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছিলো এ সংঘাতে প্রথমিকভাবে পোপ তথা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বিজয়ী হয় এবং তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পোপ হিল্ডার ব্রাণ্ড সম্রাট চতুর্থ হেনরীকে নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, তিনি যেনো ক্যানোসা দুর্গে তার সম্মুখে অবনত মস্তকে উপস্থিত হন। সম্রাট চতুর্থ হেনরী পোপের নির্দেশ অনুসারে সেভাবেই উপস্থিত হন।

পোপের শাগরেদদের অনুরোধে সম্রাটকে মাথা সোজা করার অনুমতি প্রদান করেন পোপ। সম্রাট নগ্ন পায়ে পোপের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এভাবে একাধিকবার রাষ্ট্রের সাথে পাদ্রীদের মতানৈক্য ঘটে এবং রাজা বাদশাহ ও সম্রাটকে তাদের আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। এ অবস্থায় দেশের সাধারণ নাগরিকদের একদিকে রাষ্ট্রের দাবি পূরণ করতে হয়, দাবি পূরণে অক্ষম হলে নির্যাতিত হতে হত, অপরদিকে গীর্জার দাবি অনুসারে সেখানেও অর্থ প্রদান করতে হত। অক্ষম হলে নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চলতো। সাধারণ মানুষ রাষ্ট্র ও গীর্জার দ্বৈত দাসত্বে ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়েছিলো। মধ্য যুগে গীর্জাধিপতি হিসেবে খৃষ্টিয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রধান পোপ এক বিরাট বিস্তৃত ক্ষমতা ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, তার তুলনায় রোম সম্রাটও ছিলো তুচ্ছ।

যাজকতন্ত্রই মধ্যযুগীয় বর্বরতার জন্মদাতা

তদানীন্তকালে পাশ্চাত্যের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যে বিশাল ক্ষমতার অধিকারী ছিলো, এ ক্ষমতা তারা ইতিবাচক পথে ব্যবহার করলে উন্নতির পথে তখনই অগ্রসর করাতে পারতো। কিন্তু ক্ষমতা তাদেরকে স্বৈরাচারী দাম্ভিকে পরিণত করেছিলো। খৃষ্ট ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সবথেকে বিপজ্জনক যে ভুলটি করেছিলো এবং এ ভুলের কারণেই সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে ধর্মবিরোধী প্রবণতার প্রসার ঘটেছিলো, ধর্মবিরোধী নানা মত সৃষ্টি হয়েছিলো এবং পরিণতিতে তারা ক্ষমতা ও মর্যাদা দুটোই হারিয়ে ছিলো। যে যুগে তারা ধর্মগ্রন্থে পরিবর্তন সাধন করেছিলো, সে যুগে মানুষের জ্ঞানের পরিধি অনুসারেই তারা ধর্মগ্রন্থে পরিবর্তন করেছিলো। ভেবেছিলো, মানুষের জ্ঞান এখন পর্যন্ত যে সীমায়

উপনীত রয়েছে, এ সীমা বোধহয় কোনো যুগে অতিক্রম করবে না। তারা ভুলে গিয়েছিলো মানুষের জ্ঞান ক্রমিকহারে অগ্রসরমান, উন্নয়নমুখী, উর্ধ্বমুখী এবং ভ্রমণশীল। জ্ঞানের শাখা প্রশাখায় বিচরণ করা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য এবং মানুষ নিত্য নতুন আবিষ্কারে অভ্যস্থ।

যাজক ও পাদ্রীগণ সে যুগে পৌঁছানো মানুষের জ্ঞানের সীমাকে চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচনা করে তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে বৈজ্ঞানিক, ভৌগলিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক, মানবাধিকার বিষয়ক, সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত বিষয়াদি সংযোজন করেছিলো। এসবের বিরুদ্ধে তখন কোনো প্রতিবাদ উত্থিত হয়নি। কারণ, মানুষের জ্ঞানের সীমাও তখন প্রচলিত জ্ঞান সম্ভারের রেখা অতিক্রম করেনি। যাজকদের ধর্মগ্রন্থে পরিবর্তন কর্ম তাদেরই ওপরে এক সময় দুর্বিসহ বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এ কথা তারা কল্পনাও করেনি। তাদের রোপিত বৃক্ষ তাদেরই ওপরে ভেঙ্গে পড়বে এবং সমগ্র ইউরোপে তাদের মর্মান্তিক পতন ঘটবে, পতনের পরে তারা আর কখনোই মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না, এ বিষয়টি ছিলো তাদের সম্পূর্ণ অজানা। যাজকদের ভুলের কারণেই সমগ্র পাশ্চাত্যে ধর্মবিরোধী ও ধর্মের প্রতি সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়েছিলো। যার ধারাবাহিকতায় আধুনিক পাশ্চাত্যের কাছে ধর্ম নিতান্তই এক গুরুত্বহীন বিষয়।

যাজকগণ ধর্মগ্রন্থে পরিবর্তন সাধন করে যে ভুল করেছিলো, সে ভুলের স্বীকৃতি দিলে তাদের সম্পূর্ণ ধর্মীয় কাঠামো ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়তো। ধর্মের পরিবর্তিত কাঠামো ঠিক রাখতেই তারা হঠকারিতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। পৃথিবীর সৃষ্টি, মানুষের আগমন, মৃত্তিকার উপাদাম, পানির উপাদান, মাতৃগর্ভে মানুষের দেহ গঠন, রক্তের উপাদান, বাতাসের গতি, সূর্যের অবস্থান ও গতি, চন্দ্রের অবস্থান ও গতি, পৃথিবীর গতি, ভৌগলিক, দার্শনিক ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তাবিদগণ নানা ধরনের মতামত দেয়া শুরু করলে খৃষ্টধর্মের পাদ্রী ও যাজকগণ ধর্মের ছদ্মাবরণে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের জ্ঞান পিপাসাকে নিবৃত্ত করতে উদ্যোগী হলো। কিন্তু সচেতন অনুসন্ধানী মানুষ তাদের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে অধিক অনুসন্ধানে নিয়োজিত হয়েছে। আর ঠিক এ সময়টিতেই মুসলিমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় সফল নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিলো। মুসলিম শাসিত সাম্রাজ্যে অগণিত বিজ্ঞানী সৃষ্টি হয়েছিলো এবং মুসলিম দেশসমূহে বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কারে নিয়োজিত ছিলেন। সে যুগে মুসলিম শাসিত স্পেন ছিলো আধুনিক বিজ্ঞানের রাজধানী। চৌদ্দ

শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্যের জ্ঞান পিপাসুগণ আলহামরা, কর্ডোভা ও গ্রানাডায় জ্ঞানের সন্ধানে ভীড় জমাতো।

জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রীক সভ্যতা খৃষ্টপূর্ব যুগে নেতৃত্ব দিয়েছিলো এটি ঐতিহাসিক সত্য। তাদের পতনের পরে সপ্তম শতাব্দী থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় মুসলমানদের অবদান রয়েছে। যদিও পাশ্চাত্যের গবেষকদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী মুসলমানদের অবদান ছোট্ট করে দেখা, গোপন করা ও নাম বিকৃতি করা হয়েছে। মুসলিম বিজ্ঞানী ও চিন্তানায়কদের নাম এমনভাবে বিকৃত করেছে যে, তা পাঠ করলে তাদের পরিচয় জানা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। পনের শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যবাসী মুসলমানদের কাছ থেকে প্রথম হাতে খড়ি নিয়েছিলো। অপরদিকে মুসলিম গবেষকগণ বার শতাব্দীর পর থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ত্যাগ করে বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে পড়েছিলো। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতের পূর্ব পুরুষদের সাধনা লব্ধ জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পদের ওপর নির্ভর করে তাদের জীবন গতানুগতিক ধারায় এগিয়ে যাচ্ছিলো বটে, কিন্তু তাদের সকল কিছুতেই এক অসীম নীরবতা নেমে এসেছিলো। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিলো, মুসলিম জ্ঞানের সাধকগণ নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তাদের এ নিদ্রা ভাঙ্গার কোনো ইঙ্গিতও দেখা যাচ্ছিলো না।

অপরদিকে পাশ্চাত্য বিশ্ব মুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে সুত্র লাভ করেছিলো, সে সুত্রের ওপর তারা থেমে থাকেনি। জ্ঞান সুত্রের ভিত্তিতে তারা ক্রমশ: সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। একদিকে ইউরোপে জ্ঞানের নিত্য নতুন মশাল প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিলো, অপরদিকে পাদ্রী ও যাজকগণ ধর্মের আবরণে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে শাসনদণ্ড হাতে সিংহাসনে আসীন ছিলো। জনগণের ওপর তাদের সকল আদেশ নিষেধ ও জারী করা আইনকে স্রষ্টার আইন হিসেবে ঘোষণা দিতো। সেই সাথে মানুষের কাছে নিরঙ্কুশ আনুগত্য দাবি করতো এবং শাসনদণ্ড হাতে থাকায় সকল ক্ষেত্রেই শক্তি প্রয়োগ করতো। জ্ঞান অনুসন্ধানী গবেষকগণ যে মতামত ব্যক্ত করতেন, পাদ্রীগণ সম্পূর্ণ তার বিপরীত মতামত উপস্থাপন করতো এবং তাদের মতামতে বিশ্বাস করা একজন খৃষ্টানের জন্য অপরিহার্য ছিলো। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সম্পর্কে যাজকগণ নানা পুস্তক রচনা করে এর নাম দিলো Christian Topography এবং এ সকল কিছু অবনত মস্তকে

মেনে নিতে মানুষকে বাধ্য করা হলো। যারা তা মানলো না তাদেরকে ধর্মদ্রোহী ও অবিশ্বাসী কাফির আখ্যায়িত করলো।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ সময় ইউরোপে ইসলাম ও মুসলিম বিজ্ঞানীদের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি প্রবল বিস্ফোরণে অগ্নি উদগিরণ করে চললো। ইউরোপের সকল দার্শনিক, চিন্তাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী ও সচেতন মানুষ ধর্ম নেতাদের অন্ধ অযৌক্তিক আনুগত্যের শৃঙ্খল ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে সম্মুখের দিকে ধাবিত হলো। নানা বিষয়ে যেসব তত্ত্ব পাদ্রীরা ধর্মগ্রন্থে প্রবিষ্ট করেছিলো, এসব তত্ত্বের অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা হলো। যুক্তি ও প্রমাণ ব্যতীত চিন্তানায়কগণ পাদ্রীদের মনগড়া কথা মেনে নিতে প্রস্তুত হলো না। বিজ্ঞানীগণ নব নব উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ঘোষণা অব্যাহত রাখলো। তৎকালীন ইউরোপের পরিবেশ এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছিলো যে, পাদ্রী ও যাজকতন্ত্রের অযৌক্তিক মতবাদ অচিরেই কবরস্থ হতে যাচ্ছে। এ বিষয়টি বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্থ পাদ্রীরা স্পষ্ট অনুভব করে ক্ষমতা হারানো আতঙ্কে কম্পমান হয়ে উঠেছিলো। পায়ের তলার মাটির কম্পন থামাতে তারা নিজস্ব অস্ত্র প্রয়োগ শুরু করলো।

প্রথমে তারা চার্চের মাধ্যমে ধর্মের নামে আইন জারীর পথে অগ্রসর হলো। চিন্তাবিদ, গবেষক, আবিষ্কারক ও বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে আইন জারী করে তাদেরকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করলো। দেশের জনগণকে তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার আদেশ জারি হলো। অপরদিকে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধকগণও প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে সম্পূর্ণ বেপরোয়াভাবে যাজকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সংগ্রামের ঘোষণা দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে পাদ্রীদের উৎখাত করার প্রতীজ্ঞা করলো। পাদ্রীরাও ধর্মের দোহাই দিয়ে ধর্মান্ধ জনতার সহযোগিতায় ও রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুললো। পাদ্রীরা তাদের ভাষায় ধর্মদ্রোহীদের গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ ও তাদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন চালালো। তাদের ধন-সম্পদ গীর্জার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করলো। এতেও যখন বিজ্ঞানীদের দমন করা গেলো না, তখন তাদেরকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার লক্ষ্যে পাদ্রীরা Court of Inquisition নাম দিয়ে বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করলো। পাদ্রীরা ঘোষণা করলো, বিচার প্রতিষ্ঠান সেসব ধর্মদ্রোহী নাস্তিকদের শাস্তি প্রদান করবে যারা গ্রাম গঞ্জে, শহরে বন্দরে, ঘরে বাইরে, অন্ধকার গৃহকোণে, বনে জঙ্গলে, পর্বত গুহায় ও ক্ষেতে খামারে লুকিয়ে রয়েছে। এসব বিচার প্রতিষ্ঠান তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে।

সমগ্র ইউরোপে বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করে পাদ্রীরা আনাচে কানাচে গোয়েন্দা নিযুক্ত করলো। আবিষ্কারক, চিন্তাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের এবং তাদের সমর্থকদের খুঁজে বের করে বিচারালয়ে সোপর্দ করাই ছিলো গোয়েন্দাদের দায়িত্ব। কারো প্রতি সন্দেহ হলেই তাকে গোয়েন্দারা গ্রেফতার করে নির্যাতন করতো। সমগ্র ইউরোপে খুন, গুম হত্যা এমন স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিলো যে, কোনো মানুষ রোগ ব্যাধি জরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, এমন আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গিয়েছিলো। আর এসব কিছুই সংঘটিত হচ্ছিলো খৃষ্টান পাদ্রী ও চার্চের মাধ্যমে। মধ্যযুগীয় পাদ্রীদের বর্বর নির্যাতনের চিত্র অঙ্কন করে একজন খৃষ্টান গবেষক লিখেছেন, It was hardly possible for a man to be a Christian and die his bed. অর্থাৎ একজন খৃষ্টান বিছানায় মৃত্যুবরণ করবে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পাদ্রীদের প্রতিষ্ঠিত Court of Inquisition নামক বিচারালয় ১৪৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনূন্য তিন লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করেছে। অগণিত অসংখ্য মানুষের ওপর লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ চিরদিনের মতো পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। অসংখ্য মানুষের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অগণিত বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রায় লক্ষাধিক মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। আগুনের উত্তাপে মানুষ যখন আর্তচিৎকার করেছে, পাদ্রীরা লোমহর্ষক এ দৃশ্য দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছে। বহু সংখ্যক চিন্তানায়ককে হিংস্র পশুর খাঁচায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। হিংস্র পশু যখন মানুষকে ছিন্নভিন্ন করেছে, তার আর্তনাদ শুনে ও নির্মম দৃশ্য দেখে যাজকরা উল্লাস প্রকাশ করেছে।

যে সকল চিন্তাবিদদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্রুনো একজন। তাঁর প্রধান অপরাধ ছিলো, তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'এ পৃথিবী ব্যতীত আরো বহু সংখ্যক গ্রহ রয়েছে এবং সেসব গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে'। গোয়েন্দারা তাঁকে গ্রেফতার করে বিচারালয়ে যখন সোপর্দ করেছিলো, তখন সুপারিশ করেছিলো যে, 'এ লোকটিকে যেনো খুবই লঘু শাস্তি দেয়া হয়। শাস্তি প্রদানের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেনো লোকটির একটি ফোটা রক্তও মাটিতে না পড়ে'। এর অর্থ ছিলো লোকটিকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করতে হবে। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে গ্রেফতার করে পাদ্রীদের আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলো। তাঁর অপরাধ ছিলো যে, তিনি এ মত পোষণ করতেন, 'সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে'। পাদ্রী ও যাজকগণ

অগণিত জ্ঞান পিপাসু মানুষকে নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করেছে। কাঠের তক্তায় পেরেক গেঁথে মানুষকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তার বুকের ওপর বিকৃত ধর্মের অনুসারীরা লাফিয়ে আনন্দ ফূর্তি করেছে। কাউকে গাছের শাখায় ঝুলিয়ে রেখে ক্ষুধা পিপাসায় কষ্ট দিয়ে একটু একটু করে হত্যা করেছে। মধ্য যুগের ইউরোপের ইতিহাস খৃষ্টান ধর্ম নেতাদের বর্বরতার ইতিহাস। এসব ইতিহাস পাঠকালে চোখের অশ্রুধারা সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

মধ্যযুগীয় যাজকদের বর্বরতার পরিণতি

খুন, গুম, হত্যা, দমন নিপীড়ন ও নির্যাতন বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা ও মানুষের জ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধ করা যায় না। খৃষ্টান ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সম্মুখে ষষ্ঠ শতাব্দীর মুসলিমদের ইতিহাস জীবিত ছিলো। একজন মাত্র ব্যক্তি যাঁর পবিত্র নাম হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ), মানুষের স্থবির জড়বাদী বুদ্ধির দুর্গে আদর্শিক আঘাত করলেন। পৌত্তলিক জড়বাদী চেতনার দুর্গ ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে মাত্র তের বছর পরেই রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। এরপর অর্ধ পৃথিবী আদর্শের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলো। ইউরোপের চিন্তানায়কগণের মুক্তবুদ্ধি চর্চায় বাধাগ্রস্থ করে তাদেরকে সংগ্রাম ও আন্দোলনের ময়দানে পাদ্রীরাই নিক্ষেপ করেছিলো। প্রগতিবাদীদের ধৈর্য্যের বাঁধ তারাই ভেঙ্গে দিয়েছিলো। বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীনে তারাই বাধ্য করেছিলো। ইউরোপের সচেতন জনগোষ্ঠী বিকৃত ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীল যাজকদের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামের ঘোষণা দিতে বাধ্য হলো। তারা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের নিপীড়ন, নির্যাতন, অত্যাচার, বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার বিরুদ্ধে এমনভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো যে, প্রথম দিকে খৃষ্ট ধর্মের চেতনা, বিশ্বাস, কর্মপদ্ধতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাদের মনে প্রবল ঘৃণাবোধের সৃষ্টি হলো। পরবর্তীতে এ ঘৃণাবোধ সকল ধর্মের প্রতিই ছড়িয়ে পড়লো। আর এটা ছিলো মধ্যযুগীয় যাজকদের বর্বর কর্মকাণ্ডের অনিবার্য্য ফলশ্রুতি।

ইউরোপে বিজ্ঞানীদের বিকৃত ধর্মের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের সূচনা হলো, তা ক্রমশঃ সাধারণভাবে সকল ধর্ম ও ধর্মীয় চেতনার বিরুদ্ধে প্রবাহিত হলো। যে বৈরিতা ও যুদ্ধ প্রথম দিকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার ধারক এবং সেন্ট পলের খৃষ্ট ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো, পরে তা ধর্ম ও বিজ্ঞানের যুদ্ধ এবং পারস্পরিক সংঘর্ষের রূপ ধারণ করলো। মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী ও প্রগতিবাদীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, জ্ঞান বিজ্ঞান একদিকে এবং

ধর্ম আরেকদিকে। জ্ঞান বিজ্ঞান মানুষকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে আর ধর্ম মানুষকে পশ্চাতে ধাবিত করে। বিজ্ঞান মানুষকে আলোর পথের সন্ধান দেয় আর ধর্ম মানুষকে অন্ধকারে নিয়ে যায় এবং শোষণ করে। বিজ্ঞান মানুষকে মার্জিত ও ভদ্র বানায় আর ধর্ম মানুষকে বর্বর পশুত্বের নিম্ন স্তরে নামিয়ে দেয়। সুতরাং ধর্ম ও বিজ্ঞান একে অপরের প্রতিপক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী, এ দুটো কখনো সহবস্থান করতে পারে না, এক সাথে চলতেও পারে না। একটির উত্থানে আরেকটি আত্মগোপনে বা আত্মহত্যায় বাধ্য। বিজ্ঞান গবেষণা ও মুক্তিবুদ্ধির চর্চায় ধর্ম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, এ জন্যে ধর্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে।

ইউরোপে খৃষ্টান ধর্ম নেতাদের বর্বর আচরণের কারণে যারা ধর্ম সম্পর্কে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো এবং পরবর্তী প্রজন্ম যারা খৃষ্টান পাদ্রীদের ও ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস পাঠ করছে, তাদের সম্মুখে যখন ধর্মের নাম উচ্চারিত হয়, তখন তাদের মানসপটে ধর্মনেতা, ধর্মীয় প্রতিনিধি এবং গীর্জা ও চার্চের লোকজনদের প্রবল হিংস্র চেহারা ভেসে ওঠে। সকল নির্যাতনের ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাদের দৃষ্টির সম্মুখে জীবন্ত হয়ে ওঠে। যে সকল কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, গবেষক, আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক একান্ত অসহায়ভাবে হিংস্র পাদ্রীদের হাতে লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করেছিলো, সে সকল চিত্র তাদের হৃদয় মনকে বিগলিত করে দৃষ্টি অশ্রুসজল করে তোলে। ধর্মনিষ্ঠ লোক মানেই ক্রোধব্যঞ্জক অবয়ব, রুদ্র ভয়াল রুক্ষ মূর্তি, অগ্নিক্ষরা দৃষ্টি, কর্কস কণ্ঠ, দাম্ভিক অহঙ্কারী, চর্বি থলথলে শ্রম বিমুখ বিলাসী দেহ, স্থূল মস্তিষ্ক সম্পন্ন সঙ্কীর্ণ মন মানসিকতার অধিকারী মানুষরূপী পশুর চিত্র তাদের চোখে ভেসে ওঠে। এ কারণে তারা শুধুমাত্র বিকৃত ধর্ম সেন্ট পলের খৃষ্টবাদের বিরোধী না হয়ে সাধারণভাবে সকল ধর্মের প্রতিই ভীতি ও ঘৃণাকেই নিজেদের জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও উত্তরাধিকার হিসেবে গড়ে যায়। এ ধারাবাহিকতা এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

মধ্য যুগীয় বর্বরতা- ইসলাম ও মুসলমান

ভ্রষ্ট চিন্তা চেতনার অধিকারী পাদ্রী তথা খৃষ্ট ধর্ম নেতৃবৃন্দ কিভাবে ধর্মে পরিবর্তন সাধন করে নিজেদের মন মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা ধর্মগ্রন্থসমূহে প্রবিষ্ট করেছে, ইতোপূর্বে আমরা সে ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ কথাও আমরা আলোচনা করেছি, খৃষ্টধর্মের নামে যা কিছু প্রচলিত রয়েছে তা হযরত ঈসা

(আঃ) কর্তৃক প্রচারিত আদর্শ নয়। তিনি তাঁর অনুসারীগণকে নবী করীম (সাঃ) এর আগমন ও তাঁকে অনুসরণ করার কঠিন নির্দেশ দিয়েছেন, এ বিষয়টি আমরা তাদেরই বর্তমান বাইবেল থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছি। বার্ণাবাস এর বাইবেল সম্পর্কে আলোচনা করে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরেছি। খৃষ্টানদের চরমপন্থা বৈরাগ্যবাদ সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। ঐতিহাসিক এসব আলোচনা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, খৃষ্টান ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ নিজেদের মনগড়া বিধানকে খোদার বিধান হিসেবে চালায় এবং এতে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন পরিবর্ধন করে। ইউরোপে ধর্মের নামে যে বর্বরতা ঘটিয়েছে তা-ও নিজেদের মনগড়া বিধানের অভিব্যক্তি। এর মধ্যে খোদায়ী বিধানের নাম নিশানাও নেই এবং থাকারও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ তাদের কাছে খোদায়ী কোনো বিধানের অস্তিত্ব কখনোই ছিলো না। খৃষ্টান পাদ্রীদের বর্বরতা দেখে ও ইতিহাস পাঠ করে যারা সাধারণভাবে সকল ধর্মের ব্যাপারে যে বৈরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তারাও ঐতিহাসিকভাবে ভুল সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে।

নিজেদের মুক্তিবুদ্ধির চর্চাকারী ও প্রগতিবাদী বলে যারা পরিচয় দেয় তাদের মধ্যে ধৈর্য্য ও ধীর স্থিরভাবে মুক্ত মনে অধ্যয়ন এবং গভীর চিন্তা ভাবনা করার শক্তি তখনও কার্যকর ছিলো না এখনো নেই। কারণ তারা একদিকেই দৌড় দিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। আশে পাশে দৃষ্টি দেয়ার অবকাশ যেনো তাদের নেই। প্রকৃত ধর্ম, ধর্মের প্রতিনিধি ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মের ছদ্মাবরণে হিংস্র নেকড়ে বাঘের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে প্রকৃত ধর্মকে চেনা জানার লক্ষ্যে যে সময় ব্যয় প্রয়োজন, তা সে যুগের ধর্ম বিরোধীগণও ব্যয় করেনি, তাদের অন্ধ অনুসারীগণ এখনো ব্যয় করতে রাজী নয়। এরা আনন্দ ফূর্তি, নৃত্য গীত, নাটক সিনেমা দেখায় ও নানাবিধ সাহিত্য এবং ইতিহাস পাঠে অঢেল সময় ব্যয় করতে রাজী, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম অনুসন্ধানে অধ্যয়ন করতে রাজী নয়। ইউরোপের মাটিতে ধর্মের নামে যে বর্বরতা সংঘটিত হয়েছিলো, এ জন্যে ধর্ম কতটা দায়ি, আর খৃষ্টিয় পাদ্রীদের মূর্খতা, মূঢ়তা, দাম্ভিকতা, অহঙ্কার, ক্ষমতা লিপ্সা, ভোগ-বিলাস, ভ্রান্ত চিন্তা, প্রতিহিংসামূলক অসহিষ্ণুতা, নির্যাতন ও ভ্রান্ত প্রতিনিধিত্ব কতটা দায়ি, তা কখনো ধর্ম বিরোধিগণ চিন্তা করে দেখেনি।

সে সময় উদ্ভূত পরিস্থিতি তাদেরকে চিন্তা করার সুযোগ না দিলেও পরবর্তীতে তারা চিন্তা করতে পারতো। সে যুগের ধর্ম বিরোধিগণ মুসলিম অধ্যুষিত অর্ধেক পৃথিবীর ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতো, সেখানে বিভিন্ন জাতি একই আদর্শের পতাকাতলে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির সাথে বসবাস করছে এবং ধর্মীয়

ব্যক্তিত্বগণ সকলের সাথে কেমন বিনয়ী আচরণ ও ইনসাফ করছে। মুক্তবুদ্ধি ও বিজ্ঞান চর্চায় কিভাবে ইসলাম তার অনুসারীদের উৎসাহিত করছে, ইসলামী ব্যক্তিত্বগণ কিভাবে নিত্য নতুন আবিষ্কার করছে, তাহলেই তাদের কাছে ইসলাম ও খৃষ্টবাদের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে যেত। তাদের সম্মুখে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হত। কিন্তু সেদিকে তারা দৃষ্টি না দিয়ে ধর্মমাত্রই বর্বর বলে রায় দিয়েছে। প্রকৃত সত্য জানার লক্ষ্যে কোনোরূপ চিন্তা গবেষণা না করেই পাদ্রীদের বর্বরতার জন্যে ধর্মকে দায়ি করে ধর্মকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, ধর্মকে শাস্তি দেয়া এবং ধর্মের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা কি সুবিবেচনাপ্রসূত? পরবর্তীকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত যারা মধ্যযুগীয় বর্বরতার জন্যে ধর্মকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করে, তারা কি কখনো ইসলাম ও পাদ্রীদের ভ্রান্ত মতবাদের পার্থক্য অনুসন্ধান করে দেখেছে? বর্বরতার ঐ ঘৃণ্য কর্মে একজন ইসলামী ব্যক্তিত্বের সামান্যতম ভূমিকা রয়েছে কিনা তা কখনো ভেবে দেখেছে?

মধ্যযুগে যখন ইউরোপে যাজকতন্ত্র প্রচলিত ছিলো এবং পাদ্রীদের হাতে ছিলো শাসনদণ্ড, তখন তারা সমগ্র ইউরোপে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চালিয়ে মানুষের মনে ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে ঘৃণাই সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রচারণার সে ধারায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অধিক গতি সঞ্চার হয়েছে। সে যুগেও যেমন ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যের সাধারণ অধিবাসীগণ প্রকৃত সত্য জানতে পারেনি, এখনো পারছে না। ফলে মধ্যযুগে পাদ্রীদের নির্মম নির্যাতনে প্রাণ হারালেও তারা ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে জানার আগ্রহ অনুভব করেনি। এ ব্যাপারে সে যুগের মুসলিমদের অলসতাও দায়ি। তারা কয়েক শত বছর পাশ্চাত্যের মতো বিশাল দেশসমূহে ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং সেখানের মানুষদের ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কাজে মনোনিবেশ করেননি। যাজকতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট অন্ধকারে মানুষ যেভাবে নিগৃহীত হয়েছে, তাদের সম্মুখে নন্দিত আদর্শ ইসলামের সৌন্দর্য্য তুলে ধরলে ইউরোপের ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতো।

সুতরাং মধ্যযুগীয় বর্বরতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে যারা ইসলামের প্রতি মানুষের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করছে, হয় তারা সম্পূর্ণ জেনে বুঝে জ্ঞানপাপীর ভূমিকা পালন করছে, অথবা তারা তদানীন্তন ইউরোপে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ইসলামের সাথেও বৈরী আচরণ করছে। প্রায় অর্ধ পৃথিবী ইসলামী অনুশাসনের অন্তর্ভূক্ত ছিলো, বিভিন্ন গোত্র বংশ ও জাতি গোষ্ঠী মুসলিম সাম্রাজ্যের অধীনে শাসিত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব যারা

করেছেন, তাঁরা কোথাও মুসলিম বা অমুসলিম কারো প্রতি ইসলামের নামে সামান্যতম অবিচার করেছেন ইতিহাসে এমন একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে বের করা যাবে না। ইসলাম জ্ঞানের অলঙ্কারে মানুষকে সজ্জিত হয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে আদেশ দিয়েছে। নবী করীম (সা:) এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী অবতীর্ণ করা হয় তার প্রথম বাক্যই ছিলো, 'আপনি পড়ুন আপনার রব-এর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন'। অর্থাৎ ওহীর সূচনা করা হলো, 'পড়ো' শব্দের মাধ্যমে। জ্ঞানার্জন করা ইসলাম তার অনুসারীদের ওপর ফরজ করেছে। কারণ ইসলাম একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের অনুসারীগণ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকলে তারা অপশক্তির ষড়যন্ত্রের সহজ শিকারে পরিণত হতে পারে। এ জন্য পড়তে হবে, জানতে হবে এবং জ্ঞানার্জন করতে হবে। ইসলামের আগমনই ঘটেছে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য। পৃথিবী থেকে মূর্খতার অন্ধকার দূরিভূত করে সমগ্র পৃথিবীর পরিবেশকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করার উদ্দেশ্যেই ওহীর সূচনাতেই বলা হয়েছে, 'পড়ো' Read-read and read। আল্লাহর কোরআনের অনেক আয়াতে মানব মণ্ডলীকে আহ্বান জানানো হয়েছে, 'হে চক্ষুষ্মানরা! দৃষ্টি উন্মিলিচিত করো। আমার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করো। আমি যে বস্তুসমূহ দান করেছি, তা নিয়ে গবেষণা করে নিজেদের কাজে লাগাও। হে জ্ঞানবান চিন্তাশীলরা! সমস্ত কিছুর ওপরে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করো। আমার সৃষ্টি বস্তুনিচয়কে যথাযথ উপায়ে ব্যবহার করো। জ্ঞানার্জন করো এবং জ্ঞানের অস্ত্র প্রয়োগ করে মূর্খতাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দাও'।

জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের বলেছেন, 'আমার কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আবেদন করো, আমি তোমাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দিবো'। সূরা ত্বাহা-এর ১১৪ নম্বর আয়াতে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এভাবে দোয়া করতে বলা হয়েছে, 'হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও'। যারা জ্ঞানার্জন করেছে, জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানার্জন করেনি, তারা কখনো সমান হতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা যুমারের ৯ নম্বর আয়াতে বলেন, 'যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?' জ্ঞানীদের সম্মান ও মর্যাদা মহান আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিবেন। সূরা মুজাদিলার ১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন'। আল্লাহর কোরআনে যেমন জ্ঞানার্জন সম্পর্কে বার বার তাগিদ দেয়া হয়েছে, এর ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি হাদীসেও জ্ঞান ও জ্ঞানীদের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে মদীনা নগরী থেকে দূরতম দেশ সুদূর চীনে যাওয়ার জন্যও উৎসাহিত করেছেন। রাসূলের এ কথার অর্থ এটা নয় যে, একমাত্র চীনে গিয়েই বোধহয় জ্ঞানার্জন করতে হবে। রাসূলের কথার অর্থ হলো, জ্ঞানার্জনের জন্য পৃথিবীর যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হবে, সেখানেই যেতে হবে। যুদ্ধে যারা মুসলমানদের হাতে সে যুগে বন্দী হতো, তাদেরকে পণ্যের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হতো। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ)ই সর্বপ্রথম বন্দীদের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, বন্দীদের মধ্যে যারা অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন তারা দশজন মুসলমানকে অক্ষর জ্ঞান দিতে পারলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। বাস্তবেও তিনি তাই করেছিলেন। গণশিক্ষা কার্যক্রম এই পৃথিবীতে নবী করীম (সাঃ)ই সর্বপ্রথম চালু করেছিলেন। কোন্ জ্ঞান অর্জন করতে হবে, সে কথাও প্রথম ওহীতে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ওহীর সূচনাতেই বলা হয়েছে, 'পড়ো তোমার রব-এর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন'। ঐ জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যে জ্ঞান স্বয়ং রব- মানুষের মালিক, প্রভু, মনিব, ইলাহ, প্রতিপালক, আইনদাতা, বিধানদাতা তথা যাবতীয় প্রয়োজন যিনি আবেদন করার পূর্বেই পূরণ করেছেন এবং করেন, তিনি যে জ্ঞান ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে তাঁর রাসূলের কাছে অবতীর্ণ করেছেন, সেই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যেক দিক রচনা করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা নয়- ধর্মভিত্তিক তথা ওহীভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কেবলমাত্র এই শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ তার প্রকৃত পরিচয় এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবে। এই শিক্ষাই মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহ বিকশিত করে এক মানুষকে অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল করতে পারে। অপরের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি করতে পারে কেবলমাত্র ওহীভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

এ কথা চিরন্তন সত্য যে অজ্ঞতাই পশ্চাদপদতা। অজ্ঞতা মানুষকে পেছনের দিকে নিয়ে যায়। পড়তে হবে, না পড়লে কোনো কিছু জানা অসম্ভব। যত পড়া ও অধ্যয়ন করা হবে, ততই জ্ঞানের জগতে সমৃদ্ধি ঘটবে। মানুষ পৃথিবীতে জ্ঞানের কুঞ্জবনে এক মধুমক্ষিকা। এখানে সে যত খুশী জ্ঞানার্জন করবে। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে দশজন লোক উপস্থিত হয়ে জানালো, 'আপনি অনুগ্রহ করে অনুমতি দিলে আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করার ইচ্ছা পোষণ করি'। খলিফা জানালেন, 'আপনারা নির্ভীক চিত্তে স্বাধীনভাবে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন'। লোকগুলো বললো, 'আমাদের দশজনের প্রশ্ন মাত্র একটি। কিন্তু আমরা আশা করি

আপনি একটি প্রশ্নের দশ ধরনের জবাব দিয়ে আমাদেরকে সন্তুষ্ট করবেন। প্রশ্নটি হলো, জ্ঞান ও সম্পদের মধ্যে কোনটি উত্তম এবং কেনো উত্তম?'

হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিলেন, 'আল্লাহর রাসূলের নীতি হলো জ্ঞান আর ফেরাউনের উত্তরাধিকার হলো সম্পদ-সুতরাং জ্ঞানই উত্তম। সম্পদশালীর শত্রুর সংখ্যা অধিক আর জ্ঞানীর বন্ধুর সংখ্যা অধিক, অতএব জ্ঞানই উত্তম। তুমি স্বয়ং সম্পদের পাহারাদার আর জ্ঞান তোমার পাহারাদার, সুতরাং জ্ঞানই উত্তম। জ্ঞান বিতরণে বৃদ্ধি পায় আর সম্পদ বিতরণে হ্রাস পায়, অতএব জ্ঞানই উত্তম। সম্পদশালী হয় কৃপণ আর জ্ঞানী হয় দানশীল, সুতরাং জ্ঞানই উত্তম। জ্ঞান চুরি করা যায় না কিন্তু সম্পদ চুরি করা যায়, অতএব জ্ঞানই উত্তম। কালের করাল গ্রাসে সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয় কিন্তু জ্ঞান ক্ষতিগ্রস্থ হয় না, সুতরাং জ্ঞানই উত্তম। সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং তা গণনা করা যায় কিন্তু জ্ঞান সীমাহীন, তা গণনা করা যায় না, সুতরাং জ্ঞানই উত্তম। জ্ঞান হৃদয়ের অন্ধকার দূরিভূত করে হৃদয়কে আলোকিত করে আর সম্পদ হৃদয়কে কালিমা লিপ্ত অহঙ্কারী করে, অতএব জ্ঞানই উত্তম। জ্ঞান মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে যেমন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মহান আল্লাহকে বলেছেন, আমরা আপনার দাসত্ব করি, আমরা আপনারই দাস। পক্ষান্তরে সম্পদ ফেরাউন ও নমরুদকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, তারা দাবী করেছে আমরা ইলাহ'।

পবিত্র কোরআনে জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি কাগজ কলমের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদেরকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন'। পবিত্র কোরআন এবং হাদীস অভ্রান্ত জ্ঞানের এক অনিঃশেষ মহাসমুদ্র। কোরআন ও হাদীসের স্পর্শে যারাই এসেছে তারাই জ্ঞানার্জনের প্রতি মনোযোগী হয়েছে। মুসলিমরা জ্ঞানের প্রতি প্রবল আগ্রহী এক মিল্লাত। মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত একটিও নেই যে, এরা জ্ঞানার্জনের প্রতি কোথাও সামান্যতম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত সত্য জানার জন্যে পবিত্র কোরআন মানুষকে নির্দেশ দিয়েছে। অথচ ধর্মের নামে পৃথিবীতে এমন কিছু মতবাদ রয়েছে, যা তার সংখ্যা গরিষ্ঠ অনুসারীদের জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ নিষিদ্ধই শুধু করেনি, স্পর্শ করা ও কানে শোনাও নিষিদ্ধ করেছে। অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের পথে অর্গল তুলে দিয়েছে। আর ইসলাম পবিত্র কোরআন হাদীসকে সকল মানুষের জন্যে উন্মুক্ত অবারিত করে দিয়েছে। পৃথিবীর যে কোনো মানুষ কোরআন হাদীস অধ্যয়ন করতে পারে। এভাবে ইসলাম জ্ঞানার্জনের সকল দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়ে প্রকৃত সত্য জানতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।

চিন্তা গবেষণা ও জ্ঞানার্জনের প্রতি মুসলিম মিল্লাতের প্রবল আগ্রহের একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত মুসলিমদের সাথে খৃষ্টানদের সন্ধিতে পাওয়া যায়। অষ্টম শতকের শেষ দিকে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে নিসোফোরাস আরোহণ করে। শক্তিগর্বে অন্ধ হয়ে রোম সম্রাট বাগদাদের খলীফাকে পূর্ব নির্ধারিত কর দেয়া বন্ধ করে দিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করে জানিয়ে দেয় যে, 'ইতোপূর্বে যেসব মহামূল্যবান বস্তু আপনার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে তা ফেরৎ পাঠান, যদি না পাঠান তাহলে অস্ত্রই এর মীমাংসা করবে'। বাগদাদের খলীফা পত্রের উত্তর দিলেন, 'তোমার পাঠানো পত্রের উত্তর কিছু দিনের মধ্যে চোখেই দেখতে পাবে'। বাগদাদের খলীফা বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্যে অগ্রসর হলেন। হেকক্লিয়াতে খৃষ্টান ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে প্রবল যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং খৃষ্টান বাহিনী পরাজিত হলো। রোম সম্রাট নিসোফোরাস আতঙ্কিত হয়ে পূর্বের তুলনায় অধিক কর দিতে সম্মত হয়ে সন্ধি ভিক্ষা করলো। ইতোমধ্যেই বাগদাদের খলীফা নিসোফোরাসের রাজ্য প্রায় অর্ধেক দখল করে নিয়েছেন। রোম সম্রাটের সন্ধির প্রস্তাবে রাজী হয়ে বাগদাদের খলীফা এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিলেন। খলীফা বলে পাঠালেন, 'আপনার রাজ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে যে সকল গ্রন্থ রয়েছে তার প্রত্যেকটির একটি করে কপি আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন। বিনিময়ে আমি আপনার রাজ্যের যে অর্ধেক দখল করেছি তা আপনাকে ফিরিয়ে দিবো'। এরপর খলীফা এশিয়া মাইনরে দলে দলে মুসলিম পণ্ডিতদের প্রেরণ করলেন। তাঁরা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় বহু মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ করে বাগদাদে নিয়ে এলো। রাজ্যের বিনিময়ে পুস্তক, এ উদারতা জ্ঞান পিপাসু মুসলিমদের পক্ষেই প্রদর্শন করা সম্ভব।

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে অযৌক্তিক এমন একটি বাক্যও নেই যা মানুষের কাছে দুর্বোধ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। ইসলামী বিধান মানুষকে মানতে বাধ্য করা হবে, এমন একটি কথাও কোরআন হাদীসে নেই। নবী করীম (সাঃ) কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'আপনাকে আমি দারোগা হিসেবে প্রেরণ করিনি, প্রেরণ করেছি সতর্ককারী হিসেবে। আপনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রকৃত সত্য মানুষের সম্মুখে তুলে ধরুন, তারপর যার ইচ্ছা সে সত্য অনুসরণ করবে আর যার ইচ্ছা সে ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করবে'। আর ঠিক এ কারণেই যাঁরা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁরা সাম্ভাব্য সকল উপায়ে সুন্দরতম পন্থায় মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। জান্নাত ও জাহান্নামের দুটি পৃথক পথ তাঁরা মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেন। পোপ পাদ্রী ও যাজকদের ন্যায় তাঁরা জান্নাত ও জাহান্নামের সনদ বিক্রি করেন না।

চিন্তা গবেষণা ও আবিষ্কারের সাথে ইসলামের বিরোধ নেই বরং ইসলাম বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণ করার জন্যে পবিত্র কোরআন হাদীসে সামগ্রিক সুত্রসমূহের সন্ধান দিয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে নিয়োজিত হবার আদেশ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে জড়তা, অলসতা, আরাম প্রিয়তা, শ্রম বিমুখতা, কাপুরুষতা, হীনমন্যতা ইত্যাদি দূরে ঠেলে মৃদু তিরস্কারের ভাষায় মানবজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছে, 'তোমরা কি চিন্তা গবেষণা করবে না? তোমরা কি দৃষ্টি উন্মোচন করে দেখবে না? তোমাদের কি বিবেক নেই? তোমাদের কি দৃষ্টি নেই? তোমাদের কি জ্ঞান বুদ্ধি নেই? তোমাদের অন্তর কি তালাবদ্ধ? তোমরা কি সত্য অনুধাবন করবে না? তোমরা কি দেখো না? আমি কি তোমাদের মগজ দেইনি? তোমরা কি বুঝো না? যে জানে আর যে জানে না, সে কি সমান? তোমাদের দেহনির্গত শুক্র সম্পর্কে ভেবে দেখেছো? মাতৃগর্ভে কিভাবে ভ্রূণ বৃদ্ধি পায় তা কি কখনো ভেবেছো? বীজ থেকে কিভাবে ফসল উৎপাদন হয় তা কি কখনো ভেবে দেখেছো? আকাশকে কিভাবে স্তম্ভ ব্যতীতই রেখেছি তা কি কখনো ভেবেছো? মেঘমালা সম্পর্কে ভেবেছো? মেঘমালা থেকে কিভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত যমীনকে জীবিত করি কিভাবে তা চিন্তা করে দেখেছো? সমুদ্রে যান চলাচল করে কিভাবে তা কি ভেবে দেখেছো? চন্দ্র সূর্য ও ছায়া সম্পর্কে কখনো ভেবেছো? বজ্রপাত সম্পর্কে কখনো চিন্তা করে দেখেছো? নিজের জানা না থাকলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো, পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, সত্য অনুসন্ধান করো, পৃথিবীর বস্তু নিচয় আমি তোমাদের কল্যাণে সৃষ্টি করেছি' তোমাদের পশু সম্পদের দিকে তাকাও, বনাঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি দাও, বৃক্ষ তরুলতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, নিজ দেহের প্রতি দৃষ্টি দাও'।

এ ধরনের অগণিত বিষয়ে মানুষকে চিন্তা গবেষণা করার লক্ষ্যে ইসলাম বার বার তাগিদ দিয়েছে। মহাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ, পৃথিবীর গতি, ঘূর্ণন, কক্ষীয় গতি, কক্ষ পথে পরিভ্রমণ, অয়ন গতি, গ্রহ, নক্ষত্র ও সৌর জগৎ, চন্দ্র-সূর্য্য, সূর্য্যের ঘূর্ণন, পৃথিবীর ওপর সূর্য্যের প্রভাব, ছায়াপথ ও তার ঘূর্ণন, সৃষ্টি জগতের গঠন প্রণালী, সৃষ্টি জগতের সম্প্রসারণ, সৃষ্টি জগতের অতীত, দিকচক্রবাল, জীবের বৈশিষ্ট্য ও জীবের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ, বায়ু মণ্ডল, পানি থেকে জীবন্ত বস্তুর সৃষ্টি, ভূ-পৃষ্ঠ, পাহাড়-পর্বত, মৃত্তিকা, পৃথিবীর কম্পন, বর্ষ, দিন ও মাস গণনা, গ্রহ নক্ষত্র তারকাপুঞ্জ ও সূর্য্যের অন্তিম দশা, কোয়াশার, ব্লাকহোল, নক্ষত্রের পতন, প্রাথমিক ডিম্ব, প্রজনন, ডিম্বাণু, ভ্রূণ, বীর্যের উৎপত্তি, জরায়ুতে ভ্রূণের স্থাপন, ভ্রূণের বর্ধন ও বিকাশ, ভ্রূণের লিঙ্গ, প্রাণের সঞ্চার ইত্যাদি বিষয়ে পবিত কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য স্থানে

আলোচনা করে এসব বিষয়ে মানুষকে প্রকৃত সত্য জানার জন্যে উৎসাহিত করে বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, 'এক ঘন্টা জ্ঞানার্জন করা সারা রাত নফল নামাজের চেয়ে উত্তম'।

ইসলামই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের সকল সূত্র মানুষের সম্মুখে প্রকাশ করেছে। এ মন্তব্য করার কোনো অবকাশই নেই যে, বিজ্ঞান চর্চার সাথে ইসলামের বিরোধ রয়েছে এবং ইসলাম ও বিজ্ঞান পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন সূত্রের জন্যে আধুনিক বিজ্ঞান ইসলামের কাছে ভিখারীর ন্যায় হাত পেতে রয়েছে। মুসলমানরাই কয়েক শতাব্দীব্যাপী পৃথিবীতে বিজ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। জন্ম দিয়েছিলেন মানবেতিহাসের অনন্য সাধারণ একটি অধ্যায়ের, যে অধ্যায়ের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন কট্টরপন্থী বহু সংখ্যক ইসলাম বিদ্বেষীও। মধ্য যুগে খৃষ্টিয় পাদ্রীদের সৃষ্ট কুহেলিকায় মুসলিমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের এক দেদীপ্যমান আলোর উৎসব সৃষ্টি করেছিলো। পুরনো জাতিসমূহের জ্ঞান বিজ্ঞান সংগ্রহে মেতে উঠেছিলো মুসলিম অনুবাদকবৃন্দ। জ্ঞান গবেষণার এক পর্যায়ে তাঁরা জন্ম দিয়েছিলো এক অসামান্য শতাব্দীর, যা বিশ্ব সভ্যতায় আরব সভ্যতা নামে পরিচিত। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উন্নয়নে এবং জ্ঞান গবেষণার নিত্য নতুন অভিধার সন্ধানে মুসলিম বিজ্ঞানী ও মনীষীগণ পৃথিবীর সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত করলেন এমনই দীপ্ত শিখা যা সেই মধ্য যুগকে আলোকিত করেছিলো। আধুনিক বিজ্ঞান ও আবিষ্কার যুগের পথিকৃৎ হয়ে রয়েছে সেই যুগ প্রবর্তক মুসলিম বিজ্ঞানীগণ।

অনেকে মধ্য যুগকে অন্ধকার যুগ হিসেবে চিত্রিত করেন। ইউরোপ তথা পাশ্চাত্যকে অন্ধকার যুগ বলে চিত্রিত করা সম্ভব এবং খৃষ্টিয় পাদ্রীগণ পাশ্চাত্যকে অন্ধকারাচ্ছন্ন রেখেছিলো এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য যে, মধ্যযুগে মুসলিমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় বিচরণ করে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। মধ্যযুগে মুসলমানদের ভূমিকা প্রকৃতপক্ষেই আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার। আধুনিক বিজ্ঞান শুধু বিস্ময়কর আবিষ্কারের জন্যই নয়, তার নিজের অস্তিত্বের জন্যই মুসলমানদের কাছে ঋণী। পাশ্চাত্যের গবেষক Robert Brifault তাঁর The Making of Humanity নামক গ্রন্থে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world. The debt of our science to that of Arabs does not consist in starling discoveries or revolutionary

theories; science owes a great deal more to the Arab culture, it owes its existence.

বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা প্রশাখা নেই যেখানে মুসলিমদের হাতের স্পর্শ ঘটেনি। মুসলিমদের রচিত বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত কালজয়ী গ্রন্থসমূহ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পঠিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্পে আক্রান্ত পাশ্চাত্যের গবেষকবৃন্দ মুসলিম সভ্যতা উল্লেখ না করে আরব সভ্যতা হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। বিজ্ঞান জগতে মুসলিম মিল্লাতের শ্রেষ্ঠযুগ হিসেবে সাধারণত ৭৫০ থেকে ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ৩৫০ বছরকে গণনায় ধরা হয়। অথচ এই উত্তরাধিকার কাজে লাগাতে পাশ্চাত্যকে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অপক্ষো করতে হয়েছে। পাশ্চাত্যে একমাত্র স্পেন ব্যতীত অন্য কোথাও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। স্পেনেও যদি মুসলিমরা প্রবেশ করতে সক্ষম না হতো তাহলে নিশ্চিতভাবে এ সত্য বলা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞান আরো কয়েক শতাব্দী পেছনে পড়ে থাকতো। ইসলাম এমন অসংখ্য মুসলিম কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী জন্ম দিয়েছে যাঁদের শুধুমাত্র নাম উল্লেখ করতে গেলে বিশাল আকৃতির গ্রন্থ রচিত হবে।

বর্বরতার গর্ভজাত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

ইতোপূর্বে আমরা ইউরোপের মাটিতে পোপ, পাদ্রী ও যাজকদের সাথে মধ্যযুগে চিন্তাবিদ, গবেষক, আবিষ্কারক ও বিজ্ঞানীদের সংঘর্ষ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ধর্মের নামাবলী আবৃত পাদ্রীদের দ্বারা বিজ্ঞানীগণ কিভাবে নির্যাতিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন তা ইতিহাস থেকে উল্লেখ করেছি। এ কথাও আমরা ঐতিহাসিক তথ্য থেকে উল্লেখ করেছি, পাদ্রীদের কাছে কোনো ঐশীবাণী ছিলো না। জ্ঞানার্জনের সকল পথে তারা অর্গল তুলে দিয়ে সম্পূর্ণ মনগড়া বিধানের অধীনে মানুষকে দাসত্ব করতে বাধ্য করতো। তাদের বিরুদ্ধে যে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন সংগ্রামের সূচনা হয়েছিলো, তা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীব্যাপী অব্যাহত ছিলো। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামে উভয় পক্ষই ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে অবশেষে আপোষের দিকে অগ্রসর হলো। মার্টিন লুথার নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলনকে আপোষ আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আপোষ আন্দোলন থেকে পোপ, পাদ্রী ও যাজকদের কাছে এ প্রস্তাব পেশ করা হলো, 'ধর্ম জনগণের ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকবে। জনগণের ধর্মীয় দিক ও বিভাগসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে পোপ, পাদ্রী ও যাজক তথা চার্চের হাতে। দেশ, সমাজ তথা পার্থিব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। পার্থিব কোনো বিষয়ে পোপ, পাদ্রী, যাজক তথা চার্চের কোনো প্রাধান্য থাকবে না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে পোপ, পাদ্রী, যাজক তথা চার্চের কাছেই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় শপথ গ্রহণ করতে হবে'।

মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে পরিচালিত এ আপোষ প্রস্তাব যাজকগোষ্ঠী ও বিজ্ঞানপন্থীদের কাছে পেশ করা হলো। মুক্ত চিন্তানায়কগণ, গবেষকবৃন্দ ও বিজ্ঞানীগণ এবং তাদের সমর্থকবৃন্দ এ প্রস্তাব আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করলো। যদিও তারা ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করার লক্ষ্যেই আন্দোলন করছিলো, তবে এ প্রস্তাবের মাধ্যমে তারা বুঝলো, পার্থিব কোনো দিক ও বিভাগে যদি ধর্মের কোনো কর্তৃত্ব ও প্রভাব না থাকে, তাহলে ধর্ম এক সময় নিজ পরিমণ্ডলেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে। ধর্মের প্রভাবমুক্ত যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে, এ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজন ধর্মের স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবে এবং ধর্মের কোনো প্রয়োজন জীবনে অনুভব করবে না। ফলে ধর্ম সকল প্রভাব হারিয়ে শুধুমাত্র গীর্জা পরিমণ্ডলে টিকে থাকলেও তাদের ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

অপরদিকে চার্চের যাজকগণ সমগ্র দেশ থেকে একত্রিত হয়ে এ প্রস্তাব পর্যালোচনা করার কাজে ব্যাপৃত হলো। তারা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে তখন যথেষ্ট সচেতন হয়েছিলো। অনুভব করেছিলো, সমাজের চিন্তানায়কদের সমর্থন, সহযোগিতা ও সাহায্য ব্যতীত শুধুমাত্র ধর্মান্ধ জনতার সমর্থনে নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখা যাবে না। দীর্ঘ দুইশত বছর আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করে তারা বিজয়ী হবার আশাও ত্যাগ করেছিলো। এ ছাড়া প্রস্তাবের একটি দিক ছিলো, 'রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে পোপ, পাদ্রী, যাজক তথা চার্চের কাছেই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় শপথ গ্রহণ করতে হবে'। এ দিকটি তাদের মর্যাদা কিছুটা হলেও রক্ষা করেছে বলে তারা বিবেচনা করে মার্টিন লুথারের আপোষ প্রস্তাবে সম্মত হলো। এরই ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত পাশ্চাত্যের দেশসমূহে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাইবেলে হাত রেখে চার্চ প্রধানের কাছে শপথ গ্রহণ করে।

ধর্মের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন হলো এবং মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ বিজয়ীর আসনে আসীন হলো। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ যাজকতন্ত্রের বর্বরতার গর্ভজাত সন্তান, এর সাথে ইসলাম ও মুসলিমদের দূরতম সম্পর্কও নেই। এ আন্দোলনের সাথে ইসলাম ও মুসলিমদের সামান্যতম সংশ্লিষ্টতা বা সম্পৃক্ততা ছিলো না, এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। বিজ্ঞানপন্থীগণ যখন আবিষ্কারের দুয়ার উন্মুক্ত করার দাবিতে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলো তখন পৃথিবীর অর্ধেক ভূখণ্ডে মুসলিমদের পরিচর্চায় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা প্রশাখা ক্রমশঃ সম্মুখের দিকে আলো বিকিরণ করে এগিয়ে যাচ্ছিলো। সে যুগে পাশ্চাত্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে খৃষ্টান ধর্ম যাজকদের প্রাধান্য ছিলো এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের সাম্প্রদায়িক প্রচারণার কারণে নন্দিত আদর্শ ইসলামের শিক্ষা সেখানে প্রবেশের সুযোগ পায়নি। সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে বাধা দিলেও বৈষয়িক স্বার্থে মুসলমানদের কাছ থেকে তারা বস্তুগত, জড় জীবন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সুত্রসমূহ গ্রহণ করেছিলো।

খৃষ্টান পাদ্রীদের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন সংগ্রামে লিপ্ত ছিলো তারাও অমুসলিম ছিলো এবং ধর্ম বলতে তারা বিকৃত খৃষ্টধর্ম সম্পর্কেই জানতো। ঐশী জীবন বিধান সম্পর্কে তারা ছিলো সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিকৃত খৃষ্ট ধর্মের কদর্যতা, বিভৎসতা, আত্মনিপীড়ন, বৈরাগ্যবাদ, স্ববিরোধী চিন্তা চেতনা, মানব প্রকৃতি বিরোধী ধ্যান ধারণা, পাদ্রীদের স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদির অনিবার্য ফল ছিলো চরমপন্থী মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা। এ মতবাদ কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে ভূমিষ্ঠ হয়নি, কোনো মুসলিম কর্তৃক আদর আপ্যায়নে বিকশিতও হয়নি। অমুসলিম দেশে তাদেরই অনুসৃত ভ্রান্তনীতির কারণে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উৎপত্তি। এর জন্মলগ্ন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এ মতবাদের মৌলিক কাঠামোয় কোনো পরিবর্তন সাধিত না হলেও এর সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ইংরেজী Secularism শব্দের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ। এ মতবাদের সমর্থক ও অনুসারীগণ প্রচার করেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থই হলো ধর্মহীনতা। Oxford dictionary Secularism-এর সংজ্ঞা দিয়েছে-

Secularism means the doctrine morality should be based solely on regard to the well being of mankind in the present

life- to exclusion of all considarations drawn from belif in God or in future state.

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হচ্ছে এমন এক মতবাদ যা মনে করে আল্লাহ বিশ্বাস বা পরকাল বিশ্বাসনির্ভর সকল বিবেচনা থেকে মুক্ত মানব জাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার ওপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।

Encyclopedia Britanica, সহ সকল বিশ্বকোষে Secularism-এর অর্থ করা হয়েছে–

No. 1- Secular sprit or tendency especially a system of politcal on social philosofy that rejects all forms religious faith.

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হচ্ছে সেই রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্ম বিশ্বাসকেই প্রত্যাখ্যান করে।

No. 2- The view that public education and other matters of civil society should be conducted without the introduction of a religious element.

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার একমাত্র অর্থ ধর্মহীনতা, কোনো ধর্মের অন্তর্গত না থাকা বা ধর্মদ্রোহীতা। ধর্মনিরপেক্ষতার এসব অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ বা সংজ্ঞা পৃথিবীর কোনো ডিকশনারীতে নেই। ধর্মীয় আচরণকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের প্রত্যেক স্তর থেকে ধর্মকে মুক্ত রাখতে হবে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এ মতবাদের লক্ষ্য। এ জন্যে এই মতবাদকে 'ধর্মহীনতা' বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

বিশ্বখ্যাত Random house dictionary of english language- secularism- এর তিনটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে–

No. 1-Not regarded as religious or spiritually sacred. যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।

No. 2-Not partaning to or connected with any religion. যা কোনো ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।

No. 3-Not belonging to a religious order. যা কোনো ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত নয়।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের নীতিমালা অনুসারেই নাস্তিক ব্যতীত কারো পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা ধর্মনিরপেক্ষ হবার দাবী করেন এবং ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালন করেন বলে প্রচার করে থাকেন, তারা হয় ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সাথে জেনে বুঝে প্রহসন করেন অথবা দেশের ধর্মভীরু জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্যেই প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিমালা স্পষ্টই ঘোষণা করেছে, নাস্তিকতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। English Secularism এ ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে–

Secularism is a code of duty pertaining to this life founded on consideration purely human, and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable. (English Secularism- 35)

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা শুধুমাত্র মানব সম্প্রদায়ের পার্থিব দায়িত্ব সম্পর্কিত নিয়মসমূহ এবং যারা ধর্মতত্ত্বকে অস্পষ্ট, অপূর্ণ, বিশ্বাস স্থাপনের অযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য মনে করে এই আদর্শ তাদের জন্যে।

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো, যারা ধর্মীয় বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতিকে অপূর্ণ বলে মনে করে, ধর্মীয় বিষয় যাদের কাছে অস্পষ্ট এবং ধর্ম এমন এক আদর্শ যা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য তথা ধর্মীয় বিষয়সমূহ একেবারেই অবিশ্বাস্য, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কেবলমাত্র তাদেরই আদর্শ হতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে নিজেদের যারা দাবী করেন ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে যারা কথা বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা অনুযায়ীই তারা নাস্তিক।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সর্ববিনাশী প্রভাব

ইতোপূর্বেই আমরা ইতিহাস থেকে আলোচনা করেছি যে, গ্রীক ও রোমান সভ্যতা মূলত: বস্তুবাদী ধ্যান ধারণার ওপর গড়ে উঠেছিলো এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসকেও বস্তুবাদের আঙ্গিকে সজ্জিত করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ অপ্রতিরোধ্য বন্যার গতিতে পাশ্চাত্যের সকল দিক প্লাবিত করে দিলো। প্রচ্ছন্ন বস্তুবাদ কয়েক শতাব্দীর সংগ্রাম ও আন্দোলনে বিজয়ী হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সংহারী মূর্তিতে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। এর পরিণতি যা আশঙ্কা করা হয়েছিলো, তার

থেকেও ভয়াবহ আকারে তা প্রকাশ পেলো। সমগ্র পাশ্চাত্য ধর্মকে পরিহার করে বস্তুবাদের দিকে প্রবল বেগে অগ্রসর হলো। চিন্তা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, মন-মস্তিষ্ক, মানসিকতা, মননশীলতা, দৃষ্টিভঙ্গী, আচার আচরণ, সামাজিকতা, রাজনীতি ও সরকার, গবেষণাভিত্তিক ও সৃজনশীল সাহিত্য, উপন্যাস, জ্ঞান বিজ্ঞান তথা মানব জীবনের সকল শাখা প্রশাখায় বস্তুবাদ ক্রমশঃ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রথম দিকে এর গতি শ্লথ থাকলেও পরবর্তীতে তা আলোর গতিতে চারদিকে অগ্রসর হলো।

আলাপ-আলোচনা, বক্তৃতামালা ও প্রবন্ধ উপস্থাপনে সর্বত্রই প্রচার হতে থাকলো, এ মহাবিশ্ব এক দুর্ঘটনার অনিবার্য ফলশ্রুতি এবং এর কোনো স্রষ্টা নেই। পৃথিবীর কোনো প্রতিপালক বা ব্যবস্থাপক নেই এবং সকল কিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে যেমন সৃষ্টি হয়েছে তেমনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলছে। এই প্রকৃতি ও বস্তুর উর্ধ্বে এমন কোনো শক্তি নেই যিনি এই পৃথিবীতে হস্তক্ষেপ করে বা প্রাকৃতিক বিধানে ভূমিকা পালন করে। না দেখে বা অনুভব না করে অদেখা বা অদৃশ্য স্রষ্টার প্রতি অকারণ আনুগত্য করতে তারা অসম্মতি জানালো। ধর্ম তাদের কাছে অবৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত হলো এবং ধর্ম ব্যঙ্গ বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত হলো। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন প্রত্যেক বস্তু ও বুদ্ধির অগম্য সকল কিছুকে তারা কল্পিত হিসেবে বিবেচনা করলো। দেশ জাতি ও সমাজের চালিকা শক্তির প্রভাবশালী অংশটি জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগে বস্তুবাদী ধর্মহীন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলো এবং সকল কিছুকেই বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে লাগলো।

স্রষ্টার সকল প্রভাব জীবনের সকল ক্ষেত্রে উপেক্ষা করার মনোবৃত্তি স্বয়ং স্রষ্টাকে অস্বীকার করার পর্যায়ে উপনীত যেমন হলো, তেমনি ধর্মরক্ষার লক্ষ্যেও একশ্রেণীর মানুষ সচেষ্ট ছিলো। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রও স্বার্থের প্রয়োজনে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে ধর্ম প্রভাব প্রতিপত্তিহীন হয়ে গীর্জায় টিকে থাক এ ব্যবস্থাও করেছিলো। কিন্তু ধর্ম টিকে রাখার উদ্দেশ্যে যারা তৎপর ছিলো, তারা বস্তুবাদে বিশ্বাসীদের সাথে একত্রে অগ্রসর হতে সক্ষম হলো না। কারণ বিকৃত খৃষ্টধর্মের গতি ছিলো সম্বুকের শ্লথ গতি, অপর দিকে বস্তুবাদের গতি ছিলো আলোকচ্ছটার ন্যায়। এ সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্যের ভূমিতে যে মানব সন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো তারা সমকালীন বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ভিত্তিতেই শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠছিলো। পরবর্তীকালে নতুন প্রজন্মদের মধ্যে বিপুল পরিমাণে লেখক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, অভিনেতা, চিন্তাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী, তাত্ত্বিক, সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানী গড়ে উঠলো এবং তারা সকলেই ছিলো বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা

শিক্ষায় শিক্ষিত। তারা তাদের সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের মন-মস্তিষ্কে বস্তুবাদের বীজ রোপন করলো। দার্শনিকগণ দার্শনিক নীতিমালাসমূহ এবং নীতিশাস্ত্রবিদগণ নীতি-নৈতিকতার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিতেন। তারা কখনো উপযোগিতাবাদের দর্শন তুলে ধরতেন কখনো বা বলতেন Eat drink and be merry খাও দাও আর ফূর্তি করো।

জীবন কেবলমাত্র একটি, এ জীবন একবার চলে গেলে আর ফীরে কখনো আসেনি এবং আসবেও না। পূর্বসূরীদের মধ্যে যারা অতীত হয়েছে তাদের নাম চিহ্ন মুছে গিয়েছে, দেহের অস্থিসমূহ মৃত্তিকার আহারে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আমরা যারা জীবিত রয়েছি আমাদেরও অনুরূপ পরিণতি ঘটবে। প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যু কখন কোন্ মুহূর্তে এসে জীবন ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, তা কেউ জানে না। মৃত্যুর আগমনের পূর্বেই জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে হবে। ধর্ম যে পরকালের কথা বলে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, অতএব পরকাল বলে কিছুই নেই। ধর্ম আবিষ্কৃত পরকাল সন্দেহ সংশয়ের আবরণে ধর্মস্থানেই অবস্থান করুক, জীবনের অঙ্গনে তা টেনে এনে জীবনকে অপূর্ণ রাখা ও অতৃপ্তি দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ধর্ম আবিষ্কৃত পরকাল বলে যদি কিছু থেকেই থাকে তাহলে সেটা বাকী। জীবনের বাকীর খাতা শূন্য থাক, অনেক দূরে যে বাদ্য বাজে তা দূর থেকে উপভোগ করে আনন্দ নেই। যেখানে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হচ্ছে আর তুমি যেখানে অবস্থান করছো, এর মাঝে অনেক দূরত্ব। পরকাল যদি থাকে তাহলে তোমার ও পরকালের মাঝে বিশাল ব্যবধান। সুতরাং মস্তিষ্ককে এসব কাল্পনিক চিন্তায় ব্যয় না করে জীবনকে ভোগ করো।

এই বেলা ভাই মদ পান করে নাও
কাল নিশিতের ভরসা কৈ?
চাঁদনী জাগিবে যুগ যুগ ধরি
আমরা তো আর রবো না সৈ।
নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকীর খাতায় শূন্য থাক
দূরের বাদ্য কী লাভ শুনে
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।

মিঃ মেকিয়াভেলী ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। সে যুগে তিনি 'ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক বিষয়' এ দর্শন পাশ্চাত্যবাসীর সম্মুখে তুলে ধরে নীতি ও

নৈতিকতাকে দুইভাগে বিভক্ত করলেন। একটি রাজনৈতিক আরেকটি ব্যক্তিগত নীতি নৈতিকতা। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, 'ধর্মের যদি কারো একান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে তা থাকবে তার ব্যক্তি জীবনে। বৈষয়িক কোনো বিষয়ে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না এবং রাজনীতি ও রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোনোরূপ সম্পর্কের প্রশ্নই আসে না। রাজনীতি ও রাষ্ট্র থাকবে সকল কিছুর উর্ধ্বে এবং সকল কিছুর মোকাবেলায় রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার সুরক্ষা করতে হবে। রাজনীতি ও রাষ্ট্র সবথেকে মূল্যবান বলে বিবেচনা করতে হবে। খৃষ্টধর্মের সকল সম্পর্ক থাকবে কেবলমাত্র গীর্জা ও পারলৌকিক বিষয়ের সাথে। পার্থিব জীবনের সাথে ধর্মের কোনোরূপ সম্পর্ক থাকবে না। ধর্মভীরু ও সৎ মানুষ দিয়ে রাজনীতি ও রাষ্ট্র চলে না, এসবে রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজন নেই এবং এর মধ্যে কোনো কল্যাণও নেই। কারণ ধর্মের অনুসারীগণ নীতি নৈতিকতা ও ঔচিত্যবোধকে উপেক্ষা করতে পারে না। রাষ্ট্র ও প্রশাসনযন্ত্রে অধিষ্ঠিত লোকজনকে রাষ্ট্র ও প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনায় অস্বাভাবিক রকমের ধূর্ত হতে হয়। রাজনীতি, রাষ্ট্র ও প্রশাসনযন্ত্রের স্বার্থে ধোঁকা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যার আশ্রয়, অঙ্গীকার ভঙ্গ, নির্যাতন অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ধর্ম অনুসারী লোকদের দ্বারা এসব সম্ভব নয় বিধায় রাজনীতি ও রাষ্ট্রের কাজে তাদের প্রয়োজন নেই। মেকিয়াভেলীর এই দর্শন বস্তুবাদকে অধিক শক্তিশালী করলো এবং পাশ্চাত্যের জাতিয়তাবাদী দর্শন এ নীতি গ্রহণ করে বাস্তবায়িত করলো।

তৎকালীন সমাজের বুদ্ধিজীবীগণ বক্তৃতা, বিবৃতি, লেখনী ও অন্যান্য সহায়তাকারী উপকরণের মাধ্যমে চারিত্রিক নীতি নৈতিকতা এবং সামাজিক বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে মানুষের জীবনধারায় বিশাল পরিবর্তন সাধন করে। অন্যায়, অনৈতিক ও পাপাচারমূলক কাজকে মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক পোশাকে সজ্জিত করে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরে। মানুষের সৃষ্টিগত প্রকৃতি এবং মানুষের স্বভাবকে সকল ধরনের বন্ধন থেকে মুক্ত বলে তারা প্রচারণা চালায়। স্বাভাবিক লজ্জানুভূতিকে নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করে প্রচার চলতে থাকে যে, নর ও নারীর যৌবন ক্ষুধা অপূর্ণ রাখা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যৌবনকে ক্ষুধার্ত না রেখে ভোগ করার অধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত। নারী ও পুরুষকে তাদের কামনা বাসনা ও ইচ্ছানুযায়ী সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার প্রদান করে জীবনের স্বাদ আস্বাদন করার সুযোগ প্রদান করা উচিত। অর্থোপার্জনে কোনো শৃঙ্খল আরোপ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। বুদ্ধিজীবী ও তৎকালীন সুশিল এবং অভিজাত লোকদের এসব প্রচারণা নীতি নৈতিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক সকল শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন করে নিরেট বস্তুবাদের ওপর মানুষকে বসিয়ে দিলো।

বর্তমানে এটাই বাস্তব সত্য যে, পাশ্চাত্যবাসীকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করছে বস্তুবাদ ও বস্তুপূজা। বস্তুপূজায় তাড়িত হয়েই তারা সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পৃথিবী বিখ্যাত চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ আসাদ (রাহঃ) যিনি ইয়াহূদী ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁর Islam at the cross road নামক গ্রন্থে পাশ্চাত্যের চিত্র এভাবে অঙ্কন করেছেন-

No doubt, there are still many individuals in the west who feel and think in a religious way and make the most desperate efforts to reconcile their beliefs with the spirit of their civilization, but they are exceptions only. The average occidental- be he a Democrat or a Fascist, a Capitalist or a Bolshevik, a manual worker or an intellectual- knows only one positive religion, and that is no other goal in life than to make life continually easier or as the current expression goes, independent of nature. The temples of this religion are the gigantic factories, cinemas, chemical laboratories, dancing halls, hydro-electric works; and its priests are bankers, engineers, film-stars, captains of industry, finance magnates. The unavoidable result of this craving after power and pleasure in the creation of hostile groups armed to the teeth and determind to destroy one another whenever and wherever their respective interests come to a clash. And on the cultural side the result is the question of practical utility alone, and whose highest criterion of good and evil is the material success. (Islam at the cross road)

অর্থাৎ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, পাশ্চাত্যের দেশসমূহে বর্তমান এমন বহু মানুষ রয়েছে যারা ধর্মকে অনুভব করেন। চিন্তা ভাবনা করেন এবং প্রচেষ্টা চালান তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও সভ্যতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য। পক্ষান্তরে তারা হলেন ব্যতিক্রমধর্মী। গণতন্ত্রী বা ফ্যাসিষ্ট, পুঁজিবাদী বা সমাজতন্ত্রী বলশেভিক, দিন মজুর বা বুদ্ধিজীবী, ইউরোপের যে কোনো সাধারণ এবং মধ্যম শ্রেণীর মানুষ একটি মাত্র ইতিবাচক ধর্ম সম্পর্কে জানে, সেটা হলো বস্তুবাদী উন্নতির পূজা। তাদের বিশ্বাস জীবনকে পর্যায়ক্রমে মুক্ত, সকল বন্ধনমুক্ত ও একান্ত সহজ করে তোলা ব্যতীত জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এক কথায় প্রকৃতি নিরপেক্ষ হওয়াই তাদের ধর্ম। বিশাল

কারখানাসমূহ, সিনেমা, রাসায়নিক গবেষণাগার, নৃত্যশালা, পানি, বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে তাদের ধর্ম মন্দির আর পুরোহিতরা হলো ব্যাংকার, ইঞ্জিনিয়ার, অভিনেতা, শিল্পপতি প্রভৃত অর্থ বিত্তের অধিকারীগণ। ক্ষমতা ও আনন্দের নেশার পরিণাম হয়েছে সর্বত্র স্বার্থ সংক্রান্ত সংঘাত। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এর অনিবার্য ফল হচ্ছে এমন ধরনের মানুষ গড়া, যাদের নীতি শুধু মাত্র উপযোগবাদের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ এবং প্রত্যেকের কল্যাণ ও অকল্যাণের মানদণ্ড হচ্ছে একমাত্র বস্তুবাদী সফলতা অর্জন।

আল্লামা মুহাম্মাদ আসাদ (রাহঃ) তাঁর গ্রন্থে অন্যত্র উল্লেখ করেছেন, 'পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে না। পক্ষান্তরে প্রকৃত সত্য হলো, পশ্চিমা সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ক ধারায় স্রষ্টার কোনো স্থান নেই এবং তার সামান্যতম প্রয়োজনও সেখানে অনুভূত হয় না'। (Islam at the cross road)

খৃষ্টিয় যাজকদের বর্বরতার গর্ভজাত সন্তান ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে সম্পূর্ণ স্রষ্টা বিমুখ জাতিতে পরিণত করে হৃদয়কে করেছে কঠিন এবং অনুভূতিশূন্য। প্রলয়ঙ্করী ঝড়, বন্যা, সুনামী, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, সর্বগ্রাসী দাবানল, আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদগীরণ, অর্থনৈতিক মন্দা, নানাবিধ রোগ যখন তাদেরকে গ্রাস করে, তখনও তারা অবচেতন মনেও স্রষ্টার কাছে বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে না। এদের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ- فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ-

আপনার পূর্বের জাতিসমূহের কাছেও আমি আমার রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তাদেরও আমি দুঃখ কষ্ট ও বিপর্যয়ে আটকে রেখেছিলাম, যাতে তারা বিনয়ের সাথে নতী স্বীকার করে। কিন্তু সত্যই যখন তাদের ওপর আমার বিপর্যয় এসে আপতিত হলো, তখনও তারা বিনীত হলো না, অধিকন্তু তাদের হৃদয় এতে আরো কঠিন হয়ে গেলো এবং তারা যা করে যাচ্ছিলো, শয়তান তাদের কাছে তা আকর্ষণীয় করে তুলে ধরলো। (সূরা আল আনয়াম-৪২-৪৩)

বিপদের ঘনঘটায় এরা মুহূর্তকালের জন্যেও অন্যায় অবৈধ ভোগবিলাস থেকে বিরত থাকে না এবং নিজ স্রষ্টার কাছে সাহায্যের আবেদন করে না। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এদের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, আসন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মোকাবেলা করা হবে বলে প্রচার মাধ্যমে বার বার ঘোষণা দেয়। এদের অবস্থা সম্পর্কে মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ–

আমি এদের কঠোর আযাব দ্বারা গ্রেফতার করলাম, তারপরও এরা নিজেদের মালিকের প্রতি নত হলো না এবং কখনো এরা কাতর প্রার্থনাটুকু পর্যন্ত আমার কাছে পেশ করলো না। (সূরা আল মুমিনুন-৭৬)

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের রাষ্ট্রে, সামাজিক অঙ্গনে, স্বভাব চরিত্রে, ভিন্ন জাতি ও দেশের প্রতি অনুসৃত নীতিতে যে কদর্যতা, পাশবিকতা, পশুত্ব, বর্বরতা, হিংস্রতা, হৃদয়হীনতা ও দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়, তা অভিশপ্ত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বীভৎ কদর্য অবদান। নিজেদের কুৎসিত আদর্শ ভিন্ন দেশ ও জাতির ওপর শক্তিবলে চাপিয়ে দেয়াও পশ্চিমা সভ্যতার ধারক বাহকদের অন্যতম নীতি। ধর্মের নামে খৃষ্টিয় বিকৃত আদর্শ অনুসরণে বৈরাগ্যবাদের আত্মনির্যাতন, পরবর্তীকালে ভোগ বিলাসে লিপ্ত ধর্মনেতাদের অত্যাচার ইত্যাদীর কারণেই পরবর্তী শতাব্দীসমূহে মানবতা বিধ্বংসী কিং মার্টিন লুথারের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, আমেরিকার পূজিবাদ, ডারউনের বিবর্তনবাদ ও কার্লমাক্সের সমাজতন্ত্রের ন্যায় ভ্রান্ত মতবাদসমূহ ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

মুসলিমদের পতন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্থান

ইতোপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম মিল্লাতকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন করে মধ্যমপন্থী উম্মাহ্ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাদের প্রতি এ দায়িত্ব কর্তব্য অর্পিত হলো যে, তাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে বা নির্দেশ দিবে এবং অকল্যাণের পথে অর্গল তুলে দিয়ে অন্যায় কর্মসমূহ নিষিদ্ধ করবে। এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন ছিলো রাষ্ট্র ক্ষমতা, সেটাও আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম মিল্লাতকে উপহার দিয়েছিলেন। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁরা অর্ধ পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব প্রতিপত্তি

ও নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন ছিলো অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক শক্তি। এগুলোও মুসলিমদের করতলগত ছিলো এবং আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাঁরা এক যুগান্তকারী বিপ্লব সাধিত করেছিলো। বিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখায় বিচরণ করে মানব সভ্যতার সম্মুখে তাঁরা এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলো। চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা অপরিহার্য, এ শক্তিও তখন পর্যন্ত তাদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছিলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এ কথা সত্য যে, অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্যের বিষয়টি আত্মবিস্মৃত হয়ে এ দায়িত্ব থেকে মুসলিম মিল্লাত পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করলো। মুসলিম ঐক্যে সার্বিক ক্ষেত্রে ফাটল ধরলো এবং এ ফাটল ক্রমশ: বৃদ্ধিই হলো। ইসলামের নানা বিধি বিধান নিয়ে যে সকল সম্মানীত ওলামাবৃন্দ চিন্ত গবেষণা করতেন, তাঁদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে নানা দল উপদলের জন্ম হলো। অথচ এসব মতপার্থক্য ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ছিলো না। দিনের পর দিন তাঁরা ক্ষুদ্রাতি থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয় নিয়ে মূল্যবান সময় ও মস্তিষ্ক ব্যয় করতেন। এর সুদূর প্রসারী প্রভাব মুসলিম জনসাধারণের ওপর আপতিত হয়ে তাঁরাও নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে ফতোয়ার অস্ত্র বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হতে লাগলো। দেহের এক অঙ্গে বেদনানুভূত হলে সর্বাঙ্গে বেদনানুভূত হয়, অর্থাৎ একজন মুসলিম বিপদগ্রস্থ হলে সমগ্র মুসলিম সমাজ সে বিপদকে নিজের বিপদ মনে করবে, ইসলামের এ বিঘোষিত চিরন্তন নীতি স্বয়ং মুসলমানদের কাছেই উপেক্ষিত হলো।

মুসলিমদের ব্যক্তিগত চরিত্রে, স্বভাবে, চিন্তা-ভাবনায়, নৈতিকনীতিসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিলো। ব্যবসা-বাণিজ্যে, লেনদেনে, কথাবার্তায়, অঙ্গীকার পালনে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি আচরণে ইসলামের শিক্ষাসমূহ শিথিল হয়ে এলো। তাক্বওয়াদারী, পরহেজগারী তথা আল্লাহভীরুতা ক্রমশ: হ্রাস পেয়ে এর নিম্নমুখী গতি অব্যাহত থাকলো। জনগণের মন-মানসিকতা পাপাচারের দিকে ধাবিত হলো। মিথ্যা বলায়, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে, অন্যের অধিকার হরণ ও মর্যাদা রক্ষায়, নারী-পুরুষের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদী ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনমূলক মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটলো। লজ্জানুভূতি হ্রাস পেয়ে অশ্লীলতা বেহাইয়াপনা আত্মপ্রকাশ করলো। নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ অনুভূতিও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলো। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রেই ন্যায়-নীতিবোধ বর্জনে স্বাভাবিক লজ্জানুভূতির ক্ষয় শুরু হলো।

মুসলিম সাম্রাজ্য আঞ্চলিকতার বিষ বাষ্পে আক্রান্ত হলো। নেতৃত্বের প্রত্যাশা, লোভ ও কোন্দল সর্বত্রই অনুভূত হলো। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়লো। ষড়যন্ত্রে অভ্যস্থ, হিংসুক, লোভী, তোষামদকারী, পরশ্রীকাতর, হীনম্মন্য, উচ্চাভিলাসী, ভোগবিলাস প্রিয় লোকজন মুসলিম শাসকদের চার পাশে সমবেত হলো। এসব লোকজনের স্বার্থান্ধ ও ভ্রান্ত পরামর্শে শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় সম্পদকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করলো। শাসক ও শাসিতে সৃষ্টি হলো ব্যাপক পার্থক্য এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ যথেচ্ছা ব্যয় হতে থাকলো। মুসলিম সমাজে এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব ঘটলো, যাঁরা কোরআন হাদীস চর্চা করতো, জনসাধারণে আলেম, ওলামা, ইসলামী চিন্তানায়ক ও আল্লামা হিসেবে পরিচিত ছিলো। তাঁরা শাসকবৃন্দকে কোরআন হাদীসের আলোকে সত্য সঠিক পরামর্শ দেয়ার পরিবর্তে উপহার উপঢৌকনের প্রত্যাশায় রাজদরবারে ভীড় জমিয়ে সত্য প্রকাশে কৃপণতা অবলম্বন করলো। বরং যে সকল আলেম সত্য প্রকাশ করতেন তাঁদের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করা এদের পেশা হয়ে দাঁড়ালো। সত্য প্রকাশে নির্ভীক ওলামা সমাজ শাসকদের কোপানলে নিপতিত হলো এবং তাঁদের স্থান হলো অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে। কুচক্রিদের পরামর্শে রাষ্ট্রের সীমানা ও সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষেত্র বিশেষে মুসলিম শাসকগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও অবতীর্ণ হলো।

ওলামা হযরতদের একটি অংশ কোরআন হাদীসকে সম্মান- মর্যাদা, সুনাম ও ধন-সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করলো। আরেকটি অংশ সত্য প্রকাশে অনড় অবস্থানে দাঁড়িয়ে সকল প্রকার নির্যাতনকে হাসিমুখে বরণ করলেন। আরেকটি অংশ বৈষয়িক জগৎ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে মুসলিম উম্মাহর আত্মসংশোধনে খান্‌কায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ওদিকে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী ভোগবিলাস সমুদ্রে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করলো। মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে গিয়ে তাঁরা নানাবিধ খেলা-ধূলায় মেতে উঠলো। রাজদরবারে শাসকদের বন্দনামূলক কবিতার সমাদর বৃদ্ধি হলো, কবির জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা নির্ধারণ হলো। অপরদিকে কোরআন হাদীস চর্চাকারী নির্ভীক ওলামা সমাজ নিগৃহীত হয়ে দারিদ্র পীড়িত জীবন অবলম্বনে বাধ্য হলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় বিচরণে সক্ষম ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত হয়ে দারিদ্রতা নিরসনে অর্থোপার্জনে নিয়োজিত হলেন। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সীমানা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর গণ্ডীতে আবদ্ধ হলো।

মানবেতিহাসে এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সেই জনগোষ্ঠীই অন্যান্য জাতির মানসিক ও জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, যারা জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক নেতৃত্বের ভিত্তি রচিত হয় চিন্তা-গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার ওপর। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পরিমণ্ডলে যে জনগোষ্ঠী কর্তৃত্ব করেছে তাদের চিন্তা চেতনা মানব সভ্যতাকে আচ্ছন্ন করেছে। আর যে জনগোষ্ঠী জ্ঞান বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে দারিদ্র পীড়িত, তারা অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে বাধ্য এবং ভিন্ন কোনো জনগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনার জগতে প্রাধান্য ও আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পায় না। জ্ঞানের জগতে প্রাধান্য বিস্তারকারী জনগোষ্ঠী অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে সাধারণ নিয়মে গোলামীতে আবদ্ধ করে। মুসলিম উম্মাহ্ যতদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে প্রাধান্য দিয়েছে, ততদিন তারা সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করেছিলো। ইসলামী চেতনা ও দর্শন মানব সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছিলো। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহ অবচেতনভাবে হলেও ইসলামের মানব কল্যাণমূলক নীতিমালাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ ও অকল্যাণ, ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতিসমূহ ইসলামী নীতিমালা কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ডকে অবচেতনভাবে নিজেদের জীবনাচারে গ্রহণ করেছিলো।

স্বাভাবিকভাবে বিজয়ী সভ্যতা সমগ্র পৃথিবীকে যেভাবে প্রভাবান্বিত করে, মুসলিমদের অগ্রযাত্রায় ইসলামী সভ্যতাও মানুষকে সেভাবেই প্রভাবিত করেছিলো। পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন, একটি সর্বোন্নত সমৃদ্ধ সভ্যতার অধিকারী মুসলিমরা ক্রমশঃ অলসতা, বিলাসিতা, অকর্মণ্যতা ইত্যাদীতে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে দৈন্য দারিদ্রতার পরিচয় দেয়া শুরু করলো। অবনতিশীল ও পতনোম্মুখ জাতির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পতনের পূর্বে যেসব চিহ্ন কদর্য ও বীভৎরূপে প্রকাশ পায়, মুসলিম উম্মাহর ক্ষেত্রেও তাই প্রকাশিত হলো। জাতিয় জীবনে যে পরিবেশ বিরাজ করছিলো, সে পরিবেশের অনিবার্য ফলশ্রুতিতেই মুসলিম মায়েরা চিন্তানায়ক, গবেষক, চিন্তাবিদ, জ্ঞানী বিজ্ঞানী সন্তান ভূমিষ্ঠে বন্ধাত্যের পরিচয় দিতে লাগলেন। বিজ্ঞানী, গবেষক, চিন্তানায়ক ও বীর প্রসবিনী মুসলিম মা-বোনরা অলস, অকর্মণ্য, ভোগবিলাসী, শ্রমবিমুখ, ত্যাগে অনিচ্ছুক, ভীরু- কাপুরুষ আত্মকেন্দ্রিক সন্তান ভূমিষ্ঠ করতে লাগলেন। ফলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ জড়তায় আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার দ্বার অর্গলবদ্ধ করে গভীর ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেলো। পূর্বসুরীরা

জ্ঞান বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের যে সকল সুত্র সঞ্চিত করেছিলেন, সেগুলোকে আরাম শয্যায় পরিণত করলো মুসলিম মিল্লাত।

অপরদিকে ইউরোপ মুসলিমদের কাছ থেকে সংগৃহীত জ্ঞান বিজ্ঞানের সুত্রসমূহকে ভিত্তি করে চিন্তা গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিপ্লবের স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করলো। জ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় সত্যানুসন্ধিৎসু মস্তিষ্কে দ্রুত ধাবিত হয়ে আবিষ্কারের নব নব দ্বার উন্মোচন করে পৃথিবীবাসীকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিলো। সৃষ্টির দৃশ্য ও অদৃশ্যমান সকল কিছুর মূল রহস্য উদ্ঘাটনে তারা আত্মনিয়োগ করে মানব মনের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে থাকলো। জ্ঞান, বিজ্ঞান, গবেষণা ও চিন্তাশক্তির সম্মুখে ইতোপূর্বে মুসলিম মিল্লাতের পদতলে যেভাবে বিশ্বের জাতিসমূহ মাথানত করেছিলো, ইউরোপের কাছেও ঠিক একইভাবে মাথানত করলো। মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অভ্যুত্থান ঘটলো এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব ও জরাগ্রস্ত মুসলিম মিল্লাত যে সুখ সুপ্তিতে নিমগ্ন ছিলো, ইতোমধ্যে তাদের চোখ থেকে নিদ্রার আবেশ দূর হলো। চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলো, কোনো কিছুই আর তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত এবং এ শক্তিতে তারা সমগ্র পৃথিবীকে পদানত করেছে।

পরিবেশ পরিস্থিতির গুরুত্ব এতটা বেশী ছিলো যে, এ অবস্থার প্রতিরোধ চিন্তা কল্পনাতেও এলো না। বরং পরাজিত জাতির সকল বৈশিষ্ট্য প্রবল বেগে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলো। অধ:পতিত মুসলিম মন-মানসিকতা নিজের সোনালী অতীত ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যের সকল কিছু দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তা প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করলো। পাশ্চাত্য থেকে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ হিসেবে যা এলো তাও যেমন পান করলো, জীবন ধ্বংসকারী হলাহল যা এলো তাও অমৃত ভেবে গলধ:করণ করলো। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ পাশ্চাত্যের তুলনায় কতক ক্ষেত্রে অধিক যোগ্যতার পরিচয় দিতে লাগলো। ইসলামী নানা বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এরা বস্তুবাদী ব্যাখ্যার দাবি উত্থাপন করে কোরআন ও হাদীসের প্রতি সন্দেহ সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। বস্তুবাদের প্রভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম মিল্লাত আর তাঁদের জীবনীশক্তির একমাত্র উৎস ইসলামের মাঝে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি হলো।

মুসলিম মিল্লাতের ওলামা সমাজ এ অবস্থা অবলোকনে মর্মবেদনায় অশ্রুপাত করে প্রথম দিকে সম্বিৎহারা হলেও অচিরেই তাঁরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলেন। মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষায় তাঁরা সর্বাত্মক প্রাচীর নির্মাণের ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। কারণ, তাদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি, সমরশক্তি ও বিজ্ঞানের শক্তি ছিলো

না। যুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাঁরা ছিলেন নিতান্তই দুর্বল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অথৈ সমুদ্র পবিত্র কোরআন হাদীস তাঁদের হাতে থাকলেও এ দু'টো থেকে তাঁরা বৈষয়িক জীবন ও আখিরাত সম্পর্কিত তথ্য এবং বিধি-বিধান আবিষ্কারে মস্তিষ্ক ব্যয় করেছেন, পরস্পর বিতর্ক করেছেন এবং একের বিরুদ্ধে আরেকজন ফতোয়ার অস্ত্র প্রয়োগে ব্যস্ত থেকেছেন।

মানবদেহ, জীব জগৎ, জড় পদার্থসমূহ, প্রাণী জগৎ, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, মহাশূন্য ও আকাশ, তারকাপুঞ্জ, গতি ও স্থিরতা, কার্যকারণ ইত্যাদি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি প্রয়োগে আলেম সমাজ ছিলেন অনভ্যস্থ। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ যেসব আবিষ্কারের সূত্র ও বিজ্ঞানগ্রন্থ রচিত করেছিলেন, সেগুলোও অধিকাংশ আলেম সমাজ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানের নানা বিষয় যখন তাঁদের সম্মুখে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উপস্থিত হলো, তখন তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। যুক্তিগ্রাহ্য, সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদানে অপারগ হয়ে শুধুমাত্র আখিরাতের আযাবের ভয় প্রদর্শন করে মুসলিমদের বৃহৎ অংশকে নিবৃত করা গেলো না। পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনার অসারতা ও মানবজাতির ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য গবেষণাসমৃদ্ধ একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও ওলামা সমাজ রচনায় অক্ষমতার পরিচয় দিলেন। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও যুক্তিবাদের মোকাবেলা করার জ্ঞানগত যোগ্যতাসম্পন্ন মনীষীর অভাবে বস্তুবাদ সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম মানসে আসন দৃঢ় করলো। ফলে মুসলিম উম্মাহ্ পতন গহ্বরের অতল তলদেশে নিমজ্জিত হলো।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও মুসলিম মানস

মুসলিমদের উত্থানকাল থেকে শুরু করে পতনকাল এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্থান থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত দু'টি সভ্যতা মুখোমুখি অবস্থান করে আসছে। এ দু'টো সভ্যতা দীর্ঘ ১৪ শতাব্দীকাল মানবজাতি অবলোকন করছে। ইসলামী সভ্যতার সার্বিক কল্যাণময় রূপও মানবজাতি অবলোকন করেছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার হিংস্রতাও অবলোকন করছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজেকে ইসলামী সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করলেও ইসলামী সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার নূন্যতম যোগ্যতাও পাশ্চাত্য সভ্যতার নেই। কারণ এ সভ্যতার অধিকাংশ নীতিসমূহ মানব প্রকৃতি বিরোধী ভিত্তির ওপর স্থাপিত। সৃষ্টি জগতের স্রষ্টাকে অস্বীকৃতির মধ্য দিয়েই এ সভ্যতা বিকশিত ও লালিত পালিত হয়েছে। যে বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি, দর্শন ও বিজ্ঞানের ছায়ায়

পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রতিপালিত হয়েছে, প্রায় ছয় শতাব্দীব্যাপী তা বস্তুবাদ, ধর্মদ্রোহীতা, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, ভোগবাদের পথ ধরে সম্মুখে এগিয়ে গিয়েছে। এ সভ্যতার উত্থান পরবর্তীকালে অন্যান্য যে সকল সভ্যতার মোকাবেলা করেছে, সে সকল সভ্যতার কোনো স্থায়ী বুনিয়াদ ছিলো না বিধায় তা পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু মুসলিম সভ্যতা ছিলো অন্যান্য সকল সভ্যতার থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এদের সভ্যতায় কোনো অপূর্ণাঙ্গ বা অস্পষ্টতা ছিলো না। এর ভিত্তিও এমন দুর্বল কাঠামোর ওপর রচিত হয়নি যে, সামান্য বাতাসে তা নড়বড়ে হয়ে যাবে। এর ভিত্তিমূল এত গভীরে প্রোথিত যে, প্রবল কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির পক্ষ্যেই এর ভিত্তিমূলে পূর্ণ শক্তিতে আঘাত হেনেও মূলোৎপাটন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তথা পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা মানবজাতিকে উপহার দিয়েছে এবং মুসলিমরা এর ধারক ও বাহক। এ সভ্যতার বিধি বিধান, নিয়ম-নীতি, চিন্তা ও কর্ম মানব জীবনের সকল দিকে পরিব্যাপ্ত। মানুষের হৃদয়বৃত্তিসমূহে, চিন্তা-চেতনায় ও বাহ্যিক কর্মসমূহে এ সভ্যতা প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের শুধুমাত্র বাহ্যিক দিকে বিচার বিশ্লেষণ করে ভ্রান্ত নীতিমালা উপস্থাপন করেছে এবং মানুষের মন, আত্মা ও প্রাকৃতিক স্বভাব উপেক্ষা করেছে। এসব নানাবিধ কারণে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও কর্মের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার চিরন্তন দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মদাতাগণ যেহেতু তাদের বিকৃত ধর্ম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম আন্দোলনে বিজয়ী হয়েছিলেন, সেহেতু তারা 'ধর্ম মাত্রই প্রগতি বিরোধী' চিন্তাকে ভিত্তি করে ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। তাঁরা ধারণা করেছেন, স্রষ্টাকে কেন্দ্র করেই ধর্ম আবর্তিত হয়, আর ধর্ম হলো প্রগতির শত্রু এবং পাদ্রীগণ তা বাস্তবে দেখিয়েছেন, সে কারণে প্রগতি বিরোধী স্রষ্টাকে মানব জীবনে স্বীকৃতি দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। স্রষ্টা মুক্তচিন্তা, বুদ্ধিচর্চা ও বিজ্ঞানের শত্রু, এমন শত্রুকে জীবনের সকল অঙ্গন থেকে বিতাড়িত করা অনিবার্য বলে মনে করেছিলো পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক জন্মদাতাগণ। ধর্মের ব্যাপারে তাদের চিন্তা-ভাবনা, বাস্তবতা ও পর্যবেক্ষণ সীমাবদ্ধ ছিলো পাদ্রীগণ এবং তাদের বিকৃত আদর্শ। ওহীভিত্তিক ধর্ম ও ধর্মীয় আদর্শ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিলো না এবং এর অনুসন্ধানও তাঁরা করেনি। বিকৃত ধর্মীয় নীতিসমূহের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে তারা যে কোনো ধর্মকেই বিজ্ঞান ও মুক্ত চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী হিসেবে গণ্য করেছিলো।

মুক্ত চিন্তানায়ক দলের ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিলো সম্পূর্ণ আবেগ উচ্ছাস নির্ভর। পোপ, পাদ্রী ও যাজকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিলো তা ধর্মের বিরুদ্ধে এক প্রবল ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়েছিলো। স্রষ্টার বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিলো এ কারণে যে, তাদের শত্রু পাদ্রীদের তিনি প্রভু। যদিও স্রষ্টা নামক প্রভুর প্রভাব থেকে স্বয়ং তাদের মন- মানসিকতা ও চিন্তার জগৎ মুক্ত ছিলো না। আর এ কারণেই কিং মার্টিন লুথারের আপোষ প্রস্তাবের মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের স্বভাব চরিত্র ও চিন্তা-চেতনার মধ্যে এক পরস্পর বিরোধী অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের জনকরূপে খ্যাত মিঃ ডেকার্টের মন-মানসিকতা স্ববিরোধী চিন্তাধারায় তাড়িত ছিলো। তিনি একদিকে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন অপরদিকে তিনি বস্তুর সাথে অদৃশ্য আত্মার পৃথক অস্তিত্বও স্বীকার করতেন। কিন্তু তিনিই সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে স্রষ্টাকে ত্যাগ করে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতি বেছে নিলেন এবং তাঁর প্রবর্তিত চিন্তা পদ্ধতি পরবর্তীতে বস্তুবাদকে অধিক মাত্রায় শক্তিশালী করলো।

চিন্তানায়ক মিঃ হব্স প্রকাশ্যে অতি প্রকৃতিবাদের বিরোধিতা করতেন সেই সাথে তিনি স্রষ্টার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতেন। তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগৎ এবং সকল কিছুকেই যান্ত্রিক বিশ্লেষণের উপযোগী বলে ঘোষণা করেন এবং সৃষ্টি জগতে সক্রিয় যে কোনো আত্মিক বা অশরীরী শক্তির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। একদিকে তিনি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন অপরদিকে সৃষ্টি জগতে স্রষ্টার প্রভাবকে স্বীকার করতেন না। সে যুগে যুক্তিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রনায়ক ছিলেন মিঃ স্পিনোজার। তিনি একদিকে স্রষ্টা ও সকল সৃষ্টিকে একই সত্ত্বায় পরিণত করেছিলেন অপরদিকে স্রষ্টাকে সর্বশক্তিমান হিসেবে গ্রহণ করতে অপ্রস্তুত ছিলেন। মিঃ লক্ ও মিঃ লিব্নিজ একদিকে প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন অপরদিকে স্রষ্টার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতেন। তৎকালীন যুগের চিন্তানায়কদের চিন্তা-চেতনা ও কর্ম বিশ্লেষণ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও তা ছিলো সম্পূর্ণ ভাবাবেগ তাড়িত। এ কারণে তাঁরা হৃদয় মন থেকে ধর্মবিশ্বাস মুছে দিতে সক্ষম হননি, যদিও তাদের আবিষ্কৃত মতবাদ ছিলো ধর্ম বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এর স্পষ্ট অর্থ হলো তখন পর্যন্ত বিজ্ঞান সম্পূর্ণ জড়বাদে পরিপূর্ণ ছিলো না এবং দর্শনশাস্ত্রে স্রষ্টায় বিশ্বাস ও নাস্তিকতা পাশাপাশি অবস্থান করছিলো।

বিজ্ঞানীদের অগ্রনায়ক গ্যালিলিও, নিউটন, কেপলার ও কোপার্নিকাস প্রমুখ কেউই নাস্তিক বা স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু তাদের আবিষ্কার

ও কর্মে স্রষ্টার প্রভাবের স্বীকৃতি নেই। একদিকে অন্তরে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস অপরদিকে সকল কর্মে স্রষ্টার প্রভাব অস্বীকার এ বিষয়টিকে তারা মনে করতেন যে, পরস্পর বিরোধী এ দু'টো জিনিস পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। চিন্তানায়কদের মধ্যে সে যুগে আবার এ প্রচেষ্টাও করেছেন যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে যে চিন্তা পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে নিয়োজিত হবে, তা যেনো কোনোক্রমেই নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদ, জড়বাদ ও ধর্মহীনতার দিকে ধাবিত না হয়। অপরদিকে আরেকদল চিন্তানায়ক, যাদের মধ্যে রুশো, মনটেস্‌কুউ, জন টোলেণ্ড, হোলবাক, ডেভিড হার্ডলে, লা মেট্রে, জোসেফ প্রিষ্টলি, ভলতেয়ার, ডেনিস ডয়েডরো, কেবানিস, হিউম প্রমুখ চিন্তাবিদগণ প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন অথবা স্বীকার করলেও স্রষ্টাকে মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ স্রষ্টার প্রভাব বাস্তব জীবনে গ্রহণ করতে রাজী হননি।

বস্তুবাদের বন্যা প্রবাহে নাস্তিক্যবাদ বিকশিত হচ্ছে দেখে চিন্তাবিদ মিঃ বার্কলি বস্তুবাদের গতিপথে প্রাচীর নির্মাণে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি তাঁর চেষ্টায় সফল হননি। মিঃ হেগেলও বস্তুবাদের স্থানে আদর্শবাদকে আসীন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু তার আদর্শবাদও সফলতার মুখ দর্শন করেনি। অন্য দিকে মিঃ কান্ট ঘোষণা করলেন, 'স্রষ্টার অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, ইচ্ছার স্বাধীনতা এসব বিষয় আমাদের বোধগম্য নয়, অতএব এগুলো অনুসরণ করাও সম্ভব নয়। তবে এসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে করা যেতে পারে। কারণ চিন্তাবিদগণের বাস্তব বিচারবোধ এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অনুকূলে'। কিন্তু তাঁর এ মতবাদও বস্তুবাদের প্রবল স্রোতে হারিয়ে যায়। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের গর্ভে জন্ম নেয়া বস্তুবাদ প্রথম দিকে স্রষ্টা সম্পর্কে সংশয়পূর্ণ এ ধারণার জন্ম দেয় যে, 'এ বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা কেউ থাকলে থাকতেও পারেন। তাঁর দ্বারাতেই যদি সকল কিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তিনি বর্তমানে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি এখন নিষ্ক্রিয় এক ক্ষমতাহীন সত্তা, যার কোনো প্রভাব বাস্তবে পরিলক্ষিত হয় না। এ রকম প্রভাব প্রতিপত্তিহীন স্রষ্টা সম্পর্কে কল্পনা করে তাঁকে মেনে চলা, তাঁর ভয়ে জীবনের ভোগ বিলাসকে বাধাগ্রস্ত করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান সম্পূর্ণ অযৌক্তিক'।

পরবর্তীকালে স্রষ্টা সম্পর্কে এ সংশয়পূর্ণ ধারণাকেও বাতিল করে দিয়ে বস্তুবাদ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মিঃ মোল্‌শট, মিঃ ভোগট, মিঃ কোমে, মিঃ রুখনার, মিঃ জোলবে, মিঃ ফুয়েরবাখ, মিঃ সাইমন, মিঃ তেরী মিগনেট, মিঃ গিজো, মিঃ সিসমণ্ডী, মিঃ ভন শেইন, মিঃ বাবুয়ীফ, মিঃ ওয়েটলিংগ এবং

অন্যান্য দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ বস্তু ও তার গুণ-বৈশিষ্ট্য ব্যতীত সকল কিছুর অস্তিত্বে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এসব চিন্তাবিদগণের মতবাদসমূহ মানুষের মনে এ ধারণার সৃষ্টি করে যে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এসবের পেছনে কোনো স্রষ্টা বা মহাশক্তি কার্যকর নেই এবং এর কোনো পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক এবং মালিকও নেই। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নিয়মে এ সৃষ্টিজগৎ পরিচালিত হচ্ছে। ঠিক এই পরিবেশে মিঃ ডারউইনের Theory of Evolution বা বিবর্তনবাদ প্রচার হয়। বিবর্তনবাদ সম্পর্কিত তাঁর লিখিত Origin of species নামক গ্রন্থ ১৮৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ডারউইন সাহেবের বিবর্তনবাদ বস্তুবাদকে উৎকর্ষতার চূড়ান্ত শিখরে পৌছে দেয়। সংশয়পূর্ণ ও কম্পমান বস্তুবাদকে বিবর্তনবাদ এসে স্থিতিশীল অবস্থান দেয়। মিঃ ডারইউনের মতবাদ উনিশ শতকের চিন্তানায়কদের মধ্যে মহাআলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তাদের কাছে মতবাদটি যুক্তির সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

সর্বত্র এ বিশ্বাস প্রচলিত হয় যে, সৃষ্টি জগৎ বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং এর অভ্যন্তরে এখন পর্যন্ত বিবর্তন ঘটেই চলেছে। এ সকল কিছুই এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার অধীনে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এর পেছনে কোনো স্রষ্টার কার্যকারিতা নেই। অতি প্রাকৃতিক কোনো সত্তার নির্দেশে নিস্প্রাণ বস্তুর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয় না। বস্তু তার নিজস্ব শক্তিতে বিবর্তিত হতে থাকে বিধায় এর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়। মানুষ বা প্রাণীর মধ্যে যা কিছুই পরিলক্ষিত হয় তা বস্তুর বিবর্তিত গুণগত বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব। মানুষ বা প্রাণী জগতের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা নেই। এক যান্ত্রিক নিয়মে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। এদের অভ্যন্তরে বিবর্তনের মাধ্যমে যে সকল বিশেষ নিয়মে স্নায়ু সন্নিবেশিত হয়েছে তা অনুরূপ নিয়মেই কর্ম সাধন করে। এসব বিশেষ নিয়মের যখন ব্যত্যায় ঘটে, অভ্যন্তরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তার মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যু হলো এক স্বাভাবিক বিলুপ্তি। এর মাধ্যমে সকল কিছুই নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায়।

অর্থাৎ মৃত্যুর মাধ্যমে স্বাভাবিক সকল কিছুরই যখন বিলুপ্তি ঘটে তখন পুনরায় এ জীবনের আবির্ভাব বা পরকালীন জীবনের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। অতএব স্রষ্টা বা পরকাল এসব কিছুই মানুষের কল্পিত বিষয়। বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। স্বাভাবিক নৈসর্গিক নিয়মে এ সৃষ্টি জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। মিঃ ডারউইনের এসব মতবাদের বিরুদ্ধে খৃষ্টান পাদ্রীগণ সোচ্চার হয়ে উঠলো। বৃটিশ এসোসিয়েশনের সভায় অক্সফোর্ড ও গ্লাডস্টোনের বিশপগণ

ডারউইনের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। এরাই আবার পরবর্তীতে নাস্তিক্যবাদের কাছে মাথানত করলো। ১৮৮২ সালে ডারউইনের মৃত্যুর পরে ইংল্যাণ্ডের চার্চ তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করলো। তাকে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে সমাহিত করার অনুমতি দেয়া হলো। অথচ এই লোকটি ধর্মের কবর রচনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলো। ডারউইন ও অন্যান্যদের আত্মঘাতী দর্শন ও চিন্তা-চেতনার পরিবেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা চূড়ান্ত পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে।

এ সভ্যতায় স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকৃত, স্বীকৃত হলেও তা সংশয়পূর্ণ। স্রষ্টা সর্বশক্তিমান, সকল কিছু দেখছেন, শুনছেন এবং তাঁর সম্মুখে সকলকে জবাবদীহী করতে হবে, এ চেতনা অনুপস্থিত। এ সভ্যতায় নবুওয়াত-রেসালাত বা ওহী জ্ঞান স্বীকৃত নয়, এখানে আধ্যাত্মিকতার স্থান নেই। সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ববোধ এ সভ্যতায় নেই। মানব জীবনে মানুষের জৈবিক উদ্দেশ্যের মোকাবেলায় অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। জীবন একটি এবং এর স্থায়ীত্ব খুবই কম, ক্ষণস্থায়ী এ জীবনকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত করা আত্মনিপীড়নের শামিল।

এসব হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুবাদী অবয়ব এবং এ অবয়র পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা, ন্যায়-পরায়ণতা, আত্মিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধতা, লজ্জাশীলতা, সত্যানুসন্ধিৎসা, সরলতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব অনুভূতি, আল্লাহভীতি ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এর ঠিক বিপরীত হলো ইসলামী সভ্যতা। শুধু বিপরীতই নয়, এসব কিছুর ওপরেই ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত এবং এসব ভিত্তিকে কেন্দ্র করেই ইসলাম রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করতে চায়। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা দুই মেরুতে অবস্থান করে এবং এদের গতি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। ইসলাম যে বিষয়সমূহের ওপর ভিত্তি করে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন গড়তে চায়, পাশ্চাত্য সভ্যতা সেগুলোকে পরম শত্রুজ্ঞানে উৎখাত করতে চায়।

চলমান পৃথিবীতে ঠিক যে সময়ে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা নাস্তিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলো ঠিক সে সময়টিতেই সমগ্র মুসলিম জাহান রাজনৈতিকভাবে পাশ্চাত্যের প্রভাব বলয়ের অধীন। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করে মুসলিম দেশসমূহে কারো পক্ষেই দেশ পরিচালনা করা সম্ভব ছিলো না। নিজ দেশে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা শাসকগোষ্ঠীর ছিলো না। পাশ্চাত্য শক্তি মুসলিম দেশসমূহের প্রভুর আসনে সমাসীন ছিলো। অধিকাংশ

মুসলিম দেশ তারা শক্তির বলে দখল করেছিলো আর যেগুলো স্বার্থের কারণেই দখল করেনি, সে দেশগুলোও তাদেরই নির্দেশে সকল নীতি গ্রহণ ও বর্জন করতো। ফলে অতি সহজেই মুসলিম দেশসমূহে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপর ভিত্তি করে রচিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমদের নতুন প্রজন্ম মন-মানসিকতায়, আচার আচরণে, ব্যবহারে, নৈতিকতায়, চিন্তা-চেতনায় ও কর্মপদ্ধতিতে তথা জীবনের সকল দিকেই পাশ্চাত্যের চাহিদা অনুসারেই গড়ে উঠলো, যেমনটি তারা কামনা করেছিলো। আদম শুমারীর খাতায় শুধুমাত্র এদের নামটি মুসলিম হিসেবে উল্লেখ থাকলেও এরা হবে নিরেট বস্তুবাদী নাস্তিক। পরিপূর্ণ নাস্তিক-এ পরিণত না হলেও ইসলাম সম্পর্কে এদের চিন্তার জগৎ হবে সংশয়পূর্ণ এবং দ্বন্দ্ব মুখর। সময়ের বিবর্তনে এরা মুসলিম নামটিও পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মানে বিসর্জন দিয়ে এমন নাম ধারণ করবে, যে নাম শুনে অনুভব করা কঠিন হবে লোকটি মুসলিম না অমুসলিম।

পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রবর্তিত ও মুসলিম দেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত মুসলিমগণের মস্তিষ্ক থেকে স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিদায় গ্রহণ করলো। তাদের মধ্যে ভালো ও মন্দের পার্থক্যবোধ, সর্বোত্তমটি গ্রহণ করার বিচারবোধ এবং অনুসন্ধান ইচ্ছার মৃত্যু ঘটলো। পাশ্চাত্য যা কিছুই অনুসরণীয় বলে ঘোষণা করে তা কোনোরূপ বিচারবোধ ব্যতীতই মুসলিমদের নতুন প্রজন্ম তা গ্রহণ করে। পশ্চিমা সভ্যতার যে কোনো মানদণ্ডকেই এরা নিজেদের মানদণ্ডে পরিণত করলো। নির্লজ্জ যৌনতা নির্ভর পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসরণে এদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার সূচনা হলো। নিজেদের স্বর্ণালী অতীত এদের কাছে অজানা রয়ে গেলো ফলে ভালো-মন্দ পরীক্ষা করা ও একমাত্র উত্তমটিকে গ্রহণ করার মতো বিচারবোধ ও অনুসন্ধান শক্তি এদের মধ্যে সৃষ্টি হলো না। চিন্তা গবেষণার জগৎ দেউলিয়া হওয়ার কারণে এদের মানসিক কাঠামো বিধ্বস্ত। যে দাড়ি ছিলো মুসলিমদের গৌরবের প্রতীক, তা পাশ্চাত্যের অনুকরণে মুখমণ্ডল থেকে এমনভাবে বিদায় গ্রহণ করলো যে, মুখমণ্ডলে নারী ও পুরুষের পার্থক্য রইলো না, অশালীন পোশাক প্রস্তুত ও পরিধানে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। মাথার চুল ছাঁটা ও খাদ্য গ্রহণ, কথার ভঙ্গীতে এবং চলাফেরায় পাশ্চাত্যের অনুকরণকে আভিজাত্য হিসাবে চিহ্নিত করা হলো। এভাবেই মুসলিম মন-মানসকে ইসলাম শূন্য করে বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা আচ্ছন্ন করেছে।

বস্তুবাদী শিক্ষার বিপরীতে মুসলিম মন-মানসে ইসলামী সভ্যতার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখার উদ্দেশ্যে ইসলামী চিন্তানায়কগণ পৃথক শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করলেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে এর মাধ্যমে মুসলিম চেতনা জাগ্রত রাখার লক্ষ্যে তাঁরা কোরআন-হাদীসকে ভিত্তি করে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করলেন। কিন্তু এ শিক্ষার প্রতি পাশ্চাত্যের অনুসারী নামধারী মুসলিমরা আকৃষ্ট হলো না বরং এর প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিই নিপতিত করলো। তবুও ওলামা হযরতগণ মুসলিম সমাজ থেকে ছাত্র ও সাহায্য সংগ্রহ করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জীবিত রাখলেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাদেরকে মুসলিম সমাজে সরবরাহ করলো, তাদেরকে সামাজিক মর্যাদা দিতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজন প্রবল অনীহা প্রদর্শন করলো। অর্থাৎ দেশ, জাতি ও সমাজ পরিচালনায় এদের গুরুত্ব স্বীকৃত হলো না। ফলে বাধ্য হয়েই এরা ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে মেধাশক্তির বিকাশ ঘটানোর সুযোগ বঞ্চিত রইলেন। মুসলিম নামে পরিচিত পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা তাড়িত লোকজন ইসলামী চেতনাসম্পন্ন লোকজনকে দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখার অযোগ্য বিবেচনা করলো এবং দেশের কোনো একটি স্তরের নেতৃত্বও এদের জন্য ছেড়ে দিতে রাজী হলো না। পাশ্চাত্য সভ্যতা সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের মন-মানসিকতা নিজ ধর্মের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলেছে।

মানব চরিত্রে ইসলামী ও বস্তুবাদী সভ্যতার প্রভাব

ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতায় মানুষের জীবন ধারায় কি পার্থক্য সূচীত হয় তা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো। দেশ, সমাজ ও জাতির নিরাপত্তার লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই নানা ধরনের আইন-কানুন রচিত হয়েছে। আইন প্রণীত হয়েছে মানুষকে সৎ ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেও মানুষকে সৎ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হয়ে থাকে। অপরাধ প্রবণতা দমন করে মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যে মানবেতিহাসে সবচেয়ে অধিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, মানুষ এ ব্যাপারে কোথাও সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। বার বার তাদেরকে ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করতে হয়েছে। এর মূল কারণ হলো, যে বিষয়টি প্রধানত: মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখতে পারে, সে বিষয়টিকেই পরিহার করে নানা ধরনের অপরাধ দমন আইন ও অপরাধ প্রতিরোধক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে আর এসব কিছুরও ভিত্তি রচিত হয়েছে বস্তুবাদের ওপর।

একজন মহাক্ষমতাবান সর্বদর্শী স্রষ্টার দরবারে মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জবাবদীহী করতে হবে, এই অনুভূতি মানুষের হৃদয় জগতে সদাজাগ্রত না থাকলে সে মানুষ কোনোক্রমেই অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে থাকতে পারে না, এ কথা ঐতিহাসিকভাবে একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু দু:খজনক হলেও এ কথা চরম সত্য যে, জাতির পরিচালকগণ উল্লেখিত মূলনীতি পরিত্যাগ করেই চরিত্র সৃষ্টির যাবতীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করে থাকে। এ যেন ঘী উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে রেখে জমাট বাঁধার সাধনা করার মতো হাস্যকর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

প্রকৃত বিষয় হলো, বিচার দিবস তথা পরকাল অমান্য ও অস্বীকার করার অনিবার্য এবং নিশ্চিত পরিণাম হচ্ছে, চরিত্রহীনতার অতল তলদেশে নিমজ্জিত হওয়া। বিচার দিবস সম্পর্কিত ভীতি শূন্য মন-মানসিকতার অধিকারী মানুষ এমন সব কদর্যতামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, যার পরিণাম ধ্বংস, পাপাচার, অরাজকতা, অশান্তি, বিশৃংখলা ইত্যাদি ব্যতীত আর কিছুই নয়। অগণিত বছরের মানবীয় আচরণ ও কর্মকাণ্ড এ কথার জ্বলন্ত সাক্ষী। বিষয়টির সত্যতা যাচাই করার জন্য সুদূর অতীতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিক্ষেপের প্রয়োজন নেই, নিজের চারপাশের পরিবেশের দিকে দৃষ্টি দিলেই সহজে অনুমান করা যাবে, বিচার দিবসে জবাবদীহীর অনুভূতিহীন বস্তুবাদী আইন-কানুন আর শিক্ষানীতি কি ধরনের নিরাপত্তাহীনতা আর বিশ্বাসহীনতার পরিবেশের জন্ম দিয়েছে।

বস্তুবাদের দর্শন অনুযায়ী যারা নিজেদেরকে বিচার দিবসে জবাবদীহী করতে বাধ্য মনে করে না, পরিশেষে নিজের সকল কাজের হিসাব বিচার দিবসে প্রদান করতে হবে, এর ভয় বা আশঙ্কাই মনে বোধ করে না, যারা নিশ্চিত ধরে নিয়েছে যে, এই পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন, এরপরে আর কিছুই নেই, এই পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, সম্মান-মর্যাদা, খ্যাতি-যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা অর্জনকে সাফল্য লাভের একমাত্র মানদণ্ড বলে মনে করে, সর্বোপরি যারা বস্তুবাদী চিন্তা, বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণের অযোগ্য বলে বিবেচনা করে, তাদের সমগ্র জীবনই অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসীগণ পৃথিবীতে বাধা-বন্ধন মুক্ত লাগামহীন জীবন-যাপন করে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর পরিচিত অপরিচিত যাবতীয় অসৎ গুণাবলী তাদের চরিত্রে সমাবেশ ঘটে। এদের অশুভ পদচারণায় সমগ্র দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। বিচার দিবসে জবাবদীহীর অনুভূতিহীন মন-মানসিকতার

অধিকারী ব্যক্তিবর্গ দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরে দেশের সম্মানিত ও মর্যাদাবান আলেম-ওলামা তথা আল্লাহভীরু লোকদেরকে অসম্মানিত করে। তাদেরকে মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ করে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায়। তাদের মতের বিরোধিদেরকে সমূলে উৎখাত করার প্রচেষ্টা চালায়। সবর্ত্র দলীয়, আত্মীয়করণ ও জাতির সম্পদ অবাধে লুট-পাট করে। মেকিয়াভেলীর দর্শন অনুসারে মিথ্যা-প্রচার প্রপাগাণ্ডা চালাতে এদের বিবেকে বাধে না। দেশব্যাপী জুলুম অন্যায়-অত্যাচারের প্লাবন বইয়ে দেয়। জাতি অনাহারে থাকলেও এদের ভোগবিলাসের সরঞ্জামের অভাব হয় না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় জাতির পেটের চামড়া পিঠের সাথে লেগে গেলেও এদের দেহ ক্রমশঃ স্ফীত হতে থাকে। এদের লজ্জানুভূতি এতটা নিঃশেষ হয়ে যায় যে, ভিন্ন নারীর সাথে তাদের অবৈধ সম্পর্কের কথা সদম্ভে প্রচার মাধ্যমে ঘোষণা করতেও এসব লজ্জাহীনের দল দ্বিধাবোধ করে না।

চরিত্রহীনা নারী বৃটেনের প্রিন্সেস ডায়না অবৈধ সন্তান গর্ভে নিয়ে মৃত্যুবরণ করার পরে লজ্জার পরিবর্তে এই শ্রেণীর মানুষগুলো শোকাহত হয়ে পড়েছিল। বৃটেনের টনি ব্লেয়ার যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁর ষোল বছর বয়সী বড় ছেলে ইউয়েন মদপান করে রাস্তায় পড়েছিল। বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে সচিত্র প্রকাশ হলেও বিচার দিবসের প্রতি জবাবদীহীর অনুভূতিহীনতার কারণে তারা কেউ লজ্জানুভব করেনি। এক সময়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের যৌননারী মনিকা লিউনস্কির অবৈধ সম্পর্কের কথা প্রকাশ হলে দেশব্যাপী যে আলোড়ন সৃষ্টি হলো, বিচার দিবসে জবাবদীহীর অনুভূতি না থাকার কারণে লজ্জা তাকে স্পর্শ করেনি।

শিক্ষাঙ্গনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, মাদ্রাসায় তথা যেসব শিক্ষাঙ্গনে বিচার দিবসে জবাবদীহী সৃষ্টির অনুভূতিমূলক সামান্য শিক্ষা দেয়া হয়, সেখানের ছাত্রদের চারিত্রিক মান আর যেখানে ঐ অনুভূতিমূলক শিক্ষার নাম-নিশানা নেই, সেখানের ছাত্রদের চারিত্রিক মানে শত যোজন পার্থক্য বিদ্যমান। দেশের সন্ত্রাসী, ছিন্‌তাইকারী, চাঁদাবাজ, চোর-ডাকাত, আত্মসাৎকারী, নারী ধর্ষকদের তালিকা প্রায় থানাতেই রয়েছে। এসব তালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, মাদ্রাসা তথা যেখানে বিচার দিবসের অনুভূতিমূলক শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সে শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কতজন, আর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে বস্তুবাদী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কতজন।

প্রকৃতপক্ষে বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসের স্বপক্ষে এটা একটি অভিজ্ঞতামূলক প্রামাণ্য দলীল। এ জন্য এ কথা আমরা নিশ্চয়তা সহকারে এবং অটল বিশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারি যে, বিচার দিবসে জবাবদীহীর অনুভূতিই কেবলমাত্র মানুষকে সৎ ও চরিত্রবান করতে সক্ষম- বস্তুবাদী বা ভিন্ন কোনো ব্যবস্থা নয়। মানুষের চরিত্র মানব রচিত আইন দিয়ে সংশোধন করা যেতে পারে না। নানা অপরাধের শাস্তি হিসেবে পৃথিবীতে অসংখ্য আইন-কানুন রচিত ও প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে, মানুষকে সে অপরাধ থেকে মুক্ত করা যায়নি। এ্যাসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেও অপরাধীদের ঐ ঘৃণ্য নিষ্ঠুর কর্ম থেকে বিরত করা যায়নি। কঠোর আইন প্রয়োগ করেও দুষ্কৃতিকারীদের মাদকদ্রব্য সেবন ও মাদক ব্যবসা থেকে দূরে রাখা যায়নি। পৃথিবীর সবচেয়ে সুসভ্য বলে দাবিদার দেশ- আমেরিকার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। মদ্য পানকারীর অধিকার নিশ্চিত করা হবে, এই ঘোষণাই মিঃ রুজভেল্টের প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়কে তরান্বিত করেছিল। এরপর ১৯৩৩ সনে আমেরিকার শাসনতন্ত্রের ১৮ নম্বর সংশোধনী বাতিলের মাধ্যমে আমেরিকায় মদের উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও মদ সংক্রান্ত যাবতীয় কিছু নিষিদ্ধ করা হয়।

মদপান থেকে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষে ১৮ নম্বর সংশোধনী বাতিল করার বেশ কয়েক বছর পূর্ব থেকেই এ্যান্টি সেলুন লীগ নামক একটি সংস্থা মদের অপকারিতা সম্পর্কে আধুনিক যুগের যাবতীয় সহযোগিতা গ্রহণ করে প্রচার চালিয়ে ছিল। এভাবে তারা প্রচার কার্য চালাতে গিয়ে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছিল। মদের অপকারিতা সম্পর্কে যত সংখ্যক বই-পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছিল, তার মোট পৃষ্ঠা ছিল প্রায় নয় কোটির মতো। মদ্য নিবারক আইনটি কার্যকর করতে গিয়ে চৌদ্দ বছরে আমেরিকার সরকার ৬৫ কোটি ডলার ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছিল। দুইশত লোককে নিহত হতে হয়েছিল। ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩ শত ৩৫ জনকে জেল দেয়া হয়েছিল। ১ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার জরিমানা করা হয়েছিল। ৪০ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার মূল্যের নানা ধরনের সম্পদ সরকার বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হয়েছিল।

আমেরিকায় মদ্যপান নিষিদ্ধ হবার সাথে সাথে গোপনে মদ উৎপাদনকারী অসংখ্য কারখানা দেশের আনাচে কানাচে প্রতিষ্ঠিত হলো। আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তা-পথে গোপনে মদ উচ্চমূল্যে বিক্রি শুরু হলো। প্রকাশ্যে যখন মদ বিক্রি হতো, তখনকার মূল্যের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি মূল্যে গোপনে মদ বিক্রি হচ্ছে- এ সুযোগ দেশবাসী হাতছাড়া করলো না। দেশের

একশেণীর জনগণ গোপনে মদের ব্যবসা শুরু করলো। পূর্বের তুলনায় মদপানকারীর সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলো।

পূর্বে যেখানে বৈধ মদের বিপনন কেন্দ্র ছিল সমগ্র আমেরিকায় ৪ শত, আর মদ নিষিদ্ধ হবার পরে মদের গোপন বিপনন কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল অগণিত। ৭ বছরে নিষিদ্ধ ঘোষিত মদের বিপনন কেন্দ্রের ৭৯ হাজার ৪ শত ৩৭ জন মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ৯৩ হাজার ৮ শত ৩১টি মদের বিপনন কেন্দ্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এ ধরনের অসংখ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেও মানুষকে মদ থেকে বিরত রাখতে আমেরিকার সরকার চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। পরবর্তীতে তারা পুনরায় মদ বৈধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

আমেরিকা সরকারের এই ব্যর্থতার পেছনে যে কারণটি সক্রিয় ছিল তাহলো, তারা মানুষের মনে বিচার দিবসে জবাবদীহীর অনুভূতি সৃষ্টি করেনি। তাদের সভ্যতার ভিত্তি বস্তুবাদ এবং এ মতবাদ অনুসারে পরকাল বা বিচার দিবস বলে কিছু নেই। মদপান করলে আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে, এ অনুভূতি যদি তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করা হতো, তাহলে অবশ্যই জাতিকে মদপান থেকে বিরত রাখা যেতো। নবী করীম (সাঃ) যে ভূখণ্ডে আগমন করেছিলেন, সে জাতি ছিল অজ্ঞতা আর বর্বরতায় নিমজ্জিত। সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো স্পর্শ তাদের জীবনে ছিলো না। হিংস্রতা আর অপরাধ প্রবণতা ছিলো শিরা-উপশিরায় ধাবমান। জেনা-ব্যভিচার তাদের দৈনন্দিন জীবনের উপকরণ ছিল। পানির মতই তারা মদপান করতো। মদ তাদের কাছে এত অধিক প্রিয় ছিল যে, সে যুগের কাব্য আর সাহিত্য মদের উল্লেখ ব্যতীত রচিত হতো না। মদকে ভালোবেসে তারা আড়াই শতেরও অধিক নাম দিয়েছিল। সেই লোকগুলোর মধ্যে বিচার দিবসের ভীতি সৃষ্টি করে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের সম্পূর্ণ জীবনধারা কিভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন, তা বর্তমানে আধুনিক যুগের পণ্ডিতদের কাছে গবেষণার বিষয়। মদ সম্পর্কে রাসূলকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালা মদ-জুয়া সম্পর্কে বলছেন–

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا–

লোকজন আপনাকে প্রশ্ন করছে মদ-জুয়া সম্পর্কে কি নির্দেশ? আপনি বলে দিন, এ দুটো জিনিস বড়ই অকল্যাণকর, যদিও এতে লোকদের জন্য কিছুটা

কল্যাণও রয়েছে, কিন্তু উভয় কাজের অকল্যাণ–কল্যাণের তুলনায় অনেক বেশী। (সূরা আল বাক্বারা-২১৯)

প্রথমবারে মদ-জুয়া সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আদেশ বা নিষেধ বাণী উচ্চারিত হলো না। শুধু এর কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হলো। যখন বলা হলো, এসবের মধ্যে অকল্যাণের দিকই বেশী, তৎক্ষণাত জাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মদপান থেকে বিরত হলো। বেশ কিছুদিন গত হবার পরে দেখা গেল লোকজন মদপান করে নামাজ আদায় করার সময় নামাজে ভুল-ভ্রান্তি করছে। রাসূলকে পুনরায় প্রশ্ন করা হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হলো–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্থ থাকো, তখন নামাজের কাছেও যেও না। নামাজ আদায় তখনই করবে যখন তোমরা কি বলছো, তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। (সূরা আন্ নিছা-৪৩)

আল্লাহর পক্ষ থেকে মদ সম্পর্কে যখন এই আদেশ অবতীর্ণ হলো, তখন লোকজনের পক্ষে মদপান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। ফজরের নামাজের পরে মদপান করলে জীবনের দৈনন্দিন এবং ব্যবসায়িক কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে লাগলো। যোহরের নামাজের পরে মদপান করলে আসরের নামাজ পর্যন্ত নেশা থাকতো। আসরের নামাজের পরে মদপান করলে মাগরিবের নামাজ পর্যন্তও নেশা থাকতো। সুতরাং তারা মদপানের জন্য দুটো বিশেষ সময় নির্ধারণ করলো। ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময় আর এশার নামাজের পরে। এই আদেশের ফলেও আরো কিছু সংখ্যক লোকজন মদপান থেকে বিরত হলো। কিন্তু মদের প্রকৃত ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে লোকজন তখন পর্যন্ত অন্ধকারে ছিল। মদপান করে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মানুষ অরাজকতা সৃষ্টি করতো, হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটাতো নেশাগ্রস্থ হয়ে। এরপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের পর্দা উঠিয়ে নিলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ- وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ-

হে ঈমানদারগণ! এই মদ, জুয়া, মূর্তি, পাশাখেলা ইত্যাদি হলো অপবিত্র এবং শয়তান কর্তৃক উদ্ভাবিত নোংরা কর্ম। অতএব তোমরা এসব কাজ বর্জন করো। এসব কাজ বর্জনের ফলে তোমরা কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে। শয়তানের আকাংখা হলো, মদ-জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসরণ করো এবং ঐসব কাজ থেকে বিরত হও। আর তোমরা যদি এই আদেশের বিরোধিতা করো, তাহলে জেনে রেখো যে, আমার রাসূলের ওপরে দায়িত্ব ছিল, তিনি স্পষ্ট ভাষায় আমার আদেশ পৌঁছে দিবেন। (সূরা মায়িদা-৯০-৯২)

ইতিহাস সাক্ষী, আল্লাহর পক্ষ থেকে মদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার সাথে সাথে ঐ লোকগুলো মদ পান থেকে শুধু বিরতই হয়নি, মদভর্তি পাত্রগুলো তারা ভেঙে এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল যে, রাস্তা-পথে মদের প্লাবন প্রবাহিত হয়েছিল। মদ নিবারক এই আইন কার্যকর করতে গিয়ে কোনো বাহিনীর প্রয়োজন হয়নি, দীর্ঘ দিন ধরে প্রচার প্রপাগাণ্ডা চালাতে হয়নি। কাউকে গ্রেফতার করতে হয়নি। মদ ছিল যাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় পানিয়, সেই মদই আল্লাহর আদেশের কারণে তাদের কাছে চরম ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হলো। কোথাও বসে কিছু সংখ্যক লোকজন মদপান করছিল। রাসূলের ঘোষণাকারীর কণ্ঠশব্দ তাদের কানে প্রবেশ করলো, 'এখন থেকে মদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে'। এই ঘোষণা নেশাগ্রস্থ কানে প্রবেশ করার সাথে সাথে যে ব্যক্তি মুখের কাছে সবেমাত্র মদের পাত্র তুলে ধরেছিল, সে তা ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করেছিল। যাদের সামনে মদ পরিপূর্ণ পাত্র ছিল, তারা তা চরম ঘৃণায় পদাঘাত করে ফেলে দিল। বিচার দিবসে প্রতিটি

কাজের জবাবদীহী করতে হবে, এই বিশ্বাস-ই মানুষের চরিত্রে এভাবে সার্বিক পরিবর্তন সাধিত করেছিল।

রাতের অন্ধকারে দুধের সাথে পানি মিশ্রিত করে বিক্রি করলে কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু সর্বদর্শী আল্লাহ তা'য়ালা দেখবেন, বিচার দিবসে জবাবদীহী করতে হবে, এই অনুভূতি এতটাই প্রবল ছিল যে, অবরোধপুরের অধিবাসিনী যুবতী নারীও দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জনের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করতো। বিক্রেতা ক্রেতাকে জানিয়ে দিতো, তার পণ্যে কোথায় কি ত্রুটি রয়েছে। বস্ত্র বিক্রেতা যদি ভুল ক্রমে কারো কাছে ত্রুটি যুক্ত বস্ত্র বিক্রি করতো, বিষয়টি স্মরণে আসার সাথে সাথে সে বিচার দিবসে জবাবদীহীর ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্যের মতই অনুসন্ধান করতে থাকতো, কোথায় গেল সেই বস্ত্রের ক্রেতা। তাকে খুঁজে বের করে অর্থ ফেরৎ দেয়া হতো। পথ চলতে গিয়ে অলঙ্কারে সুসজ্জিতা তন্বী তরুণী অনিন্দ সুন্দরী ষোড়ষী যুবতী দেখেছে তার দিকে এগিয়ে আসছে সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী যুবক। লুণ্ঠিতা আর ধর্ষিতা হবার ভয়ে আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে সে পথের ধূলায় বসে পড়েছে।

যুবক ধীর গতিতে এগিয়ে এসে সামনে স্থির দাঁড়িয়ে ভয়বিহ্বলা যুবতীর চোখের ওপরে চোখ রেখে মমতাভরা কণ্ঠে আবেদন করেছে, 'মা, কোনো ভয় নেই। আপনি কোথায় যাবেন বলুন আমি প্রহরা দিয়ে নিরাপত্তার সাথে আপনাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিবো, আমার পরিচয় শুনুন, আমি মুসলমান'। বিচার দিবসে জবাবদীহীর অনুভূতি মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি করে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এ ধরনের চরিত্রবান মানুষ গড়ে ছিলেন।

বিচার দিবসে জবাবদীহীর অনুভূতি সক্রিয় না থাকলে কোনোক্রমেই মানুষের চরিত্র ভালো হবে না, মানুষের প্রবৃত্তি থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর হবে না, এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরকাল সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সবচেয়ে বেশী আলোচনা করেছেন। মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আলোচনা এতটাই অধিক যে, তা একত্রিত করলে ত্রিশপারা কোরআনের প্রায় দশপারার সমান হবে। একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কোরআনে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার সারমর্ম হলো, মানুষের ব্যক্তিগত আচার আচরণ এবং মানব গোষ্ঠীসমূহের সামাজিক ও সামগ্রিক আচরণ কোনোক্রমেই নির্ভুল ও সঠিক হতে পারে না, যতক্ষণ না মানুষের যাবতীয় কাজকর্মের চূড়ান্ত হিসাব আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে, এই চেতনা ও দৃঢ় বিশ্বাস মানবীয় চরিত্রের গভীর বুনিয়াদে সম্পৃক্ত ও সংযোজিত হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস এবং বিচার দিবসে জবাবদীহীর অনুভূতি না থাকার পরেও অনেক মানুষ এমন রয়েছে যে, তারা অত্যন্ত সৎ এবং নীতিবান। পরকালে অবিশ্বাসী অনেক লোকের নীতিদর্শন ও কর্মবিধি সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা ভিত্তিক হওয়ার পরেও তারা বহুলাংশে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে। জুলুম, বিপর্যয়, অন্যায়, পাপ ইত্যাদি কাজ থেকে তারা দূরে অবস্থান করে। তাদের পারস্পরিক লেন-দেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং তারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক হিসেবে জাতির একনিষ্ঠ সেবক হয়ে থাকে। এটা কিভাবে সম্ভব?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র বস্তুবাদী ও ধর্মহীন নীতি দর্শন ও চিন্তা চেতনা-পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এসব সৎ স্বভাব সম্পন্ন নাস্তিক লোকদের যেসব নৈতিক সৌন্দর্য ও সৎকাজের জন্য তাদেরকে চরিত্রবান বলা হয়, প্রকৃত পক্ষে তার ভিত্তি নির্মিত হয় দেশ-জাতি ও বস্তুবাদী আদর্শকে কেন্দ্র করে। এসব ধর্মহীন দার্শনিক চিন্তা-বিশ্বাসে ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, বিশ্বাসপরায়ণতা, অঙ্গীকারপূরণ, ইনসাফ-সুবিচার, দয়া-অনুগ্রহ, বদান্যতা, উদারতা, ত্যাগ-তীতিক্ষা, সহানুভূতি, আত্মসংযম, পবিত্রতা, সত্যকে জানা, অধিকার আদায় ইত্যাদি সৎ কাজের মূলেও সংকীর্ণ জাতিয়তাবাদ আর নাস্তিক্যবাদী আদর্শ ক্রিয়াশীল। জাতিয়তাবাদ আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উল্লেখিত সৎ গুণাবলী আংশিকভাবে অর্জন করা যেতে পারে শুধুমাত্র দেশ ও জাতির স্বার্থে। আবার দেশ ও জাতির স্বার্থেই তা যে কোনো মুহূর্তে পরিহারও করা যেতে পারে। এদের কাছে চিরন্তন মূল্যবোধ বলে কিছুই নেই। এ ধরনের লোকগুলোর খোদা হয় চারটি। নিজের নফ্স, দেশ, জাতি এবং নিজেদের তৈরী করা বিধান। এই চার খোদায় বিশ্বাসী লোকগুলো ক্ষেত্র বিশেষে আংশিকভাবে সৎ গুণাবলী অর্জন করলেও তা যেমন ঐ চার খোদার প্রয়োজনে করে, আবার পরিহার করলেও তা ঐ চার খোদার প্রয়োজনেই পরিহার করে।

এক নম্বর খোদা নফ্স-এর নির্দেশে এরা যে কোনো মুহূর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের বা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য নীতি আদর্শ বিবর্জিত গর্হিত কর্মে জড়িয়ে পড়তে পারে। দুই নম্বর খোদা দেশ, এই দেশের স্বার্থে এরা যে কোনো নিন্দনীয় নীতি গ্রহণ করতে পারে। তিন নম্বর খোদা জাতি, জাতির স্বার্থে এরা অন্য জাতি বা দেশের ক্ষতি করতে সামান্য দ্বিধাবোধ করে না। চার নম্বর খোদা হলো দেশের প্রচলিত আইন-কানুন, যা তাদের নিজেদেরই

রচনা করা। যখনই এই আইন তাদের মন-মর্জ্জির বিপরীত নির্দেশ দিবে, তখনই তারা তা সংশোধন করে নিজেদের স্বার্থের অনুকূল সংশোধন করবে।

মানুষ কামনা-বাসনা, লোভ-লালসার উর্ধ্বে নয়। কারো কাছে জবাবদীহীর অনুভূতি যখন হৃদয়ে থাকে না, তখন সে অবৈধ কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য অন্য মানুষের অলক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। নিজ দেশের ও জাতির স্বার্থে সে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করবে না। দেশ ও জাতির স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যদি অন্য দেশ দখল করতে হয়, অন্য জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রয়োজন হয়, বিশ্ব বিবেকের শত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তারা তা করবেই।

এর বড় প্রমাণ ভারত, রাশিয়া, ইসরাঈল, ইউরোপ, আমেরিকা ও বৃটেন। কাশ্মিরে ভারত পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছে। প্রতিদিন তারা সেখানে মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে। কাশ্মিরীদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তারা বুলেট আর বুটের নিচে পিষ্ট করছে। রাশিয়া আফগানিস্থানে আগ্রাসন চালিয়ে অগণিত আবাল বৃদ্ধ বণিতাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। আমেরিকা ভিয়েতনামে নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে। ইরাক ও আফগানিস্থানে আমেরিকা অগণিত বনী আদমকে হত্যা করছে। আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈল ফিলিস্তীনের আবাল বৃদ্ধ বণিতাদের প্রতিদিন পাখির মতোই গুলী করে হত্যা করছে।

বসনিয়া হার্জেগোভিনায় ইউরোপীয়রা আমেরিকা বৃটেনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় লোমহর্ষক গণহত্যা চালিয়েছে। আলজিরিয়া ও আলবেনিয়ায় গণহত্যা চালানো হয়েছে। এসব অমানবিক কর্মকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত এবং প্রত্যক্ষভাবে যারা সহযোগিতা করছে, তারা সবাই মানবাধিকারের প্রবক্তা। ব্যক্তি হিসেবে এদের সকলের চরিত্রে কিছু না কিছু সৎ গুণাবলী অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু দেশ ও জাতির স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে এরা লজ্জা, ঘৃণা, নিয়ম-নীতি, মানবতা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, বিশ্বাসপরায়ণতা, অঙ্গীকারপূরণ, ইনসাফ-সুবিচার, দয়া-অনুগ্রহ, বদান্যতা, উদারতা, ত্যাগ-তীতিক্ষা, সহানুভূতি, আত্মসংযম, পবিত্রতা ইত্যাদি সৎগুণাবলীর পোশাক দূরে ছুড়ে ফেলেছে। বিশ্ব বিবেক এদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বার বার প্রতিবাদ করেছে, কোনো প্রতিবাদই তারা গ্রাহ্য করেনি। বিচার দিবসে জবাবদীহীর অনুভূতিহীন বস্তুবাদে বিশ্বাসী মানবগোষ্ঠীর কাছ থেকে এরচেয়ে ভিন্ন কোনো আচরণ আশা করা যায় না।

বিচার দিবসে জবাবদীহীর অনুভূতি সম্পন্ন মুসলিম সৈন্যবাহিনী কোনো অমুসলিম দেশ জয় করলে সে দেশের অমুসলিম জনগণের সাথে তাঁরা এমন আচরণ করেছেন যে, বিজিত দেশের জনগণ তাঁদের স্বজাতীয় শাসকের কাছ থেকে এতটা ভালো আচরণ পায়নি। একমাত্র মুসলমানরা ব্যতীত অন্যান্য সকল জাতি যে সাম্প্রদায়িক দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত তার প্রমাণ অতীতেও যেমন তারা দিয়েছে, বর্তমানেও তারা সাম্প্রদায়িক কাপালিকদের মতো আচরণ করছে। আসমুদ্র হিমাচল রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাভিলাষী ভারতের বর্ণহিন্দুরা ভিন্ন জাতি ও তাদের ধর্মীয় স্থানসমূহ সহ্য করতে পারে না।

পাশ্চাত্যের সামার্জ্যবাদী অশুভ খৃষ্টশক্তি ইউরোপের বুকে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনাও করতে নারাজ। হার্জেগোভিনা, বসনিয়া, চেচনিয়া থেকে মুসলমানদের শেষ চিহ্ন মুছে দেয়ার জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। মসজিদগুলো অস্ত্রের আঘাতে ধূলোর সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিম শক্তিসমূহ বর্তমান পৃথিবীতে নিজেদেরকে সবচেয়ে সভ্য বলে দাবী করে থাকে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের শ্লোগানে তারা উচ্চকণ্ঠ। পক্ষান্তরে অতীত ইতিহাস এবং তাদের বর্তমান কর্মকাণ্ড এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ইয়াহূদী খৃষ্ট অপশক্তি ও তাদের দোসর জড়বাদী বর্ণহিন্দুরা পৃথিবীতে মানবাধিকার সবচেয়ে বেশী লংঘন করেছে এবং করছে।

ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাথে বর্ণ হিন্দুদের আচরণ, মধ্যপ্রাচ্যে ইয়াহূদীদের নির্মম অত্যাচার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ নীতি, হর্জেগোভিনা-বসনিয়া-চেচনিয়া-কাশ্মির ও ইরাকে খৃষ্টশক্তি কর্তৃক পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন, এ সকল ঘটনাই প্রমাণ করে যে, অমুসলিমরাই সাম্প্রদায়িক কাপালিকের ভূমিকায় শাণিত কৃপাণ হস্তে বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধনযজ্ঞে অবতীর্ণ হয়েছে।

১০৯৯ সালে খৃষ্টশক্তি জেরুসালেম দখল করে ৭০ হাজার মুসলিম নারী-পুরুষ-শিশুদের একটি প্রাণীকেও জীবিত রাখেনি। মুসলমানদের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে বর্শার অগ্রভাগে গেঁথে উল্লাস প্রকাশ করেছে। ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে তারা যখন শহরে প্রবেশ করেছে, তখন তাদের ঘোড়ার পা মুসলমানদের রক্তে ডুবে গিয়েছে। কবরস্থান থেকে মুসলমানদের হাড়গোড় তুলে অপমানিত করেছে। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে জেরুসালেম নগরী খৃষ্টানদের পৈশাচিকতায় মুসলিম শূন্য হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে পুনরায় ১১৭৮ সালে মাত্র ৮৮ বছর পরে মুসলমানরা যখন জেরুসালেম পুনরুদ্ধার করে তখন একজন অমুসলিমেরও ক্ষতি করা হয়নি।

মুসলিম হত্যাযজ্ঞের মহানায়ক নরঘাতক রিচার্ড, যে রিচার্ড হাজার হাজার মুসলিম নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-তরুণকে লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছিল, যার সম্পর্কে তারই জ্ঞাতি ভাই ঐতিহাসিক 'লেনপুল' তার বর্বর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'নিষ্ঠুর কাপুরুষোচিত' বলে। এই খৃষ্টান নরপশু রিচার্ডকে ঐতিহাসিক গিবন চিহ্নিত করেছেন 'শোণিত পিপাসু' হিসেবে। আর ঐতিহাসিক কক্সবার্টের ভাষায় রিচার্ড হলো, 'মানব জাতির নির্মম চাবুক'। যুদ্ধের ময়দানে এই নরঘাতকের অস্ত্র যখন ভেঙ্গে গিয়েছিল মানবতার বন্ধু সালাহ্ উদ্দিন আইয়ুবী (রাহঃ) তখন তাকে হত্যা না করে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

নরপশু রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তার খৃষ্টান সাথীরা তাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল। তখন মুসলিম বীর সালাহ্ উদ্দিন গোপনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে এবং বর্তমানে মুসলমানরা এভাবে মানবতা প্রদর্শন করেছে, আর সেই নির্মল নিষ্কলুষ মানবতাকে নিষ্ঠুর পায়ে বার বার পদদলিত করেছে বস্তুবাদে বিশ্বাসী অমুসলিম শক্তি। পরকালে জবাবদীহীর অনুভূতি যাদের মধ্যে নেই তাদের চরিত্র আর ঐ অনুভূতি যাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের চরিত্রে শতযোজন পার্থক্য রয়েছে, পৃথিবীর জাতিসমূহের ইতিহাসই তা প্রমাণ করেছে। আল্লাহ এবং পরকালের ব্যাপারে যারা গুরুত্ব দেয় না, তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ- أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ-

প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, যারা আমার সাথে (বিচার দিবসে) মিলিত হবার কোনো আশা পোষণ করে না এবং পৃথিবীর জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে, আমার নিদর্শনগুলোর প্রতি উদাসীন থাকে, তাদের শেষ আবাসস্থল হবে জাহান্নাম, ঐসব কৃতকার্যের বিনিময়ে যা তারা (তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে) করেছে। (সূরা ইউনুস-৭-৮)

বিচার দিবসের অনুভূতি মানুষের চরিত্রকে কলুষিত হওয়া থেকে বর্মের মতোই পরিবেষ্টন করে রাখে। পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যত দেশে গণহত্যা চলেছে, এক কথায় যত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং হচ্ছে, তা সবই বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী লোকজনের দ্বারায় সংঘটিত হয়েছে, এ কথা অভিজ্ঞতায় একাধিকবার প্রমাণ হয়েছে।

আবেগ-উচ্ছ্বাস নির্ভর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

মেকিয়াভেলীর দর্শন অনুযায়ী 'ধর্মের যদি কারো একান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে তা থাকবে তার ব্যক্তি জীবনে। বৈষয়িক কোনো বিষয়ে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না এবং রাজনীতি ও রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোনোরূপ সম্পর্কের প্রশ্নই আসে না। পার্থিব জীবনের সাথে ধর্মের কোনোরূপ সম্পর্ক থাকবে না। ধর্মভীরু ও সৎ মানুষ দিয়ে রাজনীতি ও রাষ্ট্র চলে না, এসবে রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজন নেই এবং এর মধ্যে কোনো কল্যাণও নেই। কারণ ধর্মের অনুসারীগণ নীতি নৈতিকতা ও ঔচিত্যবোধকে উপেক্ষা করতে পারে না। রাষ্ট্র ও প্রশাসনযন্ত্রে অধিষ্ঠিত লোকজনকে রাষ্ট্র ও প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনায় অস্বাভাবিক রকমের ধূর্ত হতে হয়। রাজনীতি, রাষ্ট্র ও প্রশাসনযন্ত্রের স্বার্থে ধোঁকা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যার আশ্রয়, অঙ্গীকার ভঙ্গ, নির্যাতন অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ধর্ম অনুসারী লোকদের দ্বারা এসব সম্ভব নয় বিধায় রাজনীতি ও রাষ্ট্রের কাজে তাদের প্রয়োজন নেই'।

অর্থাৎ দেশ ও জাতি পরিচালনায় সৎ মানুষের প্রয়োজন নেই এবং রাজনীতির অঙ্গন সৎমানুষের স্থান নয়। অসৎ মানুষই দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, অসৎ মানুষ দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হলে সে দেশের অবস্থান কেমন হবে? অসৎ মানুষ ব্যক্তিগত, তার নিকটাত্মীয় ও দলের স্বার্থকে প্রাধান্য দিবে না দেশ ও জাতির স্বার্থ প্রাধান্য দিবে? ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের মোকাবেলায় অসৎ মানুষ দেশ ও জাতির স্বার্থ বিসর্জন দিবে না তার নিশ্চয়তা কি? অসৎ মানুষ ব্যতীত যদি রাষ্ট্র ও রাজনীতি না চলে, তাহলে মানুষকে অসৎ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে সকল কদর্য উপাদানের প্রয়োজন, এসবের জ্বালামুখ খুলে দিলে সমগ্র জাতির নৈতিকতা কোন্ পশুস্তরে উপনীত হবে? রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রয়োজনে যদি অসৎ মানুষ গড়তে হয়, তাহলে দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনের জন্যে কোনো বিশেষ বাহিনীর পেছনে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় রাষ্ট্র কেনো করবে?

ইতোপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ আবেগ উচ্ছ্বাস ও কদর্য মানসিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর পেছনে কোনো শক্তিশালী যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা নেই। কিং মার্টিন লুথার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের কাঠামোগত রূপ দিলেও এ মতবাদের চিন্তা-চেতনার জন্ম সেই প্রাচীনকালে। যে সকল নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের

সাথে বিরোধিতা করা হয়েছে, বিরোধিরা সকলেই ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনায় তাড়িত হয়েই বিরোধিতা করেছে। বিরোধিরা নবী-রাসূলগণকে প্রশ্ন করেছে, 'তুমি যে আদর্শ প্রচার করছো, তা গ্রহণ করলে কি আমাদের জাতিয় জীবনে প্রচলিত সকল রীতি নীতি পরিবর্তন করতে হবে?' কেউ প্রশ্ন করেছে, 'আমরা ব্যবসার ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করছি, অন্যকে দেয়ার ক্ষেত্রে ওজনে কম দেই এবং নিজে নেয়ার ক্ষেত্রে বেশী গ্রহণ করি, এসব নীতি কি পরিবর্তন করতে হবে?' কেউ প্রশ্ন করেছে, 'আমরা যৌন জীবনে নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি না, একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের কাছ থেকে যৌনতৃপ্তি লাভ করি, সমকামিতার এ নীতি কি পরিবর্তন করতে হবে?' কেউ বলেছে, 'আমরা মিথ্যা কথা বলি, অঙ্গীকার পালন করিনা, সুদ গ্রহণ করি, জীবিকার তাগিদে দস্যুতা, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন, আমানতের খেয়ানত, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করি, এসব নীতি কি পরিবর্তন করতে হবে?'

নবী-রাসূলগণ জবাবে বলেছেন, 'এ সকল নীতির কোনোটিই মহান আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন না, বরং এগুলো তিনি নিষিদ্ধ করেছেন। যারা এসব নীতি অবলম্বন করবে তাদেরকে তিনি শাস্তির সম্মুখীন করবেন। আমি যে আদর্শ উপস্থাপন করেছি, এ আদর্শ গ্রহণ করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পবিত্রতার ধারা অনুসরণ করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রকাশ্যে ও গোপনে সততা, স্বচ্ছতা, পবিত্রতা, ইনসাফ, ন্যায়-পরায়ণতা, সুবিচার ও কল্যাণকর নীতি অনুসরণ করতে হবে'।

নবী-রাসূলগণের এ কথা শুনে সমকালীন নেতৃবৃন্দ আপোষ প্রস্তাব দিয়ে বলেছেন, 'এসব নীতি বর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এ সকল নীতিসমূহ আমাদের জীবনধারার অঙ্গ। এগুলো পরিহার করলে আমাদের জীবনে ভোগ বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বরং তোমার জন্যে আমরা উপাসনালয় নির্মাণ করে দিচ্ছি, তুমি সেখানে বসে নামাজ- রোজা আদায় করো, আমরা তোমাকে সার্বিক দিয়ে সহযোগিতা করবো'।

নবী-রাসূলগণ দৃঢ় কণ্ঠে তাদের প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাঁদের পবিত্র আন্দোলনে মুহূর্তকালের জন্যেও বিরতি দেননি। নবী-রাসূলগণের আন্দোলনে আতঙ্কিত হয়ে বিরোধিরা পুনরায় লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছে, 'আপনাকে আমরা সর্বাধিক সুন্দরী নারী উপহার দিচ্ছি, আপনার পদতলে ধন-সম্পদ স্তুপ করছি। আপনার সকল প্রয়োজন আমরা পূরণ করবো, আপনি এ আন্দোলন থেকে বিরত থাকুন'।

নবী-রাসূলগণ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমি তোমাদের কাছে কোনোরূপ বিনিময় কামনা করি না, আমাকে বিনিময় দেয়ার দায়িত্ব মহান আল্লাহর। সুন্দরী নারী ও ধন-সম্পদে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এমনকি আমার এক হাতে আকাশের চন্দ্র আরেক হাতে সূর্য্য এনে দিলেও আমি এ আন্দোলন থেকে বিরত হবো না'।

নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বিরোধিদের একই চিত্র পরিলক্ষিত হবে। বিরোধিরা কেউ-ই ব্যক্তিগত জীবন ব্যতীত জীবনের অন্যান্য সকল দিক ও বিভাগে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিধান অনুসরণে স্বীকৃতি দেয়নি। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীগণও মানুষের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল ব্যতীত জীবনের অন্যান্য সকল দিক ও বিভাগে ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করে। সুতরাং প্রাচীন যুগের চিন্তা-চেতনা ও আধুনিক যুগের চিন্তা-চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। প্রাচীন যুগেও যে চিন্তা তাড়িত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানকে ব্যক্তিগত গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, এখন পর্যন্তও সে প্রচেষ্টা অধিক শক্তিতে অব্যাহত রয়েছে। নবী-রাসূলগণের সাথে যারা বিরোধিতা করেছে, আর এখন যারা ইসলামী আদর্শের সাথে বিরোধিতা করছে, তাদের মধ্যে নামের পার্থক্য ব্যতীত আর কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রবক্তা ও অনুসারীরা প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এ মতবাদকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে একে দুর্ভেদ্য করে তুলতে পারেনি। গ্রহণযোগ্য ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিও এ মতবাদের পক্ষে আবিষ্কারে তারা ব্যর্থ হয়েছে এবং যুক্তি প্রমাণের পরিবর্তে এ মতবাদের অনুসারীরা হিংস্রতা ও শক্তির মাধ্যমে মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষ বানানোর চেষ্টা করেছে। এরা কৌশলে রাষ্ট্র ক্ষমতা আয়ত্ব করে দেশের মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন বানানোর চেষ্টা করে থাকে। ধর্ম মানুষকে যে সকল নৈতিক নীতিমালা অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে থাকে তা মেনে চললে অবৈধ ভোগবিলাসের স্রোতে ভেসে চলা যায় না। নৈতিক বন্ধনমুক্ত জীবন যাপনের লক্ষ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। অবাধ যৌনাচার, ইচ্ছানুযায়ী জীবন পরিচালনা, যে কোনো পথে অর্থোপার্জন এবং ব্যয়, নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদির দরজা উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্যেই ধর্মকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অঙ্গনে আবদ্ধ রাখার উপদেশ দেয়া হয়।

ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম অনুসরণ করা যাবে আর পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ধর্মের প্রভাব মুক্ত থাকতে হবে, এ যুক্তি কি গ্রহণ করা যায়? অনেকগুলো ব্যক্তির সামষ্টিকরূপ সমাজ। ধর্মের অনুশাসনে অর্জিত ব্যক্তির সৎ গুণ-বৈশিষ্ট্য সামাজিকতায় প্রয়োগ করলেই পাপাচারমুক্ত সমাজ গঠিত হয়। তাহলে দুই ব্যক্তির পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব কেনো স্বীকার করা হবে না? ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে বলে মন্তব্য করে। কিন্তু কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে এবং এ পার্থক্যের সীমা কি, তা ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে পারে না। মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে তার ব্যক্তি জীবন সমাজ জীবন থেকে কিভাবে পার্থক্য থাকে তা স্পষ্ট করে বলে না। ব্যক্তি জীবনে মানুষ অপরাধী হলে সমাজ জীবনে সে মানুষ কিভাবে সৎ হতে পারে, এ প্রশ্নের জবাব ধর্মনিরপেক্ষদের কাছে নেই। সমাজ জীবনে যে মানুষ চরিত্রহীন দুষ্কৃতিকারী, সে মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে কিভাবে সৎ হতে পারে? ব্যক্তিগত জীবনে যে মানুষ আবেগ উচ্ছ্বাস নির্ভর, হঠকারী, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দোদুল্যমান, অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, বদ মেজাজি, সেই মানুষটি কি সমাজ জীবনে স্থির মস্তিষ্কের হতে পারে? সামাজিক কর্মে আবেগ উচ্ছ্বাস মুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে? উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ব্যক্তি কি সামাজিকভাবে শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে পারে?

ধর্ম শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নীতিবোধের সাথেই এর সম্পর্ক, ধর্মনিরপেক্ষদের এ মতামত সম্পূর্ণ অচল। সর্বজন স্বীকৃত মতামত হলো, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তির কোনো চিন্তাই করা যেতে পারে না। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্যান্য ব্যক্তির সাথে অগণিত ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সম্পর্কে জড়িত। আর সমাজ হচ্ছে দেহের অনুরূপ, এখানে ব্যক্তির মর্যাদা হচ্ছে জীবন্ত দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই মতো। ধর্মের যদি প্রয়োজন থেকেই থাকে তাহলে তা শুধু ব্যক্তির নিজস্ব সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির জন্যে নয়, বরং সমগ্র সমাজের কাঠামো, সংগঠন এবং পার্থিব জীবনের সকল কাজ পরিচালনার জন্যেই প্রয়োজন। আর তার প্রয়োজন না থাকলে ব্যক্তি বা সমাজ কারোর জন্যেই নেই। সমাজের বিধি বিধান এক ধরনের আর ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণ হবে আরেক ধরনের, এটা অজ্ঞতাসুলভ মতামত। সমাজ জীবনের সাথে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণের যদি সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকে, তাহলে ধর্ম বিশ্বাসের তো কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয় না এবং নিরর্থক। শুধু নিরর্থকই নয়, বরং যে সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য অংশের সাথে ধর্ম সহযোগিতা করতে পারে না, সেখানে ধর্মের বিলুপ্তি অনিবার্য।

এ অবস্থায় মাত্র দুটো পথ উন্মুক্ত রয়েছে, হয় সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধর্মহীন কাঠামোয় সাজাতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষদের দাবি অনুসারে ধর্মকে চূড়ান্তভাবে নির্বাসনে পাঠাতে হবে। নতুবা সমাজ জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মের ভিত্তিতে সজ্জিত করতে হবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করতে হবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্জিত সৎ গুণ-বৈশিষ্ট্য মানুষ কোথায় প্রয়োগ করবে? সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনই তো এর সবথেকে উপযুক্ত ক্ষেত্র। অর্জিত সৎ গুণ-বৈশিষ্ট্য সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করলেই তো সে সমাজ ও রাষ্ট্র দুর্নীতিমুক্ত স্বর্ণালী সমাজে পরিণত হবে। নবী করীম (সা:) এর পবিত্র সান্নিধ্যে অবস্থান করে সাহায়ে কেরাম যে অকল্পনীয় সৎ গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন, তাঁরা এসব কিছুই জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগে বাস্তবায়িত করেছিলেন বলেই পৃথিবীর বুকে সবথেকে কল্যাণ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে লোকটি অসৎ, আত্মসাৎকারী, মারমুখী, হিংস্র, চাঁদাবাজ, মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক, দুর্নীতিবাজ, চোর, সে লোকটি ব্যক্তি জীবনে কিভাবে সাধু হতে পারে? রাজনৈতিক জীবনে স্বার্থের জন্যে যে লোকটি নিজ দলের অন্য লোককে হত্যা করায়, সেই লোকটি ব্যক্তিগত জীবনে কি স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হবে? নেতৃত্বের পথ সুগম করার জন্যে যে লোকটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজ প্রতিপক্ষকে খুন করাতে দ্বিধাবোধ করে না, সে লোকটি ব্যক্তি জীবনে প্রতিপক্ষকে সহ্য করবে? চেঙ্গিস খাঁন, হালাকু খাঁন, হিটলার, মুসেলিনী, বিল ক্লিনটন, বুশ ও ব্লেয়ারকে কি কেউ ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক সাধু বলে স্বীকৃতি দিবে? ইন্দিরা গান্ধী যদি ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক হতেন, তাহলে কি তিনি শিখদের স্বর্ণমন্দির ধ্বংস করতে পারতেন? ভারতের নরেন্দ্র মোদী নিজ ধর্মের পোশাক পরিধান করে, ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে কপালে সিঁদুর ও চন্দন ব্যবহার করে। মুসলিম নিধনযজ্ঞে তার ভূমিকার কারণে তাকে কি কেউ ধার্মিক বলে?

কর্ম জীবনে যে লোকটি ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, অসৎ, সে লোকটি ব্যক্তি জীবনে কিভাবে সততার পরিচয় দিতে পারে? নির্বাচনী মৌসুম এলে নানা শ্রেণীর লোকজন নির্বাচনে প্রার্থী হবার ইচ্ছা পোষণ করে। বিভিন্নভাবে নির্বাচনী এলাকার জনগণকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। সজাগ সচেতন ভোটারগণ প্রার্থীর নৈতিক চরিত্র, সততা, স্বচ্ছতা, ন্যায়-পরায়ণতা ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণে আলোচনা চলতে থাকে। এসব দিক স্বচ্ছ থাকলে সচেতন ভোটারগণ তাকে ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন

করে। আর যদি ভোটারগণ জানতে পারে, প্রার্থী গুণ্ডা প্রকৃতির, অসৎ, খুনী, দুষ্কৃতিকারী, চাঁদাবাজ, তাহলে সচেতন ভোটারগণ তাকে ভোট দিবে না। প্রশ্ন হলো কেনো? কারণ ভোটারগণ জানে যে লোকটি ব্যক্তিগত জীবনে সৎ নয়। জনপ্রতিনিধি হলে এ লোকটির দ্বারায় জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। অসৎ প্রকৃতির মানুষকে এ কারণেই ভোট দিবে না, লোকটি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলে জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করবে। ক্ষমতা হাতে পেয়ে লোকটি ব্যাপকভাবে দুষ্কৃতিতে লিপ্ত হবে। এ কারণে তাকে ভোট দিবে না। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা এসব ক্ষেত্রে কি যুক্তি দিবেন?

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তারা ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বললেও তারা ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্মের অনুসরণ করে না। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষদের জীবনাচার সম্পর্কে প্রায়ই পত্রিকা মারফত প্রকাশ হয়ে থাকে। নারীদের মধ্যে যারা এ মতবাদের পক্ষে সোচ্চার তাদের কাউকেই ধর্ম অনুসরণ করতে দেখা যায় না। এদের অনেকেই বিয়েপূর্ব সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বিয়ে ব্যতীতই একই সাথে স্বামী স্ত্রীর ন্যায় বসবাস করে। অনেকে হিন্দু পুরুষ বা নারীকে জীবন সাথী বানিয়ে স্বামী স্ত্রীর ন্যায় বসবাস করছে। অনেকে নিয়মিত মদ পানে অভ্যস্থ এবং অন্যান্য মাদক গ্রহণ করে। এদের অনেকেই পারিবারিক জীবনে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল নয়। উভয়েই পরকীয়ায় লিপ্ত হয় এবং বিষয়টি প্রকাশ পেলে একে অপরের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয় অথবা আত্মহত্যা করে। প্রকৃত বিষয় হলো এরা ধর্মের বন্ধন মুক্ত জীবনে বিশ্বাসী, ব্যক্তিগত জীবনেও এরা ধর্মকে প্রবেশের অনুমতি দেয় না। ধর্মকে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যেই এরা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে।

ধর্মনিরপেক্ষগণ মুখে ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়ে একে ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে আবদ্ধ রাখার পক্ষ্যে যুক্তি দেয়। স্রষ্টা একজন আছেন, তিনি সর্বশক্তিমান এবং তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান। এরা ব্যানার ও পোষ্টারেও লিখে থাকে, 'স্রষ্টা সর্বশক্তিমান'। তাহলে সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে ব্যক্তিগত অঙ্গনে, মসজিদে, মন্দিরে, গীর্জায়, প্যাগোডায় ভ্রমণের অধিকার দেয়া যাবে, আর সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যাবে না কোনো? ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি ইত্যাদি অঙ্গনে স্রষ্টার প্রবেশ কেনো নিষিদ্ধ হবে? স্রষ্টাকে সর্বশক্তিমান বলে ব্যানার পোষ্টারে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে, অপরদিকে সেই স্রষ্টার বিচরণ ক্ষেত্র সীমিত করা হচ্ছে কোন্

যুক্তিতে? ধার্মিক লোকদের ধোকা দিয়ে তাদের সমর্থন ও সহানুভূতি কুড়ানোর জন্যে কি ব্যানার পোষ্টারে এসব কথা লিখা হচ্ছে না? স্রষ্টাকে সর্বশক্তিমান হিসেবে মানলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মানতে হবে, না মানলে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষরা এসব ক্ষেত্রে কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং নির্বোধ মানুষ ব্যতীত তাদের যুক্তি কেউ মেনে নিতে পারে না।

মানব জীবনে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতামাতার ওপর স্বাভাবিকভাবেই অর্পিত হয়। স্রষ্টা যদি মানুষ ও এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে মানুষের প্রতি কি তাঁর কোনো দায়িত্ব নেই? ধর্মনিরপেক্ষগণ কোন্ যুক্তিতে তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করছেন? স্রষ্টা যদি এ জটিল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন এবং সুষ্ঠুভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সৃষ্টি জগৎ পরিচালনা করছেন, কোথাও কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সৃষ্টির সকল বস্তু ও প্রাণী জগতে যে নিয়ম তিনি চালু করেছেন যথা নিয়মে তা পরিচালিত হচ্ছে। সেই স্রষ্টা মানুষের জন্যে কোনো নিয়ম দিবেন না, এটা কি যুক্তিসঙ্গত বা বিবেচ্য বিষয় হতে পারে? সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাপুঞ্জ, নক্ষত্রমালা, ছায়াপথ ইত্যাদি অকল্পনীয় জটিল বিষয়। এসব জটিল স্থানে স্রষ্টার নিয়ম কার্যকর বলে স্বীকৃত হলে মানুষের ক্ষুদ্র জীবনে তাঁর নিয়ম কেনো কার্যকর করা যাবে না?

মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ধর্মানুসরণ করবে, আর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের মুখাপেক্ষী হবে না, ধর্মনিরপেক্ষগণ কোন্ সনদের ভিত্তিতে এ কথা বলেন? স্রষ্টা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের আনুগত্য কামনা করেন আর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আনুগত্য দাবি করেন না, এ মতামতের সনদ কি? স্রষ্টার উদ্দেশ্যে শুধু নামাজ-রোজা, হজ্জ, কোরআন তিলাওয়াত, পূজা-পার্বন, চিবর দান, উপবাস এ ধরনের কিছু অনুষ্ঠান পালন করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন, আর জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে যার যেমন খুশী নীতি অনুসরণ করলে স্রষ্টার কোনো আপত্তি থাকবে না, এ যুক্তিরই বা সনদ কি? স্রষ্টা কি এমন কোনো ঐশী বাণী কারো প্রতি অবতীর্ণ করেছেন? যদি না করে থাকেন তাহলে শুধুমাত্র ধর্মনিরপেক্ষদের দুরাভিসন্ধিমূলক কথায় স্রষ্টাকে ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ করে জীবনের অন্যান্য অঙ্গন থেকে স্রষ্টাকে বিতাড়িত করা কি যুক্তিযুক্ত?

স্রষ্টা যদি সর্বজ্ঞ ও সর্বকাল বিশেষজ্ঞই হয়ে থাকেন, তাহলে মানব সৃষ্টির পূর্বে মানব জীবনের জটিলতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কি তিনি অনবহিত ছিলেন? মানব জীবনে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, পৌরনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি, শ্রমনীতি, যুদ্ধ ও সন্ধিনীতি, সাংস্কৃতিক নীতিমালা,

সভ্যতা, বিচারনীতি, গ্রহণ-বর্জন নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যিক নীতি ইত্যাদির প্রয়োজন হবে, এ কথা কি স্রষ্টার জানা ছিলো না? সর্বকাল বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্রষ্টার এসব জানা থাকারই কথা। তাহলে তিনি এসব নীতিমালা দিলেন না কেনো? যদি না দিয়ে থাকেন এবং মানব জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান তিনি অবতীর্ণ করে না থাকেন, তাহলে এমন অথর্ব, অক্ষম ও দুর্বল স্রষ্টার উদ্দেশ্যে মানুষ কেনো মাথানত করবে? কেনো তাঁকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করে উপাসনালয় নির্মাণ করে সেখানে হাজিরা দিবে? কেনো তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবনের চাহিদাকে বিসর্জন দিয়ে উপবাস ব্রত পালন করবে? কেনো তাঁকে ভয় করে জীবনকে ভোগ বিলাস থেকে বিরত রাখবে?

যে স্রষ্টা মানব জীবনের সমস্যা সঙ্কুল ক্ষেত্রে অভ্রান্ত পথের সন্ধান দিতে অক্ষম, তাঁকে ব্যক্তি জীবনে মেনে চলার কি কোনো প্রয়োজন কেউ অনুভব করবে? রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান যিনি দেন না, সেই স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করার কোনো প্রয়োজন কি কেউ বোধ করবে? এমন অক্ষম অথর্ব অকর্মণ্য দুর্বল স্রষ্টা পরকালের ভয় দেখাবেন, আর সেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে জীবনকে অপূর্ণ রাখার কি কোনো যুক্তি আছে? যেহেতু আবেগ, উচ্ছ্বাস ও ভোগের লালসার ওপর ভিত্তি করে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার জন্ম হয়েছে এবং পরবর্তীকালে তা পাদ্রীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আর ক্রোধের ওপর নির্ভর করে সংগঠিত হয়েছে, সেহেতু উল্লেখিত প্রশ্নসমূহের নির্ভুল উত্তর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের জানা নেই। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মূলতঃ নাস্তিক্যবাদের ভিন্ন এক রূপ, এ মতবাদের অনুসারীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন হারানোর ভয়ে প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু কৌশলে ধর্মের শিকড় উৎপাটন করাই এদের মূল লক্ষ্য।

বাস্তবতার নিরিখে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ-১

মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম তুরস্কের কামাল পাশা বিশ্বব্যাপী ঘোষনা দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। এর অনেক পরে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে তৎকালীন সরকার রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির একটি মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে গ্রহণ করে। এ ছাড়া মুসলিম বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে অনেকগুলো ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলসমূহ

আত্মপ্রকাশ করে। বাস্তবতার নিরিখে এ মতবাদ কল্যাণধর্মী কিনা বা ইসলাম ধর্মবলম্বীদের জন্য এ মতবাদের আদৌ কোনো প্রয়োজন রয়েছে কিনা বা পবিত্র কুরআন হাদীসে এর কোনো অনুমোদন আছে কিনা তা এ মতবাদের অনুসারীগণ বোধহয় চিন্তা করে দেখেননি।

একটি বিষয় তারা বোধহয় ভুলে গিয়েছেন, মানুষের জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ, ভবিষ্যৎও তার সম্পূর্ণ অজানা, অতীতকে সে ভুলে যায় আর বর্তমান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রায়ই ভুল করে। জ্ঞানের এ সীমাবদ্ধতা নিয়ে মানুষ যখন ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান রচনা করে তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মাঝে মধ্যেই সংবিধান সংশোধন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সমগ্র বিশ্বে রাষ্ট্রসমূহে মানব রচিত সংবিধান সমূহের অবস্থাও এথেকে ব্যতিক্রম কিছুই নয়। অথচ আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী জীবন বিধানে বিগত দেড় হাজার বছরেও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান সীমিত নয়, তিনি অসীম জ্ঞানের মালিক। যাঁর কাছে অতীত বা ভবিষ্যৎ কাল বলে কোনো কাল নেই, সকল কালই তাঁর কাছে বর্তমান। এ জন্যে তাঁর পক্ষেই কেবলমাত্র সম্ভব মানব সম্প্রদায়ের জন্য একটি কালজয়ী সার্বজনীন সংবিধান উপহার দেয়া। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আল্লাহ তা'য়ালা মানব গোষ্ঠীর জন্য ইসলামকেই জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।

পবিত্র কোরআনকে সংবিধান হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন, আর এ পথে সঠিকভাবে চলার জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সেই সাথে আরো মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা শুধু মুসলমানদের প্রতিপালক নন, তিনি 'রাব্বুল আলামীন' সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালনকারী। মহাগ্রন্থ আল কোরআন শুধু মুসলমানদের জন্য পথ নির্দেশিকা নয়, কোরআন হচ্ছে 'হুদাল্ লিন্নাস' মানব গোষ্ঠীর জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হিদায়াত গ্রন্থ। এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শুধু মুসলমানদের পথ প্রদর্শক ও করুণা হিসেবে প্রেরিত হননি, তিনি 'রাহ্‌মাতুল্‌লীল আ'লামীন' সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর করুণা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এ কারণেই এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই সত্য যে, আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া বিধান তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কল্যাণকামীতা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ইসলাম কবুল করলে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাওয়া যাবে, আর কেউ যদি ইসলাম কবুল না-ও করে শুধু ইসলামী বিধান মেনে চলে তাহলে পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা

না থাকলেও দুনিয়ার জীবনে অবশ্যই শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তামূলক জীবন-যাপনে অবশ্যই ধন্য হবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এ বিষয়ে দেশের সচেতন, সজাগ, সুস্থ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও কলামিষ্টদের নিকট উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই। কিছুক্ষণের জন্য তাঁরা নিজেদের মন-মস্তিষ্ক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি তাদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য পরিহার করে উদার ও পবিত্র মনে ভেবে চিন্তে নিজের সচেতন বিবেককে জবাব দিন। প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ:–

১। কোরআন মজীদের সূরা বাক্বারার ২৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সুদকে হারাম ও ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করেছেন। আমরা সবাই জানি সুদ পূজিবাদী শোষণের জঘন্য হাতিয়ার, সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি দিয়ে ধনীক শ্রেণী অধিক ধনশালী হয় আর দরিদ্র শ্রেণী হয় আরো নিঃস্ব। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র যদি কোরআনের বিধান অনুযায়ী ব্যাংকিং সেক্টর থেকে শুরু করে সকল প্রকার অর্থনৈতিক লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে এদ্বারা উপকৃত হবে শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নাকি জাতি-ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই?

২। পবিত্র কোরআন মজীদের সূরা বনী ইসরাঈলের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা জেনা-ব্যভিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এখন রাষ্ট্র যদি আইনের মাধ্যমে জেনা-ব্যভিচার বন্ধ করার লক্ষ্যে জেনার উৎস নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নারীর সৌন্দর্য্য প্রদর্শনী, সহশিক্ষা, পর্ণোগ্রাফী, অশ্লীল নাচ-গান, অশ্লীল সিনেমা ও অশ্লীল সাহিত্য বন্ধ করে দেয়, তাহলে এদ্বারা উপকৃত হবে শুধু মুসলিম সমাজ নাকি জাতি-ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সকলেই?

৩। পবিত্র কোরআন মজীদের সূরা মায়েদার ৯০-৯১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মদ-জুয়াসহ সকল প্রকার যৌন উত্তেজক মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমরা সকলেই জানি, সব ধরণের জঘন্য পাপের উৎস মদ-জুয়া। এখন রাষ্ট্র যদি আইনের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের জন্যে সব ধরণের মাদকদ্রব্য আমদানী-রফতানী, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং মদ্যপান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে মদ্যপ-মাতাল ও জুয়াড়িদের হত্যা-ধর্ষণ ও দূর্ঘটনার তাণ্ডব থেকে রক্ষা পাবে শুধু কি মুসলিম সমাজ নাকি জাতি-ধর্ম, বর্ণ, দল-মত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই?

৪। পবিত্র কোরাআন মজীদে সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৩ নং আয়াতে এবং সূরা মায়েদার ৩৩ ও ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা আদালতের মাধ্যমে

নরহত্যা ও ব্যভিচারের অভিযোগে প্রমাণীত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ছাড়া সকল প্রকার নরহত্যা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং চুরি-ডাকাতী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এখন রাষ্ট্র যদি আইনের মাধ্যমে অপরাধীদের কোরআনে বর্ণিত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা কার্যকর করে তাহলে এদ্বারা উপকৃত হবে কি শুধু মুসলিম সমাজ নাকি এই আইনের মাধ্যমে নিরাপত্তা, শান্তি ও স্বস্থি পাবে সমগ্র জাতি?

৫। সূরা বাক্বারার ২৮ নং আয়াতে এবং সূরা নিসার ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা নারীদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার, পুরুষের সমঅধিকার, তাদের ভরণ-পোষণের অধিকার এবং স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ করতে স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং পবিত্র ইসলামে সকল প্রকার নারী নির্যাতন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্র এ বিধান আইনের মাধ্যমে কার্যকর করলে এদ্বারা মুসলিম নারীরাই উপকৃত হবে নাকি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হবে? এসব প্রশ্নের জবাব যদি আপনাদের কাছে ইতিবাচক হয়, তাহলে লক্ষ্য করুন:-

ইসলাম সাম্প্রদায়িক নয়- সার্বজনীন, উগ্রপন্থী নয়- উদার, অসহিষ্ণু নয়- সহনশীল, ইসলাম মানব রচিত নয়- আল্লাহ্ প্রদত্ত। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সেই মহান সত্ত্বা যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক, প্রতিপালক, তিনিই মানবকুল সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কল্যাণ- অকল্যাণ কিসে হয় এবং তাদের জাগতিক ও পরকালীন উন্নতি কিসে হয় এসব কিছুকে সামনে রেখেই তিনি সংবিধান দিয়েছেন- যার নাম মহাগ্রন্থ আল কোরআন।

সূরা হাজ্জ এর ৪১ নং আয়াতের শেষাংশে রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের সৎকাজের আদেশ এবং সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, কোরআনে বর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্র যদি উগ্রপন্থা, জঙ্গীবাদ, অসহিষ্ণুতা, অসহনশীলতাসহ সকল প্রকার গর্হিত ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দেশের নাগরিকদের বিরত রাখে এবং সকল প্রকার ভালো তথা মানব কল্যাণমূলক কাজের প্রতি উৎসাহিত করে, তাহলে এদ্বারা শুধু মুসলিম নাগরিকবৃন্দ উপকৃত হবেন না, উপকৃত হবেন জাতি-ধর্ম, দল-মত নির্বিশেষে নাগরিক মাত্র সকলেই।

প্রাসঙ্গিক কারণে সূরা হাজ্জ এর ৪১ নং আয়াতের পূর্ণ অর্থ ও সামান্য ব্যাখ্যা প্রদান এখানে জরুরী মনে করছি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ-

আমি যদি এ (মুসলমান)-দের (আমার) যমীনে (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা (প্রথমে) নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, (দ্বিতীয়ত) যাকাত আদায় (-এর ব্যবস্থা) করবে, আর (নাগরিকদের) তারা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (সূরা হাজ্জ: ৪১)

প্রথম দুটো কাজ শুধু মুসলিম নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য হলেও এর সুফল কিন্তু ভোগ করবেন মুসলিম- অমুসলিম সকল নাগরিকই। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখায় বলা যায় ব্যক্তির নামাজ আদায় এবং নামাজের শিক্ষা নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করলে সে ব্যক্তির চরিত্রে অবশ্য অবশ্যই সৎ গুণসমূহ বিকশিত হবেই। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ-

নি:সন্দেহে নামাজ (মানুষকে) অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত-৪৫)

এ জন্যে সত্যকার অর্থে নামাজী মুসলিম ব্যক্তির বিকশিত সৎ গুণ- বৈশিষ্ট্যের কারণে শুধুমাত্র মুসলিম নাগরিকই উপকৃত হবেন না, অমুসলিম নাগরিকগণও উপকৃত হবেন। এভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কল্যাণ লাভ করবেন।

দ্বিতীয় কাজটি হলো যাকাত আদায়। অর্থাৎ দেশের ধনী মুসলিমদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ দেশে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে তথা 'সাত তলা আর গাছ তলা' এ ব্যবধান দূর করা হবে। যাকাত ভিত্তিক এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ এক শ্রেণীর হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়া এবং শোষণের পথ রুদ্ধ করা হবে। ফলে দেশের নাগরিক সকলেই সমভাবে উপকৃত হবেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ দায়িত্ব হলো, রাষ্ট্রের পরিচালকগণ নিজেরা সৎ হবেন, সৎ কাজের আদেশ দিবেন এবং যাবতীয় অসৎ কাজ থেকে দেশের নাগরিকগণকে বিরত রাখবেন। আর এই দুটো কাজ মুসলিম- অমুসলিম সকলের প্রতিই প্রযোজ্য হবে। যে রাষ্ট্রে শুধু মাত্র সৎকাজের প্রবর্তন করা হবে এবং অসৎ

কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা হবে, সেই রাষ্ট্রের সকল শ্রেণী, পেশা ও ধর্মের অনুসারী মানুষই শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে। ইসলাম এ বিষয়টি শুধু মাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত করেনি, সকল মানুষের সাথেই সংযুক্ত করেছে। তাহলে ইসলামকে 'সাম্প্রদায়িক' বলার কি কোনো সুযোগ আছে?

সাম্য মৈত্রীর এ সংবিধান পবিত্র কোরআন স্পষ্ট ঘোষণা করেছে, 'সকল মানুষই এক আল্লাহর সৃষ্টি' তারা সকলেই পরস্পরে সমান। শ্রেণী, বংশ, গোত্র, বর্ণ ও আঞ্চলিকতার পার্থক্য জঘন্য এক প্রথা মাত্র এবং এই জঘন্য প্রথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আদর্শসমূহ পৃথিবীর জন্য এক মহাবিপদ। সমগ্র মানবগোষ্ঠী মহান আল্লাহর একক এক পরিবার এবং কোনো ধরণের বিভেদের স্থান এখানে নেই। সমগ্র মানুষই এক, হোক সে মানুষ আরব বা অনারব, সাদা বা কালো, ধনী বা গরীব, প্রাচ্যের বা প্রতীচ্যের, আর্য বা অনার্য, দৈহিক গঠন আকৃতিতে সুন্দর বা কদাকার। সকল মানুষকেই মানুষ হিসেবে সম্মান মর্যাদা দিতে হবে। সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ–

আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের (মানুষকে) মর্যাদা দান করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৭০)

সকল মানুষই একজন মাত্র নারী ও পুরুষ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অতএব মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তথা সাম্প্রদায়িকতার মূলে কুঠারাঘাত করেছে ইসলাম। এই পৃথিবীতে যে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে জীবন-যাপন করে, সে মানুষই সততা ও স্বচ্ছতার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। আর এরূপ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীকে শান্তি ও স্বস্তির আবাস স্থলে পরিণত করতে সক্ষম এবং মানব সমাজও এরূপ মানুষের দ্বারাই কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম। আর ঠিক এ কারণেই আল্লাহভীরু মানুষকে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলাম মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি নিষিদ্ধ করেছে। সকল মানুষকেই সম্মান মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। এরপরও যারা ইসলামী জীবন বিধানে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আবিষ্কার করছেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন, হয়তো তা না বুঝে করছেন অথবা জেনে বুঝে বিশেষ কোনো দেশের এজেণ্ডা বাস্তবায়নে নিষ্ফল প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

ইসলাম মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে, মানুষে মানুষে গোত্র, বর্ণ, ও অঞ্চলভিত্তিক পার্থক্যের সফল বিলোপ সাধন করাই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। এই শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই বিখ্যাত চিন্তাবিদ Sir C. P. Ramaswamy Aiyer ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেছেন, 'ইসলাম কি দাবী করে? বর্তমান পৃথিবীতে প্রকৃত অর্থে সক্রিয় একমাত্র গণতান্ত্রিক ধর্মব্যবস্থা হিসেবে আমি ইসলামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি। কেবলমাত্র আমিই নই, চিন্তাশীল প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সত্যের স্বীকৃতি না দিয়ে পারবে না। হিন্দু এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। এ মহাসত্য স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করার সৎ সাহস আমার রয়েছে। দার্শনিক ভিত্তি থাকার পরও আমার নিজের ধর্ম 'একক এক মানব সমাজের' বাস্তব প্রতিষ্ঠায় সফলতা অর্জন করেনি। ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে সকল মানবগোষ্ঠী এক ও অভিন্ন, এই অতীব প্রয়োজনীয় চেতনার বাস্তব প্রতিষ্ঠা করতে ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মই সক্ষম হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়েরস্ (Boers), শ্বেতাঙ্গ অষ্ট্রেলিয়া অথবা আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যসমূহের সমস্যা এমনকি যুক্তরাজ্যের সমাজ জীবনে লুকায়িত দ্বন্দ্ব-বিভেদ ইত্যাদির মতো যে কোনো সমস্যা ইসলামে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত'।' (Eastern Times, 22nd December, 1944)

Arnold Toynbee তাঁর Civilization on Trial নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন, 'আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান দিকসমূহের সাথে অস্থির ও বিক্ষিপ্ত চিন্তার অনুসারী মানুষগুলো বড় ধরনের দুটো সমস্যা উপস্থিত করেছে। এর একটি হলো উগ্র বর্ণবাদ আর আরেকটি হলো মদ। এগুলোর মোকাবেলায় ইসলামের অভ্যন্তরীণ শক্তি এমন অবদান রাখতে সক্ষম, যা গ্রহণ করলে আমরা উন্নত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সৌধ গড়তে পারি। মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে বর্ণবাদের মূলোৎপাটন ইসলামের বিরাট অবদান। বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামের এই মহৎ নীতির প্রচার ও প্রসার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে যা অবস্থা, তাতে বর্ণবাদী অসহনশীলতার প্রচারকদের চেহারা ক্রমেই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করছে। বর্ণবাদী এই মানসিকতা চলতে থাকলে তা মারাত্মক ক্ষতি বা ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। ইসলামের বর্ণবাদ বিরোধী শক্তির উত্থান ঘটিয়েই কেবলমাত্র বর্ণবাদকে পরাজিত করে শান্তি ও সহিষ্ণুতার পরিবেশ

সৃষ্টি করা সম্ভব'। (Civilization on Trial- by Arnold Toynbee, P. 205-206)

মহাপবিত্র সংবিধান আল কোরআন শুধুমাত্র মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলেনি, সকল মানুষের প্রতিই সুবিচার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান এবং বিচার পরিচালনায় কোনো ধরনের পার্থক্য ও পক্ষপাতিত্বের সামান্যতম প্রশ্রয় দেয় না। কে মুসলিম এবং কে অমুসলিম, ইসলাম সুবিচারের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন-

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ-

যখন মানুষের মধ্যে তোমরা বিচার ফয়সালা করো তখন তা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে করবে। (সূরা নেসাঃ ৫৮)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ-

আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দশন দিয়ে প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে দিয়েছি পবিত্র গ্রন্থ ও ন্যায়দন্ড যাতে করে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। (সূরা আল হাদীদঃ ২৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا-

হে বিশ্বাসীগণ! সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তোমরা কঠোরতা অবলম্বন করো, আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ, এমনকি তা যদি তোমার নিজের, তোমার পিতার বা তোমার আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও যায় এবং সুবিচারের ক্ষেত্রে ধনী ও গরীবের মধ্যেও কোনো পার্থক্য করবে না, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করো না, এ পথ থেকে

বিচ্যুত হয়ো না। যদি সুবিচারকে বিকৃত করো বা সুবিচার প্রদর্শনে অস্বীকৃত হও, তাহলে মনে রেখো তুমি যা কিছুই করছো আল্লাহ সকল কিছুই দেখছেন। (সূরা নেসাঃ ১৩৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ۔

হে বিশ্বাসীগণ! সাম্য ও সুবিচারের ক্ষেত্রে তোমরা অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন করো। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা যেনো তোমাদের সুবিচার থেকে বিপথগামী করতে না পারে। সুবিচারের সাথে কাজ করো। (সূরা আল মায়েদাঃ ৮)

সুতরাং পবিত্র কোরআনকে সংবিধান হিসেবে যে রাষ্ট্র গ্রহণ করবে, সেই রাষ্ট্রের মুসলিম, অমুসলিম সকল নাগরিকই সুবিচার লাভে ধন্য হবেন। ইসলামের এই নির্দেশ শুধুমাত্র কোরআনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে তা বাস্তবায়ন করে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সম্মুখে স্বর্ণালী দৃষ্টান্ত স্থাপনও করেছে। চুরির অপরাধে নবী করীম (সাঃ) এর বিচারালয় থেকে উচ্চ সম্মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী গোত্রের এক মহিলার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হলো। সম্মান-মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে সে রায় পুনর্বিবেচনার জন্যে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে সুপারিশ করা হলে তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, 'আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি এ ধরনের অপরাধে অপরাধী হতো, তাহলে তাঁর ক্ষেত্রেও দণ্ড ভোগের বিন্দুমাত্র হ্রাস- বৃদ্ধি করা হতো না'। (আল হাদীস)

দ্বিতীয় খলিফার শাসনামলে একজন অমুসলিমকে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত একজন মুসলমানকে গ্রেফতার করে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের হাতে সোপর্দ করে অপরাধীকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এবং অপরাধী মুসলমানকে হত্যা করে অমুসলিমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলো। তৃতীয় খলিফার শাসনামলে দ্বিতীয় খলিফার এক সন্তান হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হলো। সাক্ষ্য প্রমাণে অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণ হলে দ্বিতীয় খলিফার সন্তানকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। চতুর্থ খলিফার শাসনামলে একজন অমুসলিমকে হত্যা করার অভিযোগে মুসলিম এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত হলে উক্ত মুসলিম ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডাদেশ দেয়া হলো। নিহত অমুসলিমের ভাই

এসে খলিফাকে জানালেন, 'অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিয়েছে, এ জন্যে আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আপনারা তাকে মুক্তি দিন'। শুধুমাত্র মুখের কথায় খলিফা আসামীকে মুক্তি দিলেন না, তিনি গোয়েন্দাদের মাধ্যমে তদন্ত করে দেখলেন, কোনো ধরণের প্রভাব, হুমকি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন ব্যতীতই অমুসলিম লোকটি ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে আসামীকে মুক্তি দেয়ার অনুরোধ করছে। এরপর অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়া হয়। (Islamic Law and Constitution, P. 179)

এ ধরণের অসংখ্য দৃষ্টান্তে ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ। মানব জাতির ইতিহাস সাক্ষী, ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারী ব্যতীত এ ধরণের অসাম্প্রদায়িক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন ভিন্ন কোনো আদর্শ এবং জনগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী মুসলিম শাসকগণ সকল ধর্মের প্রজাদের ওপর রাজত্ব করেছেন। রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি সুলতান মাহ্মুদের বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে একজন হিন্দু নাগরিক মামলা দায়ের করলে স্বয়ং সুলতান মাহমুদকে অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যে কাজীর আদালতে উপস্থিত হতে হয়েছিলো। একজন ব্যবসায়ীর সাথে অশোভন আচরণের অভিযোগে শেরশাহ সুরী তাঁর সন্তানকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেছিলেন। একজন অমুসলিম মহিলাকে অপমান করার অভিযোগে সম্রাট আলমগীর তাঁর প্রধানমন্ত্রী আসাদ খাঁনের পুত্র মির্জা তাফাখুরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।

অভিযোগ করা হয়ে থাকে ইসলাম এবং এর অনুসারীরা অমুসলিমদের প্রতি সহিষ্ণু নয়, অসহনশীল এবং এ কারণে ইসলামী রাজনীতি তথা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। এই দাবী যারা তুলছেন, তাদের প্রতি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি, ইসলাম, ইসলামী শাসন এবং মুসলিম শাসনের ইতিহাসের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। অমুসলিমদের প্রতি অসহনশীলতার একটি দৃষ্টান্তও আবিষ্কার করতে পারবেন না। বরং মানবতাবাদী এবং সকল মানুষের জন্যে অনুসরণযোগ্য অগণিত দৃষ্টান্তে ইসলামী শাসন ও মুসলিম শাসনের ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ।

T. W. Arnold Toynbee লিখেছেন, 'মুসলিম সৈন্য বাহিনী জর্ডান উপত্যকায় পৌঁছার পর সেনাপতি আবু উবায়দা ফিবলে নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। এ সময় খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে তাদের নেতৃবৃন্দ মুসলিম বাহিনীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, সে পত্রে তারা উল্লেখ করেন, 'হে মুসলিম সম্প্রদায়! বাইজান্টাইনদের

তুলনায় আমরা আপনাদের অধিক পসন্দ করি। ওরা আমাদের অনুরূপ খৃষ্টান হবার পরও আমাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে আমাদেরকে বাস্তুহারা করেছে। অপরদিকে আপনারা এসেছেন আমাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদের প্রতি নিশ্চিত নিরাপত্তার বাণী নিয়ে। তাদের তুলনায় আপনাদের শাসন আমাদের জন্যে অধিকতর মঙ্গলজনক'। এমিসা নগরীতে বসবাসকারী খৃষ্টান সম্প্রদায় নগরীর দরজা তাদেরই জ্ঞাতি ভাই হেরাক্লিয়াসের খৃষ্টান বাহিনীর জন্যে বন্ধ করে দিয়ে মুসলিম বাহিনীর প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলো, 'এই নগরীতে বসবাসকারী খৃষ্টান সম্প্রদায় গ্রীকদের অত্যাচার আর অবিচারের তুলনায় মুসলমানদের শাসন ও সুবিচারকে অধিকতর স্বাগত জানায়'। (The Preaching of Islam- by Arnold Toynbee, P. 55)

ঐতিহাসিক গিবন লিখেছেন, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর খৃষ্টান প্রজাদের প্রাণ, ধন-সম্পদ, জীবনাচার, ব্যবসায়-বাণিজ্য, স্বাধীনতা এবং তাদের ধর্মীয় আচার আচরণের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের নিশ্চয়তা প্রদান করেন'। (Gibbon: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, P. 269-270)

Arnold Toynbee লিখেছেন, 'উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষায় প্রশিক্ষিত মুসলিম বিজয়ীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং অভিযান চলাকালে তাদের মহানুভবতা ও উদারতা বিজিতের মন-মানসে তাদের জন্যে সৃষ্টি করেছিলো সম্মান-শ্রদ্ধা, বিজিতরা তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিলো। জেরুসালেম নগরী যখন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমার (রাঃ) এর হাতে তুলে দেয়া হয়েছিলো তখন তিনি লিখিত শপথ পাঠ করেছিলেন, 'আমি উমার, জেরুসালেমবাসী খৃষ্টানদের প্রাণ, ধন-সম্পদ, তাদের সন্তান-সন্ততি, গীর্জা, ক্রুশ ও তাদের ধর্ম, ভূমি এবং জীবনাচারের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ের প্রতি নিশ্চয়তা প্রদান করছি। এখানে তাদের গীর্জা ধ্বংস করা হবে না, গীর্জার কোনোরূপ অবমাননা বা ক্ষতি সাধন করা হবে না, এর মর্যাদার প্রতি আঘাত করা হবে না। ধর্মীয় কারণে এখানে কেউ-ই নির্যাতিত হবে না এবং ধর্মীয় কারণে কারো প্রতি আঘাত করা হবে না'। (The Preaching of Islam- by Arnold Toynbee)

জেরুসালেম নগরীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার পর হযরত উমার (রাঃ) সেখানে অবস্থিত খৃষ্টানদের ধর্মীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সম্পর্কে Arnold Toynbee লিখেছেন, 'উমার (রাঃ) পরিদর্শন করছিলেন তখন নামাজ আদায়ের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হয়। গীর্জার পুরোহিত উক্ত গীর্জাতেই

খলিফাকে নামাজ আদায়ের জন্যে অনুরোধ করেন। খলিফা বিনয়ের সাথে পুরোহিতকে বলেন, 'আজ আমি যদি এই গীর্জায় নামাজ আদায় করি, তাহলে পরবর্তী সময় মুসলিম জনগোষ্ঠী এই গীর্জাকে তাদের উপাসনার স্থান হিসেবে দাবী করতে পারে'। (The Preaching of Islam- by Arnold Toynbee, P. 5-7)

'প্রাচ্যের ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী সরকার বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে নিপীড়ন ও সন্ত্রাসমূলক কোনো রূপ পরিগ্রহ করেনি। বর্বরতার অন্ধকার, চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির শৃংখলিত দুর্দশা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে কোনো চিরন্তনী সংগ্রাম প্রবণতা আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। পক্ষান্তরে এসবই ছিলো ইউরোপের গ্রীস ও রোমান সভ্যতার অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্য'। (Robert Briffault: The Making of Humanity, P. 113)

খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত সিরিয়ায় সেনাবাহিনী প্রেরণকালে প্রথম খলিফা সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তোমাদের হাত যেনো নারী ও শিশুর রক্তে রঞ্জিত না হয়। শত্রুপক্ষের বৃক্ষ বিনষ্ট করবে না, তাদের শস্য ক্ষেতে আগুন দিবে না, কোনো ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, গৃহপালিত পশুর ক্ষতি করবে না, তোমাদের খাদ্যের প্রয়োজনে তাদের পশু হত্যা করবে না, তাদের সাথে যদি চুক্তি হয় তাহলে সে চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের প্রতি দেয়া ওয়াদা যথাযথভাবে পালন করবে, তাদের উপাসনালয়ের কোনো ক্ষতি করবে না'। (Gibbon: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, P. 309-310)

ইতিহাস সাক্ষী, ইসলাম ও মুসলমানদের পরমত সহিষ্ণুতায় সন্তুষ্ট হয়ে অমুসলিমরা মুসলিম শাসনের বাইরে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলো। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর লিখেছেন, 'বিজিতদের প্রতি ইসলামের সহনশীলতা, উদারতা, সুবিচার ও সংহতির নীতি রোমের খৃষ্টান শাসকদের অসহিষ্ণুতা ও অত্যাচার-নির্যাতনের সম্পূর্ণ বিপরীত এক দৃষ্টান্ত। সম্রাট হেরাক্লিয়াসের অধীনে খৃষ্টান নাগরিকরা যে অধিকার ভোগ করতো, তার তুলনায় অনেক বেশী জাতীয় স্বাধীনতা সিরিয়ার খৃষ্টানরা মুসলিম শাসকদের অধীনে ভোগ করেছে এবং এ কারণেই তারা তাদের পূর্ব জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক ছিলো না'। (Wiliam Muir: The Caliphate its Rise, Decline and Fall, P. 128)

ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীদারগণ যতই চেষ্টা করুক না কেনো, ইসলাম এবং এর অনুসারীদের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস মসীলিপ্ত করতে পারবে না। দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য কিরণসম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। তুষার ধবল রাজহংসের শুভ্র দেহে যতোই পানির ছিটা দেয়া হোক, তা অবশ্য অবশ্যই ঝরে পড়বে।

যারা ইসলামকে সাম্প্রদায়িক এবং অসহিষ্ণু ভেবে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রে এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে বলে মনে করে এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের পক্ষে সোচ্চার, তাদের কাছে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা যে ধরণের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ পসন্দ করেন, সেই গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কতটা অসহনশীল তা কি কখনো খতিয়ে দেখেছেন? ভোগবাদী গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ যেসব দেশে ক্রিয়াশীল রয়েছে, সেসব দেশের শাসকবৃন্দ জাতিগত ব্যাপারে, ভিন্ন আদর্শ ও ভিন্ন মতের ব্যাপারে কতটা অসহনশীল তা কি কখনো লক্ষ্য করেছেন?

'ইউরোপের বুকে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বরদাস্ত করা হবে না' সাম্প্রদায়িক এ ঘৃণ্য ঘোষণাও এসেছে পশ্চিমা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী হিসেবে দাবীদার বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের কাছ থেকেই। 'শান্তি ও স্বস্তিতে বসবাস করতে হলে আমাদের সভ্যতা গ্রহণ করতে হবে' এ ঘোষণাও এসেছে পরমত ও আদর্শ অসহিষ্ণু আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের মুখ থেকে। মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র মক্কায় বোমা নিক্ষেপ করার পরামর্শও দিয়েছেন পরধর্ম অসহিষ্ণু পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী আমেরিকার একজন জাতীয় নেতা। মাত্র কিছুদিন পূর্বেও সাম্প্রদায়িকতার আগুনে জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হলো ফ্রান্সের মূলবান ধন-সম্পদ। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এতটাই অসহনশীল যে, মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রাচীন নিদর্শন, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা তারা বরদাস্ত করতে পারে না। নিজেরা পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়ে সারা দুনিয়ার ওপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে, কিন্তু মুসলিম কোনো রাষ্ট্র দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে ও আত্মরক্ষার জন্যে শান্তিপূর্ণভাবে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করবে, এটাও তারা সহ্য করতে পারে না। তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের আত্মরক্ষারও অধিকার নেই।

বাস্তবতার নিরিখে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ-২

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীদের এতটাই অসহিষ্ণু করে তুলেছে যে, তারা ভিন্ন কোনো আদর্শ ও সভ্যতা ক্ষণিকের জন্যেও সহ্য করতে নারাজ। এ কারণেই তারা সমরশক্তির বলে বলিয়ান হয়ে সাত সমুদ্রের ওপার থেকে ছুটে এসে মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্থান ও ইরাককে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করেছে। প্রাচীন সভ্যতার লালন ভূমি বাগদাদ নগরীকে মৃত্যুপুরীর রূপ দিয়েছে। পবিত্র মাস রমজানে এবং ঈদের দিনে ঈদের জামায়াতেও বোমা নিক্ষেপ ও গুলী চালিয়ে মুসলমানদের পাখির মতো হত্যা করে গায়ের জোরে তারা তাদের 'গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিষ্ঠার অভিযান চালাচ্ছে। বস্তুবাদী গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা কুকুর-বিড়ালের অধিকার সংরক্ষণে সদা সচেতন থাকলেও তাদেরই নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে মুসলমানের মরণ আর্তনাদ শোনার ক্ষেত্রে তাদের শ্রবণশক্তি বধির। নিজেরা গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারেন, কিন্তু মুসলিম নারীর হিজাব তারা সহ্য করতে পারেন না।

আমেরিকা- ইউরোপ তাদের নিজেদের দেশসমূহে বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকা অনাবাদী ও পরিত্যক্ত থাকলেও অসহিষ্ণুতার কারণেই ইয়াহুদীদের ধর্মীয় রাষ্ট্র 'ইসরাঈল' সেখানে প্রতিষ্ঠিত না করে মুসলমানদের উত্যক্ত করার লক্ষ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রের বিষ ফোঁড়া সৃষ্টি করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পরমত সহিষ্ণুতা যারা দেখতে পান তাদের প্রতি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী দেশসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিন। দেখুন, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হিন্দু দেবতা হনুমান, বানর আর ময়ুর পাখি হত্যা করা দূরে থাক, কষ্ট দেয়াও নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই ভারতেই মুসলমানদের কোরবানীর পশু গরু যবেহ্ স্থান বিশেষে নিষিদ্ধ এবং সারা দেশে আইনগতভাবে গরু যবেহ নিষিদ্ধের দাবী তোলা হচ্ছে। মাইকে আযান নিষিদ্ধ করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। কোরআন নিষিদ্ধ করার দাবী করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা এর অনুসারীদের এতোই অসহিষ্ণু করে তুলেছে যে, ভারতীয় নেতা বালথ্যাকারে হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলো, 'মুসলমানদের লাথি মেরে ভারত থেকে বের করে দিতে হবে'। গুজরাটে হাজার হাজার মুসলিম নিধন যজ্ঞের প্রধান হোতা নরেন্দ্র মোদীও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় নেতা। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দই বাবরী মসজিদ ধ্বংসের অনুকুল পরিবেশও সৃষ্টি করে দিয়েছিলো। ঈদের জামায়াতে শূকর ছেড়ে দিয়ে মুসলিম নিধন অভিযানও চালানো হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে।

শিখ ধর্মাবলম্বী দেহরক্ষীর হাতে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পরে নির্দোষ শিখ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যে নির্যাতন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে চালানো হয়েছে, তা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সকল ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে।

অসহিষ্ণুতা আর সাম্প্রদায়িকতা উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সারা দুনিয়ার সম্মুখে নিজের কুৎসিত অবয়ব আরেকবার উলঙ্গ করে দেখিয়েছে। ২৫ শে ডিসেম্বর ২০০৭, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বড়দিন। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যে বসবাসরত খৃষ্টান সম্প্রদায়ও তাদের সব থেকে বড় ধর্মীয় উৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষ্যে আনন্দে- উল্লাসে মেতে উঠেছিলো। হরিষে বিষাদ নেমে এলো। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বৃহৎ সম্প্রদায়ের লোকজন একযোগে কয়েকটি গীর্জায় হামলা চালিয়ে একজনকে হত্যা করলো, এতে গুরুত্বর আহত হলো ৩০ জন, খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থান ১৪ টি গীর্জায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে দিলো। (নয়া দিগন্ত, এএফপি, খালিজ টাইম, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ২০০৭)

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রবক্তাদের পরমত অসহিষ্ণুতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা যাক, ৯ই ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির কিউ ট্রেনে একদল উচ্ছৃঙ্খল তরুণ- তরুণী তাদের ধর্মীয় শ্লোগান 'মেরি ক্রিসমাস' বলে চিৎকার করছিলো। একই ট্রেনের যাত্রী ছিলো ওয়ালটার এডলার নামক একজন ইয়াহূদী ধর্মাবলম্বী যুবক। মেরি ক্রিসমাস শ্লোগান শুনে সেও তাদের ধর্মীয় শ্লোগন 'হ্যাপি হনুকা' বলে ধ্বনি দিয়েছিলো। সাথে সাথে খৃষ্টান তরুণ- তরুণীর দল 'যিশু খৃষ্টকে হত্যা করেছে ইয়াহূদীরাই' এ কথা বলে ইয়াহূদী যুবকের ওপর প্রবল আক্রোসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। উক্ত কম্পার্টমেন্টে বেশ কয়েকজন ইয়াহূদী যাত্রীও ছিলো। নিজেদের জ্জাতী ভাইকে রক্ষা না করে তারা নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলো। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লালনভূমি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নওয়াব পরিবারের সন্তান আমেরিকা প্রবাসী হাসান আসকারী- যার দেহের শিরা- উপশিরায় ধাবমান রয়েছে ইসলামী চেতনায় শানিত অসাম্প্রদায়িক মুসলিম রক্ত, তার পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা কি সম্ভব?

'মজলুমের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াও' অসাম্প্রদায়িক মহান ইসলামের এ শিক্ষা হাসান আসকারীর রক্তে প্রতিবাদের তরঙ্গ সৃষ্টি করলো। ভুলে গেলো সে, ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা:) কে নানা কৌশলে হত্যা করার অপচেষ্টা করেছে এবং খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে, তার মুসলিম ভাইবোন ফিলিস্তিনীদের দেশ ছাড়া করেছে, প্রত্যেক দিনই মুসলিম ভাইদের রক্তে ইয়াহূদীরা

হাত লাল করছে। সব কিছু ছাপিয়ে ইসলামের মহান শিক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে ইয়াহূদী যুবক ওয়ালটার এডলারকে রক্ষার জন্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো। নিজেও সে মারাত্মকভাবে আহত হলো খৃষ্টান তরুণ- তরুণীদের হাতে। অবশেষে পুলিশ মুমূর্ষ অবস্থায় ইয়াহূদী যুবক ও বাংলাদেশের হাসান আসকারীকে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার অগ্নিগর্ভ থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করলো।

আক্রমণের শিকার ইয়াহূদী যুবক ওয়ালটার এডলার গত ২১শে ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে নিউজ ওয়ার্ল্ডের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমি ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্ট্যাডি করেছি। তাতে ইসলাম ধর্মকে যারা সন্ত্রাস বা চরমপন্থা বলে অপবাদ দেয় তার কোনো সত্যতা খুঁজে পাইনি। আমি দেখেছি, ইসলাম হচ্ছে একান্তই মানবতার ধর্ম। বিশ্বাস ও আদর্শিকভাবে ইসলাম হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে কাছের ধর্ম। আর এখন হাসানের আচরণে সেটি বদ্ধমূল হয়েছে আমার বিশ্বাসে। বর্তমানে ইয়াহূদী- মুসলিম বিদ্বেষ হচ্ছে একান্তই রাজনৈতিক। ধর্মীয় কারণে এটি হচ্ছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এ জন্যে বিষয়টি রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে'।

নিউজ ওয়ার্ল্ডের সাথে সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের কৃতি সন্তান হাসান আসকারী বলেন, 'আমি যে ধর্মে বিশ্বাসী তা কখনো কাউকে হেয় বা অপমান করার নীতিতে বিশ্বাস করে না। ইসলাম বলেছে, কেউ অন্যায়ের শিকার হলে তাকে সাহায্য করতে। ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছে এবং এই শিক্ষাই আমাকে উজ্জীবিত করেছে অসহায় নির্যাতিত ওয়ালটার এডলারকে সাহায্য করতে'। (সূত্রঃ নিউজ ওয়ার্ল্ড, নিউইয়র্ক, নয়াদিগন্ত, ২৭শে ডিসেম্বর ২০০৭)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ সফরে এসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নসিহত খয়রাত করতে ভুলে না, কিন্তু নিজ দেশে যে সাম্প্রদায়িকতা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে তা তাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেনা। ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে দিনরাত কথা বলে যারা মুখে ফেনা তুলছে, হাসান আসকারীকে কি তারা সাম্প্রদায়িক বলবেন? কোন্ সে শিক্ষা যা হাসান আসকারীকে নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও একজন ইয়াহূদীকে সাহায্য করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিলো? সে পবিত্র আদর্শের নাম ইসলাম।

হাসান আসকারী সেই দেশের সন্তান, যে দেশে রোজা আর পূজা নির্বিঘ্নে একই সাথে চলে। মসজিদ, মন্দির আর গীর্জা পাশাপাশি অবস্থান করে এবং যে যার পদ্ধতিতে স্রষ্টার আরাধনা করে। যে দেশের মানুষ পরস্পরের ধর্মীয় আনন্দে অংশগ্রহণ করে, পরস্পরের শোক-দুঃখে পাশে এসে দাঁড়ায়। ক্রান্তি কালে কে কোন্ ধর্মের অনুসারী সেদিকে কেউ-ই দৃষ্টি দেয় না। প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকায় আলেম-ওলামা, মাশায়েখ, ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্বগণ মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সকলকেই সাধ্যানুযায়ী সাহায্য-সহযোগিতা করে। সাম্প্রদায়িকতার গন্ধও এদেরকে স্পর্শ করে না।

বাংলাদেশ, অগণিত শহীদের রক্ত বিধৌত এদেশের মাটি। এ মাটিতে ঘুমিয়ে রয়েছেন মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় ওলামা, অগণিত পীর- আওয়ালীয়া। ধর্মভীরু অসাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠী বুকে নিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে গর্বিত ভঙ্গিতে আপন অবয়ব উজ্জ্বল করে রেখেছে বাংলাদেশ। এই দেশ শুধু একজন হাসান আসকারীকে জন্ম দেয়নি, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের অসংখ্য হাসান আসকারী। সুতরাং যে দেশ, যে মাটি হাসান আসকারীর মতো মানবতাবাদী সন্তান জন্ম দিয়ে সারা দুনিয়ায় নিজের ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, সেই দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা আমদানী করে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার আগুন জ্বালানোর স্বপ্ন যারা দেখছে, তাদের সে স্বপ্ন এদেশের অসাম্প্রদায়িক জনতা বাস্তবায়িত হতে দিবে না ইন্‌শাআল্লাহ।

দেশের ঐ সকল বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিক, কলামিষ্ট– যারা মুসলিম নামের অধিকারী তাদের প্রতি অনুরোধ করছি, আপনারা বাংলাদেশের অহঙ্কার হাসান আসকারীর মতো মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে না পারলেও ইয়াহূদী যুবক ওয়ালটার এডলারের মতো ঐ মানসিকতা অন্তত সৃষ্টি করুন, যে মানসিকতা আপনাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জানা ও বোঝার আগ্রহ সৃষ্টি করবে। ওয়ালটার এডলার ইয়াহূদী যুবক হয়েও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম নামধারী ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও কলামিষ্টদের, তারা নানা মতবাদ- মতাদর্শ ভিত্তিক রচিত বিশালাকৃতির গ্রন্থ অধ্যয়নে অনেক সময় ব্যয় করলেও ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্যে সামান্য সময় ব্যয় করে ওয়ালটার এডলারের ছাত্র হবার যোগ্যতাও অর্জন করেনি। নিজ ধর্মের প্রতি মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবী, সুশীল ও কলামিষ্টদের বিদ্বেষ প্রসূত অবজ্ঞার এ দুঃখজনক দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোনো জাতীর মধ্যে আছে বলে বলে মনে হয় না।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ ও ভোগবাদী গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা আর সমাজতান্ত্রিক অসহিষ্ণুতা এতই প্রকট যে, এর অনুসারীরা ভিন্ন মত, আদর্শ ও ভিন্ন ধর্মীয় স্থান সহ্যই করতে পারে না। তুরস্কের কামাল পাশা টুপি, মুসলিম নারীর হিজাব, মসজিদ, আরবী ভাষায় আযান এমনকি 'আল্লাহু আকবার' শব্দটিও সহ্য করতে পারেননি। এসব কিছু নিষিদ্ধ করেও তিনি স্বস্তি পাননি, অগণিত মসজিদকে তিনি পানশালায় পরিণত করেছিলেন এবং অগণিত ভিন্ন মতাবলম্বীকে তিনি অত্যন্ত পৈশাচিক পদ্ধতিতে হত্যা করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক অসহনশীলতা এতটাই প্রকট ছিলো যে, সমাজতন্ত্রের পতনের পরে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ভিন্ন মতাবলম্বীদের অগণিত গণকবর এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতা; পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র আর রাশিয়ার সমাজতন্ত্র কতটা অসহনশীল, সাম্প্রদায়িক এবং পরমত অসহিষ্ণু তার লোমহর্ষক বর্ণনা রয়েছে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থসমূহে।

সুতরাং ইসলাম এবং এর অনুসারীদের অসহিষ্ণু আখ্যায় আখ্যায়িত করে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী যারা তুলছেন, তারাই সবথেকে বেশী অসহনশীল, সাম্প্রদায়িক এবং পরমত অসহিষ্ণু। এর বড় প্রমাণ, ধর্মবিদ্বেষী এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের দাবীদাররাই এদেশে হত্যা, গুম, জ্বালাও- পোড়াও, ভাংচুর ও গলাকাটা রাজনীতির প্রবক্তা। হিন্দুদের পূজা মণ্ডপে হামলা করে তারাই মূর্তি ভেঙেছে। 'বন্দুকের নল থেকে ক্ষমতা বেরিয়ে আসে' এ শ্লোগান একমাত্র তারাই সারা দেশের দেয়ালে দেয়ালে লিখেছে। দলীয় কোন্দলে নিজেরা মারামারি করে মরলেও হরতাল-অবরোধের নামে লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ, স্থাপনা ধ্বংস ও যান-বাহন ভাংচুর করে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করা ধর্মনিরপেক্ষ অসহিষ্ণুতার নিত্য-নৈমিত্তিক চিত্র। সুতরাং সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের জন্মদাতা কারা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'চোরের মা'র বড় গলা' এ কথা সবাই জানে।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের নীতিমালা অনুসারেই নাস্তিক ব্যতীত কারো পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা ধর্মনিরপেক্ষ হবার দাবী করেন এবং ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালন করেন বলে প্রচার করে থাকেন, তারা হয় ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সাথে জেনে বুঝে প্রহসন করেন অথবা দেশের ধর্মভীরু জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্যেই প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিমালা স্পষ্টই ঘোষণা করেছে, নাস্তিকতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না।

লক্ষাধিক নবী- রাসূলদের একজনও ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না, অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামের একজনও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী ছিলেন না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের সম্মানিত ওলামায়ে কেরামের নিকট পরিচিত অগণিত বিজ্ঞ ওলামা- মাশায়েখদের একজনও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গ্রহণ তো করেনই নি বরং এ মতবাদকে সুস্পষ্ট কুফ্‌রী মতবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

যারা ব্যক্তি জীবনে ধর্ম-কর্ম পালনে অভ্যস্ত নয়, ধর্মে বিশ্বাস করে না, পরকালে জবাবদীহীতার প্রতি আস্থা নেই, কবরের আযাব, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত-জাহান্নামকে কাল্পনিক বলে মনে করে এবং ধর্মকে 'আফিম' বলে, কেবলমাত্র তারাই দেশ ও রাষ্ট্রকে ধর্মমুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের কাছে ধর্মই হচ্ছে জঙ্গীবাদের মূল। পৃথিবীর যেসব দেশ ইসলামকে উপেক্ষা করে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে, সেসব দেশ এর বিষাক্ত ফলশ্রুতিতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও পরাজয় ব্যতীত আর কিছুই অর্জন করতে পারেনি।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমেই মানুষ চরিত্রবান হতে পারে। প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, মন্ত্রী ও এমপি থাকা অবস্থায় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যারা অসৎ উপার্জন করেননি, আমানতের খেয়ানত করেননি, যেসব সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষয়ত্রী, ব্যবসায়ী এবং আইন শৃংখলা ও প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নির্মোহ জীবন-যাপন করেছেন তা কেবলমাত্র তারা ধর্মকে বিশ্বাস করেন, আল্লাহকে ভয় করেন বলেই তাদের জন্য সততা-স্বচ্ছতায় সমৃদ্ধ জীবন-যাপন করা সম্ভব হয়েছে। এর বিপরীতে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশেরই নৈতিক স্খলন ঘটেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মহীনতা-১

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সমগ্র মুসলিম মিল্লাত ও মুসলিম দেশসমূহের জন্য চরম আত্মঘাতি। এ মতবাদের মূল চেতনা কোরআন-হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত, ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের পরিপন্থী। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মূলভিত্তি হলো বস্তুবাদ, এ মতবাদকে কেন্দ্র করেই ধর্মনিরপেক্ষতা আবর্তিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার স্পষ্ট অর্থ হলো, ইসলামকে উম্মাহ্‌র নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করে দেয়া, রাষ্ট্রকে ধর্মমুক্ত করা, ইসলামকে দেশের আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধ ও শাসন প্রভাবের স্থান থেকে বিদায় করে দেয়া। এ

মতবাদের অনুসারীদের মরণপন প্রতীজ্ঞা হচ্ছে যে কোনো মূল্যে ইসলামকে উটপাখী বানিয়ে রাখতে হবে। উটপাখী নামে উট কিন্তু উটের ন্যায় বোঝা বহনে সক্ষম নয়। এটি এমন একটি পাখী, যা উড়তেও সক্ষম নয়। সুতরাং ইসলামকে উটপাখীর মতো করে মসজিদ-মাদ্রাসা ও খানকার চার দেয়ালে বন্দী করে রাখতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً -

হে ঈমানদারেরা! তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরোপুরিভাবে প্রবেশ করো। (সূরা বাক্বারাহ-২০৮)

পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষদের দাবি, 'ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার' একে রাজনীতিতে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। তাদের বক্তব্য ও চিন্তা-চেতনা এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিজীবীদের লিখনীতে এটাই প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহর দেয়া বিধানের চাইতে উত্তম বিধান দিয়ে দেশ ও বিশ্ব পরিচালনায় পারঙ্গম। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন-

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ-

আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম আইনদাতা আর কে? (সূরা আল মায়িদা-৫০)

ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে চায়। জীবনের ক্ষুদ্র একটি অংশ আল্লাহর জন্যে তাও আবার ঐচ্ছিক, আর বৃহত্তর অংশে প্রবৃত্তির গোলামী এবং শাসক ও রাষ্ট্রের জন্য। ইসলামে বিশ্বাসী কোনো মুসলমানের জন্য এমন ধারণা পোষণ করা সুস্পষ্ট কুফ্‌রী। এ মতবাদের অনুসারীরা ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তেপান্তরের মাঠ দিয়ে লাগামহীন অশ্বে চড়ে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে ছুটে বেড়াতে চান। কারণ অসৎ উপার্জনে, নারীর সৌন্দর্য্য প্রদর্শনীতে, অশালীন চলা-ফেরায়, মদপানে, জুয়া খেলায়, ব্যভিচারী লীভ টুগেদারে, সমকামীতায়, সুদ-ঘুষ ও জুলুম-অত্যাচারের পথে ইসলামই সবথেকে বড় প্রতিবন্ধকতা। তাই জীবন-যৌবনকে কানায় কানায় ভোগ করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া ব্যতীত উপায় নেই।

বুঝে হোক না বুঝেই হোক বিশ্বের কয়েকটি দেশের বিভিন্ন ধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অন্ধ অনুসারী। অন্যান্য ধর্মে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার বিধি-বিধানের অনুপস্থিতি হেতু সে সকল ধর্মের

অনুসারীরা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসী হলে সেখানে আমাদের বলার তেমন কিছু থাকে না। কিন্তু একজন মুসলমান যখন নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করেন তখন তার প্রতি করুণা হয়। কারণ তিনি অনেক বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখলেও নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের এই ব্যর্থতার পেছনে দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত: তিনি এমন শিক্ষায় শিক্ষিত যেখানে তিনি ইসলাম শিক্ষার পরিবেশ পাননি। দ্বিতীয়ত: আমাদের আলেম সমাজের একটি অংশ তাদেরকে ইসলামের কালজয়ী আদর্শ বা ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা বোঝাতে সক্ষম হননি। অতএব এ ব্যর্থতার দায় থেকে আমাদের আলেম সমাজও মুক্ত নন।

ইসলামী মূল্যবোধের বিষয়টি কোনো সাধারণ ধর্মমত বা অস্পষ্ট এবং অপূর্ণাঙ্গ ধর্মবিশ্বাসের নাম নয়। ইসলাম হচ্ছে এক সার্বজনীন বিশ্বাসসম্মত পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শের নাম। যার মধ্যে রয়েছে বিশ্ব মানবতার ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণমূলক অভ্রান্ত দিক নির্দেশনা। মানব সভ্যতার বিকাশে এতে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, ব্যক্তি, পরিবার-সমাজ পরিচালনার নির্ভুল পদ্ধতি, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং নির্মূল পদ্ধতি, মানবাধিকার, নারী-পুরুষের সমঅধিকার, শিশু-কিশোরের অধিকার, মালিক-শ্রমিক ও মেহনতী জনতার অধিকার, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিসহ জীবন পরিচালনায় অভ্রান্ত বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত সকল মানুষের গ্রহণযোগ্য এক মহাপরিকল্পনা। সুতরাং আল্লাহ, রাসূল, কোরআন-হাদীস ও পরকালে বিশ্বাসী একজন মুসলমান কোনো অবস্থাতেই মানব রচিত চরম ক্ষতিকর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী হতে পারে না। এটি ইসলামের সাথে সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে চরম বিশ্বাস ঘাতকতা।

কারণ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মূল কথাই হলো, রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে ধর্ম সংযুক্ত থাকবে না, ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনোভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করা যাবে না। মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলাম মুক্ত শাসন, ইসলামকে ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। রাজনীতি, অর্থনীতি, তথা সকল কিছুকে ধর্মহীন তথা ইসলাম মুক্ত করা। ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্ববাসীর জন্য এক মারাত্মক ক্ষতিকর মতবাদ যা প্রত্যেক ধর্মের মানুষকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে অনীহা সৃষ্টি করে। এই মতবাদের প্রচার ও প্রসারের অর্থই মানবতার অকল্যাণ এবং ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতি। ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলিম ঐক্য এবং পারস্পরিক

সম্পর্কই শুধু বিনষ্ট করে না, বরং প্রত্যেক ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত হানে। এমনকি দেশের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। সুতরাং যে কোনো ধর্মাবলম্বীর পক্ষেই ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। অতএব ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া মানবতার কল্যাণকামী প্রত্যেকটি সচেতন মানুষের যেমন দায়িত্ব তেমনি প্রত্যেকটি মুসলমানের ঈমানের দাবী।

মুসলিম নামে পরিচিত বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও কবি-সাহিত্যিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ফ্রয়েড, মার্কস, হেগেল, প্লেটো, ডারউইন, কপার নিকাস, কেপলার, লেনিন, মাও সেতুঙ, হোচিমিন থেকে শুরু করে রাজা রামমোহন রায় বা করম চাঁদ গান্ধী পর্যন্ত যেভাবে পড়েছেন-জেনেছেন, তার শত ভাগের এক ভাগও আল্লাহ-রাসূল, কোরআন-হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্র সম্পর্কে পড়তে বা জানতে চেষ্টা করেননি। মুসলিম মিল্লাতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসও পড়েননি। পড়লেও নিরপেক্ষ ইতিহাস না পড়ে পাশ্চাত্য গবেষকদের পক্ষপাতিত্বমূলক গবেষণা পড়েছেন। ফলে নিরপেক্ষতাও যে একটি পক্ষ তা বুঝতে সক্ষম হননি। যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী তাঁরা নিঃসন্দেহে নিজেকে প্রতারিত করছেন। কারণ ধর্মে বিশ্বাসী কোনো মানুষ কখনোই ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হতে পারে না। 'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থই হচ্ছে পক্ষেও নয় বিপক্ষেও নয়।

ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গীতে মুসলমান তো দূরের কথা, অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীও ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করার অর্থ নিজের সাথেই নিজেই প্রতারণা করার শামিল। আমার এ কথার স্বপক্ষে বাস্তব কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন, একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ যখন পরনে ধুতী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে নামাবলী ও পৈতা জড়িয়ে, মাথায় টিকি, সিঁথিতে সিঁদুর ও হাতে শাখা পরেন, বার মাসে তের পূজা এবং তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাস করে প্রত্যেহ মন্দিরে গিয়ে দেবতার পদপাদ্যে অর্ঘ-নৈবদ্য নিবেদন করেন, তখন তিনি কি আর ধর্মনিরপেক্ষ রইলেন? তিনি তো ধর্মের পক্ষাবলম্বন করলেন।

একজন শিখ যখন গুরু নানকের অনুসারী হয়ে দাড়ি না কেটে মাথায় পাগড়ী পরেন এবং হাতে বালা ও কৃপাণ ধারণ করেন, গুরুদুয়ারায় গিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন তখন তো তিনি ধর্মের পক্ষেই থাকলেন। একজন বৌদ্ধ যখন গৌতম বুদ্ধের অহিংসা পরমধর্ম ও জীব হত্যা মহাপাপ নীতিতে বিশ্বাসী

হয়ে গেরুয়া বসন পরিধান করে আত্মা মহানির্বাণ লাভের জন্যে কৃচ্ছ্র-সাধন করেন, বোধিবৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞান করে প্যাগোডায় যান তিনিও তো ধর্মের পক্ষই অবলম্বন করলেন।

একজন খৃষ্টান যখন যিশুখৃষ্টকে তাদের ত্রাণকর্তা প্রভু বলে বিশ্বাস করেন, গলায় ক্রুশ ঝুলান, ত্রিত্ববাদ ও বাইবেলে বিশ্বাস করেন, মুখে যিশুর নাম উচ্চারণ করে প্রতি রবিবার গীর্জায় প্রার্থনা করেন, আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট যখন বাইবেল স্পর্শ করে প্রেসিডেন্টের শপথ নেন এবং তাদের প্রতিটি ডলারে যখন ছাপার অক্ষরে লেখা থাকে IN GOD WE TRUST তখন তারাও তো আর ধর্মনিরপেক্ষ রইলেন না, ধর্মের পক্ষাবলম্বনই করলেন।

একজন মুসলিম পুরুষ যখন মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি এবং লম্বা জামা পরেন, নামাজ-রোজা, হজ্জ ও উমরাহ্ পালন করেন, মুসলিম নারী যখন শালীন পোশাক তথা পর্দা করেন, হিজাব পরিধান করেন, আল্লাহ-রাসূল, কোরআন-হাদীস, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস করেন, তিনিও তো ধর্মের পক্ষেই অবস্থান নিলেন। এটাই যখন অটল বাস্তবতা, তাহলে 'ধর্মনিরপেক্ষ' রইলো কে? প্রকৃত বিষয় হচ্ছে ধর্মে বিশ্বাসী কোনো মানুষই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না।

মুসলিম হিসেবে বিষয়টি আরো একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালা ধর্মের ব্যাপারে কি বলছেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ–

নিশ্চয়ই জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)। (সূরা আলে ইমরাণ-১৯)

সূরা কাফিরুনে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে দিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন, তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) তোমাদের জন্য, আমাদের দ্বীন (ধর্ম) আমাদের জন্য'। এখানেও ধর্মের পক্ষের কথা। অর্থাৎ তোমরা যে ধর্মেরই অনুসারী হও ধর্মকে মিশ্রণ করা যাবে না, ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকা যাবে না, তোমরা তোমাদের ধর্মের পক্ষে থাকো আমরা আমাদের ধর্মের পক্ষে থাকি।

বিশেষ করে একজন মুসলমানের জন্য ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ভাবার এবং নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী বানানোর অধিকার থাকতে পারে না। এটা তার ঈমানের সাথে একেবারেই সাংঘর্ষিক। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যদি পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, পরধর্মের অধিকার, তাদের প্রতি উদারতা, সহিষ্ণুতা হয় তাহলে এর কোন্ বিষয়টি ইসলাম অমুসলিমদেরকে দেয়নি? নিজে গোলাম হয়ে প্রভুর আইনে নাক গলানো হচ্ছে কোন্ যুক্তিতে? ইসলামের নির্দেশ হলো–

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে অমুসলিমদের উপাসনালয় ভাংতে এবং তাদের উপাস্য দেবদেবীদের সম্পর্কে কটুক্তি করতে নিষেধ করেছেন।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচরণ করতেন। তাদের গীবত করা, স্বার্থহানী, অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ ও নষ্ট করা এবং তাদের প্রতি জুলুম করা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এর ব্যতিক্রম করা হলে নবী করীম (সাঃ) কিয়ামতের ময়দানে মজলুম অমুসলিমের পক্ষাবলম্বন করবেন বলে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। (হাদীস)

ইসলাম অমুসলিমদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে শুকর পালন ও মদ উৎপাদন, মদের ক্রয়-বিক্রয় ও তা খাওয়া-পান করায় কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি। এমনকি কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিমের মদ-শুকরের ক্ষতিসাধন করলে তার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামের নির্দেশ অনুসারে, অমুসলিমদের পারিবারিক কর্মকাণ্ড, তাদের বিয়ে-শাদী, পূজা-পার্বন, উপাসনালয় নির্মাণ, সংস্কার-সংরক্ষণে তাদের ধর্ম অনুযায়ী পালিত হবে তাতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে তাদের মৌলিক মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার একজন মুসলিম নাগরিকের মতোই সংরক্ষিত হবে।

উল্লেখিত কথাগুলোর একটিও আমার মন-মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। প্রমাণ হিসেবে দেখুন, ফাত্হুল বয়ান, ৪র্থ খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা, ফতহুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা, আল মাবসুত, ১৩শ খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা, শরহে সিয়ারুল কবীর, ৩য় খণ্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা, বাদায়ে আছ ছানায়ে, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা, দুররুল মোখতার, ৭ম খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা, কিতাবুল খারাজ, ৮২ পৃষ্ঠা।

অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি ইসলামের উদারতা, ঔদার্য্য, সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধাবোধ ও তাদের প্রতি ইসলাম প্রদেয় অধিকার সম্পর্কে পড়া-শোনা

থাকলে কোনো শিক্ষিত মুসলমান বা কোনো সচেতন অমুসলিমও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী হবার কোনো যুক্তি থাকে না। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীদের অধিকাংশই ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচারের শিকার। ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণেই তারা সাম্প্রদায়িকতা নির্মূলের নামে ইসলাম মুক্ত দেশ দেখতে চায়। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ যে মানবতার জন্যে চরম ক্ষতিকর এক অভিশাপমূলক মতবাদ, এ বিষয়টি তারা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি।

দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনাকর অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার জন্যই মহান আল্লাহ মানুষের জীবন বিধান হিসেবে পবিত্র কোরআন দান করে পরিপূর্ণভাবে কোরআনকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সত্য কথা বলা ও সৎ থাকার চেষ্টা করা হবে আর রাজনৈতিক জীবনে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ অনুসরণ করে মিথ্যা বলা ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়া হবে, জীবনকে এভাবে খণ্ডিত করার অবকাশ ইসলাম দেয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ–

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু কথা বিশ্বাস করবে, আর কিছু কথা করবে অবিশ্বাস? তোমাদের মধ্যে যারাই কোরআনের সাথে এরূপ আচরণ করবে দুনিয়ায় তাদেরকে দেয়া হবে লাঞ্ছনা ও অপমানের জীবন এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোরতম শাস্তি। (সূরা আল বাক্বারা-৮৫)

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ–

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। (সূরা নিসা-৫৯)

এ আনুগত্য শুধু নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাতেই নয় বরং মুসলিম জীবনের কোনো দিক ও বিভাগই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বাইরে চলার

কোনো মুসলমানেরই সুযোগ ও অধিকার নেই। দুনিয়ায় নবী-রাসূলগণের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিলো সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করা। এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) রাজনীতি করেছেন, রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাছাড়া তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাঁদের সাহাবায়ে কেরাম সকলেই রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় অবদান রেখেছেন। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণীত এক মহাসত্য।

মহান আল্লাহর প্রেরিত অগণিত পূতঃ পবিত্র নবীদের একজনও ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না, তাঁদের অসংখ্য সাহাবার একজনও এমনকি তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, মুহাদ্দেসীন, মুফাস্‌সিরীন, সালফে সালেহীনসহ সমগ্র বিশ্বের একজন হাক্কানী আলেম ও পীর-বুযর্গের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করতেন বা করেন।

তুরস্কে কামাল পাশা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সারা দেশে আযান নিষিদ্ধ ও আরবী অক্ষর উৎখাত করেছিলো, ফেজটুপি ও বোরকা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলো। কোরআন-হাদীসের প্রচার-প্রসার, শিক্ষা, চর্চা নিষিদ্ধ করে অগণিত আলেম-ওলামাকে হত্যা করেছিলো। তুরস্কে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, প্রকাশ্যে মদপান, জেনা-ব্যভিচার বৈধ করে নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিমজ্জিত করা হয়েছিলো।

তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে দেখতে নারাজ। সম্প্রতি তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী তায়েব এরদোগান পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল্লাহ গুলকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিলেন এবং নির্বাচনে নিশ্চিতভাবেই তিনি বিজয়ী হতেন বলে ধারণা করা হয়েছিলো। কিন্তু প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে সকল আয়োজনই ব্যর্থ করে দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা। কারণ আব্দুল্লাহ গুলের সবথেকে বড় অপরাধ (?) তাঁর স্ত্রী মাথায় স্কার্ফ পরিধান করেন। আর এ কারণেই ধর্ম বিদ্বেষী ধর্মনিরপেক্ষরা তুরস্কে সৃষ্টি করেছিলো ভয়াবহ এক রাজনৈতিক সঙ্কট।

অতীতে ধর্মনিরপেক্ষ দল শাসন ক্ষমতায় থাকাকালে যে উন্নতি করতে পারেনি আব্দুল্লাহ গুলের দল জাস্টিস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হবার পরে তুরস্ককে সবথেকে বেশী উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়েছে। অগ্রগতি ও উন্নতির এই চিত্র ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোর সমর্থক পশ্চিমা

দেশগুলোই তুলে ধরেছে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ডাচ সদস্য হেসে লাজেনজিক বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ গুলের দল তুরস্কের আধুনিকায়নের জন্য এত বেশী কিছু করেছে, যা কিনা পূর্বের সবগুলো ধর্মনিরপেক্ষ দল করতে ব্যর্থ হয়েছে'। তুরস্কে এখন পর্যন্ত মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ ব্যবহার নিষিদ্ধ। ২০০২ সালে আব্দুল্লাহ গুলের দল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তারা বিজয়ী হলে মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিবে। নির্বাচনে বিজয়ী হয়েও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেননি, এমনকি ব্যভিচার নিষিদ্ধ করে যে আইন তারা করেছিলো পরবর্তীতে সে আইনও তারা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

এরপরেও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা আব্দুল্লাহ গুলকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দেয়া মেনে নিতে পারেনি। তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তাঁর স্ত্রী তুরস্কের ফার্স্ট লেডি হয়ে রাষ্ট্র প্রধানের বাসস্থান আঙ্কারার কাঙ্কায়া প্রাসাদে থেকে মাথায় স্কার্ফ পরে বিদেশী অতিথিদের সামনে আসবেন, এটা ধর্মনিরপেক্ষরা কল্পনা করতেও নারাজ। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষদের দাবী অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ 'যার যার ধর্ম পালনের অধিকার' তাদের এ দাবী অসত্য এবং স্পষ্ট প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মহীনতা-২

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে আওয়ামী লীগ প্রতিবেশী দেশের প্রভাবে এবং দেশীয় বা নিজ দলীয় নাস্তিকদের পরামর্শে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়ে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সংযোজন করেছিলো। অথচ আওয়ামী লীগের ৬ দফায় ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উল্লেখ ছিলো না। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণেও এ কথা ছিলো না যে, দেশ স্বাধীন হলে এ দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই জানা রয়েছে যে, মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিলো পাকিস্তানের নির্মম নির্যাতন, শোষণ নিপীড়ন ও পৈশাচিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে অবশ্যই নয়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরে ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী বাম-রামপন্থীরা বলা শুরু করলো মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই নাকি ছিলো ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা। যে কারণে তারা সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখার প্রয়োজন মনে করেনি, তারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে

কোরআনের বাণী 'রাব্বি যিদ্নী ই'লমা অর্থাৎ হে প্রভু, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন' বাক্যটি বাদ দিয়ে শিক্ষাবোর্ডের সার্টিফিকেট থেকে 'ইকরা বিসমে রাব্বিকাল্লাযি খালাক্ব অর্থাৎ পড়ো, তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' কোরআনের এই আয়াতটিও বাদ দিয়েছিলো। কাজী নজরুল ইসলাম কলেজের নাম থেকেও 'ইসলাম' শব্দ বাদ দিয়ে জাতীয় কবির নামকে খণ্ডিত করে কাজী নজরুল কলেজ রাখা হয়। ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে 'ইসলামিক' শব্দ বাদ দিয়ে কলেজটির ইসলামী চরিত্রই ধ্বংস করেছিলো। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিলো। এভাবে দেশের অসংখ্য শিক্ষা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে 'ইসলাম ও মুসলিম' শব্দ মুছে দিয়েছিলো।

১৮/৫/০৭ তারিখে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ড এলাকায় চন্দ্রনাথ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার নিজ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বিভৎসতা ও গুজরাট-আহমদাবাদে মুসলিম নিধনের দগদগে ক্ষতের কথা ভুলে গিয়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ভারতের মতো বাংলাদেশ একটি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলে এখানে গনতন্ত্র শক্তিশালী হবে'। প্রকৃত সত্য হলো, ভারত ইতোপূর্বে কখনো ধর্মনিরপেক্ষ ছিলো না এবং এখনো নেই, সাম্প্রদায়িক দুষ্টক্ষতে ভারতের মন-মানসিকতা আচ্ছন্ন। বাংলাদেশের নাগরিকগণ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করে না বলেই এখানে সকল ধর্মের অনুসারীগণ পরস্পরে আত্মীয়সুলভ সম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস করছে এবং মন্দির-মসজিদ পাশাপাশি অবস্থান করছে। ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দিয়েছে অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রতি চরম ঘৃণা। আর এ কারণেই মুসলমানগণ ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল। বাংলাদেশের মুসলমানগণ ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা বহন করে না বলেই সারা দুনিয়ায় এদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের বদ্ধমূল ধারণা, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ধর্মকে রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার দিলে ধর্মীয় সংখ্যা লঘুরা নির্যাতিত হবে অথবা তারা নাগরিক সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এটি তাদের সম্পূর্ণ অলীক ধারণা। কারণ, ইসলাম কোনো সাম্প্রদায়িক জীবন বিধান নয়, এটি সার্বজনীন– শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান। পবিত্র কোরআন যাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তিনি শুধু বিশেষ

জনগোষ্ঠীর নবী নন, তিনি বিশ্বনবী। তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন–

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا–

হে নবী! আপনি বলুন, হে মানব সকল! আল্লাহর পক্ষ হতে আমি তোমাদের সকলের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ-১৫৮)

তবে এ কথা স্মরণে রেখে ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হবে যে, ইসলামী শাসন ও মুসলিম শাসনের মধ্যে শত যোজন ব্যবধান রয়েছে। ইতিহাসের অটল বাস্তবতা এটাই যে, ইসলামী শাসনামলে একজন অমুসলিমও নির্যাতিত হওয়ার প্রমাণ নেই বরং মুসলিমদের অনুরূপ সকল নাগরিক অধিকার ভোগ করেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত হলে শুধু মুসলমানরা উপকৃত হবে আর ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা হবে নির্যাতিত, এ চিন্তা ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, মূর্খ অথবা জ্ঞানপাপীদের। ঘুমন্ত মানুষকে ডেকে সচেতন করা খুবই সহজ, কিন্তু যারা জেগে ঘুমায় তাদেরকে জাগাবার সাধ্যি কার? ইসলামী অনুশাসনে রাষ্ট্র পরিচালিত হলে অমুসলিমদের মুসলমান হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, নিজ ধর্মে অবিচল থেকেই সুখী-সমৃদ্ধ ও নিরাপত্তাপূর্ণ জীবন-যাপনে ধন্য হবেন তাঁরা।

জীবনের সাথে সকল আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর আমরা পক্ষাবলম্বন করি, আর ধর্ম তাদের কাছে এমনই অনাবশ্যকীয় বিষয় যে, শুধু এই একটি ব্যাপারেই নিরপেক্ষ থাকতে চায় ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা। মুসলিম দেশসমূহের একশ্রেণীর স্বনামধন্য ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, কলামিষ্ট ও কবি-সাহিত্যিক যারা ইসলামকে উগ্র জঙ্গীবাদ আর মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন, তাঁরা নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করেন না, তাদের লেখা পাঠ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁরা পক্ষপাত দুষ্ট। ইতিহাসে দেখা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানরা দীর্ঘ আটশত বছর শাসন করেছে। মুসলমানরা যদি সাম্প্রদায়িক হতো তাহলে সমগ্র ভারত বর্ষে মন্দির, প্যাগোডা, গীর্জা, গুরুদুয়ারা, বৌদ্ধাশ্রমসহ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সকল উপাসনালয়সমূহ মসজিদে রূপান্তরিত হওয়া স্বাভাবিক ছিলো, আর অমুসলিম সংখ্যালঘুরা বিলুপ্ত প্রজাতিতে পরিণত হতে পারতো। কিন্তু বাস্তবতা সাক্ষী দিচ্ছে এমনটি হয়নি। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা থেকে মরক্কোর রাবাত পর্যন্ত এবং স্পেন, পর্তুগালসহ সমগ্র ফ্রান্সের ৫০% এর বিশাল ভূ-ভাগ সাড়ে সাতশত বছর মুসলমানরা শাসন করেছে। মিসরসহ মধ্যপ্রাচ্যে অগণিত খৃষ্টান

বসবাস করছে, অসংখ্য গীর্জা মাথা উঁচু করে মুসলিম দেশে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। ইসলাম সাম্প্রদায়িক হলে মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যে একজন খৃষ্টানেরও তো অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। এসব দেশে মুসলমানরা কি অমুসলিমদের ওপর নির্যাতন করেছে বা তাদের নাগরিক ও ধর্ম পালনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে? ইতিহাসে এর একটি দৃষ্টান্তও কি ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা দেখাতে পারবেন?

বরং প্রকৃত ইতিহাস তো এই যে, বিশ্বে সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেই অমুসলিম সংখ্যা লঘুরা ধর্ম-কর্ম পালনে সর্বাধিক নিরাপদ ও সুবিধা ভোগী। এটাই ইসলাম ও মুসলমানদের স্বর্ণালী ইতিহাস যা অন্যদের নেই। ইসলাম ও মুসলিম শাসনের অধীনে অমুসলিমদের সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে অমুসলিম ঐতিহাসিকগণও প্রশংসা না করে পারেননি। বাংলাদেশে মুসলিম দাবিদার যে সকল নেতা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, মনে হয় তারা ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ বুঝতে ভুল করেছেন এবং একজন মুসলিম হিসেবে পরধর্ম সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী জানার চেষ্টা করেননি। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ অনুসারে ধর্মের শিক্ষা, প্রচার ও প্রসার বন্ধ করে দিয়ে ধর্মকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ করার অর্থই ধর্মকে উচ্ছেদ করা। ধর্মের প্রভাবই যদি সমাজ জীবনে ক্রিয়াশীল না থাকে, তাহলে মানুষ কি শুধু আইন ও শাস্তির ভয়ে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতী ও নৈতিকতা বিরোধী এবং অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে?

ধর্মের প্রভাব মুক্ত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ প্রকাশ্যে মদপান, লিভ টুগেদার ও জেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হোক এটা কি কারো জন্যে কাম্য হতে পারে? নারী সমাজ শালীন পোশাক পরিত্যাগ করে অর্ধোলঙ্গ বা সংক্ষিপ্ত পোশাকে চলাফেরা করুক এটা কি কারো কাম্য হতে পারে? ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী সন্তান-সন্ততি পিতামাতার প্রতি মমতার দৃষ্টি না দিয়ে তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে অসহায় অবস্থায় ফেলে বয় বা গার্ল ফ্রেণ্ড-এর সান্নিধ্যে বিভোর থাকুক এটাও কি কারো কাম্য হতে পারে? মুসলিম নামে পরিচিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীগণও এমন যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা মেনে নিবেন না। এই মতবাদ মানুষকে পৃথিবীতে আদর্শহীনতা, চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনাকর অবস্থার দিকে নিক্ষেপ করে এবং এটি একটি প্রতারণামূলক মতবাদ, যা মানুষকে যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে।

ভারতের যেসব রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এদেশে এসে অপ্রাসঙ্গিকভাবে হলেও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে এদেশের রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় সংযোজনের উপদেশ দেন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তারা কি প্রকৃতই ধর্মনিরপেক্ষ– না ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নির্মূল করে নিজেদের ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতি মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দিতে চান?

ভারত তাদের রাষ্ট্রীয় ভবনের নামকরণ করেছে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত ত্রিমূর্তি ভবন, যা কিছু অস্ত্র আবিষ্কার করছে সেগুলোর নামকরণও ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই করছে, ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই জাতীয় সংগীত রচনা করেছে, জাতীয় পতাকাতেও রয়েছে ধর্মীয় চিহ্ন অশোক চক্র, রাষ্ট্রীয় পুরস্কারসমূহের নামকরণও করেছে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনোমহন সিং তাঁর ধর্মীয় প্রতীক পাগড়ী ব্যবহার করেন এবং মুখে দাড়িও রেখেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার ভারতের অধিকাংশ নেতা নিয়মিত পূজা-পার্বন করে কপালে তিলক ব্যবহার, ধর্মীয় রীতিতে দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানান এবং ধর্মীয় লেবাস পরিধান করেন। রাখি বন্ধন পালন করেন ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে ধর্মীয় নীতি অনুযায়ীই উদ্বোধন করেন। বিয়েও করেন ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী। বাংলাদেশের দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও তারা তাদের ধর্মীয় রীতিতেই তিলক-চন্দন পরিয়ে 'দেশীকোত্তম' ডিগ্রী দিয়েছিলো।

বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা ভারতের অমিতাভ বচ্চন জ্যোতিষীদের গণনা অনুযায়ী তাঁর পুত্র অভিষেক বচ্চনের জন্য নির্বাচিত পাত্রী অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রায়ের নিয়তি থেকে অমঙ্গল দূর করার জন্যে ধর্মীয় নির্দেশ অনুসরণ করে প্রথমে তাকে বৃক্ষের সাথে বিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে নিজের সন্তানের সাথে বিয়ে দেন। মৃত্যুর পরে তাদেরকে ধর্মীয় রীতিতেই সৎকার করা হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সূচনা দেবদেবীর বন্দনা দিয়েই শুরু করা হয়, ভারতের রাষ্ট্রীয় দলীল-দস্তাবেজ, চিঠি-পত্রে দেবতা ব্রহ্মার প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের ধর্মকে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং শুধুমাত্র ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার উপদেশ দেন।

ইউরোপ-আমেরিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, তারা তাদের মুদ্রার ওপর লিখেছে 'আমরা গড-এ বিশ্বাসী' এবং আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাইবেল স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করেন। বিয়ের ক্ষেত্রেও তারা ধর্মীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে গীর্জায় গিয়ে ধর্মীয় রীতিতেই বিয়ে করেন

এবং মৃত্যুর পরেও ধর্মীয় রীতিতেই সৎকার করেন। নিজেদের ধর্ম এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কেউ যেনো কটুক্তি করতে না পারে এ জন্য তারা ব্লাসফেমী আইন বলবৎ করেছে। অথচ তারাই চরম সাম্প্রদায়িকতায় উদ্দিপ্ত হয়ে ইউরোপের বুকে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বরদাস্ত করা হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাদের দেশের পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমে, কবিতা-সাহিত্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় লেখা হচ্ছে, নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি ব্যঙ্গাত্মক লেখা ও কার্টুন ছাপা হচ্ছে। পবিত্র কোরআন, হাদীস, নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে যত বেশী আপত্তিকর কথা লিখতে পারে, তাকে তারা ততবেশী সম্মান-মর্যাদা দিয়ে 'নাইট' উপাধিসহ নানা ধরণের পুরস্কারের মাধ্যমে তার জন্যে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয় রচনা করে। গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে অফিস বা শিক্ষাঙ্গনে আসায় বাধা না থাকলেও মুসলিম মেয়েদের জন্যে হিজাব পরিধান করে অফিস বা শিক্ষাঙ্গনে আসতে বাধার সৃষ্টি করে। কোনো মুসলমান পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হবার পরে সে কোরআন স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতে চাইলেও বাধার সৃষ্টি করে। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে যারা জনগণের ঘৃণা কুড়ায়, তাদেরকে তারা নিজের দেশে সসম্মানে স্থান দিয়ে পুরস্কৃত করে। বাংলাদেশের একজন নাস্তিক ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী নারীবাদী লেখিকার পক্ষ নিয়েও খোদ আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন সাফাই পেশ করেছিলেন।

কেউ যদি হিন্দু বা খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতো এবং যা খুশী তাই লিখতো, তাহলে ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকা কি উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়ে জামাই আদরে রেখে নানা পুরস্কারে ভূষিত করে নাইট উপাধি দিয়ে তার জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো? এটাই হলো তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নমুনা। মুসলমানরা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করার চেষ্টা করলেই তারা একে মৌলবাদী আর সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করছে। আসলে তারা নিজেদের বস্তুবাদী ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক হলেও ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে নানা কৌশল অবলম্বন করে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার উপদেশ দেন। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ দিয়ে ভারত তাদের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা দিতে পারেনি– সে ইতিহাস বড়ই কলঙ্কিত, লোমহর্ষক এবং চরম অমানবিক যা বর্ণনাতীত। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খৃষ্টান ও উপজাতী সম্প্রদায় মিলেমিশে সুখে শান্তিতে যার যার ধর্ম সে সে নির্বিঘ্নে পালন করছে। এই

সুখময় পরিবেশ যাদেরকে স্বস্তি দিচ্ছে না এবং ইসলামের নাম শুনলে যাদের গা জ্বালা করে, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের পক্ষে তারাই তৎপর।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রবক্তারা মুখরোচক কথা বলে থাকে, 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার'। এ কথার আড়ালেও তারা লুকিয়ে রেখেছে তাদের সেই শানিত অস্ত্র, যা দিয়ে তারা ধর্মের শেকড় কাটায় সচেষ্ট। অর্থাৎ ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং রাষ্ট্র যেহেতু সকলের এবং সকলেই রাষ্ট্রের নাগরিক, সেহেতু রাষ্ট্র থাকবে ধর্মনিরপেক্ষ। অর্থাৎ ধর্মকে ব্যক্তির ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ও ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করে একে নিঃশেষ করে দেয়াই তাদের মূল লক্ষ্য। সাম্প্রতিককালে এরা আরেকটি মুখরোচক কথা প্রচার করছে, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। অর্থাৎ সকল ধর্মের লোকজন সকল ধর্মের উৎসবে যোগ দিতে পারবে, এতে কেউ দ্বিধাবোধ করবে না। ধর্মনিরপেক্ষদের পক্ষে হিন্দুদের পূজা পার্বনে যোগ দিয়ে মূর্তির সম্মুখে নারী পুরুষ একত্রিত হয়ে কারণসুধা পান করে প্রজ্জ্বলিত ধুপের পাত্র হাতে নৃত্য করা সম্ভব, পাঁঠা বলী দিয়ে তার মাংস ভক্ষণও সম্ভব, নারী-পুরুষ একে অপরের মুখমণ্ডলে সিঁদুর মাখিয়ে দেয়াও সম্ভব, দেয়ালী পূজায় নারী পুরুষ একই সাথে পরস্পরকে রং মাখিয়ে নৃত্য করাও সম্ভব, রাখী উৎসবে রাখী ধারণ করাও সম্ভব। কপালে চন্দন তিলক ধারণ করে রাধা কৃষ্ণের কীর্তন উৎসবে যোগ দেয়াও সম্ভব। লালন উৎসবে অংশগ্রহণ করে জটাধারীদের সাথে গঞ্জিকা সেবন করাও সম্ভব। কুম্ভ মেলায় যোগ দিয়ে গঞ্জিকা সেবন করে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গঙ্গাস্নানও সম্ভব, শীবের পূজায় গঞ্জিকা সেবন ও কালী পূজায় মদপানও সম্ভব, খৃষ্টানদের বড়দিনের উৎসবে যোগ দিয়ে শুকরের মাংস ভক্ষণ করাও সম্ভব।

মুসলিম দাবিদার ধর্মনিরপেক্ষরা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে 'দুর্গা দেবীর আগমনে ফসলে ফলন ভালো হয়, তা নিজ চোখেই দেখেন' বলে মন্তব্য করে থাকে। বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গৌতম বুদ্ধের অহিংস নীতি অনুসরণের উপদেশ দিয়ে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষদের স্বভাব-চরিত্রে যেহেতু ধর্মীয় কোনো বাঁধন নেই, তারা ধর্মীয় বন্ধনমুক্ত জীবন যাপন করে, সেহেতু তাদের পক্ষে যে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দ ফূর্তি করা সম্ভব। প্রকৃত মুসলিমের পক্ষে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা, কোনোটিই সম্ভব নয়। ধর্মনিরপেক্ষদের পক্ষে সম্ভব নয় শুধু পবিত্র কোরআন হাদীসের তাফসীর মাহফিলে যোগ দিয়ে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা। বরং ইসলামী জ্ঞানচর্চা কিভাবে বন্ধ করা যায় সে চেষ্টায় ধর্মনিরপেক্ষরা সর্বক্ষণ তাদের চিন্তাশক্তি ব্যয় করে।

পৃথিবীর দেশে দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অস্তিত্ব সগৌরবে বিরাজমান। রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি মাত্রই এ কথা জানেন যে, দুনিয়ার নানা দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সচল রয়েছে এবং এ বিষয়টি নিয়ে সেসব দেশে কারো মাথা ব্যথা নেই। ভারতে ধর্মভিত্তিক দল বিজেপি পার্লামেন্টে ক্ষমতায় ছিলো বর্তমানে গুজরাটে ক্ষমতাসীন। শীব সেনা, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ এবং অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় দল সেখানে সক্রিয় রয়েছে। সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র নেপালই ঘোষিতভাবে ২০০৬ সালের মে মাসের ১৮ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত ছিলো হিন্দু রাষ্ট। সেখানে আইনগতভাবে গরুকে জাতীয় পশু হিসেবে ঘোষণা করে গরু জবেহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নেপালে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করাও রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট, শ্রীলঙ্কায় জামায়াতে ইসলামী, ভারতে জামায়াতে ইসলামী ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী, জর্ডানে মুসলিম ব্রাদার হুড, মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুড, ইন্দোনেশিয়ায় দি মুসলিম স্কলার্স পার্টি, ফিলিস্তিনে হামাস, মালয়েশিয়ায় দি প্যান মালয়েশিয়া ইসলামিক পার্টি, লেবাননে হিয্বুলাহ, সুদানে ইসলামিক ফ্রন্ট এবং দি উম্মাহ্ পার্টি, আফগানিস্থানে হেজবে ইসলামী, বাহরাইন ও ইয়েমেনে আল ইসলাহ্ পার্টি, মরক্কতে জাস্টিস এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি, তিউনিশিয়ায় আন্ নাহ্দাহ্ পার্টি, মালদ্বীপে আদালত পার্টি। তুরস্কে জাস্টিস এণ্ড ডেভলেপমেন্ট পার্টি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছে ১২টি খৃষ্ট ধর্মভিত্তিক দল। এর মধ্যে নিউ সাউথ ডয়েলসন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বেশ তৎপর। অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে এ দলের সদস্যও রয়েছে এবং এই দলের নেতা ফ্রেডনিল অস্ট্রেলিয়ায় মুসলমানদের আগমন নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী জানিয়েছেন। ধর্মহীন সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবাতেও রয়েছে ধর্মভিত্তিক দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। খোদ আমেরিকাতে খৃষ্টধর্ম পুনর্জাগরণের শোগান দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন।

বিগত অনেক বছর ব্যাপী বৃহত্তম দল হিসেবে পরিচিত জামার্নীর বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নাম ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং চ্যান্সেলর এ্যান্জেলা মার্কেলের নেতৃত্বাধীন সহযোগী আরেকটি দলের নাম ক্রিশ্চিয়ান

সোসালিষ্ট পার্টি। এ দল দু'টো অনেক অঙ্গরাজ্য শাসন করেছে, কেউ-ই ধর্মভিত্তিক এসব দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী তুলেছে বলে শোনা যায়নি। নেদারল্যাণ্ডে ক্ষমতায় রয়েছে চার দলের কোয়ালিশন সরকার। এর বৃহত্তম দলটির নাম ডাচ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং কোয়ালিশন সরকারের শরীক আরেকটি ধর্মভিত্তিক দলের নাম ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন। এসব দলের মূল আদর্শ খৃষ্টবাদ এবং দলের সদস্যদের মূলনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'বাইবেলই একজন সদস্যের অনুপ্রেরণার উৎস'। ধর্মভিত্তিক দলসমূহের কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় এসেই নেদারল্যাণ্ড থেকে ২৬ হাজার মুসলিম অভিবাসীকে বহিষ্কার করে নিজ ধর্ম ও দলীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে।

সুইজারল্যাণ্ডে ধর্মভিত্তিক ক্রিশ্চিয়ান পিপলস পার্টি বহু পুরনো রাজনৈতিক দল, এ দলটি গঠিত হয়েছিলো ১৯১২ সনে এবং তারা বর্তমানে কোয়ালিশন সরকারের শরীক দল। এ দলটি ২০০৩ সালে ১৫ শতাংশ, ২০০৫ সালে ২০.৭ শতাংশ এবং ২০০৭ সালে ১৪.৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিলো। সুইজারল্যাণ্ডে আরো দু'টো দল সক্রিয় রয়েছে, যাদের মূল আদর্শই হলো খৃষ্টবাদ প্রতিষ্ঠা করা। এ দুটো দলের নাম ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল পার্টি ও ইভানজোলিক পিপলস পার্টি।

ইতালী ইউরোপের অন্যতম সমৃদ্ধশালী ধনী দেশ এবং এ দেশটি জি-৮ এর সদস্যভুক্ত। এদেশের ধর্মভিত্তিক দলের নাম ক্রিশ্চিয়ান ইউনিয়ন এবং পার্লামেন্টে এ দলের ৩০ জন সদস্য রয়েছে। অষ্ট্রিয়ার খৃষ্টধর্মীয় গোঁড়া মৌলবাদী নেতা মেয়র কার্ল লুগার খৃষ্টের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৮৯৩ সালে ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল পার্টি গঠন করেন। ১৯৪৫ সালে অষ্ট্রিয়া স্বাধীন হলে দলের নাম পরিবর্তন করে অষ্ট্রিয়ান পিপলস পার্টি রাখা হয়। এ দলটি আরেকটি ধর্মভিত্তিক দল অষ্ট্রিয়ান ফ্রিডম পার্টির সাথে ২০০০ সালে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছিলো। ২০০২ সালে খৃষ্ট ধর্মীয় শ্লোগানের ওপর নির্ভর করে উক্ত দলটি বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে এককভাবে সরকার গঠন করে।

কানাডার কুইবেক রাজ্যে ২০০০ সালে রোমান ক্যাথলিকদের সহযোগিতায় গঠিত হয়েছে ধর্মভিত্তিক দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে ধর্মভিত্তিক দল রয়েছে বলিভিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, পানামা, রোমানিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, সার্বিয়া, সিরিয়া, এস্তোনিয়া, লেবানন, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, হাইতি, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ অন্যান্য দেশে।

ইউরোপ আমেরিকাসহ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মভিত্তিক দল সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। যুক্তরাজ্যে Monarch is the head of the church. সেই তিনিই Supreme defender of protestant faith. যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সাধ থাকার পরও Protestant faith ত্যাগ করে Catholic faith গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি প্রধান মন্ত্রীত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করার পর এখন Catholic faith মতাদর্শে ফিরেছেন। ব্রিটেনের রাণী এলিজাবেথ সেখানকার বৃহত্তম গীর্জা এ্যাংলিকান চার্চের প্রধান। ব্রিটিশ লর্ড সভার ২৫টি আসন খৃষ্টান ধর্ম যাজকদের জন্য সংরক্ষিত। স্কটল্যাণ্ডে স্কটিশ ক্রিশ্চিয়ান পার্টি নামক ধর্মভিত্তিক দলটি রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ তৎপর। এ দলটি ২০০৪ সালে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে স্কটল্যাণ্ড থেকে অংশগ্রহণ করে ১.৮ শতাংশ ভোটও অর্জন করেছিলো। আধুনিক বিশ্ব যে যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ করলো, সেই যুক্তরাজ্যেই যখন এই অবস্থা, তখন ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কি আর কিছু অবশিষ্ট রইলো? কবি সম্রাট মহাকবি আলামা ইকবাল (রাহঃ) বলেছেন–

কওম মাযহাবসে হ্যায়
মাযহাব জো নেহী তুম ভী নেহী,
যায্‌বে বাহাম জো নেহী
মাহফিলে আন্‌জুম ভী নেহী।
কাব্যানুবাদ : ধর্মতে হয় জাতির গঠন
ধর্ম নাই তো তুমিও নেই,
নাই কো যদি মাধ্যাকর্ষণ
গ্রহ সূর্য্য ভূমিও নেই।

বিশ্বমানবতার নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ধর্মনিরপেক্ষদের প্রচারণা অনুযায়ী শুধুমাত্র একজন ধর্মীয় নেতা অবশ্যই নন, তিনিই ঐতিহাসিক যুগে সর্বপ্রথম কল্যাণ রাষ্ট্রের সফল প্রতিষ্ঠাতা। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে তাঁকে বিশ্বনবী ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য আল্লাহর করুণার মূর্ত প্রতীক বলা হয়েছে, তাঁর আনীত ও ঘোষিত সকল বিষয়ের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। জীবনে চলার সকল দিক ও বিভাগে কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেই 'আদর্শ' হিসেবে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলিম হিসেবে দাবিদার প্রত্যেককেই এ কথায় ঈমান রাখতে হবে যে, রাসূল (সাঃ) শুধুমাত্র নামাজের নেতৃত্বই দেননি। তিনি ব্যক্তি, পরিবার,

সমাজ, রাষ্ট্র, যুদ্ধ-সন্ধি, আন্দোলন-সংগ্রাম, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চুক্তি-নিরাপত্তা, অর্থ-সম্পদ, আইন-বিচার ও আমানত রক্ষায় তথা জীবন পরিচালনার সকল অঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর এসব ক্ষেত্রে তাঁকে নেতা মেনে তাঁর অনুসৃত পথ অনুসরণ করা মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য দৈনন্দিন জীবনে ফরজ দায়িত্ব। আলাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا-

(আল্লাহর) রাসূল তোমাদের যা কিছু (অনুমতি) দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং তিনি যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা আল হাশর: ৭)

হযরত মুহাম্মাদ (সা:) শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতা নন, তিনি সর্বকালের সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং সর্বশেষ নবী। সমগ্র জীবনে তিনি পবিত্র মুখে 'অসত্য' একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। অন্যের আমানত খেয়ানত করেননি, হক নষ্ট করেননি, কাউকে কথা ও আচরণ দিয়ে কষ্ট দেননি। তিনি বর্ণ বৈষম্য দূরীভূত করেছেন, নারী ও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমগ্র মানব সভ্যতায় তিনি তুলনাহীন। জীবনের চাইতেও তাঁকে বেশী ভালোবেসে তাঁর আনুগত্য করা মুসলমানদের ঈমানের দাবী। মহাগ্রন্থ আল কোরআন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো শুধুমাত্র ধর্মীয় নির্দেশ সম্বলিত সাধারণ কোনো গ্রন্থ নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ-

(হে নবী) আপনার প্রতি আমি এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। (সূরা নহল: ৮৯)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে এমন এক সুস্পষ্ট জীবন বিধান দিয়ে যাচ্ছি যা রাত ও দিনের মতো সুস্পষ্ট। নির্ঘাত ধ্বংসের পথের যাত্রী ছাড়া অন্য কেউ এথেকে বিচ্যুত হবে না'। (আল হাদীস)

আলাহ তা'য়ালা বলেছেন–

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى-

(জীবন পরিচালনার জন্য) আমার (নাযিলকৃত) হিদায়াত যারা অনুসরণ করে চলবে তারা (দুনিয়ায়) বিপথগামী হবে না এবং (আখিরাতে) কোনো কষ্ট পাবে না। (সূরা ত্বাহা: ১২৩)

তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, একবার নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'এমন এক সময় আসবে অন্ধকার রাতের মতো ফিত্না-ফাসাদ দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। একজন সাহাবী জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! সে বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি? জবাবে নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহর কোরআনই বাঁচার একমাত্র পথ, এতে রয়েছে অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ মানব গোষ্ঠীর ঘটনাবলীর ভবিষ্যৎ বাণী এবং বর্তমানের প্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কিয় আইন। বস্তুত কোরআন চূড়ান্ত বিধান, কোনো অবহেলার জিনিস নয়'। (তিরমিযী)

যে কোরআন ছিলো মুসলমানদের শক্তির উৎস, যে কোরআন দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে মুসলমানদের বসিয়ে তাদের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলো, বেদুঈন, রাখাল ও ক্রীতদাসদের ন্যায়পরায়ন শাসক, দিগ্‌বিজয়ী বীর সেনাপতি ও বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত করেছিলো, সেই কোরআনের সাথে আজকের এক শ্রেণীর মুসলমানদের সম্পর্ক শুধু সওয়াবের নিয়তে না বুঝে তিলাওয়াত করা। অথচ কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই ছিলো এ মহাগ্রন্থের আলোকে মুসলিম উম্মাহ্ তাদের ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করবে এবং এই কোরআনে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী অর্থনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতিসহ জীবনের বিশাল অঙ্গনকে ঢেলে সাজাবে। এ সম্পর্কে হযরত ইমাম মালেক (রাহঃ) বলেছেন, 'মুসলিম জাতি যে জিনিসের বদৌলতে একদিন কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করেছিলো শেষ যুগেও তারই সাহায্যে (অর্থাৎ সেই কোরআনের সাহায্যেই) কল্যাণ লাভ করবে (এর কোনোই বিকল্প নেই)'।

প্রকৃত পক্ষে পবিত্র কোরআন মানুষের জীবন চলার পথ নির্দেশিকা, এতে শুধু নামাজ-রোজার কথাই বলা হয়নি। এতে বলা হয়েছে মানুষের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই। এক কথায় জীবন চলার সকল নীতির মূলনীতি বর্ণিত যে কিতাব, তারই নাম মহাগ্রন্থ আল কোরআন। হতভাগ্য নাস্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষরা এ পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না। এ মহা অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণেই তারা ইসলামকে শুধুমাত্র ধর্ম, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে শুধু ধর্মীয় নেতা আর কোরআন মজীদকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় গ্রন্থ মনে করে।

চতুর্থ অধ্যায়

নন্দিত আদর্শের স্পর্শে ধন্য উপমহাদেশ

ইতিহাসের ঠিক কোন্ অধ্যায়ে এশিয়া মহাদেশের ভারতীয় উপমহাদেশে পবিত্র ইসলামের নন্দিত বাণী এসে পৌঁছে তা ঐতিহাসিকভাবে সূচিহ্নিত করা খুই কঠিন। তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র মক্কায় যখন ইসলাম প্রসারিত হচ্ছিলো তার পরপরই ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের বাণী এসে পৌঁছে ছিলো, এ বিষয়টি ইতিহাসের বিভিন্ন সুত্র থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন এ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ:) এর যুগ থেকেই ভারতের সাথে আরবদের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। (History of India:.The Hindu and Mahometan Periods by Mountstuart Elphinston. Third Edition, London, 1849, Chapter X, P-167-168)

আরবের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণেই দুই এলাকার মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছিলো। কে. এ. নিযামী সাহেব উল্লেখ করেছেন, 'আরব ও ভারতের সাথে নিবিড় যোগাযোগের কারণেই হযরত মুহাম্মাদ (সা:) ভারতীয় এলাকা থেকে সুগন্ধি উপহার পেয়েছিলেন এবং একজন ভারতীয় রাজা তাঁকে আচার পাঠিয়েছিলেন। হযরত আয়িশা (রা:) অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চিকিৎসার জন্যে আরবে অবস্থানকারী একজন ভারতীয় চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিলো, কারণ চিকিৎসক হিসেবে সে যুগে ভারতীয়রা আরবে সমাদৃত ছিলো। (Religion and politics in India During the Thirteenth Century, Delhi, 1974, P-261)

আরাব একাউন্টস অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, মালাবারের অন্তর্গত চের দেশের রাজা চেরুমাল পেরুমাল নবী করীম (সা:) এর যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। দশ শতকের পারস্য বণিক বুজুর্গ বিন শাহরিয়ার উল্লেখ করেছেন, আরবে নবী করীম (সা:) ইসলাম প্রচার করছেন এ কথা জেনে সরন্দীপ এলাকার লোকজন রাসূল (সা:) এর কাছে কিছু লোকজন সহ দুত প্রেরণ করেছিলো। দুর্গম পথ ও অন্যান্য কারণে সে দুত হযরত উমার (রা:) এর শাসনামলে মদীনায় পৌঁছে খলিফা উমার (রা:) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। মদীনায় অবস্থান করে তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে ও দেখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে সরন্দীপে ফিরে আসার সময়

বালুচিস্তানের কাছে মাকরান নামক স্থানে সে দুত মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সাথীগণ সরন্দীপে পৌঁছে ইসলাম সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ফলে সরন্দীপের জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সরন্দীপের রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিক জেমস্ টেইলর উল্লেখ করেছেন, হযরত ঈসা (আ:) এর জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্ব থেকে দক্ষিণ আরবের সাবা জাতির লোকজন ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব-উত্তর এলাকায় পালতোলা জাহাজে করে আসতো। তার নির্দশন তাদের প্রতিষ্ঠিত সাভার বন্দরের নামে রয়েছে। সাবা জাতির উর থেকে সাবাউর এবং এরই অপভ্রংশ থেকে পরবর্তীকালে এ বন্দর সাভার নামে পরিচিত হয়েছে। (মুফাখ্খারুল ইসলাম: উপমহাদেশের ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, ১৯৮৪)

নবী করীম (সা:) এর আগমনের পূর্ব থেকেই আরবের লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৌপথ ব্যবহার করতো। কারণ, পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধের কারণে আরবদের জন্যে স্থল পথে বাণিজ্য বিপর্যস্থ হয়ে পড়েছিলো। ইয়েমেন ও হাজরামাউতের মধ্য দিয়ে আরবদের নৌ-পথে বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা ইতোপূর্ব থেকেই তাদের ছিলো। আরবদের বাণিজ্য বহর পাক-ভারত উপমহাদেশে, বার্মা, কম্বোডিয়া এবং মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত করতো। খৃষ্টিয় পাঁচ শতকের শেষ দিকে পবিত্র মক্কার কুরাইশ ব্যবসায়ীগণও নৌপথে বাহির্বাণিজ্যের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলো। (মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁন: বাংলাদেশে ইসলাম, কয়েকটি তথ্যসুত্র, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮)

ইতিহাসে দেখা যায়, আরবদের নৌপথে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের সাথে সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের উপকূল এলাকায় অবস্থিত বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহের এলাকায় তাদের স্থায়ী উপনিবেশও গড়ে উঠেছিলো। নবী করীম (সা:) এর আবির্ভাবের কয়েক শত বছর পূর্বেই দক্ষিণ ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর এবং বাংলাদেশের চট্রগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব লোকজনদের বসতি গড়ে উঠেছিলো। 'আরব ও হিন্দকে তা'আলুকাত' নামক গবেষণা গ্রন্থে আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী (রাহ:) ভারতীয় উপমহাদেশের উপকূল এলাকায় আরবদের উপনিবেশ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করেছেন। আরব জাহান থেকে সে সময় বছরে অন্তত দু'বার এসব উপনিবেশে নৌবহর এসে জমায়েত হতো। এ কারণে

ব্যবসা পণ্যের যেমন আদান প্রদান হতো, তেমনি তথ্যেরও আদান প্রদান হতো। ড. এম. এ. রহীম উল্লেখ করেছেন, আরব ব্যবসায়ীগণই চট্টগ্রামের শাত-ইল-গঙ্গা বা গঙ্গার বদ্বীপ নামকরণ করেন। কারণ চট্টগ্রাম সে সময় গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত ছিলো। (ড. এম. এ. রহীমঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২)

ব্রহ্মপুত্র নদীর পশ্চিম তীরে বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন জনপদ কার্পাসের জন্য বিখ্যাত কাপাসিয়ার টোক বন্দরকে আরব ব্যবসায়ীগণ 'তওক' বন্দর বলে উল্লেখ করতেন। আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী (রাহঃ), ইদরীসী ও অন্যান্য গবেষকগণ বলেছেন, আরবী ভাষায় কণ্ঠহারকে তওক বলা হয়। এখানে বানাক নদী তওক বা কণ্ঠহারের মতো বেঁকে ব্রহ্মপুত্র নদীর কণ্ঠলগ্ন হয়েছে বিধায় আরবরা তাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সে যুগের বন্দরকে তওক নামকরণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীন সিরাজ বাংলার অঞ্চলকে বুঝাতে বররিন্দ শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ আরব বণীকগণ নৌপথে জাহাজে আসার পথে যখন বাংলার লালমাটির ভূখণ্ড দেখতে পেতেন তখন উচ্চস্বরে বলে উঠতেন, 'বাররি হিন্দ'। অর্থাৎ হিন্দুস্তানের মাটি, বররিন্দ শব্দটি বাররি হিন্দ শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে এবং পরবর্তীতে তা বরিন্দ্র নামে পরিচিতি পেয়েছে। কয়েকজন গবেষক উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের অন্যতম নদী বন্দর ভৈরবের নামও আরব বণিকদের দেয়া 'বাহ্‌র-ই-আব' অর্থাৎ পানির সাগর। এই 'বাহ্‌র-ই-আব' শব্দটি পরিবর্তিত হতে হতে ভৈরব শব্দে পরিণত হয়েছে। আরবদের দেয়া নাম 'সালাহাত' পরবর্তীতে শ্রীহট্ট তারপরে পর্যায়ক্রমে সিলহেট থেকে সিলেট নামকরণ হয়েছে। সালাহাত শব্দের অর্থ সদনুষ্ঠান।

ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আরবরা আসা যাওয়া করতো এবং এ অঞ্চলের লোকজন আরবদের কাছে অপরিচিত ছিলো না। আরবরা যে ব্যবসায়ী ছিলো এ কথা পবিত্র কোরআনের সূরা কুরাইশ এ আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন। নদী মাতৃক বাংলা এলাকায় ব্যবসার স্বার্থেই আরবরা বিভিন্ন স্থানে বন্দর ও বসতি স্থাপন করেছিলেন। নবুওয়াত লাভ করার পর নবী করীম (সাঃ) মানুষকে যখন ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো শুরু করলেন, তখন পর্যায়ক্রমে বিষয়টি সমগ্র আরবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলো। দূর-দূরান্তের লোকমুখেও বিষয়টি আলোচিত হতো। নবী করীম (সাঃ) মদীনায় হিজরতের পূর্বে ও পরে ভারতীয় উপমহাদেশে এবং বাংলা অঞ্চলে (বর্তমান বাংলাদেশে) আরব বণিকদের মাধ্যমেই ইসলামের বিষয়টি এসে পৌঁছে ছিলো।

ইসলাম গ্রহণকারী প্রত্যেক মুসলিম ইসলামের মূল দাওয়াত আরেকজনের কাছে পৌঁছে দিবেন, এটি তাদের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্যেই নবী করীম (সাঃ) বেশ কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামকে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। আবিসিনিয়ার বাদশাহকে হাবশী ভাষায় নুজুস বলা হতো এবং পরবর্তী নুজুস শব্দটি নাজ্জাশী শব্দে রূপান্তরতি হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের দলটি প্রতিকূল পরিবেশে অত্যন্ত সংগোপনে মক্কা থেকে লোহিত সাগরের বন্দরে পৌঁছে আবিসিনিয়াগামী জাহাজে আরোহী হয়েছিলেন। ক্ষুদ্র এ দলটির মধ্যে ছিলেন হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ), তিনি নবী করীম (সাঃ) এর আপন চাচাত ভাই এবং হযরত আলী (রাঃ) এর আপন ভাই। হযরত আমের ইবনে রবিয়া (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রী হযরত লায়লা বিনতে আবু হাসমা (রাঃ), হযরত উসমান ইবনে মাজউন (রাঃ), হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এবং তাঁর স্ত্রী আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কন্যা হযরত রুকাইয়া (রাঃ), হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুল আসাদ মাখযুমী (রাঃ) এবং তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া (রাঃ), হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রাঃ), হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ), হযরত আব্দর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), হযরত হুজাইফা ইবনে ওৎবা (রাঃ), তাঁর স্ত্রী হযরত সাহলা বিনতে সুহাইল (রাঃ), হযরত সুহাইল ইবনে বাইদা (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবু সাবুরাহ ইবনে আবু রুহাম (রাঃ)। সংখ্যায় তাঁরা কতজন ছিলেন এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

সে যুগে লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে হাবশা বর্তমান আবিসিনিয়া ছিলো উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র। পশ্চিম দিকে মিসর ও পূর্ব দিকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র পথে চলাচলকারী নৌবহর হাবশায় এসে যাত্রাবিরতি করতো এবং সেখানের বাজারে বিপুল পরিমাণে পণ্য বিনিময় হতো। নবী করীম (সাঃ) তদানীন্তন কালের ঐ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রটিকে ইসলাম প্রচারে ব্যবহারে করতে সচেষ্ট ছিলেন বলে গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন। মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁন উল্লেখ করেছেন, আবিসিনিয়ার এই বন্দর থেকেই তিনজন সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) এর নেতৃত্বে বেশ কিছু হাবশী মুসলিমদের সাথে নিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পূর্বদিকের সুদীর্ঘ বাণিজ্য পথ বেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। যাত্রা পথে তাঁরা যে সকল বন্দরে থেমে ছিলেন, সে সকল বন্দর এলাকার লোকজনের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। তাঁদের মাধ্যমেই ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যেক উপকূলীয় বাণিজ্যকেন্দ্র ও আরব

উপনিবেশ থেকে শুরু করে সুদূর চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিলো এবং সে সময় নবী করীম (সাঃ) জীবিত ছিলেন।

নবী করীম (সাঃ) নবুওয়াত লাভ করার পাঁচ বছর সময়কালে সাহাবায়ে কেরাম হাবশায় হিজরত করেছিলেন। নবুওয়াত লাভের সাত বছর সময়কালে হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) বাদশাহ নাজ্জাশীর উপহার দেয়া সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে দিক দিগন্তে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর লক্ষ্যে বের হয়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবু কায়েস ইবনে হারেছ (রাঃ), হযরত ওরওয়াহ্ ইবনে আছাছা (রাঃ) ও হযরত আবু কায়স ইবনে হারেছ (রাঃ)। সকল সাহাবায়ে কেরামের জীবনী সম্বলিত গবেষণাভিত্তিক সকল গ্রন্থেই উপরোক্ত চারজন সাহাবীর নাম উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা হাবশায় হিজরত করেছিলেন এ তথ্য যেমন রয়েছে, তেমনি তাঁরা ইসলামের বিজয় যুগে মক্কা বা মদীনায় ফিরে গিয়েছিলেন এমন তথ্য পাওয়া যায় না। চীনের উইঘরসহ অন্যান্য মুসলিমগণ উক্ত সাহাবায়ে কেরামেরই উত্তরাধিকার বহন করছে বলে অনেক গবেষকগণ মন্তব্য করেছেন।

তদানীন্তন যুগে চীনে ইসলাম প্রচারকারী দলের নেতা ছিলেন হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব ইবনে আবদে মানাফ (রাঃ)। হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর গর্ভধারিণী মাতা হযরত আমিনার আপন চাচাত ভাই। সেদিক থেকে তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর মামা। চীনের প্রাচীন ইতিহাসে সে দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে যে সকল তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায়, খৃষ্টিয় ৬২৬ সালের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে চীন উপকূলে ইসলাম প্রচারক দল জাহাজ থেকে অবতরণ করেন। দলনেতা হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন এবং তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। চীনের উক্ত এলাকায় কোয়াংটাং মসজিদটি তিনিই নির্মাণ করেন এবং এখন পর্যন্ত সে মসজিদটি সমুদ্র তীরে সগৌরবে সুউচ্চ মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মসজিদের অদূরেই হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) এর কবর, গত প্রায় চৌদ্দশত বছরব্যাপী চীনের মুসলিম এবং চীনের বাইরে থেকে উক্ত এলাকায় যে সকল মুসলিম গমন করেন, তাঁরা হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) এর কবরে ফাতিহা পাঠ করে দোয়া করেন। আর তিনজন সাহাবীর মধ্যে একজন চীনের অভ্যন্তরে গিয়ে ইসলাম প্রচার করেন, তাঁর কবর সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। অন্য দু'জন চীনের ফুকীন প্রদেশের চুয়ানচু বন্দরের কাছেই লিং নামক

পর্বতের ওপর সমাহিত রয়েছেন। গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন, হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) এর নেতৃত্বে চীন যাত্রাকালে বাংলা অঞ্চলের কোনো এক বন্দরে তাঁরা অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করেছেন, চীন যাত্রাকালে তাঁদের সাথে বেশ কিছু সংখ্যক বাংলাভাষী মুসলিমও ছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায়, সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সাঃ) এর নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর সময়কালে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। নবুওয়াত লাভের সাত বছর সময়কালে হাবশা থেকেই তাঁরা সমুদ্রগামী জাহাজযোগে বের হন।

চীনের প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, ৬২৬ খৃষ্টাব্দে হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) এর নেতৃত্বে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলিম চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবতরণ করেন। অর্থাৎ হাবশা থেকে যাত্রা করার প্রায় নয় বছর পর তাঁরা চীন পৌছান। মাঝে প্রায় নয় বছর তাঁরা ইসলামের দাওয়াত ভারতীয় উপমহাদেশেসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে পৌছে দেন। যে সকল বন্দরে তাঁরা অবতরণ করেছেন, সে সকল এলাকা থেকেই লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে তাঁদের সাথী হয়েছেন। সুতরাং ঐতিহাসিক সকল উপাত্ত থেকে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ হয় যে, বর্তমান বাংলাদেশে ইসলাম স্থলপথে নয়, সমুদ্রপথে আগমন করেছে। নবী করীম (সাঃ) এর জীবিতকালে এমনকি হিজরতের পূর্বেই বাংলাদেশের উপকূল এলাকায় ইসলামের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে। বাংলাদেশের মাটিও সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র পদরেণু ধন্য হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম এদেশে তাবেঈ এবং তাবে তাবেঈ রেখে গিয়েছেন। চীনে ইসলাম প্রচারে বাংলাদেশী মুসলিমগণও অবদান রেখেছে। (মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁনঃ বাংলাদেশে ইসলাম, কয়েকটি তথ্যসুত্র, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮)

নবী করীম (সাঃ) এর যুগে ভারতবর্ষে ইসলাম

নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব (রাঃ) এবং তাঁর সাথের অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের সাথে বিভিন্ন অঞ্চলের যে সকল মুসলিম সাথী হয়ে ইসলাম প্রচার করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে গবেষণা ভিত্তিক কোনো গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এখন পর্যন্ত রচিত হয়নি। তবে চীনা ও তামিল ভাষায় লেখা বেশ কয়েকটি গ্রন্থে তাঁদের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমাল্ পেরুমাল্

ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন'। মালাবারের চের দেশ বা চেরর রাজ্যের রাজা চেরুমাল পেরুমালের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রাচীন গ্রন্থসমূহের বিবরণ উল্লেখ করে শায়খ যয়নুদ্দীন তাঁর গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থ 'তোহফাতুল মুজাহেদীন' রচনা করেছেন।

মালাবারের চেরর রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন, আরব দেশের কিছু সংখ্যক মানুষ নৌপথে জাহাজ যোগে মালাবার আগমন করেছিলেন। তাঁদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে চেরর রাজ্যের রাজা চেরুমাল পেরুমাল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি একদল লোক সাথে নিয়ে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) এর সাথে সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন। রাসূল (সা:) এর জন্যে উপহার হিসেবে তিনি সাথে করে বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলেন। নানাবিধ উপহার সামগ্রীর মধ্যে আদা এবং এদেশে নির্মিত একটি মূল্যবান তরবারীও ছিলো। নবী করীম (সা:) সে আদা স্বয়ং খেয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও বন্টন করে দিয়েছেন। তারবারীটি তিনি নিজের সাথেই রাখতেন। রাজা কিছুদিন রাসূল (সা:) এর সান্নিধ্যে অবস্থান করে সাথীদের নিয়ে নিজ দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

নিজ দেশে আসার পথে রাজা চেরুমল পেরুমল দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তিনি শাহর নামক বন্দরে ইন্তেকাল করেন। নবী করীম (সা:) এর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে অবস্থানকারী রাজা চেরুমল পেরুমল সাহাবীর মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। তিনি নিজ রাজ্যে সততা, স্বচ্ছতা, সুবিচার ও ন্যায়-পরায়ণতার কারণে এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে, এমন একজন মহান ব্যক্তিত্ব মৃত্যুবরণ করতে পারে তা অনেকেই বিশ্বাস করেনি। চেরর রাজ্যের জনগণের অনেকেই বিশ্বাস করতো, তিনি অবশ্যই একদিন ফিরে আসবেন। (তোহফাতুল মুজাহিদীন, মোহাম্মাদ আকরাম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০, কোলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ: ২৩৪)

হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব (রা:) এর কাছেই রাজা চেরুমল পেরুমল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এ কথা প্রত্যয়ের সাথেই উল্লেখ করা যায়। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে শায়খ যয়নুদ্দীন তাঁর তোহফাতুল মুজাহিদীন গ্রন্থে কয়েকজন হাদীস বর্ণনাকারী নাম উল্লেখ করেছেন। মাদ্রাজ প্রদেশের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার মালাবার নামক স্থানে

যে সকল আরব বসবাস করতেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা মোপ্‌লা নামে পরিচিত ছিলেন। সে যুগে মালাবারে তাঁরা দশটি মসজিদও নির্মাণ করেন। আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী (রাহ:) উল্লেখ করেছেন, মিসর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত সুদীর্ঘ সমুদ্রপথে আরব নাবিকগণ নৌ জাহাজ পরিচালনা করতেন। মালাবার উপকূল হয়ে তাঁরা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন। তাঁদের জাহাজসমূহ বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও সিলেটে নোঙ্গর করতো। সুদীর্ঘ পথে পালেটানা জাহাজ একাধারে যাত্রা করতে পারতো না। পথে বিভিন্ন স্থানে নোঙ্গর করে জাহাজ মেরামতের প্রয়োজন হতো। এসব বিষয় সম্মুখে রাখলে এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, মালাবার থেকে যাত্রা করে হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা:) এর জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে নোঙ্গর করেছিলো। চীনের বিখ্যাত পরিব্রাজক মাহুয়ান উল্লেখ করেছেন, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যবর্তী একটি স্থানে বন্দর নগরীতে খুবই উন্নতমানের সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মিত হতো। এসব জাহাজ প্রাচ্যের দেশসমূহে যাতায়াত করতো। এ বন্দরে জাহাজ মেরামতও হতো এবং এ কারণে দূর পথে যাতায়াতকারী জাহাজ এ বন্দরে যাত্রা বিরতি করতো।

হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা:) এর জাহাজ যেমন মালাবার বন্দরে নোঙ্গর করেছিলে, তেমনি চট্টগ্রামের উক্ত বন্দরে নোঙ্গরও করেছিলো এবং কিছুকাল তাঁরা সেখানে অবস্থান করে মানুষদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেছেন। সুতরাং সকল ঐতিহাসিক উপাত্ত্য একত্রিত করলে এ কথা প্রত্যায়ের সাথে বলা যায় যে, নবী করীম (সা:) পৃথিবীতে অবস্থানরত অবস্থায়ই বর্তমান বাংলাদেশ নন্দিত আদর্শ ইসলামের স্পর্শে এসে ধন্য হয়েছিলো। এ সকল বিষয় স্বনামধন্য সাংবাদিক মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণালব্ধ গ্রন্থ 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও সুসাহিত্যিক আব্বাস আলী খাঁন (রাহ:)ও তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থ 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।

রাসূল (সা:) এর পরবর্তী যুগে বাংলাদেশে ইসলাম

ড. হাসান জামান তাঁর 'সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে হযরত উমার (রা:) এর শাসনামলে ইসলাম প্রচারে পর পর পাঁচটি দল বাংলাদেশে আগমন করেন। মিসর ও পারস্য

থেকেও ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে মুসলিমগণ বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। ১৯৮৬ সালের ২৩ই এপ্রিল দৈনিক বাংলা পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়, রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে লালমনিরহাটের সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার মজদের আড়া নামক গ্রামে ৬৯ হিজরী সালে নির্মিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তীতে দৈনিক ইনকিলাব ও দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকাও এর সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলো। সংবাদে উল্লেখ করা হয়, কারবালার প্রান্তরে হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাতের আট বছরের ব্যবধানে এবং মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ২৪ বছর পূর্বে উমাইয়া শাসনকর্তা প্রথম মারওয়ানের সন্তান আব্দুল মালিকের শাসনামলের এই মসজিদ বাংলাদেশে এ যাবতৎকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। একটি বাঁশ ঝাড়ের উঁচু টিলা সমতল করতে গিয়ে এ প্রাচীন মসজিদটি আবিষ্কৃত হয়।

মসজিদের যে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিলো তা বিশেষ ধরনের ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিলো। বিশেষ আকৃতির এসব ইটে বিভিন্ন ধরনের নকশা, ফুল ও আরবী অক্ষরে পবিত্র কালেমা তাইয়্যেবা লিখা রয়েছে। আবিষ্কৃত ইটে হিজরী ৬৯ সাল উল্লেখ রয়েছে। মসজিদের আশেপাশে আরো অনেকগুলো স্থাপনা পাওয়া গিয়েছে। উক্ত গ্রামের নাম বর্তমানে 'মজদের আড়া' নামটি পরিবর্তিত রূপ হিসেবেই গবেষকগণ দেখছেন। তাঁরা মনে করেন, 'মসজিদের আড়া' নামটির অপভ্রংশ মজদের আড়া। কারণ আড়া শব্দের অর্থ ঘাঁটি, ডাঙ্গা বা কিনারা। এ মসজিদকে ঘাঁটি করেই ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে এখানে মুসলিম জনবসতি গড়ে উঠেছিলো এবং এ কারণেই এলাকাটি মসজিদের আড়া নামে পরিচিতি পেয়েছিলো। উক্ত গ্রামের চারদিকে অনেকগুলো বহু প্রাচীন কবর রয়েছে। গবেষকদের ধারণা, সে কবরগুলো সে যুগে আগত ইসলাম প্রচারকদের কবর। সুতরাং ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের পূর্বেই ইসলামের প্রথম যুগে এদেশে ইসলাম প্রচার হয়েছে এবং মুসলিমদের জনবসতি গড়ে উঠেছিলো তা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়।

হাদীস গ্রন্থ নাসাঈ শরীফ ও মুসনাদে আহমাদ, কিতাবুল জিহাদ। হযরত সাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে দুইটি সৈন্যবাহিনীকে আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন। এর মধ্যে একটি দল হলো ভারত আক্রমণকারী

সৈন্যবাহিনী আর দ্বিতীয়টি হলো ঈসা ইবনে মারিয়ামের সহযোগী সৈন্যবাহিনী'। নাসাঈ হাদীসে বর্ণিত, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, 'নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে ভারত অভিযানের নিশ্চিত অঙ্গীকার দিয়েছেন। অতএব সে সময় পর্যন্ত আমি জীবিত থাকলে সে অভিযানে অবশ্যই আমার ধন-সম্পদ ও প্রাণ উৎসর্গ করতে আমি কুণ্ঠিত হবো না। সে অভিযানে যদি আমাকে হত্যা করা হয় তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবো, আর যদি ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি হবো জাহান্নাম থেকে মুক্ত'।

হযরত উমার (রাঃ) এর শাসনামলে ১৫ হিজরীর মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু অভিযানের সূচনা হয়। এস. সি. রায় চৌধুরী কর্তৃক লিখিত সোশ্যাল, কালচারাল এণ্ড ইকনোমিক হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, ৬৩৬ সালে ভারতের পানি সীমানায় বোম্বের থানা নামক স্থানে প্রথম মুসলিম রণতরীর আগমণ ঘটে। নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের বত্রিশ বছরের মধ্যে ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে মুসলিমগণ আফগানিস্তান দখল করে। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসনামালে ৪৪ হিজরীতে সেনাপ্রধান মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরী স্থলপথে সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজ নামক স্থানে উপনীত হন। ৯৩ হিজরীতে মুহাম্মাদ বিন কাশিম যখন পাঞ্জাব ও মুলতানে অভিযানে আগমন করেন তখন তাঁর সাথে ৪ হাজার জাঠ সৈন্য যোগ দেয়। মুহাম্মাদ বিন কাসিম পুরনো ব্রাহ্মণাবাদ এলাকা জয় করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হবার সময় সাওয়ান্দার এলাকার স্থানীয় বহু মুসলিম তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলো।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে ভারতীয় শাসক ও জ্ঞান গবেষকদের সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ ছিলো এ কথা উল্লেখ করে বালাযুরী লিখেছেন, উমাইয়া খলিফা ইসলামের প্রথম মুজাদ্দিদ হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রাহঃ) ভারতীয় রাজাদের ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে বহু সংখ্যক পত্র প্রেরণ করেন এবং ব্রাহ্মণাবাদের রাজা জয় সিংহ ইসলাম কবুল করেছিলেন। ভারতীয় বিভিন্ন রাজার দরবারে মুসলিমগণ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। আট থেকে দশ শতক পর্যন্ত চট্টগ্রাম উপকূল থেকে মেঘনার তীর পর্যন্ত এবং স্থলপথে রাজশাহীর পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়নামতিতে ইসলাম ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলো। দুর্গম ও অপরিচিত পথ অতিক্রম করে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে ইসলাম প্রচারকগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার কেন্দ্র

স্থাপন করেন। ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রচারকগণ এলাকার জনগণের ভাষায় ইসলামের সৌন্দর্য্য তুলে ধরতেন।

তদানীন্তন যুগে এসব এলাকার মানুষ ছিলেন বহুবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। মূর্তি, বৃক্ষ তরুলতা ও প্রকৃতি পূজা করতো এবং ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে নরবলী দিতো। সেই সাথে তারা বর্ণহিন্দু, বৌদ্ধ ও রাজাদের অত্যাচারে ছিলো অতিষ্ঠ। সাম্য মৈত্রির আদর্শ ইসলামের নান্দনিক বাণী তাদের সম্মুখে তুলে ধরা হলে তাঁরা ব্যাপকভাবে ইসলাম কবুল করে। এ কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম জনবসতি গড়ে ওঠে। সে সময় চট্টগ্রামে মুসলিম আমীরদের অধীনে ক্ষুদ্র একটি শাসন ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সময় হিন্দুস্তানী ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ হয়েছিলো। আলোয়ারের রাজা মাহরোক বিন রাইকের অনুরোধে সিন্ধুর শাসক আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন আব্দুল আযীয ২৭০ হিজরীতে পবিত্র কোরআন অনুবাদের ব্যবস্থা করেন এবং কোরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রাজা ইসলাম কবুল করে মুসলিম হন। (ড. মুহাম্মাদ যাকী: এ্যারাব একাউন্টস অব ইণ্ডিয়া)

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে এদেশে একক কোনো শক্তিশালী রাজা ছিলো না বিধায় এদেশ ছিলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই প্রতিকূল পরিবেশেই প্রচারকদের ইসলাম প্রচারের কারণে এদেশে মুসলমানদের স্বশাসিত বা সামাজিক শাসিত অঞ্চল গড়ে উঠেছিলো। সাত শতকের মধ্যভাগ থেকে বারো শতকের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৫৫০ বছর রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীতই প্রচারকগণ এদেশে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁরা অসীম ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে এদেশেই শুধু নয়, সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে আরব দেশ থেকে একদল ইসলাম প্রচারক সমুদ্রপথে বাংলাদেশে এসে সাগর তীরে নেমে সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েন। চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের পাশে পাহাড়ী এলাকায় প্রচারক দলের অনেকের কবর রয়েছে। যদিও এসব কবরের কোনো চিহ্ন বর্তমানে নেই। ৯০০ খৃষ্টাব্দে শেখ আব্বাস ইবনে হামজাহ্ নিশাপুরী (রাহ:) ইসলাম প্রচারে এসে ঢাকাতেই ইন্তেকাল করেন। দশম শতাব্দীতে যাঁরা ঢাকায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শেখ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ, শেখ ইসমাইল ইবনে নযন্দ নিশাপুরী প্রমুখ বুজর্গ ব্যক্তিগণ ৯৫২ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইসলাম প্রচার করেছেন।

হযরত বায়েজিদ বুস্তামী (রাহঃ) চট্টগ্রামের এমন এক এলাকায় ইসলাম প্রচার করেছেন যেখানে ছিলো ঘন জঙ্গল ও হিংস্র পশুর বসবাস। চট্টগ্রামের নাসিরাবাদের এক পাহাড় চূড়ায় তাঁর স্মারক সমাধি থাকলেও ইতিহাসে দেখা যায় তিনি ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যের বুস্তাম নগরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে মীর সাইয়্যেদ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহিসওয়ার (রাহঃ) বাংলাদেশের বগুড়ার অদূরে মহাস্থানে আগমন করেন এবং এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন। বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলা পূর্বে হরিরামপুর নামে পরিচিত ছিলো এবং হরিরামপুরের রাজা ছিলেন বলরাম। প্রজা নিপীড়ক এ রাজার অত্যাচারের ঘটনা জেনে তিনি তাঁকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। দাওয়াত গ্রহণ না করে রাজা বলরাম ইসলামের এ প্রচারকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন।

রাজা প্রথমে মাহমুদ বলখীকে নিজ এলাকা থেকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। মাহমুদ বলখীর মুসলিম বাহিনীর সাথে যখন রাজা বলরামের সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু হয় তখন এলাকার অত্যাচারিত প্রজাগণও মাহমুদ বলখীর মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে রাজার বাহিনী পরাজিত হলে স্বয়ং রাজা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে রাজা নিহত হলে তাঁর মন্ত্রীগণ মাহমুদ বলখীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে মানিকগঞ্জে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। মানিকগঞ্জে অবস্থানকালেই তিনি সংবাদ পান, বগুড়া মহাস্থানের অত্যাচারী ক্ষত্রিয় শাসক পরশুরাম প্রজাগণের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তিনি কালবিলম্ব না করে সাথীদের নিয়ে মহাস্থান গমন করে রাজা পরশুরামকে ইসলামের দাওয়াত দেন। রাজা পরশুরাম দাওয়াত অগ্রাহ্য করে মাহমুদ বলখীকে মহাস্থান থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করেন।

হরিরামপুর এলাকার অত্যাচারিত জনগণ যেমন মাহমুদ বলখীকে সহযোগিতা করেছিলো, তেমনি মহাস্থানের বিক্ষুব্ধ ও বর্ণহিন্দু শাসনে উৎপীড়িত এবং নিপীড়িত বৌদ্ধ, অনার্য ও নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় তাঁকে সহযোগিতা করেছিলো। রাজা পরশুরামের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে তিনি যুদ্ধের সূচনা করেন। যুদ্ধে রাজা পরশুরাম ও তাঁর মন্ত্রী নিহত হলে রাজার সেনাপতি এবং এলাকার অভিজাত হিন্দুগণ মাহমুদ বলখীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে আগমনকারী অধিকাংশ ইসলাম প্রচারকগণ শুধু মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে বসে নসিহত করেননি। নবী করীম (সাঃ) যেমন যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ, প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করেছেন, বাংলায় ইসলাম প্রচারকগণও সেখান

থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন। যেখানেই মানুষ অত্যাচারিত হয়েছে সেখানেই তাঁরা ছুটে গিয়েছেন এবং প্রয়োজনে যুদ্ধের উপকরণ যোগাড় ও প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁরা অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ বঞ্চনা থেকে মানুষকে রক্ষা করেছেন এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দেহের তপ্ত রক্ত উৎসর্গ করেছেন। যেখানেই উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল সেখানেই ছুটে গিয়েছেন সংগ্রামী ইসলাম প্রচারকদল। হিন্দু রাজাদের অত্যাচার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহে তাঁরা বিজ্ঞোচিত নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তদানীন্তন যুগে শাহ মোহাম্মাদ সুলতান রুমী (রাহ:) সংগ্রামী ইসলাম প্রচারকদের আরেকজন ছিলেন। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষক সাইয়্যেদ শাহ সুর্খখল আনতিয়াহ (রাহ:)কে সাথে নিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহের নেত্রকোনার মদনপুর গ্রামে আগমন করেন। সে সময় উক্ত এলাকায় তিনি ও তাঁর সাথে আগমনকারী লোকজন ব্যতীত অন্য কোনো মুসলিম ছিলো না। তখন উক্ত এলাকায় কোচ নামক রাজার রাজত্ব ছিলো, সুলতান রুমী উক্ত রাজার দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সৌন্দর্য্য তুলে ধরেন। রাজা ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ ইসলামের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচারের সুবিধার্থে রাজা মদনপুর গ্রামটি সুলতান রুমী (রাহ:) কে দান করেন এবং উক্ত এলাকায় এখনো তাঁর কবর রয়েছে। পাল রাজত্বের শেষ পর্যায়ে এগারো শতকের মধ্যভাগে বাংলার অমুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় তাঁকে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা ও সংগ্রাম করেই ইসলাম প্রচার করতে হয়েছিলো।

হযরত আদম (রাহ:) ইতিহাসে যিনি বাবা আদম শহীদ মক্কী নামে পরিচিত। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি বাংলার এক হজ্ব পালনকারী মুসলিমের মুখে এদেশে রাজা বল্লাল সেনের প্রজা নিপীড়নের কাহিনী শুনতে পান। তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাথী ও উপকরণ যোগাড় করে আসাম হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। আসামেও বহু সংখ্যক মানুষ তাঁর কাছে ইসলাম কবুল করেন। তিনি বাংলার বিক্রমপুর পরগণার আব্দুল্লাহপুর গ্রামে উপস্থিত হন। হযরত আদম (রাহ:) এর আগমনের সংবাদ পেয়ে রাজা বল্লাল সেন বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করে। দীর্ঘ চৌদ্দদিন ব্যাপী উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তাওহীদের বাহিনীর কাছে পৌত্তলিক বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে। রাজা স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার ঘোষণা দিয়ে রাজপ্রাসাদে একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে রাজপরিবারের সদস্যদের বলে যান, তিনি সাথে দু'টো

কবুর নিয়ে যাচ্ছেন। এ কবুতর দু'টো ফীরে আসার অর্থ হলো তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন এবং পরিবারের সকলেই যেনো অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেয়।

যুদ্ধের ময়দানে রাজা বল্লাল সেনের বাহিনীর কাছে আদম (রাহঃ) এর বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সৈন্য শাহাদাতবরণ করেন। স্বয়ং আদমও সশস্ত্র জিহাদরত অবস্থায় এক সময় অনুভব করেন, তাঁর শাহাদাতের সময় আগত। তিনি যুদ্ধের ময়দানে জীবনের শেষবারের মতো মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালাকে সিজদা দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যান। এ সুযোগে বল্লাল সেন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে শহীদ করে। যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে রাজা দেহের মলিনতা পরিষ্কার করার জন্যে স্থানীয় একটি পুকুরে নামেন। এ সময় তাঁর পোশাকে আবৃত কবুতর দু'টো উড়ে রাজপ্রাসাদের দিকে যায়। রাজপরিবারের লোকজন কবুতর দু'টো দেখতে পেয়ে ধারণা করে, রাজা নিহত হয়েছেন। তখন তারা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেয় এবং স্বয়ং রাজাও এ সংবাদ শোনার পরে আগুনে আত্মাহুতি দেয়। ইতিহাসে এ রাজাকে 'পোড়া রাজা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আদম (রাহঃ) ও তাঁর মুসলিম বাহিনীর শাহাদাতবরণ বৃথা যায়নি। তাঁদের পবিত্র রক্তের ধারায় বিক্রমপুরে ইসলামী আদর্শের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়।

অত্যাচারী রাজার মৃত্যুর পরে শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত প্রজাগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেন। বিক্রমপুরের আব্দুল্লাহপুরে যেখানে আদম মক্কীর মুসলিম বাহিনীর সাথে হিন্দু রাজার যুদ্ধ হয়েছিলো, সেখানে আদমই প্রথম ইসলাম প্রচারক ছিলেন না। তাঁর পূর্বেও সেখানে ইসলাম প্রচার হয়েছে এবং বহু সংখ্যক মুসলিম সেখানে বসবাস করতেন, এ প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে এবং গ্রামের 'আব্দুল্লাহপুর' নামটিকেই ঐতিহাসিকগণ বড় প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিক্রমপুরের বিভিন্ন এলাকায় আদম মক্কী শহীদ (রাহঃ) ও তাঁর সাথীদের কবর রয়েছে। বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বে শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রাহঃ) ঢাকায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন। বর্তমান বঙ্গভবনের সামান্য দূরে দিলখুশা এলাকায় তিনি কেন্দ্র স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করতেন এবং এখনো তাঁর ও অন্যান্য সাথীদের কবর এখানে রয়েছে।

ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানের পৌত্তলিকগণ ইসলাম প্রচার কাজে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছিলো। শাহ নিয়ামত উল্লাহ ও মুসলিমদের তারা প্রশান্তির সাথে নামাজ আদায়ও করতে দিতো না। চরম প্রতিকূলতা

উপেক্ষা করে তিনি ও তাঁর সাথীগণ ইসলাম প্রচার করেছেন। তিনি একদিন নিজ স্থানে নামাজরত ছিলেন এ সময় ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরা কতকগুলো মূর্তি নিয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে ব্যাপক গোলযোগ সৃষ্টি করেছিলো। নামাজ শেষে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে মূর্তিগুলোর দিকে আঙ্গুলের ইশারা করামাত্র মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এ ঘটনার পরে লোকজন ব্যাপকভাবে ইসলাম কবুল করে এবং শাহ নিয়ামত উল্লাহ 'বুত শিকন' উপাধি লাভ করেন। বুত শিকন শব্দের অর্থ মূর্তি বিনাশকারী।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, শাহ মখদুম রূপোস নামে খ্যাত ইসলামের এক মর্দে মুজাহিদ বহু সংখ্যক সঙ্গি সাথীসহ ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যে ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের রাজশাহী এলাকায় আগমন করেন। তদানীন্তকালে রাজশাহী শহরের নাম ছিলো মহাকালগড় এবং হিন্দুদের মহাকালদেবের মন্দির থাকার কারণে উক্ত এলাকা মহাকালগড় নামে পরিচিত ছিলো। রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকা হিন্দু রাজাদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো এবং তারা নিয়মিত মন্দিরে নরবলী দিতো। বলি দেয়ার জন্যে গরীব প্রজাদের সন্তান ছিনিয়ে নেয়া হতো এবং রাজাদের নানাবিধ অত্যাচারে এলাকার মানুষ ছিলো অতিষ্ঠ। শাহ মখদুম রূপোস (রাহঃ) রাজশাহীর বাঘা নামক এলাকায় পদ্মা নদীর কাছে একটি কেল্লা নির্মাণ করেন এবং এ কেল্লাটি অত্যাচারিত মানুষের আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। তিনি ও তাঁর সাথীগণ এলাকার জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন এবং আশেপাশের হিন্দু রাজাদেরও ইসলামের দিকে আহ্বান জানান।

এক পর্যায়ে রাজার সৈন্যবাহিনীর সাথে হযরত শাহ মখদুম রূপোস (রাহঃ) এর বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তাঁর নিজের ও সাথীদের অনেকগুলো ঘোড়া নিহত হলে রাজশাহীর উক্ত এলাকা 'ঘোড়ামারা' নামে পরিচিতি পায় এবং এখন পর্যন্ত উক্ত এলাকা ঘোড়ামারা নামেই পরিচিত। সশস্ত্র জিহাদের ময়দানে বহু সংখ্যক ইসলাম প্রচারক শাহাদাতবরণ করেন। যুদ্ধে মখদুম (রাহঃ) এর বিজয় হয় এবং হিন্দু রাজাগণ পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এরপরে রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকায় দ্রুত নন্দিত আদর্শ ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। মখদুম (রাহঃ) সেখানেই ইন্তেকাল করেন এবং রাজশাহীর পদ্মানদীর তীরে তাঁর ও অন্যান্য ইসলাম প্রাচরকগণের কবর রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর জীবিতকালে যেমন বাংলাদেশ নন্দিত আদর্শ ইসলামের স্পর্শে ধন্য হয়েছে, তেমনি তাঁর ইন্তেকালের পরে

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের পূর্ব পর্যন্তও ইসলাম প্রচারকদের অসীম ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে এদেশ ইসলামের স্পর্শে ধন্য হয়েছে। গত প্রায় চৌদ্দশত বছর যাবৎ বাংলাদেশের মাটি ইসলামের বীর মুজাহিদদের তপ্ত রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। এদেশের অনেক গভীরে ইসলামের মূল শিকড় প্রোথিত এবং ইসলাম বিরোধীশক্তির যে কোনো ঝড়ো বাতাসে বাংলাদেশে ইসলামের বিশাল বৃক্ষ কখনোই উৎপাটিত হবে না।

মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে ইসলাম

নবী করীম (সাঃ) এর যুগ থেকে পরবর্তী প্রায় ছয়শত বছরব্যাপী ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকাসহ বাংলাদেশে চরম প্রতিকূল অবস্থা উপেক্ষা করে ব্যাপকভাবে নন্দিত আদর্শ ইসলাম প্রচার হতে থাকে। ইসলাম প্রচারকারী অগণিত আলেম ওলামাদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বিশাল আকৃতির গ্রন্থ রচিত হবে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ, তাবেতাবেঈ ও তাঁদের দ্বারা প্রশিক্ষিত দেশ-বিদেশের আলেমগণ বাংলার গ্রাম-গঞ্জে ইসলামের অমীয় বাণী ছড়িয়ে দেন। ইসলাম প্রচারের স্বার্থে এসব আলেম ওলামাগণ কেউ দূর-দূরান্তে গমন করেছেন, অনেকের সাথে পরবর্তীতে পরিবারের কারো সাক্ষাৎ ঘটেনি। কোথায় তাঁরা মৃতুবরণ করেছেন পরিবারের লোকজন জানতেও পারেনি। অনেকে শাহাদাতের উত্তপ্ত ময়দানে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। অনেকে সহায়-সম্পত্তি হারিয়েছেন। কেউ বা চরমভাবে হিন্দুদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। যাতায়াত ব্যবস্থা দুর্গম থাকার কারণে বিপদ সঙ্কুল পথ অতিক্রম করে তাঁরা শুধুমাত্র ইসলামের স্বার্থে সকল কষ্ট হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন। প্রায় ছয়শত বছর আলেম ওলামা যে ত্যাগ স্বীকার করে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তি রচনা করেছিলেন, সেই ভিত্তির ওপরই তুর্কিস্থানের মর্দে মুজাহিদ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজী এদেশে মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেছিলেন।

আলেম ওলামাদের এদেশের নির্যাতিত, নিষ্পেষিত বঞ্চিত জনগণ নিজেদের মুক্তিদাতার আসনে আসীন করেছিলেন এবং তাঁদের অসীম ত্যাগই এদেশে মুসলিম শাসনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো। এদেশের সকল ধর্মের সাধারণ মানুষ বর্ণবাদী হিন্দু রাজাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিলো। তাঁরা ইসলাম প্রচারক আলেম ওলামাদের নিজেদের মুক্তিদাতা হিসেবে

পেয়েছিলো। সে যুগের ওলামা সমাজ সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা ও সংগ্রামের মধ্যে একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি জনগণের সমর্থন ও সহমর্মিতার দৃঢ়ভিত্তি নির্মিত হয়েছিলো। রাজা লক্ষ্মন সেনও এ এলাকায় বহিরাগত ছিলো এবং তাঁকে উচ্ছেদকারী ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখয়িার খিলজীকে এ এলাকার জনগণ আরেকজন উৎপীড়ক হিসেবে দেখেনি। বরং তুর্কিস্থানের এ মুসলিম বিজেতার মধ্যে তাঁরা দেখেছেন তাদের মুক্তিদাতার প্রতিচ্ছবি।

বাংলাদেশে বহিরাগত মুসলিম শাসকদের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির কারিগর ছিলেন ওলামা সমাজ। গবেষক আসকার ইবনে শাইখ তাঁর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার প্রবন্ধে লিখেছেন, বাংলার আদি অধিবাসীদের সন্তানেরা যারা আর্যদের পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে গিয়ে নির্যাতিত হয়ে আসছিলো এতদিন, তারাও ইসলাম প্রচারকদের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। তারপর যখন প্রতিষ্ঠিত হলো লাখনৌতির মুসলিম রাজ্য, তখন এক বহিরাগত জালেম শক্তিকে উচ্ছেদকারী অন্য বহিরাগত মুসলিম শক্তিকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এলো না কেউ। এর তো একটি মাত্রই উত্তর। চরম অত্যাচারী বহিরাগত ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের উচ্ছেদকারী নতুন বহিরাগত মুসলিম শক্তিকে শত্রু না ভেবে মুক্তিদাতা হিসাবেই গ্রহণ করেছিলো বাংলার নির্যাতিত জনসাধারণ।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের কারণে লাখনৌতিকে কেন্দ্র করে বহিরাগত ও এদেশীয় নওমুসলিমদের সমন্বয়ে বাংলায় প্রথম আনুষ্ঠানিক মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া বিজয়ের একশত বছরের মধ্যে বাংলার প্রায় অর্ধেক এলাকায় মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং চৌদ্দ শতকের মধ্যে বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে আসে। ইতিহাস সাক্ষী, বাংলায় মুসলিম রাজ্য বিস্তার, মুসলিম সমাজ গঠন ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ওলামা সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। অপরদিকে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ায় হালাকু খান যে ধ্বংস যজ্ঞের সূচনা করেছিলো, সে সময় ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, তুর্কিস্থান ও ভারতের উত্তরাংশ থেকে অগণিত আলেম ওলামা বাংলাদেশে আগমন করেন। তাঁদের আগমনে বাংলাদেশে ইসলাম ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে।

তদানীন্তন যুগের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ওলামাদের মধ্যে ছিলেন, হযরত শাহ মখদুম গজনভী (রাহ:) মোঙ্গল কোট এলাকায় প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত জালাল

উদ্দীন তাবরিযী (রাহঃ) লাখনৌতি ও পাণ্ডুয়া এলাকায় ১২১৬ খৃষ্টাব্দে দায়িত্ব পালন করেন। হযরত মাহমুদ শাহ দৌলাহ শহীদ (রাহঃ) ১২৪০ থেকে ১২৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শাহজাদপুর এলাকায় দায়িত্ব পালন করেন। শাহ তুরকান (রাহঃ) বগুড়ায় দায়িত্ব পালন করেন এবং মাওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (রাহঃ) রাজশাহী এলাকায় ১২৫০ খৃষ্টাব্দে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। আল্লামা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ও আল্লামা শরফউদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী (রাহঃ) ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকার অদূরে সোনারগাঁ এলাকায় দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাম শাহ সুফী শহীদ (রাহঃ) ১২৯০ খৃষ্টাব্দে হুগলী এলাকায় ছিলেন। হযরত জাফর খাঁন গাযী (রাহঃ) ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। হযরত সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীন শাহ নেকমর্দান (রাহঃ) ১৩০২ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন।

হযরত শাহ জালাল (রাহঃ) ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ ও আসাম এলাকায় দায়িত্ব পালন করেন। হযরত সাইয়্যেদ আহমদ কল্লাহ শহীদ (রাহঃ) ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শাহ তান্নুরী ওরফে মীরান শাহ (রাহঃ) ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীপুর এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। মাওলানা আতা (রাহঃ) ১৩০৫ থেকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুরে এবং হযরত মখদুম শাহ জালাল উদ্দীন জাহাঁগাশত বোখারী (রাহঃ) ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে রংপুরে দায়িত্ব পালন করেন। হযরত সাইয়্যেদ আব্বাস আলী মক্কী ও রওশন আলী (রাহঃ) ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণা ও খুলনা এলাকায় দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আখি সিরাজ উদ্দীন, আল্লামা আলাউল হক, হযরত সাইয়্যেদ আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানী, হযরত হুসাইন যোক্করপোশ ও হযরত বদরুল ইসলাম শহীদ (রাহঃ) ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে গৌড় ও পাণ্ডুয়া এলাকায় দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত শাহ মোল্লাহ মিশকিন, হযরত শাহ নূর, হযরত শাহ আশরাফ কাবুলী, হযরত শাহ বান্দারী ও হযরত শাহ মোবারাক আলী ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম এলাকায় ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত সাইয়্যেদ রিযা ইয়েমেনী (রাহঃ) ১৩৪২ থেকে ১৩৫৮ ও হযরত রাসতি শাহ ও হযরত শাহ মুহাম্মাদ বাগদাদী (রাহঃ) ১৩৫১ থেকে ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা নোয়াখালী অঞ্চলে প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত নূর কুত্‌ব উল আলম, হযরত আনোয়ার শহীদ, হযরত জাহিদ (রাহঃ) ১৩৫০ থেকে ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে এবং হযরত সাইয়্যেদুল আরেফীন (রাহঃ) ১৩৫০ সালে পটুয়াখালী এলাকায় দায়িত্ব পালন করেন।

শাহ লঙ্গর (রাহঃ) ১৩০০ সালের পরে ঢাকায় দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৫০ সালের দিকে হযরত যায়নুদ্দীন বাগদাদী ও চিহিল গাজী (রাহঃ) রংপুর ও দিনাজপুরে, হযরত খান জাহান আলী (রাহঃ) যশোর, খুলনা ও বরিশালে ১৪৩৭ সালে ইসলাম প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত বদরুদ্দীন বদরে আলম শাহিদী ও শাহ মজলিশ (রাহঃ) ১৪৪০ সালে, হযরত হুসামউদ্দীন মানিকপুরী ১৪৭৭ সালে, হযরত সালেহ ১৫ শতকের শেষ দিকে ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জে দায়িত্ব পালন করেন। হযরত শাহ সাল্লাহ (রাহঃ) ১৫০৬ সাল পর্যন্ত সোনারগাঁ এ দায়িত্ব পালন করেন। হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রাহঃ) ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর ও ঢাকায় দায়িত্ব পালন করেন। হযরত একদিল শাহ (রাহঃ) চব্বিশ পরগণায় ১৫১৯ সাল পর্যন্ত ইসলাম প্রচার করেন। হযরত শাহ মুয়াজ্জাম হুসাইন দানিশমান্দ (রাহঃ) ১৫৪৫ সাল পর্যন্ত রাজশাহী এলাকায়, হযরত শাহ জামাল (রাহঃ) ১৬০৬ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ এলাকায়, হযরত বাহরাম শাক্কা (রাহঃ) পশ্চিম বঙ্গে ও হযরত শরফউদ্দীন চিশতী (রাহঃ) ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। এখানে এসব আলেম ওলামা হযরতদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম এ জন্যেই উল্লেখ করা হলো, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁরা যে কর্মকৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তা বর্তমান যুগের ওলামা হযরতদের অনেকেরই অজনা। তাঁদের কর্মকৌশল জানা থাকলে বর্তমান যুগে ইসলামী আন্দোলনের কাজে বহুলাংশে সহায়ক হবে।

তদানীন্তন যুগের ওলামা সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা থেকে বৃটিশ কর্তৃক এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা পর্যন্ত প্রায় আটশত বছর আলেম ওলামা সমাজ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এক স্বর্ণালী অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। এদেশের বাইরে থেকে যে সকল ওলামাগণ এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতীত সকলেই এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এখানেই ইন্তেকাল করেছেন। অগণিত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশ-বিদেশের বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীগণ সমবেত হয়ে ইসলাম সম্পর্কিত নানা বিষয়ে গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেছেন। মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে তাঁরা ইসলামের বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী, সমরকুশলী ও রাজনৈতিক যোগ্যতার

অধিকারী ছিলেন। অত্যাচারী হিন্দু শাসক ও সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে আলেম ওলামাদের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষ সশস্ত্র জিহাদের অবতীর্ণ হয়েছেন। সম্মুখ যুদ্ধে অনেকে বিজয়ী হয়ে গাযী উপাধি পেয়েছেন আবার অনেকে শাহাদাতবরণ করে শহীদ উপাধি পেয়েছেন।

তাঁরা ইসলাম শিক্ষা অর্জন করে শুধুমাত্র মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখেননি। অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ নিষ্পেষন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মজলুম মানুষের পক্ষাবলম্বন করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। অর্থোপার্জন, যশ খ্যাতি ও সম্পদের নেশা তাঁদের ছিলো না। মধ্যমপন্থী মিল্লাত হিসেবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব 'সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে বিরত' রাখার দায়িত্ব পালনই ছিলো তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বৃহত্তর আলেম সমাজ মুসলিম শাসকদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে মুসলিম রাজ্য বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। তাঁরা সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় যুদ্ধ করে বিভিন্ন নগর, শহর ও অঞ্চল জয় করে সেখানে নন্দিত আদর্শ ইসলামের রঙে মানুষকে রঙিন করেছেন।

তদানীন্তন যুগে অধিকাংশ সমাজ ছিলো গোষ্ঠীভিত্তিক এবং সমাজের একজন নেতা ছিলেন, সমাজের সকলের ওপর নেতার ব্যাপক প্রভাব ছিলো। ওলামা সমাজ এসব নেতৃবৃন্দের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য্য তুলে ধরতেন। নেতা ইসলাম গ্রহণ করলে সমাজের প্রত্যেক সদস্যই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। ওলামা সমাজ ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে এলাকায় জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন। সমাজের লোকদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে এবং তাদের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছেন। ওলামা সমাজের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, নৈতিক চরিত্র, সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা, জনগণের অভাব অনটন ও দুঃখ বেদনার সাথে নিজেদেরকে জড়িত করা ইত্যাদি কারণে সাধারণ জনগণ ওলামা হযরতদের মর্যাদার আসনে আসীন করেছিলো।

তৎকালীন বাংলাদেশের ওলামা সমাজ মুসলিম রাজ্য বিস্তার, রাজ্যের ঐক্য, সংহতি, সুরক্ষা, নিরাপত্তা বিধান ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। ওলামা হযরতদের ব্যক্তিত্ব ছিলো উৎসাহ ব্যঞ্জক। জনগণের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয়ে আলেমদের কেউ অংশগ্রহণ করলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ

উদ্দীপনা সৃষ্টি হতো। যুদ্ধের ময়দানে সেনাবাহিনীর সাথে যখন অংশগ্রহণ করতেন, তখন তাদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি হতো এবং তাঁরা অসীম সাহসে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যেতেন। এভাবে নিত্য নতুন এলাকা আলেম ওলামার সহযোগিতায় মুসলিম শাসনের অধিকারে এসেছিলো। মুসলিম শাসন সীমা বিস্তার ও হিন্দু রাজা এবং জমিদারদের অত্যাচারে নিষ্পেষিত জনগণকে নির্যাতনের কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মুসলিম শাসনকর্তা বা সেনাপতিদের সাথে আলেম সমাজ যোগ দিয়েছেন। ফলে মুসলিম বাহিনীতে অপরাজেয় নৈতিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে, আলেমদের উপস্থিতির কারণে মুসলিম বাহিনী শাহাদাতের অদম্য উদ্দীপনায় প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিম জনগণের ওপর আলেম সমাজের যে প্রভাব ছিলো, জনগণ আলেম সমাজকে যে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতো এবং তাঁদেরকে আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস বলে বিবেচনা করতো, তা ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুরা সুকৌশলে ধ্বংস করে দিয়ে নোংড়া চরিত্রের নীতিহীন রাজনীতিবিদ, অভিনেতা অভিনেত্রী, খেলোয়াড়, শিল্পী, চিত্রকর, কবি সাহিত্যিকদের প্রভাবশালী বানিয়েছে। যাদের স্বভাব চরিত্রে নৈতিক বন্ধন বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। মানুষের নৈতিক চরিত্র ধ্বংসে এরাই উৎসাহী ভূমিকা পালন করে। ইলেক্ট্রিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ায় এদেরকে প্রাধান্য দিয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার ও পণ্যদ্রব্যের প্রচারের ক্ষেত্রে মডেল বানিয়ে এদের প্রভাব বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমান জাতিসংঘও এসব চরিত্রহীন লোকদের শুভেচ্ছা দুত নির্বাচিত করছে। অপরদিকে মিডিয়াসমূহ আলেম ওলামাদের খল চরিত্র হিসেবে তুলে ধরছে এবং বর্তমানে তাঁদেরকে জঙ্গী সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে সাধারণ মুসলিমদের কাছে ঘৃণার পাত্রে পরিণত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। যে আলেম সমাজ ছিলেন মুসলিম শাসকদের পরামর্শদাতা এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে আসীন, জনগণের উন্নত চরিত্র গড়ার কারিগর, তাঁদেরকে প্রভাব প্রতিপত্তিহীন বানিয়ে শুধুমাত্র মসজিদ মাদ্রাসার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ করেছে।

অথচ যুদ্ধের ময়দানে আলেম সমাজের উপস্থিতি যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছে। ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকার পাকিস্তান আক্রমণ করলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার দেশের মসজিদসমূহের খতীবদের মাধ্যমে জিহাদ সম্পর্কে উদ্দীপনামূলক বক্তব্য এবং মিডিয়াতেও তাঁদেরকে নিয়োজিত করে সেনাবাহিনীকে উদ্দীপ্ত করতে জিহাদ সম্পর্কে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলো। ইতিহাস সাক্ষী, হযরত মাওলানা জাফর

খাঁন গাযী ও মাওলানা শাহ সফিউদ্দীন (রাহঃ) সাতগাঁওয়ের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে উক্ত এলাকা মুসলিম রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। হযরত শাহ জালাল ইয়েমেনী (রাহঃ) এবং তাঁর সাথীগণ উচ্চ পর্যায়ের আলিম ছিলেন। তিনি ও তাঁর সাথীগণ ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে শুধু খানকাভিত্তিক জীবন যাপন করেননি। সিকান্দার শাহের মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়ে সিলেটের হিন্দু রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সেখানে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের বিশাল সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হযরত খাঁন জাহান আলী (রাহঃ)। তিনি শুধু উচ্চ পর্যায়ের আলিমই ছিলেন না, একজন বিখ্যাত সমরবিদও ছিলেন এবং সে কারণে তাঁকে বিশাল বাহিনীর সেনাধ্যাক্ষ নির্বাচন করা হয়েছিলো। তিনি বৃহৎ খুলনা ও যশোরের দুর্গম অঞ্চলকে মুসলিম শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন। রুকন উদ্দীন বারবক শাহের শাসনামলে সে যুগের বিখ্যাত আলিম হযরত ইসমাঈল গাযী মক্কী (রাহঃ) উড়িষ্যার অত্যাচারিত হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মান্দারন বিজয় করেন, পরবর্তীতে তিনি কামরূপ বর্তমানের আসামের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে রাজাকে বাংলার সুলতানের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। সে যুগের সংগ্রামী আলেম সমাজ সংগ্রাম মুখর জীবন যাপন করেছেন এবং নিজেরা উদ্যোগী হয়ে মুসলিম শাসকদের কাছে গিয়ে রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শ দিয়েছেন। শাসকদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সতর্ক করে তাঁদের হৃদয়ে মহান আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন।

মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র বিপদগ্রস্ত হলে তাঁরা ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশের হেফাজত, স্বাধীনতা ও ঈমান হেফাজতের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সে যুগের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা আলাউল হক (রাহঃ) মুসলিম শাসকদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনায় অন্যায় নীতি পরিহার করার জন্যে সতর্ক করতেন। হযরত মাওলানা মুজাফ্ফর শামস বলখী (রাহঃ) সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহকে পত্র যোগে পরামর্শ দিতেন এবং ভ্রান্ত নীতির ব্যাপারে সতর্ক করতেন। সে যুগের আলেম সমাজ জ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে রাজনৈতিক দূরদর্শীতাসহ নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। হিন্দু রাজা গণেশের ব্যাপারে তাঁরা একাধিকবার মুসলিম শাসকবর্গকে সতর্ক করেছিলেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে আলেমদের পরামর্শ বাস্তবায়নে দেরী হবার কারণেই রাজা গণেশের নেতৃত্বে হিন্দুদের উত্থান ঘটেছিলো। এ উত্থানের বিরুদ্ধে মাওলানা নূর কুত্ব উল আলম (রাহঃ) এর নেতৃত্বে আলেম সমাজ প্রবল

প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো বিধায় মুসলিম রাজত্ব পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছিলো। ইতিহাসের প্রত্যেক বাঁকেই দেখা গিয়েছে, আলেম ওলামা হযরতগণ যখন ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে শাহাদাত কামনায় ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন, ইসলামের দুশমনগণ পরাজিত হয়ে গর্তে আত্মগোপনে বাধ্য হয়েছে।

সে যুগে শিক্ষা বিস্তার ও মানব সেবায় আলেম সমাজ

তদানীন্তন যুগে আলেম সমাজ দেশের জনগণের ওপর ব্যাপক প্রভাবশীল ও প্রেরণার উৎস ছিলেন। এ সম্পর্কে বৃটিশ শাসনের যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এদেশের মুসলিম জনসাধারণ অন্ধকারে রয়েছে। আলেম ওলামা সমাজের প্রকৃত পরিচয়, অবদান ও ভূমিকা সম্পর্কে জানলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে, মানুষ তাঁদেরকেই নেতৃত্বের আসনে আসীন করার আগ্রহ পোষণ করবে, এসব নানাবিধ কারণে ইসলামের দুশমনরা সংগ্রামী ওলামা হযরতদের ভূমিকা দৃষ্টির আড়ালে রেখেছে। যেমন তারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও এর প্রতিষ্ঠাতা ও বিরোধীদের ভূমিকা এ ভার্সিটির ছাত্রদের কাছে গোপন রেখেছে। দুশমনরা এ কথাও গোপন রেখেছে, এ বাংলা থেকে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও জ্ঞানহীনতা দূরীকরণে ওলামা সমাজই সবথেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন ও অবদান রেখেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পূর্বে ও পরে বিশেষ করে বাংলাদেশে আলেম সমাজ শিক্ষা বিস্তারে অন্যান্য সকলের তুলনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, সোনারগাঁ, গৌড়, পাণ্ডুয়া, দরসবাড়ী, মুরশিদাবাদ ইত্যাদি এলাকায় আলিমগণ বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। সোনার গাঁয়ে আল্লামা শেখ শরফ উদ্দীন আবু তাওয়ামা (রাহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আল্লামা মখদুম শাহ শরফ উদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী (রাহঃ) এর মতো ভারত বিখ্যাত মনীষীগণ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরের বহু দেশ থেকে জ্ঞান পিপাসু লোকজন এখানে ভীড় জমিয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেছেন। পাণ্ডুয়ায় আল্লামা আলাউল হক (রাহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আল্লামা মীর সাইয়্যেদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী, আল্লামা নাসির উদ্দীন মানিকপুরী ও আল্লামা হুসাইন যোক্করপোশ (রাহঃ) এর মতো

খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছাড়াও উত্তর ভারতের বিখ্যাত আলেমগণ শিক্ষা অর্জন করেছেন।

সমগ্র বাংলাদেশে আলেম ওলামাগণের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়, জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে এবং মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিলো। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে লোকজন দেশ ও জাতিয় ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছে এবং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের কেন্দ্র হিসেবে তৎপরতা চালিয়েছে। মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট মক্তবগুলোয় মুসলিম শিশু কিশোরগণ কোরআন শিক্ষা গ্রহণ করেছে। ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী তাঁর History of traditional Islamic education in Bangladesh নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বাংলার বর্ণাশ্রমভিত্তিক জনপদে সার্বজনীন শিক্ষার ধরন ও পদ্ধতি ওলামা সমাজই প্রথম আবিষ্কার করেন। ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় প্রতি তিনশত লোকের জন্য একটি করে আশি হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু ছিলো। ঐতিহাসিক ম্যাক্সমুলারও এ বিষয়টি উল্লেখ না করে পারেনি।

মানব সেবার ক্ষেত্রেও ওলামা সমাজ ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তাঁরা ইসলামের শিক্ষা বিস্তার ও মানুষের চরিত্র সংশোধন করে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে যে সকল কেন্দ্র নির্মাণ করছিলেন, সে কেন্দ্রগুলো দু:স্থ ও বিপন্ন মানুষের আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। এসব কেন্দ্র থেকে যেমন ইসলামের অমীয় বাণী প্রচারিত হতো তেমনি এসব কেন্দ্রের সাথে লঙ্গরখানা চালু ছিলো। প্রতিষ্ঠিত ছিলো দাতব্য চিকিৎসালয় ও সালিশী কেন্দ্র। ওলামাগণ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে গরীব দু:স্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন এবং সমাজের লোকদের পরস্পর মতবিরোধ ঘটলে মতানৈক্য দূর করে সুসম্পর্ক গড়ে দিতেন। জনগণের সহযোগিতায় আলিমগণ যে সকল লঙ্গরখানা চালু করেছিলেন, সেখানে সকল শ্রেণীর যে কোনো ধর্মের অনুসারীগণ দু'বেলা খাদ্য পেয়েছে। ঢাকার অদূরে নারায়নগঞ্জে যিনি লঙ্গরখানা চালু করেছিলেন, তাঁর প্রকৃত নাম হারিয়ে গিয়েছে, তিনি লঙ্গরখানার নামেই পরিচিত হয়ে শাহ লঙ্গর নামে পরিচিতি পেয়েছেন।

ইংরেজ গবেষক ব্লকম্যান তাঁর Contribution to the Geography and History of Bengal নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, উত্তর বঙ্গের বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক আল্লামা জালাল উদ্দীন তিবরিযী (রাহ:) অভাবী, বিপন্ন, দু:খী, দু:স্থ ও মুসাফীরদের জন্যে একটি বিরাট লঙ্গরখানা পরিচালনা করতেন। তিনি একাধারে ২৩ বছর যাবৎ এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে

ইসলামের শিক্ষা বিস্তার করেছেন, তাঁর কাছে অগণিত অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং বিপন্ন মানুষ তাঁকে মুক্তিদাতা হিসেবেই দেখতো। তাঁর ব্যাপক প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং এ এলাকায় মুসলিম শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতেও তাঁর অবদান অপরিসীম। পাণ্ডুয়ায় তিনি যে কেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন, তা মুসলিম সমাজের ভিত্তি সংহত করতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রসমূহ সে যুগের বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। মানুষ সাহায্যের আশায় আপনজনদের কাছ থেকে বিমুখ হলেও আলেম ওলামার কাছ থেকে বিমুখ হতো না।

তৎকালীন ওলামা সমাজ এভাবেই মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। আল্লামা হযরত আখি সিরাজ (রাহঃ) লাখনৌতিতে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেটি মানবসেবার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। সেখানে অগণিত অসহায়, গরীব দুঃস্থ মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। সেখানের দাতব্য চিকিৎসালয় এবং অনাথ আশ্রম মানবসেবায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো। তিনি যে বিশাল লঙ্গরখানা স্থাপন করেছিলেন, সেখানে ক্ষুধার্ত মানুষ তিন বেলা খাবার পেতেন। বহু সংখ্যক আলেমগণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে লঙ্গরখানা, দাবত্য চিকিৎসালয় ও অনাথ আশ্রমে মানবসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। আল্লামা আলাউল হক (রাহঃ) তাঁর মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন, তা দেখে তৎকালীন সুলতান সিকান্দার শাহ ইর্ষান্বিত ছিলেন। ইসলাম তরবারীর শক্তিতে বিস্তৃতি লাভ করেনি, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, সালফে সালেহীন, আইয়ামে মুজতাহেদীন ও আলেম ওলামাগণের মানব সেবা ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে ভীড় জমিয়েছে।

বাংলার ওলামা সমাজ মানবসেবাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, এ কারণেই তাঁরা সাধারণ জনগণের হৃদয় জয় করেছিলেন। হযরত আল্লামা নূর কুত্ব উল আলম (রাহঃ) সে যুগের একজন বিখ্যাত আলিম ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শেষে তিনি নিজ পিতা হযরত আল্লামা আলাউল হক (রাহঃ) এর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। পিতাপুত্র উভয়ে মিলে মানব সেবার যে কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, সে কেন্দ্রে আশ্রিত গরবী দুঃখী, অভাবী ও অসুস্থ লোকদের সেবা করাই ছিলো তাঁর কাজ। তিনি আশ্রিত লোকদের কাপড় ধুতেন, অযুর পানি গরম করে দিতেন, কেন্দ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে নিজে ঝাড়ু দিতেন এবং আশ্রিত লোকজনের মলত্যাগের

স্থান পরিষ্কার করতেন। অসুস্থ লোকদের মলত্যাগের স্থানে নিয়ে যাবার সময় অনেকেই তাঁর কাপড়ে মলত্যাগ করে দিতো। লঙ্গরখানার জন্যে তিনি স্বয়ং জ্বালানী কাঠ বহন করতেন।

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত আল্লামা নূর কুতুব উল আলম (রাহঃ)কে রাজদরবার থেকে উচ্চপদে চাকরীতে যোগ দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রচুর অর্থ ও বিলাসী জীবন এ আলেমকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করছিলো। তিনি কোনো কিছুর প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে মানবসেবার মাধ্যমে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটানোর কণ্টকাকীর্ণ জীবন বেছে নিয়েছিলেন। সে যুগের আলেম সমাজ যেমন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না, তেমনি তাঁরা শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি বিমুখও ছিলেন না। জনগণের নাড়ির সাথে ছিলো তাঁদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, এলাকার জনগণের দুঃখ, বেদনা, দুর্দশা, বিপদ মুসিবত, অভাব অনটন, আশা আকাঙ্খা ইত্যাদির সাথে তাঁরা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। জনগণের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করে তাঁরা মুসলিম শাসকদের সাথে যোগাযোগ রেখে যথাযথ পরামর্শ দিতেন। শাসক ও জনগণের মধ্যে তাঁরা সেতু বন্ধন গড়ে তুলেছিলেন এবং মানুষের কল্যাণে নানা ধরনের কর্মসূচী প্রণয়ন করে তা শাসকদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। ফলে শাসক ও শাসিতে তেমন ব্যবধান সৃষ্টি হয়নি এবং দেশের বিপুল সংখ্যক অমুসলিমদের ওপরে মুসলিম শাসকগণ নির্বিঘ্নে শাসন কার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তদানীন্তন যুগের আলেম ওলামাগণের ভূমিকা সম্পর্কে অধ্যাপক সাইয়্যেদ হাসান আশকারী উল্লেখ করেছেন, আলেম ওলামাগণ শাসক বা আমীর ওমরাহ তথা মন্ত্রী ও রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে কখনোই নিজেদের সত্তা বিলীন করে দেননি। তাঁরা স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাদের মধ্যে ইসলামী চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। ওলামাগণের প্রভাবে শাসকদের কার্যক্রম সাধারণ মানুষের কল্যাণে অনেক বেশী নিয়োজিত হতে পেরেছিলো। দীর্ঘস্থায়ী ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্যাতন ও শোষণমূলক শাসন ব্যবস্থার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানুষকে ওলামাগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুক্ত করেছেন। তাঁরা জনগণকে স্বাধীন, উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনধারায় পরিচালিত করেছেন। তাঁরা বর্ণবাদী ব্রাহ্মণদের শাসনের পাষাণ ভারাক্রান্ত স্পন্দনহীন জনজীবনে স্পন্দন সৃষ্টি করে যে গতিবেগ দান করেছিলেন, তা সাধারণ মানুষকে মুসলিম শাসকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে ব্যাপক অবদান রেখেছে।

মুসলিম রাজ্য পুনরুদ্ধারে আলেম সমাজ

আলেম ওলামা হযরতদের অবর্ণনীয় ত্যাগ তিতিক্ষার কারণেই বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তি রচিত হয়েছিলো এবং শাসকগণের ইসলামী চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁদের অসামান্য অবদান ছিলো। মদীনায় ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা লুপ্ত হবার প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর পর বাংলাদেশে মুসলিম শাসন যুগের সূচনা হয়েছিলো। যেদিন খিলাফত ব্যবস্থা লুপ্ত হলো সেদিন থেকেই প্রকৃত ইসলামী শাসন থেকে মুসলিম মিল্লাত ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকলো এবং এক কথায় মুসলিম মিল্লাতের পতনের সূচনা হলো। মুসলিম সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হয়ে শাসন ব্যবস্থায় রাজা বাদশাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো এবং ইসলামী বিধান অনুসরণে শাসকদের মধ্যে শিথিলতা দেখা দিলো। বাংলাদেশে যখন মুসলিম শাসনের সূচনা হলো তখন অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে মুসলিমগণ বিজ্ঞান চর্চায় বহুদূর এগিয়ে ছিলো এবং তাঁদের কাছ থেকে বিজ্ঞানের সুত্র জানার জন্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে জ্ঞান পিপাসুগণ মুসলিমদের সাথে যোগাযোগের সূচনা করেছিলো। অপরদিকে ইউরোপে খৃষ্টান পাদ্রীদের অপশাসনের বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধি চর্চাকারীদের ক্ষোভও দাঁনা বেঁধে উঠছিলো।

ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা লুপ্ত হবার পরে খোলাফায়ে রাশেদার অনুসৃত নীতি থেকে সরে এসে মুসলিম বিশ্বে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। ইসলামী আইন ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকলেও ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সূচীত হয়েছিলো। বাংলাদেশের মুসলিম শাসকগণ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম শাসকদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই অনুমিত হয়। কারণ বাংলাদেশের মুসলিম শাসকদের কেউ-ই খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেননি এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাও তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিলো না। তবে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও সমাজ জীবনে ইসলামী নীতিমালা বাস্তবায়নে তাঁরা অনুকূল ভূমিকা পালন করেছেন এবং ওলামা সমাজকে সহযোগিতা করেছেন।

বাংলার মুসলিম শাসকগণ শাসনতান্ত্রিক ধারায় একটি ইসলামী নীতি কার্যকর করেছিলেন, সেটি হলো কেউ-ই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। বাংলার শাসক গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ সম্পর্কে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ইসলামী নীতিমালা অনুসরণে অত্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। এক বিধবার পুত্র সন্তানকে আঘাত করার দায়ে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে কাজীর বিচারালয়ে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি খোলাফায়ে রাশেদার একটি আদর্শকে

সমুন্নত করেছিলেন। বিচার ব্যবস্থায় ইসলামী নীতিমালা সংযোজিত ছিলো বিধায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হয়েছিলো। এরপরেও বর্ণবাদী ব্রাহ্মণগণ মুসলিম শাসকদের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছিলো এবং আলেম সমাজ তা অনুধাবন করে শাসকদের সতর্কও করেছিলেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে নন্দিত আদর্শ ইসলামের সৌন্দর্য্য ব্যাপকভাবে সমগ্র ভারতে প্রচার হয়নি, যদি তা করা হতো তাহলে ভারতের ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতো। মুসলিম শাসকগণ উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে অমুসলিমদের বসিয়ে ছিলেন।

মুসলিম শাসকদের উদারতার সুযোগে বর্ণহিন্দুরা রাজপদে উচ্চ আসনে আসীন হয়ে ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ষড়যন্ত্রের ডাল পালা বিস্তৃত করছিলো। রাষ্ট্রীয় পদস্থ কর্মকর্তার আসনসমূহে হিন্দুদের বসানোর অশুভ ও মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে হযরত মাওলানা মুজাফফর শামস বলখী (রাহঃ) বাংলার শাসক গিয়াস উদ্দীন আযম শাহকে এক দীর্ঘ পত্রে সতর্ক করেছিলেন। তিনি পবিত্র কোরআন হাদীস ও ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পত্রে উল্লেখ করেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন, ইয়াহূদী ও মুশরিকরা তথা পৌত্তলিকরা ইসলাম এবং মুসলিমদের সবথেকে বড় শত্রু। তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অতি সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা অনুচিত, প্রয়োজনও নেই এবং বিপদের কারণ। গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ পত্র পাঠ করে পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে হিন্দুদের ষড়যন্ত্র শাখা প্রশাখা মেলে বহু দূর এগিয়ে ছিলো।

বাংলার মুসলিম শাসকের প্রভাবশালী হিন্দু মন্ত্রী এবং দিনাজপুরের ভাতুরিয়ার জমিদার গণেশের নেতৃত্বে অন্যান্য হিন্দু কর্মকর্তাদের ষড়যন্ত্রে বাংলার ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক গিয়াস উদ্দীন আযম শাহকে প্রাণ হারাতে হলো। আযম শাহ নিহত হবার পরে অনুকূল পরিবেশ না থাকার কারণে গণেশ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেনি। পরবর্তীতে বাংলার আরেক মুসলিম শাসক আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে হত্যা করে ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে গণেশ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিলো। সাম্প্রদায়িক হিন্দু ঐতিহাসিকগণ গণেশ কর্তৃক বাংলার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ও তারপরবর্তী ইতিহাসকে কালিমা লিপ্ত করে উল্লেখ করেছে, 'সেটি ছিলো হিন্দুদের পুনর্জাগরণের যুগ'। অথচ মুসলিম শাসনের অধীনে হিন্দুগণ নির্যাতিত হয়েছে, এ প্রমাণ কেউ-ই দিতে পারেনি। রাজা গণেশের বাংলার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের দুইশত বছরের মুসলিম বিদ্বেষ ও ক্ষোভ পুঞ্জিভূত আক্রোশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হিন্দু জমিদার গণেশ বাংলার ওপর আধিপত্য অর্জন করে সর্বপ্রথমে তিনি মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করলো। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের শেষ চিহ্ন মুছে দেয়াই তার স্থির লক্ষ্যে পরিণত হলো। তাঁর স্বল্পকাল মেয়াদী শাসনামলকে কোনো কোনো হিন্দু ঐতিহাসিক 'হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের প্রচেষ্টা' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দুইশত বছরের মুসলিম শাসনের পর ব্রাহ্মণ জমিদার ও মন্ত্রী গণেশের নেতৃত্বে এটি ছিলো বর্ণহিন্দুদের প্রথম অভ্যুত্থান। গণেশের রাজ্য শাসনের প্রকৃতি দেখে মনে হয়, বাংলার মাটি থেকে ইসলামের শেষ চিহ্ন বিদায় এবং বাংলার জনজীবনে ইসলামের কল্যাণ স্পর্শে মুক্তির যে বাতায়ন উন্মুক্ত হয়েছিলো তা পুনরায় রুদ্ধ করে দিতে তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন।

রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে গণেশ সর্বপ্রথম লক্ষ্য স্থির করলো বাংলার আলেম সমাজের দিকে। তাঁর জানা ছিলো, এই আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকার কারণেই বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে এবং মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এ কারণে সর্বপ্রথম আলেম সমাজকে ধ্বংস করার কর্মসূচী তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অগণিত মসজিদ, মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্যালয়, আলেম সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান তিনি ধ্বংস করলেন। বিখ্যাত আদিনা মসজিদকে তিনি কাচারী বাড়িতে পরিণত করলেন। তাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আলেম সমাজই গর্জে উঠেছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক আলেমদের গ্রেফতার করে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করলেন। শাহাদাতের অদম্য আগ্রহী আলেম সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিক গণেশের লোমহর্ষক নির্যাতনের সম্মুখে মাথানত করেননি। তাঁরা জনগণকে সংগঠিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। দুইশত বছর পর মুসলিম শাসনের অস্তিত্ব বিরোধী কার্যক্রমের মোকাবেলায় আলেম সমাজ জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিলেন। (সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, আব্বাস আলী খাঁন : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস)

তদানীন্তন যুগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা বদরুল ইসলাম (রাহঃ) এর ওপর গণেশ অবর্ণনীয় নির্যাতন শুরু করলো। গণেশকে কুর্ণিশ না করার কারণে ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে গণেশ তঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আমাকে কুর্ণিশ করলেন না কেনো?' ইসলামের মর্দে মুজাহিদ স্পষ্ট জবাব দিলেন, 'আমাদের পক্ষে পৌত্তলিকদের কুর্ণিশ করা শোভনীয় নয়।

বিশেষ করে তোমার মতো নররক্ত পিপাসু, নিষ্ঠুর নির্মম স্বভাব চরিত্রের অমুসলিম, যে মুসলমানদের রক্তপাত করছে, তাকে কুর্ণিশ করার প্রশ্নই আসে না'। ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমন গণেশ একটি নীচু ও সঙ্কীর্ণ দরজা বিশিষ্ট ঘরে মাওলান বদরুল ইসলাম (রাহ:) ও তাঁর কয়েকজন ভাইকে ডেকে পাঠালেন। ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হয়েই মাওলানা অনুভব করলেন, গণেশের সম্মুখে তাঁর মাথানত করানোর জন্যেই এই সঙ্কীর্ণ দরজার আয়োজন। তিনি ঘরের মধ্যে প্রথমে পা দিয়ে তারপর প্রবেশ করলেন। অত্যাচারী গণেশ মুহূর্তকাল দেরী না করে তাঁকে ও তাঁর ভাইদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো।

মুসলমানদের হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারে অগণিত আলেম ওলামা শাহাদাতবরণ করেছেন। তাঁদের তপ্ত রক্ত বৃথা যায়নি এবং তাঁদের রক্তের বন্যায় ইসলামের দুশমনরা ভেসে যেতে বাধ্য হয়েছে, রাজা গণেশও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের মুসলিমদের দু:সময়ে আল্লামা আলাউল হক (রাহ:) এর সুযোগ্য সন্তান এবং সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামা নূর কুত্ব উল আলম (রাহ:) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বাংলার মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করে জৌনপুরের শাসক ইবরাহীম শর্কীকে পত্র লিখেছিলেন। তদানীন্তন যুগের মুসলিম শাসকগণ আল্লামা নূর কুত্ব উল আলমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। ভারতবর্ষের প্রায় আলেমদের কাছেই আল্লামা নূর কুত্ব উল আলম (রাহ:) বাংলাদেশে গণেশের অত্যাচারে মুসলিমদের দূরাবস্থা সম্পর্কে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। ইসলাম, দেশ ও জাতিকে গণেশের নির্যাতন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি অসীম ত্যাগ স্বীকার করে বিশাল ভূমিকা পালন করেছেন।

পত্রে তিনি জৌনপুরের মুসলিম শাসক ইবরাহীম শর্কীকে লিখেছিলেন, প্রায় তিনশত বছর পরে বাংলার ইসলামী রঙে রঙিন ভূমিতে ইসলাম, ঈমান ও আলেম ওলামা বিধ্বংসী কাফিরদের অশুভ কালোছায়া পড়ে সমগ্র দেশ অন্ধকারের গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। এখানে ইসলামের অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন এবং মুসলিমদের সম্মান মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত। মুসলিম পুরুষদের প্রাণ বিপন্ন এবং নারীদের সম্ভ্রম নিরাপত্তাহীন। সমগ্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের যে প্রদীপগুলো আলোর জ্যোতি বিকিরণ করে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতো, সেগুলো গণেশ সৃষ্ট প্রবল ঝড়ে নির্বাপিত হয়েছে। আলেম ওলামার রক্তে এদেশের মাটি প্রতি নিয়ত রঞ্জিত হচ্ছে। মুসলিম শিশু-কিশোররা হারিয়ে যাচ্ছে, কোথাও কারো নিরাপত্তা নেই। ইসলাম ও মুসলিমদের এই চরম দুর্দিনে আপনি কিভাবে প্রশান্তিতে সিংহাসনে বসে রয়েছেন? আপনি

নিশ্চিন্ত রয়েছেন অথচ এখানে আপনার মুসলিম মা-বোনরা ইজ্জত হারাচ্ছে। এখানে কুফ্‌রীর আগুনের লেলিহান শিখা সকল কিছুকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে আর আপনি আপনার তলোয়ার কোষাবদ্ধ করে রেখেছেন। এদেশকে পৃথিবীর স্বর্গ বলা হয়, অথচ গণেশ এদেশকে নরকে পরিণত করেছে। প্রত্যেক নাগরিকের ওপর এমন অত্যাচার চলছে যা পত্রে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আপনি আর মুহূর্তকাল সিংহাসনে বসে বিশ্রাম গ্রহণ করবেন না। (Bengal past and present, Vol-LXVII, 1948, p-32-33, সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর)

এভাবে তদানীন্তন বাংলার সংগ্রামী আলেম সমাজ দেশের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে বিভিন্ন স্থানে পত্র প্রেরণ করেন। হযরত মাওলানা আশরাফ সিমনানী (রাহঃ) মুসলিম শাসক ইবরাহীম শর্কীকে উদ্বুদ্ধ করে বাংলাদেশে অভিযান পরিচালনা করতে যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাতে তিনি উল্লেখ করেন, 'আল্লাহভীরু শাসকদের পক্ষে মুসলমানদের জীবন ব্যবস্থা ইসলাম ও ঈমানের হেফাজতের জন্য সেনাবাহিনী পরিচালনার তুলনায় সর্বোত্তম কাজ আর কিছুই নেই'। আল্লামা আশরাফ সিমনানী (রাহঃ) আল্লামা নূর কুত্‌ব (রাহঃ)কে পত্র প্রেরণ করে জানিয়ে দেন, 'স্বয়ং ইবরাহীম শর্কী তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে ইতোমধ্যেই আপনার দেশের দিকে যাত্রা করেছেন। তিনি কাফিরদের উচিত শিক্ষা দিতে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ। আশা করা যাচ্ছে যে, মুসলিমগণ অত্যাচারী গণেশের অত্যাচার থেকে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করবে'। (সুখময় মুখোপাধ্যায়ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর)

বিশ্বাসঘাতক গণেশ বিপদের গুরুত্ব অনুধাবন করে আলেম সমাজের পায়ের ওপর আছড়ে পড়েন। তৎকালীন বাংলার আলেমদের মধ্যমণি আল্লামা নূর কুত্‌ব উল আলম (রাহঃ)-এর কাছে গিয়ে অনিবার্য বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্যে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাতে থাকেন। কিন্তু আলেমদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত তাকে হতাশ করে। তার অত্যাচার স্মরণ করে আলেমগণ তাঁকে রাষ্ট্র ক্ষমতা ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। অবশেষে নিজ প্রাণ রক্ষার তাগিদে গণেশ ইসলাম গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পরে তিনি নিজের পরিবর্তে তাঁর সন্তান যদু ওরফে জিতমল ইসলাম কবুল করবে বলে জানান। আলেমগণ গণেশের এ প্রস্তাব গ্রহণ করে ইবরাহীম শর্কীকে সেনাবাহিনীসহ ফিরে যাবার অনুরোধ জানান। ইবরাহীম শর্কী অসন্তুষ্ট চিত্তে নিজ রাজ্যে ফিরে যান। আল্লামা নূর কুত্‌ব

উল আলম (রাহঃ) এর কাছে গণেশ তনয় জিতমল ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নামকরণ করা হয় জালাল উদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ।

গণেশ পুত্র জিতমলের ইসলাম গ্রহণ করে জালাল উদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ নাম ধারণ করে বাংলার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার ইতিহাস হিন্দু ঐতিহাসিকগণ বিকৃত করে নানা ধরনের কল্পিত কাহিনী আবিষ্কার করেছে। কল্পিত কাহিনীর জন্ম দিতে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন হিন্দু ঐতিহাসিকদের অনেকেই সে যুগের সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীদের পতিতা পর্যন্ত বানিয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আব্বাস আলী খাঁন (রাহঃ) তাঁর 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে হিন্দু ঐতিহাসিকদের সাম্প্রদায়িকতার জাল ছিন্ন ও তাদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে সকল সত্য সম্মুখে এনেছেন। প্রকৃত বিষয় হলো, নিজ পিতা গণেশের ধূর্তামি সম্পর্কে যদু ওরফে জিতমল যেমন অবগত ছিলো এবং তাঁর উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনা ও মুসলিম নিপীড়নের কারণে জিতমল পিতা গণেশের প্রতি রুষ্ট ছিলো। আল্লামা নূর কুত্ব উল আলম (রাহঃ) এর সাথে যদুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে সে ইসলামের নান্দিক সৌন্দর্য্য অনুধাবন করেছিলো। এ কারণে আলেম সমাজ তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হবার ব্যাপারে সম্মতি দিয়ে ইবরাহীম শর্কীকে সীমান্ত থেকেই ফিরে যাবার অনুরোধ করেছিলেন।

বাংলার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়ে গণেশ পুত্র নওমুসলিম জালাল উদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ ব্যক্তি জীবনে যেমন ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করতেন তেমনি রাজ্যেও ইসলামী বিধি বিধান জারী করেছিলেন। নিজ পিতা গণেশ কর্তৃক প্রবর্তিত মদ্যপান তিনি নিষিদ্ধ করেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসার কাজেও তিনি ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তাঁর শাসনামলে চীন সম্রাটের একটি প্রতিনিধি দল বাংলায় আগমন করলে তিনি তাদের সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করেন। প্রতিনিধি দলকে তিনি মোষ, গরুর গোস্ত ও শরবত দিয়ে আপ্যায়ন করেন। কিন্তু তাঁর পিতা বিশ্বাসঘাতক গণেশ নীরব ছিলেন না, চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে থাকেন এবং সুযোগ বুঝে নিজ মুসলিম পুত্র জালাল উদ্দীন মুহাম্মাদ শাহকে বন্দী করে পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হন। রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়ে গণেশ পূর্বের তুলনায় অধিক উৎসাহে মুসলিম নিধন যজ্ঞ শুরু করেন।

নিজ পুত্র জালাল উদ্দীন মুহাম্মাদ শাহকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্যে নির্যাতন শুরু করেন। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী নিজ সন্তানকে জাতে তোলার জন্যে 'সুবর্ণধেণু ব্রত' এর আয়োজন করেন। অর্থাৎ একটি বিশাল আকৃতির স্বর্ণ

নির্মিত গরু তৈরী করা হয়। এরপর নানা ধরনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ঐ গরুর মুখ দিয়ে নিজ পুত্রকে প্রবেশ করিয়ে মলদ্বার দিয়ে টেনে বের করা হয়। ইসলাম গ্রহণ করে নিজ পুত্র যে পাপ করেছিলো তা স্খলনের আয়োজন করেও ধূর্ত গণেশ নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। তিনি জালাল উদ্দীন মুহাম্মাদ শাহকে কারাগারে বন্দী করে রাখেন। গণেশ নতুন উদ্যোমে আলেম ওলামা নিধনের কর্মসূচী গ্রহণ করে সর্বপ্রথমে আল্লামা নূর কুত্ব উল আলম (রাহঃ) এর ওপর নির্যাতন শুরু করে। ইসলামের এ মর্দে মুজাহিদের বসতবাড়ী ধূলায় মিশিয়ে দেয়া হয়, তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের ওপরে অকল্পনীয় নির্যাতন করা হয়। এমনকি তাঁর আশ্রিত লোকজন ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোকজনও গণেশের নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্ত থাকেনি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও গরবী দুঃখীদের আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ আগুনে ভস্মিভূত করা হয়।

আল্লামা নূর কুত্ব উল আলম (রাহঃ) এর দু'জন সুযোগ্য সন্তান আল্লামা আনোয়ার ও আল্লামা জাহিদকে প্রথমে গ্রেফতার করে নির্বাসনে পাঠায় গণেশ। স্বয়ং নূর কুত্বকে সমর্থন দেয়ার জন্যে গণেশ চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু তিনি ইসলামের দুশমনদের কাছে মাথানত করেননি। তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়, তিনি যদি গণের প্রস্তাবে রাজী হয়ে তাঁকে সমর্থন ও সহযোগিতা না করেন তাহলে তাঁর দুই সন্তান আনোয়ার ও জাহিদকে লোমহর্ষক নির্যাতনে হত্যা করা হবে। নিষ্ঠুর এ প্রস্তাবেও তিনি নিজ আদর্শ ইসলামের প্রতি অবিচল থেকে জানিয়ে দেন, কোনো অবস্থাতেই তিনি ইসলামের দুশমনদের কাছে নিজ মাথা বিক্রি করবেন না। এরপর তাঁর সুযোগ্য পুত্রকে গণেশ নির্মম নির্যাতনে হত্যা করে। ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, যেদিন আল্লামা নূর কুত্ব উল আলম (রাহঃ) এর সুযোগ্য সন্তানদের রক্তে সোনারগাঁয়ের মাটি রঞ্জিত হয়, সেদিনই অত্যাচারী গণেশও মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে জাহান্নামের দিকে যাত্রা করে।

গণেশের মৃত্যুকে কেন্দ্র করেও জড়বাদে বিশ্বাসী বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন ধরনের কল্পিত কাহিনীর জন্ম দিয়ে জালাল উদ্দীন মুহাম্মাদ শাহকে কলঙ্কিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। গণেশের মৃত্যুর পরে জালাল উদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ দ্বিতীয়বার বাংলার শাসক হিসেবে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁর পিতা গণেশ দেশের সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা, ওলামা সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান যেভাবে ধ্বংস করেছিলো, তা তিনি পুনরায় নির্মাণ করেন। সমগ্র

বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিস্তারে তিনি আলেম ওলামাগণকে সহযোগিতা করেন। এ বাংলাদেশের মাটি আলেম ওলামাগণের রক্তে নন্দিত আদর্শ ইসলামের জন্যে উর্বর হয়েছে। এ উর্বরতাকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে দুশমনরা অত্যন্ত তৎপর, এ ব্যাপারে আলেম ওলামা ও সচেতন মুসলিম সমাজকে সজাগ সতর্ক থেকে সময়োচিত ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

আকবরের কুফুরী মতবাদের বন্যা ও আলেম সমাজ

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মদীনার খেলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্তির বহু পরে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা মুসলিম শাসকদের মূল লক্ষ্য ছিলো না। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের কারণে অগণিত অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন, কিন্তু নওমুসলিমদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামী চরিত্র সৃষ্টি ও মন-মানসিকতায় ইসলামী চেতনা দৃঢ় করার জন্যে যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিলো, নবী করীম (সাঃ) যেভাবে সাহাবায়ে কেরামকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, সে প্রশিক্ষণের অভাবে অধিকাংশ নওমুসলিমের জীবন ধারায় ইসলাম গ্রহণের পূর্ববর্তী চিন্তা চেতনার ব্যাপক প্রভাব অবশিষ্ট ছিলো। যদিও আলেম ওলামাগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে কুফুরী চিন্তা চেতনার প্রভাব মুসলিমদের জীবন থেকে ক্রমশঃ দূরিভূত হচ্ছিলো। অপরদিকে খোদ আলেম সমাজেরই একটি অংশ মারেফতের নামে ইসলামের বিপরীত চিন্তা বিশ্বাসে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো।

আরেকদিকে শ্রীচৈতন্যদেবের আদিরস ও রাধাকৃষ্ণের কামকেলীর আন্দোলন বাংলায় অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং প্রকৃত ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত বহু সংখ্যক মুসলিমও তাঁর আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। চৈতন্যদেব আদিরস ভিত্তিক মতবাদ প্রচারের পাশাপাশি ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে প্রবল হিংসা বিদ্বেষ প্রচার করতে থাকে। হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথার কারণে নিম্ন বর্ণের হিন্দুগণ ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এ কারণে চৈতন্যদেব তাদেরকে হিন্দুধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখার কৌশল অবলম্বন করেছিলো। চিন্তাবিদ ও গবেষক আব্দুল মান্নান তালিব উল্লেখ করেছেন, যুগ ধর্মের তাগিদে চৈতন্যদেব সংকীর্তন ও নগর কীর্তনের প্রচলন করেন। বৈষ্ণবেরা সংকীর্তনের ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে ঢাক-ঢোল, খোল-করতাল ও মৃদঙ্গ বাজিয়ে এবং গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে নগর কীর্তনে

বের হতো এবং আনন্দে উদ্বেল হয়ে নতৃগীত করতে করতে শোভাযাত্রা সহকারে এমনভাবে রাজপথসমূহ প্রদক্ষিণ করতো যে, সমগ্র শহর মুখরিত হয়ে উঠতো। এভাবে তারা মানুষকে কীর্তনের প্রভাবাধীনে আনার চেষ্টা করতো। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলাই হচ্ছে তাদের ঈশ্বরপ্রেমের প্রতীক। চৈতন্যদেব স্বকীয়া প্রেমের তুলনায় পরকীয়া প্রেমকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ এর প্রভাব অনেক বেশী। বৃন্দাবনের গোপীগণের কিশোর কৃষ্ণের সাথে রাধার লাস্য ও মাদুর্যপূর্ণ লীলাকে কেন্দ্র করে ভগবত ভক্তি ও ঈশ্বর প্রেমের বিকাশ ছিলো বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। এ প্রেমের উচ্ছ্বাসে শ্রীচৈতন্য কখনো কখনো উন্মাদ ও সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়তেন এবং প্রেমরস আস্বাদনের প্রকৃষ্ট উপায় হিসেবে তিনি হরিণাম সংকীর্তনের প্রচলন করেন। (আব্দুল মান্নান তালিবঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃষ্ঠা ২২৭-২২৯)

শ্রীচৈতন্যের ধর্মাদর্শে সঞ্চারিত আদিরস সম্পর্কে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 'গীতগৌবিন্দের দ্বাদশ সর্গে রাধা কৃষ্ণের কামকেলীর যে বর্ণনা আছে, বর্তমানকালের কোনো গ্রন্থে তা থাকলে উক্ত গ্রন্থকার দুর্নীতির দায়ে আদালতে দণ্ডিত হতেন'। চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সম্পর্কে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ ড. বিমলবিহারী মজুমদার লিখেছেন, 'আদিরসের ছড়াছড়ি থাকায় কাব্যটি প্রায় পর্ণোগ্রাফীর পর্যায়ে পড়েছে। শ্রীচৈতন্য পুরাতন বৈষ্ণব ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চালান। এর ফলে বাংলাদেশের ধর্ম রাজ্যে বীভৎসতার সৃষ্টি হয়। হিন্দুর সাথে সাথে মুসলমানদেরও তার ফলে যথেষ্ট সর্বনাশ হয়েছিলো'। হিংসা ও সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি এবং রজকীনি প্রেমের আদিরস সঞ্চার করে শ্রীচৈতন্য নিম্নবর্ণ হিন্দুদের একটি বড় অংশকে ইসলামের প্রভাবসীমা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। এ সম্পর্কে আযার্চ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মন্তব্য করেছেন, 'শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব না হলে জাতিভেদের জন্যই কিছু উঁচু বর্ণের হিন্দু ব্যতীত সকলেই মুসলমান হয়ে যেতো'। (কলিকাতা থেকে প্রকাশিত, বাংলার রূপরেখা, পৃষ্ঠা-২৭)

শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ ও অন্যান্য বিকৃত চিন্তা-চেতনায় একশ্রেণীর লোকজন প্রবলভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাদের বিকৃত ও শিরকমূলক চিন্তা-চেতনার প্রভাব থেকে কতক মুসলিম শাসকও প্রভাবিত হয়েছিলেন। সবথেকে বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন সম্রাট আকবর। আকবর তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন এ কথা সত্য, তবে তার জ্ঞান-ভাণ্ডার ছিলো শূন্য। একদিকে মূর্খতা ওপরদিকে বিপুল ক্ষমতা, এ দুই বিপরীতমুখী অবস্থা আকবরের জন্যে পথভ্রষ্টতার কারণে পরিণত হয়েছিলো। একদিকে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের বাদশাহ, অন্যদিকে

মুসলিমদের সামরিক মেরুদণ্ড বলে স্বীকৃত তুর্কী ও পাঠানরা ছিলো তাঁর প্রবল বিরোধী। এ অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোরঞ্জন করতে তিনি দ্বীন-ই ইলাহী নামে তথাকথিত এক নতুন ধর্মমতের প্রচার শুরু করেন। তাঁর নতুন ধর্মে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য সকল ধর্মের অনুষ্ঠানসমূহ দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করা হয়। আকবরের বিকৃত ও ভ্রান্ত চিন্তার প্রভাব বাংলাদেশেও পৌঁছেছিলো। হিন্দু লেখক, গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ আকবর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, তাঁকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও নাটক রচনা করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'ইয়াহূদী ও পৌত্তলিকরা কখনোই তোমাদেরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ তোমরা ইসলাম ত্যাগ করে তাদের আদর্শ গ্রহণ না করো'। আকবর ইসলাম ত্যাগ করেছিলেন বিধায় তাঁর প্রশংসার বন্যা প্রবাহিত করেছে হিন্দুগণ, এ জন্যে আকবরের স্বভাব, চরিত্র ও নীতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

সম্রাট আকবরের নামটি শুধু মুসলিমদের অনুরূপ ছিলো। প্রকৃত পক্ষে তিনি মুসলিম ছিলেন না। আকবর স্বয়ং কপালে চন্দন তিলক ব্যবহার করতেন, গলায় পরতেন রুদ্রাক্ষের মালা। সকাল সন্ধ্যায় সূর্য বন্দনা করতেন। তিনি হিন্দু নারীদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রাসাদে নিয়মিত মূর্তি ও অগ্নিপূজা চালু করলেন। হিন্দুদের অবাধে মূর্তিপূজার সুযোগ দিলেও মুসলিমদের ধর্ম পালন অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হলো। হিন্দুরা তাঁকে ভগবানের আসনে বসিয়ে 'দিল্লীশ্বরো- জগদিশ্বরো' বলে পরম উৎসাহে রাজদরবারসহ সর্বত্র ধ্বনি দিতে লাগলো। সরকারী মুদ্রা থেকে পবিত্র কালেমা তৈইয়্যেবা লেখা ছিলো, তা উৎখাত করে লেখা হলো, 'আল্লাহু আকবর-জাল্লাজালালাহু'। এ লেখাটিও এমনভাবে উৎকীর্ণ করা হলো যে, দেখলে মনে হতো 'জালালুদ্দীন আকবর'। ইয়াহূদী, ব্রাহ্মণ, পাদ্রী, অগ্নিপূজক ও ভ্রান্ত শিয়াগণ ছিলো তাঁর উপদেষ্টা। এদের পরামর্শেই আকবর ইসলাম বিকৃত ও বিতাড়িত করার কর্মসূচী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলো।

ইসলামী পদ্ধতিতে পরস্পরের দেখা সাক্ষাতে আচ্ছালামু আলাইকুম বলার রীতি রহিত করা হলো এবং এ রীতি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমল পর্যন্ত বহাল ছিলো। সালামের পরিবর্তে নতজানু হয়ে বাদশাহকে সিজদা করতে মুসলিমদের বাধ্য করা হলো। আকবর দেশে গরু জবেহ, মুখে দাড়ি রাখা ও নামাজের জন্যে আযান দেয়া নিষিদ্ধ করলো। অগণিত মসজিদ ধ্বংস করা হলো, মসজিদকে মন্দির ও নাট্যশালায় রূপান্তরিত করা হলো। মুসলিমদের ঈমান আকিদার বিপরীত আইন জারী করে তা মুসলিমদের অনুসরণে বাধ্য করা হলো। বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের যুগে অর্থ বিত্ত লোভী এক শ্রেণীর

দুনিয়া পূজাড়ী আলেম ছিলো, যারা অর্থের লোভে উভয় বাদশাহকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতো এবং প্রকৃত হক্কানী আলেমদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতো। অবশ্য এই শ্রেণীর ওলামার অস্তিত্ব সকল যুগেই ছিলো, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহঃ) উল্লেখ করেছেন, 'বাদশাহ আকবর স্বয়ং ধারণা করতেন, ইসলাম মূর্খ ও অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলো এবং ইসলাম সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতির উপযোগী নয়। নবুওয়াত, ওহী, আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইসলামের এসব মূল বিশ্বাসকে বিদ্রুপের বস্তুতে পরিণত করা হয়। পবিত্র কোরআন আল্লাহর বাণী কি না এ ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়। ওহীর অবতরণ বুদ্ধিবিরোধী বলে প্রচার করা হয়। মৃত্যুর পরে আখিরাতের জীবন এক অনিশ্চিত বিশ্বাস বলে প্রচারিত হয়। তবে হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ সকল দিক দিয়েই যুক্তিযুক্ত ও সম্ভবপর বলে বিবেচনা করা হয়। নবী করীম (সাঃ) এর মিরাজ এক অসম্ভব বিষয় বলে গণ্য করে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কটুক্তি করা হয়। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর পবিত্রা স্ত্রীদের সংখ্যা ও তাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জিহাদসমূহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করা হয়। 'আহমাদ ও মুহাম্মাদ' নাম দুটির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে এ নাম যাদের ছিলো তা পরিবর্তন করা হয়।

আকবরের যুগে বেয়াদবীর চরম সীমা লঙ্ঘন করে রাসূল (আঃ) এর মধ্যে দাজ্জালের চিহ্ন আবিষ্কারের ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করা হয়। আকবরের শাহী দেওয়ান খানায় নামাজ আদায় ছিলো নিষিদ্ধ এবং আকবরের সভাষদ আবুল ফজল নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত ও ইসলামের অন্যান্য ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কঠোর আপত্তি উত্থাপন করে এগুলোকে পরিহাস করে। রাজদরবারের কবি সাহিত্যিকগণ ইসলামকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে কবিতা ও সাহিত্য রচনা করে। প্রকৃতপক্ষে বাহাই মতবাদের ভিত্তিও আকবরের যুগেই স্থাপিত হয়। প্রচার করা হতে থাকে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) যে দ্বীন পেশ করেছিলেন তার মেয়াদ ছিলো এক হাজার বছর, বর্তমানে তা পূর্ণ হয়েছে বিধায় নতুন দ্বীনের প্রয়োজন। মুদ্রার মাধ্যমে এ মতবাদ প্রচারিত হতে থাকে, কারণ সে যুগে মুদ্রাই ছিলো প্রচারের সবথেকে বড় মাধ্যম। এরপর বাদশাহ আকবর হিন্দু ব্রাহ্মণ, পাদ্রী, অগ্নিপূজক ও একশ্রেণীর দরবারী দুনিয়া পূজাড়ী আলেমের সহযোগিতায় এক নতুন মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করে এর নাম দেয় দ্বীন-ই ইলাহী।

প্রকৃতপক্ষে এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো বিভিন্ন ধর্মকে মিলিয়ে একটি মিশ্রিত ধর্ম আবিষ্কার করা, যেনো সরকারের শাসন শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। দরবারের ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ভবিষ্যৎ বাণী শোনাতে থাকে যে, এই যুগেই একজন বাদশাহ আগমন করে তিনি গোহত্যা রোধ করবেন। বাদশাহ আকবরই সেই প্রতিশ্রুত বাদশাহ। সরকারী আলেমরা আকবরই ইমাম মাহদী, যুগস্রষ্টা, মুজতাহিদ, জামানার ইমাম, শরিয়াত প্রণেতা, তিনি আল্লাহর প্রতিবিম্ব ইত্যাদি বিশেষণে আকবরকে ভূষিত করতে থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করা হতে থাকে যে, সকল ধর্মই সত্য এবং ধর্মীয় বিরোধ অবসানের জন্যে সকল ধর্মের সমন্বয়ে একটি ধর্ম প্রণয়ন করা উচিত। আর সেই ধর্মের নাম দ্বীন-ই ইলাহী। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-আকবর খলিফাতুল্লাহ' এই ধর্মের কালেমা নির্ধারিত হয়। ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ ও তাওবা করে এই নতুন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে হত। যারা নতুন ধর্ম গ্রহণ করতো তাদেরকে 'চেলা' আখ্যা দিয়ে আকবর বাদশার চিত্র দেয়া হতো, এ চিত্র তারা পাগড়ীতে ব্যবহার করতো। সালাম প্রথার পরিবর্তন করে নিয়ম করা হয়েছিলো, সালামকারী আল্লাহু আকবর বলবে আর জবাবদাতা বলবে জাল্লেজালালাহু।

প্রতিদিন প্রত্যুষে বাদশাহকে দর্শন করে তাকে সিজদা করা হত। দরবারী আলেমগণ তাকে হুমড়ী খেয়ে পড়ে সিজদা দিত। নতুন ধর্মের ভিত্তি স্থাপনের সময় যদিও প্রচার করা হয়েছিলো, সকল ধর্মের সমন্বয়ে নতুন ধর্ম রচিত হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো, ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম এতে স্থান পেয়েছে, আর ইসলামকে ঘৃণা ও বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত করা হয়েছে। অগ্নিপূজা ও মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা করে প্রদীপ জ্বালানোর সময় আগুনের সম্মানে দাঁড়ানো বাধ্যতামূলক ছিলো। খৃষ্টানদের কাছ থেকে 'ঘন্টা বাজানো' ও ত্রিত্ববাদ গ্রহণ করা হয়। সবথেকে বেশী নিয়ম নীতি গ্রহণ করা হয় হিন্দুদের কাছ থেকে। কারণ তারাই ছিলো দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং এদেরকে সন্তুষ্ট করা আকবরের ক্ষমতার জন্যে বেশী প্রয়োজন ছিলো। গরু জবেহ নিষিদ্ধ করে হিন্দুদের উৎসব, দেওয়ালী, শিবরাত্রি, পুণম, রাখী, দশোহারা ইত্যাদি হিন্দুরীতি অনুযায়ী পালন করা বাধ্যতামূল করা হলো। প্রতিদিন চারবার সূর্যের উপাসনা ও সূর্যের এক হাজার নাম জপ করা হত। সূর্যের নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে বলা হতো, 'তার শক্তি মহান'। কপালে তিলক ধারণ, কোমর ও কাঁধে পৈতা বাঁধা, মাথায় টিকি রাখা ও গরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হত।

ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে বিষোদগার করা হত এবং যে সকল ওলামা হযরতগণ এসবের বিরোধিতা করতেন, তাদেরকে নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করে নির্যাতন করা হত। সুদ, জুয়া, মদ, বাঘ, সিংহ ও শূকরের গোস্ত হালাল ঘোষণা দেয়া হলো। শূকরকে পবিত্র প্রাণী ঘোষণা দিয়ে প্রতিদিন সকালে শূকর দর্শনকে শুভ লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হত। রাজ সভায় মদ পান অপরিহার্য করা হলো এবং কাজী ও মুফতীদের মদ পানে বাধ্য করা হলো। দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ করা হলো, চাচাত ও মামাত বোনদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ হলো। একাধিক বিয়েও নিষেধ করা হলো এবং পুরুষদের জন্যে ১৬ বছর ও মেয়েদের জন্যে ১৪ বছর বিয়ের বয়স নির্ধারিত হলো। মুসলিম মৃতদেহ পুড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করা হলো, আর যদিও তা কবরস্থ করা হয় তাহলে পবিত্র কা'বা ঘরের দিকে পা রেখে মৃতদেহ কবরস্থ করতে বলা হত। স্বয়ং বাদশাহ আকবর পবিত্র কা'বার দিকে পা দিয়ে ঘুমাতো। আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষাকে অপছন্দ করা হত এবং ভাষার মধ্য থেকে আরবী শব্দসমূহ বিদায় করে হিন্দু রীতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলো। এ অবস্থায় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাত্র শূন্য হয়ে পড়লো এবং অধিকাংশ আলেম ওলামাগণ হিজরত করে অন্য স্থানে চলে গেলেন। বাদশাহ আকবরের সময় নানা মতবাদের মিশ্রণে মুসলিম সমাজে 'তাসাউফ' এর নামে এক ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের জন্ম হলো এবং তা দ্রুত ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হলো। এর বিষাক্ত ছোবল থেকে বাংলাদেশও মুক্ত থাকলো না।

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের এই চরম দুর্দিনে ইসলামের অভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের পতাকা হাতে এগিয়ে এলেন মর্দে মুজাহিদ শায়খ আহমাদ সারহিন্দী তথা মুজাদ্দিদে আলফিসানী (রাহ:)। তিনি বহু সংখ্যক আলেম ওলামাকে ইসলামের প্রকৃত আকিদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত তাসাউফের শিক্ষা ও আকবরের ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে সতর্ক করে তা পরিহার করার আহ্বান জানানোর কাজে নিয়োজিত করলেন। আল ফিসানী (রাহ:) স্বয়ং রাজদরবারের মন্ত্রী পরিষদ ও অন্যান্য প্রভাবশালী লোকদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। তাঁর ও তাঁর সাথের আলেম সমাজের আন্দোলন সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো। সমকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম শায়খ আবদুল হক দেহলবী (রাহ:)ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করলেন। মৃতপ্রায় আলেম সমাজের দেহে যেনো নতুন করে তাঁরা প্রাণের সঞ্চার করলেন। ইতোমধ্যে আকবরের মৃত্যু ঘটলে জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করে আকবরের ভ্রান্তনীতিই অনুসরণ করতে লাগলো।

মুজাদ্দিদে আলফিসানী (রাহঃ) এর প্রবল আন্দোলনের কারণে জনগণের মধ্যে ইসলামের চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠছিলো। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইসলামের এ মর্দে মুজাহিদকে কারারুদ্ধ করে ভেবেছিলেন, ইসলামী আন্দোলনের গতিবেগ রুদ্ধ করা যাবে। তাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখা হয় এবং তাঁকে গ্রেফতার করার কারণে একদিকে সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয় অপরদিকে জনগণের মধ্যেও ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সকল দিক বিবেচনা করে আলফিসানীর কয়েকটি শর্ত মেনে নিয়ে জাহাঙ্গীর তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। আলফিসানী (রাহঃ) এর দেয়া শর্তানুসারে দ্বীন-ই ইলাহী নামক কুফুরী মতবাদের সকল নিয়ম নীতি রাজদরবার থেকে বিতাড়িত করা হয়। আকবর কর্তৃক ধ্বংসকৃত মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় নির্মাণ করা হয়। দেশে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি বিকাশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে জনগণের মধ্য থেকে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের মধ্য থেকেও ইসলামের বিপরীত চেতনা ক্রমশঃ দূর হতে থাকে এবং তিনি রাজদরবারের কাছেই একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে সভাসদগণকে নিয়ে নিয়মিত নামাজ আদায় করতে থাকেন।

বাদশাহ আরঙ্গযীব আলমগীর হযরত মুজাদ্দিদে আলফিসানী (রাহঃ) এর প্রভাবে সর্বাধিক প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও আইন কানুন প্রবর্তনে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। দেশ থেকে ইসলামের বিপরীত প্রথা, নিয়ম, নীতি তথা বিদআত উৎখাতে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছেন। বাদশাহী সম্পত্তিকে তিনি সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করে তা সাধারণ জনগণের সম্পদে পরিণত করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ইসলামের বিঘোষিত নীতি 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ' চালু করেন। রাজ্যের সকল মসজিদের ইমাম, খতীব ও মুয়াজ্জিনদের বেতন ভাতার ব্যবস্থা করেন। সামাজিক সমস্যার ইসলামী সমাধানের লক্ষ্যে তিনি সহজবোধ্যভাবে 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী' নামক এক বিখ্যাত ইসলামী আইন গ্রন্থ রচনা করান। খোলাফায়ে রাশেদার অনুসরণে তিনি জনসাধারণে অধিকার প্রতিষ্ঠার আইনগত ব্যবস্থা করেন। তাঁর শাসনামলেই বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের মুসলিমগণ ইসলামী শাসনের সাথে কিছুটা পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলো এবং ইসলামী শাসনের কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করেছিলো। আর এ সকল কিছুর পেছনে সর্বাধিক অবদান ছিলো শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী মুজাদ্দিদ আল্লামা আলফিসানী (রাহঃ) এর।

নিন্দিত পথে নন্দিত জাতি

ইসলামী জীবন বিধান ত্যাগ করে বাদশাহ্ আকবর রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে অপকর্ম করেছিলেন, তার পরিণাম ভোগ তাঁর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে যায়নি। মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সকল উত্তরাধিকারীকে জীবনের যথাসর্বস্ব দিয়ে এই অপকর্মের পরিণাম ভোগ করতে হয়েছে এবং অনাগত কতকাল যে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের সেই পরিণাম ফল ভোগ করতে হবে তা একমাত্র মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। বাংলাদেশে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতিকে ধ্বংস ও মুসলিম আকিদা বিশ্বাস বিকৃত করার ক্ষেত্রে ছদ্মবেশী হোসেন শাহ যেমন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলো তেমনি ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের পতনের মূলে কার্যকর ছিলো বাদশাহ আকবরের বিকৃত চিন্তাধারা। মুসলিমরূপী অমুসলিম আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বাংলার শাসক হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সাধারণ মুসলিমদের ঈমান হরণ ও চরিত্র বিনষ্ট করে হিন্দুদের সকল রীতি নীতি চালু করেছিলো। বাংলার মুসলিম সমাজে সকল প্রকার শিরক ও বিদআত এ লোকটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলো এবং সে ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্তও বাংলার মুসলিম সমাজে কবরপূজা, পীরপূজা, লালনপূজা, দরগাহ পূজা ইত্যাদি চালু রয়েছে। অমুসলিম এই হোসেন শাহকে কেন্দ্র করে অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ নানাবিধ কল্পকাহিনীর জন্ম দিয়ে তাঁকে সাইয়্যেদ বংশের মক্কার অধিবাসী হিসেবে চিত্রিত করার অপচেষ্টা করেছে। যার দ্বারায় ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি সাধিত হয় তাকেই অমুসলিমগণ হিরো বানানোর চেষ্টায় রত থাকে, এটা তাদের মজ্জাগত কুঅভ্যাস।

স্বল্প শিক্ষিত অথবা নিরক্ষর আকবর মাত্র পনোর বা ষোল বছর বয়সে সিংহাসনে আসীন হন। যৌবনের উষালগ্নে পদার্পণকারী একজন অশিক্ষিত তরুণের পক্ষে শত্রু পরিবেষ্টিত সাম্রাজ্য পরিচালনা কোনোক্রমেই সম্ভব হতো না, যদি তাঁর পাশে বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাবান ও পারদর্শী বাইরাম খাঁন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা না করতেন। চরিত্রহীন মদ্যপ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির আকবরকে বাইরাম খাঁন চেষ্টা করেও সঠিক পথে আনতে পারেননি। বরং হিন্দু পরামর্শকদের পরামর্শে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্যের অতন্দ্র প্রহরী তুর্কী ও পাঠানদের দ্বারায় সজ্জিত মুসলিম সামরিক বাহিনীকে আকবর ধ্বংস করেছিলো। এর বিকল্প সামরিক শক্তি অর্জন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। পরবর্তীতে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠজন ও উত্তম

পরামর্শদাতা প্রধানমন্ত্রী বাইরাম খাঁন এবং আহসান খাঁন ও মুয়াজ্জাম খাঁনসহ অনেককেই ষড়যন্ত্রের জালে বন্দী করে হত্যা করা হয়। মূলত: বর্ণহিন্দুদের পরামর্শেই এদেরকে হত্যা করে সম্রাট আকবর নিজেকে নি:সঙ্গ করেছিলেন।

ঠিক এ সময়েই পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলো সকল দিক থেকে শক্তি অর্জন করে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করছিলো এবং তাদের অশুভ তৎপরতা মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্তে এসে আঘাত করছিলো। যে মুসলিম শক্তি সাম্রাজ্য রক্ষায় জীবনের শেষ শক্তি নি:শেষ করতে প্রস্তুত ছিলো, সম্রাট তাদেরকে ত্যাগ করে পৌত্তলিক মুশরিকদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতকে জানিয়ে দিয়েছেন–

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ–

অবশ্যই তোমরা ঈমানদারদের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরই বেশী কঠোর দেখতে পাবে। (সূরা আল মায়েদা-৮২)

মুশরিকরা সকল দিক দিয়ে আকবরকে ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছিলো। আকবরের ঘরে ছিলো পৌত্তলিক নারীগণ, তাদের গর্ভের সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে মুসলিম চিন্তা চেতনার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পায়নি। অমুসলিম সংস্কৃতির আবহে প্রতিপালিত আকবরের সন্তানগণ পিতার আদর্শে তাড়িত হয়ে সেই ধ্বংসের একই পথ অনুসরণ করেছে। আকবর যে মন-মানসিকতার সৃষ্টি করে অশুভ উত্তরাধিকার রেখে গেলেন তা শুধু তাঁর সুযোগ্য পুত্র জাহাঙ্গীরই অনুসরণ করেননি, এই একবিংশ শতাব্দীতেও এক শ্রেণীর নামধারী মুসলিম সে অশুভ উত্তরাধিকার দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছে এবং অনাগত কোন্ কাল পর্যন্ত প্রতিপালিত হতে থাকবে তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। খৃষ্টান প্রীতি জাহাঙ্গীরকে এতদূর পৌঁছে দিয়েছিলো যে, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স আগ্রায় আগমন করলে তাকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে সহচর হিসেবে গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় খেতাব ও বৃত্তি প্রদান করেন।

রাজপরিবারে খৃষ্টানদের প্রভাবে কয়েকজন শাহজাদা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং হকিন্সের নেতৃত্বে খৃষ্টানরা অশ্বে আরোহণ করে মিছিল সহকারে গীর্জায় গমন করতেন। জাহাঙ্গীর তাঁর খৃষ্টান বন্ধুদের নিয়ে রাজমহলে মদ্যপানে বিভোর থাকতেন। সুযোগ বুঝে খৃষ্টানরা তাঁকে দিয়ে নানা ধরনের দাবি আদায়ে

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছিলো। মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে খাল খনন করে কুমির আমদানীর সুযোগ করে দেয়া হলো। দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুশক্তিও প্রবল শক্তিতে আত্ম প্রকাশের অপেক্ষায় নিজেদের সংগঠিত করছিলো। ওদিকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাজপুত ও মারাঠা শক্তিকেও মোগল সাম্রাজ্যের পরম শত্রুতে পরিণত করা হয়েছিলো। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর মুসলিম শক্তির যে ধ্বংস সাধন করেছিলেন, তা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আওরঙ্গযিব আজীবন সংগ্রাম করেছেন। অথচ অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ আওরঙ্গযিবকেই মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাঁকে দোষী ও কলঙ্কিত করার কারণ হলো, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী। আল্লামা শিবলী নোমানী (রাহঃ) তাঁর রচিত 'আওরঙ্গযিব আলমগীর প্যর এ্যক নজর' গ্রন্থে অমুসলিম ঐতিহাসিকদের সকল মিথ্যা অভিযোগের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

একদিকে মুসলিম সাম্রাজ্য ক্রমশঃ পতনের দ্বার প্রান্তে উপনীত হচ্ছিলো, অপরদিকে শাসকগোষ্ঠী, মন্ত্রী ও রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী মুসলিম ধনিকশ্রেণীর মধ্যে চরম বিলাসিতা, নিষ্ক্রিয়তা ও নির্বীর্যতা আসন গেড়ে বসেছিলো। বাংলাসহ ভারতের সমগ্র মুসলিম সমাজের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় ধ্বংসের প্রায় শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছিলো। মুসলিমদের আকিদা বিশ্বাসে তাওহীদের চিন্তা-চেতনা লোপ পেয়ে শিরকের জঞ্জাল এসে বাসা বেঁধেছিলো। মুসলমানদের নন্দিত আদর্শ ইসলামের পরিবর্তে শিরক, বিদআত, শ্রীচৈতন্যদেবের আদিরস ভিত্তিক অনুষ্ঠান, হিন্দু চেতনা প্রভাবিত সুফীতত্ত্ব, তাসাউফের নামে ইসলামের বিপরীত কর্মকাণ্ড তথা কোরআন সুন্নাহ্ পরিপন্থী নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠান প্রাধান্য লাভ করেছিলো। ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিকরা রঙ্গমঞ্চের অন্তরাল থেকে অশুভ ইন্ধন যুগিয়ে আসছিলো। ইসলামের প্রতি মুসলিমদের বিশ্বাসে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিম নামধারী বহু কবি সাহিত্যিক সৃষ্টি করা হলো। বাংলাভাষা উন্নয়নের নামে তারা হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের আদর্শ হিসেবে গ্রণ করে দেব-দেবীর স্তুতিমূলক কবিতা, কৃষ্ণ পদাবলী ও পুঁথিপুস্তক রচনা শুরু করলো। তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা, যৌন আবেদনমূলক কীর্তন, মনসার ভাসান সঙ্গীত, দুর্গাদেবী ও গঙ্গার স্তোত্র এবং হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নানা ধরনের পুঁথি রচনা করলো।

হিন্দুগণ সত্য নারায়ণের পূজা করে, মুসলিম সমাজেও সত্যপীর নামক একজনকে কল্পনা করে তার নামে মানত মানা ও তোবারক বিতরণ শুরু হলো। হিন্দুদের দুর্গা উৎসবের ও রথযাত্রার অনুকরণে মহরমের তাজিয়া অনুষ্ঠান, কালী পূজার সময় দেওয়ালীর অনুকরণে শবে বরাতে আলোকসজ্জা ও বাজী পোড়ানো আমদানী করা হলো। কলেরা, বসন্ত রোগ ও সাপের ভয়ে মুসলিম সমাজেও ওলা ওঠাবিবি ও মনসাদেবীর পূজার প্রচলন এবং ভালো ফসলের জন্য মুসলিম কৃষকদেরকে দরগায় মানত করতে উৎসাহিত করা হলো। ঢাকা শহরের পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে দরগা নির্মাণ করে সেখানে একটি কালো পাথর স্থাপন করে বলা হলো এ পাথরে নবী করীম (সাঃ) এর পায়ের চিহ্ন বিদ্যমান। অর্থাৎ কদম রসূল নাম দিয়ে পাথরের পূজা আমদানী হলো। গয়ার ব্রাহ্মণগণ হিন্দু তীর্থযাত্রীদের বিষ্ণু দেবতার পায়ের চিহ্ন বিষ্ণুপদ দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করে। কদম রসূল দেখিয়েও অর্থ শোষণের ব্যবস্থা করা হলো।

ভারতের আজমীরে হযরত মুঈনউদ্দীন চিশ্তী (রাহঃ) এর কবরে গিলাফ পরিয়ে অর্থের বিনিময়ে সে গিলাফ উঁচু করে 'জান্নাতের দরজা' দেখানোর নামে অর্থ শোষণ শুরু হলো। যে সকল আলেম ওলামা, পীরগণ সমগ্র জীবনব্যাপী কবরপূজা, মাজার পূজা তথা শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের ইন্তেকালের পর তাঁদের কবরসমূহ হিন্দুদের অনুকরণে পূজিত হতে লাগলো। সিলেটে হযরত শাহজালাল ইয়েমেনী (রাহঃ) এবং অন্যদের কবর, খুলনা বাগের হাটে হযরত খাঁন জাহান আলী (রাহঃ) ও অন্যদের কবর, রাজশাহীতে হযরত শাহ মখদুম রূপোস (রাহঃ) ও অন্যদের কবর, চট্টগ্রামে অসংখ্য আলেম ওলামা, পীর আওলিয়াদের কবরসহ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মাটিতে শায়িত মহান আল্লাহর ওলীগণের কবরকে পূজার আখ্ড়ায় পরিণত করা হলো। এখন পর্যন্ত অজ্ঞ মুসলিমদের কবর, পীর ও দরগা পূজার মধ্যে নিমজ্জিত রাখা হয়েছে। নিজ নামের পূর্বে মাওলানা- আল্লামা শব্দ জুড়ে দিয়ে একশ্রেণীর অর্থ লিপ্সু ধুরন্ধর লোক ফতোয়া দিয়ে কবরপূজাকে বৈধতা দিয়ে ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত লোকজনকে পথভ্রষ্ট করছে।

মুসলিম চরিত্র থেকে ইসলামের শেষ প্রভাবটুকু বিদায় করে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামের নামে 'বাউল, মারফতী ফকির, নেড়ার ফকির' নামক বিকৃত রুচিসম্পন্ন দলের আমদানী করা হলো। এগুলো ছিলো হিন্দু বৈষ্ণব ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের মুসিলম সংস্করণ, যাতে করে ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত সাধারণ

মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করা যায়। এরা মুসলিম সমাজে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ভট ধারণা প্রচার, মদ, গাঁজা, অবাধ যৌনাচার ও উল্লেখের অযোগ্য নোংড়ামীর আমদানী করলো। এদের মধ্যে বাউলরা সবথেকে জঘন্য ও যৌনপ্রবণ নোংড়া কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিলো, বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রবক্তারা এদের সমর্থন যুগিয়ে আসছে। চিন্তানায়ক মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর 'মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' নামক গ্রন্থে এদের সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

ইসলাম একটি বিশাল মতাদর্শ, একটি বিপ্লবী আদর্শ, এ আদর্শের সৌন্দর্য্য উপস্থাপন করাই মুসলিমদের দায়িত্ব কর্তব্য, ইসলামই মুসলিমদের উত্থানের একমাত্র উদ্দীপনা অনুপ্রেরণা, এই আদর্শই মুসলিমদের স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ, এটিই তাঁদের সভ্যতা সংস্কৃতি নির্মাণ ও রক্ষার মৌল উপাদান, সে চেতনা সাধারণ মুসলিমদের মধ্য থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলো। ইসলামী চরিত্রের পরিবর্তে বিকৃত চিন্তা চেতনা, কদর্যতা ও বিভৎসতা সামগ্রিকরূপে মুসলিম সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। মুসলিম নামধারী কবি লাল মামুদ তুলসী গাছের পূজা শুরু করেছিলো এবং মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেছে বলে আক্ষেপ করতো। পীর ভক্তির নামে পীর নামে কথিত লোকদের পা ধোয়া পানি পান করতো এবং নারী মুরিদরা পীরকে সন্তুষ্ট করলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পীর নামক লম্পটের পদতলে নিজের যৌবনকে বিসর্জন দিতো।

মুসলিম মিল্লাতের এ দুর্দিনে ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ আলেম সমাজ নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্রাতি থেকে ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে আত্মকলহে লিপ্ত ছিলেন। অভ্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কুল-কিনারাহীন অথৈ সমুদ্র পবিত্র কোরআন ও হাদীস সাজিয়ে রেখে ফিকাহ্ শাস্ত্রের এমন সব ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত ছিলেন, যা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে সর্বত্র বিভক্তির রেখা অঙ্কন করেছিলো। অধিকাংশ আলেমের চিন্তার জগতে জিহাদী চেতনার পরিবর্তে স্থবিরতা পুঞ্জিভূত হয়েছিলো। ফলে মুসলিম সমাজে ইসলামের বিপরীত সভ্যতা সংস্কৃতির প্রবাহিত স্রোত দেখেও তাঁরা সামান্য প্রতিবাদ করতেও ভুলে গিয়েছিলো। পবিত্র কোরআন হাদীস গবেষণা করার পরিবর্তে তাঁরা আল্লামা রুমী ও শেখ সাদী (রাহঃ) এর মসনবী ও গুলিস্তা চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। মুসলিম জাতিকে রক্ষাকারী ঢাল ও বর্ম নামক আলেম সমাজ যখন জিহাদ, সংগ্রাম ও আন্দোলনের ময়দানে দৈন্যতার পরিচয়

দিলেন, তখন দুশমনদের সৃষ্ট প্রবল স্রোত এ মিল্লাতকে খড় কুটোর মতোই গণ্য করে ভাসিয়ে নিতে উদ্যোগী হলো।

অধিকাংশ আলেমের নিষ্ক্রিয়তা, মুসলিম শাসকদের দুর্বলতা, অযোগ্যতা, রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজমান বিভেদ বিশৃঙ্খলা, মারাঠা ও শিখদের উত্থান, ষড়যন্ত্র প্রিয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি তাদের অশুভ চক্রান্ত বাস্তবায়নে উর্বর ক্ষেত্র পেয়ে প্রকাশ্যে তৎপর হলো। সুযোগ বুঝে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান মিশনারীর দল অর্থ সম্পদের লোভে আকৃষ্ট করে শুধুমাত্র কালেমা পাঠকারী ইসলামী আদর্শে প্রশিক্ষণহীন মুসলিম ও হিন্দুদের খৃষ্টানে পরিণত করা শুরু করলো। বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলসহ মুসলিম শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্র স্থাপন করে অগণিত মানুষকে বিকৃত খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিলো। মুসলিম শাসকগণ খৃষ্টানদের হীন কার্যক্রমে বাধার পরিবর্তে সহযোগিতা করলো এবং পাদ্রীদের মোকাবেলায় অধিকাংশ ওলামাগণ দুর্বল ভূমিকা পালন করেছেন অথবা নীরবতা অবলম্বন করলেন। ইতোপূর্বে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতক ইংরেজের দল বণিকের বেশে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করেছিলো, তারা পর্তুগীজ ও ওলান্দাজ বণিকদের প্রতদ্বিন্দ্বী গণ্য করে বিতাড়িত করেছিলো এবং সুযোগ বুঝে ইংরেজরা হিন্দুদের সহযোগিতায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের দিকে এগিয়ে গেলো।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (রাহঃ) এর সংগ্রামী ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে নন্দিত মুসলিম জাতি যখন নিন্দিত পথে অগ্রসর হয়ে ধ্বংসের অতলান্তে তলিয়ে যাচ্ছিলো, তখন মহান আল্লাহর অসীম রহমতে শতাব্দী শ্রেষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রাহঃ) বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদের ময়দানে কলমকে অস্ত্র বানিয়ে অবতীর্ণ হলেন। তিনি শুধু কলমের মধ্যেই জিহাদকে সীমাবদ্ধ করলেন না, নিন্দিত পথ থেকে মুসলিম মিল্লাতকে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনে সে যুগের চাহিদা অনুযায়ী যা কিছু করা সম্ভব ছিলো, তিনি সকল কিছুরই আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি সম্রাট আওরঙ্গযিব আলমগীর (রাহঃ) এর ইন্তেকালের চার বছর পূর্বে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত ও ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারটি উত্তরাধিকার সুত্রেই ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির দৃঢ় অনুসারী ছিলো। তিনি ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দিল্লীর দশজন সম্রাট

ভারতবর্ষের কয়েকজন আঞ্চলিক শাসকের শাসনকাল দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সাথে দস্যু ইংরেজদের দস্যুতার মাধ্যমে বাংলাকে দখল করে মুসলিম নির্যাতনের যুগও দেখেছেন।

শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন আলেম হিসেবে নন্দিত জাতি মুসলিমদের নন্দিত পথে অগ্রসর হবার মূল কারণ উপলব্ধি করে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুতিই মুসলিমদের পতনের একমাত্র কারণ'। এ ঘোষণার আলোকেই তিনি নিজের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি, চেতনা, ভাবধারা ও জীবন বিধানের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ পুনর্গঠনের একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুসলিমদের চিন্তার জগতে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়েছে, এ বিষয়টি অনুভব করে তিনি মুসলিমদের চিন্তার সংশোধন ও পরিশুদ্ধির কাজে অগ্রসর হন। মুসলিম শাসক থেকে শুরু করে আলেম ওলামা ও ক্ষেতের কৃষক তথা সকল শ্রেণীর মুসলিমকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাস, ইবাদাত বন্দেগী, স্বভাব-চরিত্রে, রাজনীতি ও কবিতা সাহিত্যে, পরিবার ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামের বিপরীত যে সকল অনুষ্ঠান ও চিন্তা চেতনা প্রবেশ করেছিলো, কোরআন হাদীস দিয়ে তিনি সকল সমস্যার যুগপোযোগী সমাধান দিয়েছিলেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহঃ) এর দার্শনিক তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ লেখনীর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয় এ জন্যে যে, প্রায় সোয়া দুইশত বছর পূর্বের পরিবেশে অবস্থান করেও বর্তমান আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে অবস্থানকারী দার্শনিক ও গবেষকের ন্যায় সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইসলামী জীবন বিধানের সকল শাখার মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যার সমাধান তিনি কোরআন হাদীসের মাধ্যমে দিয়েছেন। ইসলামের প্রাণশক্তি হলো ইজতেহাদ- অর্থাৎ পবিত্র কোরআন হাদীস এবং এর আলোকে সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থার ওপর গবেষণা করে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানের পথ নির্ণয় করা। এই ইজতেহাদই ইসলামের প্রাণশক্তি এবং নন্দিত আদর্শ ইসলামকে গতিময় করে রাখে। ইজতেহাদের জগতে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছিলো এবং একশ্রেণীর আলেম ওলামা পূর্ববর্তীদের ইজতেহাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁরা কয়েক

শতাব্দী পূর্বের ইজতেহাদের মধ্যে বর্তমান সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে ইসলামকে পশ্চাৎপদ স্থবির আদর্শে পরিণত করেছিলেন।

আল্লামা ওয়ালিউল্লাহ্ ইজতেহাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে একে সকল যুগের জন্যে ফরজে কিফায়া অর্থাৎ জ্ঞান গবেষক আলিমদের জন্যে বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করেন। কিভাবে ইজতেহাদ করতে হবে এ সম্পর্কে তিনি নিয়ম বিধান ও শর্তাবলী উল্লেখ করে ইজতেহাদের শৃঙ্খলার পথনির্দেশ দেন। তিনি ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম, এ ধারণা চূর্ণ করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সকল দিক সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেন। সে যুগে ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতিতে তিনি ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে শিক্ষাকে যুগপোযোগী করার ব্যবস্থা করেন। তিনি ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র আল্লামা শাহ আযীয (রাহঃ), উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চা শুরু হয়। তৎকালীন সামাজিক ভাষা ফারসীতে পবিত্র কোরআন অনুবাদ করে মানুষের মধ্যে কোরআন বুঝার আগ্রহ সৃষ্টি করেন। হাদীসের প্রথম সঙ্কলিত গ্রন্থ 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' এর অনুবাদ করে এতে তিনি টীকা সংযোজন করে মানুষের জন্যে সহজবোধ্য করেন। ইসলামে ব্যক্তি গঠন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, বিচার ব্যবস্থা, সামরিক বিভাগ, বিচার বিভাগ, দেশ শাসন পদ্ধতি, কর ব্যবস্থা ও ব্যবসানীতি ইত্যাদি দিক সম্পর্কে আলোচনা করে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।

ইসলাম ও জাহিলিয়াতের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের কারণসমূহ তুলে ধরে তিনি সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপর্যয় এবং বিকৃতির কারণসমূহ তুলে ধরে ইসলামের আলোকে এর সমাধান পেশ করেন। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ ধারণা তুলে ধরে তিনি রাজতন্ত্র ও জাহিলী রাষ্ট্রের ভয়ঙ্কর অবস্থার বর্ণনা দিয়ে এসবের সাথে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের পার্থক্য নির্ণয় করে মানুষের সম্মুখে পেশ করেন। তিনি বলিষ্ঠ ও অখণ্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে আহ্বান জানিয়ে বর্ণনা করেন, ইসলামের বিপরীত পদ্ধতিতে প্রচলিত রাষ্ট্রসমূহ উৎখাত করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ঈমানদার মুসলিমের পক্ষে অলস বসে থাকা সম্ভব নয়। ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে শক্তিশালী সংগঠন প্রয়োজন, ইসলামী বিপ্লব দেখা দিলে তা সমর্থন, ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাধা দিলে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা দরকার বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে ক্ষুদ্রতর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করা ন্যায় সঙ্গত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও তিনি নীরবতা অবলম্বন করেননি। শাসকদের ইসলামের বিপরীত ধারায় জীবন যাপনের কথা উল্লেখ করে তিনি তাদেরকে নির্ভীক চিত্তে তিরস্কার করে শাসকদের ভ্রান্ত নীতি পরিহার ও ইসলামের সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করার আহ্বান জানিয়েছেন। মুসলিম জনপদে হিংস্র মারাঠা ও শিখদের আক্রমণ, লুট ও নির্মম গণহত্যা সম্পর্কে আহমদ শাহ্ আবদালীকে জানিয়ে তাদেরকে দমন করার আহ্বান জানান। দিল্লীর কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসকদের অনৈক্য ও দুর্বলতার মধ্যেও শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহঃ) এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আহমদ শাহ আবদালী ১৭৪৭ সাল থেকে ১৭৬১ সাল পর্যন্ত চৌদ্দ বছরে দশবার অভিযান চালিয়ে মারাঠাদের দমন করেন। এদিকে বাংলায় মুসলিম শাসকের পতন ঘটিয়ে বর্ণহিন্দুদের সহযোগিতায় ইংরেজরা ক্রমশঃ সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়নি। কারণ দিল্লীতে মুসলিম শাসন অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো বলে মনে হয়।

ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে যে শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন, তা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম না হলেও আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে গিয়েছেন। ইসলামী আন্দোলনে জড়িত সকল পর্যায়ের জনশক্তির জন্যে ইসলামের নির্ভেজাল জ্ঞান অর্জন অতিআবশ্যক। আর এর জন্যে প্রয়োজন পবিত্র কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থাদি ও ইসলামী সাহিত্যের। যুগের চাহিদা অনুযায়ী তিনি সে প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর জ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে অগণিত মানস সন্তান ও অনুসারী সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যাঁরা ইসলাম সম্পর্কে নির্ভেজাল জ্ঞান অর্জন করে বিরোধী শক্তির সাথে সংগ্রাম মুখর জীবন অতিবাহিত করেছেন। বিশেষ করে তাঁরই হাতে গড়া তাঁর সুযোগ্য সন্তান আল্লামা আব্দুল আযীয দেহলভী (রাহঃ) এর বিপ্লবী ফতোয়া তস্কর ইংরেজদের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিলো।

ইসলামের খিলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্তির পর একশ্রেণীর লোকজনের আবির্ভাব ঘটে, যারা কোরআন হাদীস ব্যবহার করে পার্থিব স্বার্থোদ্ধারে লিপ্ত হয়। বিগত চৌদ্দশত বছরে মুসলিম শাসকদের ইতিহাসে দেখা যায়, ডাস্টবীনের হাড় চাটা কুকুরদের ন্যায় আলেম পদবীধারী একশ্রেণীর লোকজন শাসকদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করে শাসকদের ভ্রান্তনীতির পক্ষে কোরআন হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছে। উচ্ছিষ্ট ভোগী আলেমরাই

সম্রাট আকবরকে 'যিল্লে ইলাহী' অর্থাৎ আল্লাহর ছায়া উপাধিতে ভূষিত করে দীন-ই ইলাহী রচনায় আকবরকে উৎসাহিত করেছিলো। সকল যুগেই এদের অস্তিত্ব ছিলো এবং বর্তমান যুগেও এরা ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মহীনদের অন্যতম হাতিয়ার। ইসলামের বিপ্লবী আদর্শ প্রকৃতরূপে তুলে ধরার অপরাধে (?) আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও তাঁর সুযোগ্য সন্তান আল্লামা শাহ আযীয দেহলভী (রাহ:) এর বিরুদ্ধে একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ আলেম নামধারী লোকজন ফতোয়ার বন্যা প্রবাহিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, শারীরিকভাবেও তাঁদের লাঞ্ছিত করার অপচেষ্টা করেছে।

ভারতবর্ষে মুসলিমদের পতন ও বিপ্লবী আলেম সমাজ

ইংরেজ ও হিন্দুদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে বিশ্বাসঘাতকদের হাতে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে একান্ত অসহায় অবস্থায় প্রাণ হারাতে হলো। এরপর ভারতবর্ষের বর্ণহিন্দু, ধনিক ও বণিক শ্রেণী, খৃষ্টান মিশনারী ও ধনিকশ্রেণীর সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে ভারতবর্ষ থেকে মুসলিম শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। মুসলিমদের পতনের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকগন ও তাদের পরামর্শদাতা মুসলিমগণও নির্দোষ ছিলেন না, তাঁরাও সমভাবে দায়ি। মুসলিম শাসকগণের অমুসলিমপ্রীতি ক্রমশ: যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো এবং ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ ও ইংরেজদের যেসব সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছিলো, তা আগামী দিনে মহাবিপদের সংকেত বয়ে আনছিলো। শাসকদের ভ্রান্তনীতি অনুসরণের কারণে ভারতবর্ষে মুসলিমগণ কোন্ পরিণতি বরণ করতে যাচ্ছে, এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। ধ্বংসের যে স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছিলো, তা রোধ করার মতো উপকরণ ওলামা হযরতদের হাতে ছিলো না। তবে সার্বিক পরিস্থিতির দিকে সচেতন ওলামা সমাজ সতর্ক দৃষ্টি রেখে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় কর্মপন্থাসমূহ স্থির করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের সে কর্মপন্থার শেষ লক্ষ্য স্থির ছিলো শাহাদাতের অমীয় সুধা পানের দিকে।

হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রাহ:) ধ্বংসের স্রোতধারার মুখে বাঁধ নির্মাণের উদ্দেশ্যেই অনেকগুলো শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। দিল্লীতে মাদরাসা-ই শাহ্ আবদুল আযীয ছিলো প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এ মাদসারা অসংখ্য বিপ্লবী চিন্তানায়কদের জন্ম দিয়েছিলো, যাঁদের অনেকেই জিহাদের ময়দানে শাহাদাতবরণ করেছেন এবং অনেকে ফাঁসিকাষ্ঠে শাহাদাতের সুধা পান করেছেন। এ মাদরাসা থেকেই শিক্ষা গ্রহণ

করেছিলেন, বালাকোটের শহীদ হযরতুল আল্লাম সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রাহঃ), মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রাহঃ), শায়খুল ইসলাম মাওলানা আব্দুল হাই (রাহঃ), মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ ফুলতী (রাহঃ), মাওলানা শাহ্ ইসহাক (রাহঃ), মাওলানা মুফতী সদরুদ্দীন (রাহঃ), মাওলানা রশীদুদ্দীন দেহলভী (রাহঃ), মাওলানা মীর্যা হাসান আলী মুহাদ্দিস-ই লাখনাভী (রাহঃ), মাওলানা সাইয়্যেদ আওলাদ হোসেন কানুজী (রাহঃ), মাওলানা ইলাহী বখ্শ কান্ধলভী (রাহঃ), মাওলানা কুতুবউদ্দীন দেহলভী (রাহঃ), মাওলানা ফাযলে হক খায়রাবাদী (রাহঃ) প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণ।

এ ছাড়া দেশের অন্যান্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও ইসলামের বিপ্লবী আদর্শের দীক্ষা নিয়ে অগণিত আলেম ওলামা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ছিলেন। ভারতবর্ষে মুসলিমদের অবনতিশীল অবস্থা ও ইসলামের দুশমনদের অগ্রযাত্রা দেখে দূরদর্শী আলেমগণ অনুভব করেছিলেন, চূড়ান্ত জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে এবং জিহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাড়ে তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। সশস্ত্র জিহাদের জন্য প্রয়োজন যুগপোযোগী সামরিক প্রশিক্ষণ, সেদিকেও তৎকালীন আলেম সমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। তাওহীদের শানিত চেতনাভিত্তিক একটি বাহিনীর প্রয়োজন, সেদিকেও তাঁরা সজাগ ছিলেন। অর্থ ও অন্যান্য রসদের প্রয়োজন হবে, এ লক্ষ্যে তাঁরা সাধারণ মুসলিমদের প্রয়োজনের সময় অবারিত হস্তে সহযোগিতা করার মানসিকতাও গড়ছিলেন। নবী করীম (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগের বিপ্লবী সংগ্রামী মণীষীদের জীবনী চর্চা করে জিহাদের উদ্দীপনা সৃষ্টি করছিলেন।

ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে মুসলিমদের চূড়ান্ত পতন ঘটলো। বিজয়ী ইংরেজ খৃষ্টানরা ও তাদের এদেশীয় সহযোগিরা সর্বপ্রথম আঘাত হানলো মুসলিমদের প্রতি। ধনী মুসলিমদের নিঃস্ব গরীব ফকিরে পরিণত করে হিন্দুদের জন্যে অর্থোপার্জনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হলো। সকল প্রকার চাকরীর দরজা মুসলমানদের জন্যে রুদ্ধ করে হিন্দুদের জন্য চাকরীর দরজা খুলে দেয়া হলো। জমিদারী, ব্যবসা- বাণিজ্যের অঙ্গন থেকে মুসলিমদের বিতাড়িত করে সকল কিছু তুলে দেয়া হলো হিন্দুদের হাতে। শিক্ষা অর্জনের সকল সুযোগ থেকে মুসলিমদের বঞ্চিত করা হলো। কোথাও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হলেও মুসলিমদেরও যীশু খৃষ্ট অথবা হিন্দুদের দেবী সরস্বতীর বন্দনা গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হলো। শিক্ষা ব্যবস্থাও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপর ভিত্তি করে রচিত হলো, যাতে মুসলিমরা নামে মাত্র মুসলিম থাকে এবং স্বভাব বৈশিষ্ট্যে অমুসলিম হয়ে যায়।

মুসলিম নাম রাখাও অপরাধ বলে গণ্য হলো এবং দাড়ি রাখলে ও মসজিদ নির্মাণ করলে খাজনা দেয়া বাধ্যতামূলক করা হলো। ধুতি পরিধান বাধ্যতামূলক করে মুসলিমদের জন্যে ব্রাহ্মণ ও জমিদারের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে এবং জুতা পরিধান করে হাঁটা নিষিদ্ধ করা হলো। হিন্দুদের পূজা পার্বনে মুসলিমদেরকে চাঁদা দেয়াও বাধ্যতামূলক করা হলো। মুসলিম কৃষকদের কাছ থেকে চাষাবাদযোগ্য ভূমি ছিনিয়ে নেয়া হলো। মুসলিমদের তাঁত শিল্প ধ্বংস করা হলো। এ কথায় সকল দিক থেকে মুসলিমদের অধিকার হরণ করে তাদের জীবন ধারনের সামান্য উপকরণ থেকেও বঞ্চিত করা হলো। শাসকের জাতি পরিণত হলো ভিক্ষুকে, শাসকের জাতি মুসলিমরা শাসিতে পরিণত হয়ে হীনম্মন্যতায় নিমজ্জিত হলো।

নন্দিত আদর্শ ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের স্রোত প্রবাহিত হলো। হিন্দু পণ্ডিত ও পাদ্রীগণ নবী করীম (সাঃ) ও সম্মানীত সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষোদগার করতে শুরু করলো। প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শিক্ষা দিয়ে খৃষ্টধর্মের মর্যাদা উচ্চে তোলা হলো। রাসূল (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, পবিত্র কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে অগণিত বিভ্রান্তিকর কবিতা ও সাহিত্য রচিত হলো। মুসলিম শাসনের যুগে যে হিন্দুরা মুসলিমদের পদস্পর্শে নিজেদের ধন্য মনে করতো, তারাই মুসলিমদের ছায়াকে অপবিত্র জ্ঞানে ম্লেচ্ছ ও যবন নামে মুসলিমদের আখ্যায়িত করে ইংরেজদের প্রভুর আসনে বসালো। অগণিত মসজিদ ও মাদরাসা ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে ইসলামী শব্দসমূহ বিকৃত করা হলো। কোনো কোনো এলাকায় আযান ও গরু জবেহ নিষিদ্ধ করা হলো। ভারতবর্ষে মুসলিমদের দূরাবস্থার করুণ চিত্র উল্লেখ করতে গেলে বিশাল গ্রন্থ রচিত হবে। মুসলিম মিল্লাতের সার্বিক পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটে ওলামা হযরতগণ সংগঠিত হয়ে জিহাদের সূচনা করলেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (রাহঃ) এর প্রতিরোধ সংগ্রাম

ভারতবর্ষে মুসলিমদের দুর্দিনে যে সকল মর্দে মুজাহিদ আলেম সমাজ এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রাহঃ) ও সাউদী আরবের নজ্‌দ এলাকার মর্দে মুজাহিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রাহঃ) এর বিপ্লবী সংস্কার আন্দোলন দ্বারা উদ্দীপ্ত ছিলেন। হাজী

শরীয়তুল্লাহসহ অনেকেই তাঁদের কাছ থেকে উদ্দীপনা লাভ করেছেন। এ জন্যে সংগ্রামী মণীষী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহঃ) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। কারণ তাঁর সম্পর্কে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের দুশমনগণ নিজ স্বার্থে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলো, এখন পর্যন্তও অনেকেই সে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছে। বিস্ময়ের বিষয় হলো, যে সাউদী আরবে তিনি সংস্কার আন্দোলন করেছিলেন, সেখানে তাঁকে নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি নেই- বিভ্রান্তি শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে। ভারতবর্ষে যে সকল ওলামাগণ প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরে মানুষকে এদিকে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁদেরকেই 'ওহাবী' নামে আখ্যায়িত করে সাধারণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

বিপ্লবী সংস্কারক আল্লামা মুহাম্মাদ (রাহঃ) আঠারো শতকের গোড়ার দিকে সাউদী আরবের নজ্দ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল ওয়াহ্হাব, সে দেশের প্রথানুযায়ী মূল নামের সাথে পিতার নাম সম্পৃক্ত করা হয় বলে তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে 'ওয়াহ্হাব' নাম একটি, এর অর্থ পরমদাতা। ওয়াহ্হাব শব্দটিকে বিকৃত করে অমুসলিমরা 'ওহাব' বানিয়েছে। হিন্দুরা হাজী শরীয়তুল্লাহর নামটিও বিকৃত করে 'সরাতুল্লা' বানিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহঃ) অত্যান্ত মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি পবিত্র কোরআন হাদীস অধ্যয়ন করে ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করেছিলেন। সে সময় তিনি আরবে ইসলামের বিপরীত নানা ধরনের প্রথা দেখছিলেন এবং পবিত্র হজ্জ পালনে মক্কা-মদীনায় এসে এসব পবিত্র স্থানেও শিরক্ বিদআত দেখে গভীরভাবে মর্মাহত হন। আরবের একটি বিশাল অংশ সে যুগে তুর্কীদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো এবং তুর্কী শাসকগণ পশ্চিমা সভ্যতার স্পর্শে এসে পশ্চিমা সভ্যতার অনেক কিছুই অনুসরণ করতো। এর ঢেউ মক্কা-মদীনাতেও স্পর্শ করেছিলো।

ভারতবর্ষ, তুরস্ক ও পারস্যে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের নামে ব্যাপকভাবে মাজার- দরগাহ্ ও পীরপূজার প্রচলন ঘটানো হয়েছিলো এবং কোরআন হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে পার্থিব স্বার্থে ইসলামের বিপরীত প্রথা চালু করা হয়েছিলো। ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব দেখলেন, মুসলিমগণ কবরে বাতি জ্বালিয়ে ফুল দিয়ে সজ্জিত করছে। নানা ধরনের মানত মানছে এবং কবরে শায়িত আল্লাহর ওলীদের কাছে নানা বিষয়ে প্রার্থনা করছে। সেই সাথে শাসকগণ ইসলামের বিপরীত পথে চলছে এবং মুসলিমদের

মধ্যে অনৈক্য বিরাজ করছে। মুসলিমদের মধ্য থেকে ইসলামের বিপরীত সকল প্রথা বিদায় করে কোরআন সুন্নাহ্‌ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথমে তিনি সংস্কার আন্দোলন শুরু করলেন সিরিয়ার দামেস্ক নগরী থেকে। তুর্কী শাসকদের খিলাফতের নামে পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণের বিরুদ্ধে তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন এবং মাজার ও পীরপূজার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে মানুষকে শিরক বিদআত মুক্ত করার লক্ষ্যে তৎপর হলেন।

ফলে শাসকগোষ্ঠী যেমন তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলো তেমনি সম্মানিত লোকদের মাজারকে কেন্দ্র করে ধর্মের নামা যারা দু'পয়সা রোজগার করতো, তারাও মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রাহঃ) এর বিরুদ্ধে সরকারের সাথে যোগ দিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলো। আলেম নামে পরিচিত এসব ধর্ম ব্যবসায়ী লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়ার প্লাবন প্রবাহিত করলো। শাসকগণ তাঁকে দামেস্ক থেকে বিতাড়িত করলে তিনি নিজ জন্মভূমি নজ্‌দ প্রদেশের দেরাইয়াহ্‌ নামক স্থানে আসেন এবং এ অঞ্চলের অধিপতি মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ তাঁর সংস্কার আন্দোলন সমর্থন করে এ আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করেন। আদর্শ যতই নান্দিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হোক না কেনো, তা রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত দেশের বুকে বাস্তবায়িত হয় না। এ লক্ষ্যে মুসলিমদেরকে রাষ্ট্রশক্তি অর্জনের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন–

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا–

হে আমার মালিক! যেখানেই আমাকে নিয়ে যাও না কেনো, তুমি আমাকে সত্যের সাথে নিয়ে যেও এবং যেখান থেকেই আমাকে বের করো না কেনো সত্যের সাথেই বের করো এবং তোমার কাছ থেকে আমার জন্যে একটি সাহায্যকারী রাষ্ট্রশক্তি প্রদান করো। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮০)

মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ স্বচ্ছ ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রাহঃ) এর মেয়ে বিয়ে করলেন এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে আন্দোলনের সূচনা করলেন। আরবের অগণিত মানুষ তাঁর আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহু ঘাত প্রতিঘাতের পরে আরবের একটি বিশাল অংশ জয় করে আধুনিক সাউদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেন। সাউদ বংশের লোকজন আধুনিক এ

রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করেছিলেন বলে এটি সাউদী আরব নামে পরিচিত হলো। জামাই শ্বশুর উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেখান থেকে শিরক্ বিদআত উৎখাত হলো এবং কোরআন হাদীসের ওপর ভিত্তি করে একটি রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে সে অঞ্চলের লোকজন শিরক্ বিদআতমুক্ত ইসলাম দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলো। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহঃ) কোরআন হাদীস ভিত্তিক যে সকল মূলনীতি প্রণয়ন করে আন্দোলন করেছিলেন, তিনি সে সকল মূলনীতি তাঁর 'কিতাবুত্ তাওহীদ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

(এক) মহান আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব নেই, যার দাসত্ব, ইবাদাত, বন্দেগী, আনুগত্য, উপাসনা, আরাধনা ও আদেশ পালন করা যেতে পারে। (দুই) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা ও মানত মানা সম্পূর্ণ শিরক। (তিন) আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য অর্জনের জন্যে অন্য কাউকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা সম্পূর্ণ শিরক। (চার) নবী-রাসূল, ওলী ও ফিরিশতাদের কাছে প্রার্থনা করা, তাদের নাম উল্লেখ করে তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক এবং মূর্তিপূজার মতোই নিন্দনীয়। (পাঁচ) অধিকাংশ মানুষেরই মহান আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই, এ কারণে তারা নবী-রাসূল, পীর- ওলী দরবেশ ও কবরে গিয়ে তাদের কাছে দোয়া ও আশির্বাদ কামনা করে। এসব কিছু পবিত্র কোরআনে বর্ণিত মুশরিকদের অনুরূপ। (ছয়) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা সম্পূর্ণ কুফুরী। (৭) পবিত্র কোরআন হাদীস ও এর আলোকে যুক্তির সহজ ও অবশ্যম্ভাবী নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোনো জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা কুফুরী। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহঃ) এসব মূলনীতির প্রত্যেকটিই পবিত্র কোরআন হাদীসের নির্দেশ এবং এরই ভিত্তিতে রচিত।

সে যুগে একশ্রেণীর লোকজন কষ্ট কল্পনা করেছিলো এবং এখন পর্যন্তও কেউ কেউ বিশ্বাস করে, 'মুহাম্মাদ (সাঃ)কে আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নূর দিয়ে তৈরী করেছেন বিধায় তাঁর অর্ধেক আল্লাহ এবং অর্ধেক মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, এ কারণেই তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহর পূর্ণ শক্তি বিকশিত হয়েছে'। নাউযুবিল্লাহ- এ ধারণা বিশ্বাসকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব উৎখাত করেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ধর্ম ব্যবসায়ীগণের উপার্জন বন্ধ হবার কারণে তারা তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়েছিলো এবং মুসলমানদের স্বঘোষিত খলিফা তুর্কীর শাসকগণ প্রবল বিরোধিতা করে তাঁর বিরুদ্ধে দরবারী

আলেমদের দিয়ে ব্যাপক অপপ্রচার সৃষ্টি করেছিলো। কারণ, তাঁর আন্দোলনের ফলে মক্কা ও মদীনা তুর্কী শাসকদের হাতছাড়া হয়ে যায় ফলে তাদের স্বঘোষিত খেলাফত অর্থহীন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের মাধ্যমে মক্কা ও মদীনা পুনরায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়াও ছিলো অসম্ভব, এ কারণে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহ:) ও তাঁর সংস্কার আন্দোলনের অনুসারী সমর্থকদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ভিত্তিহীন অপপ্রচার করে সমগ্র দুনিয়ার মুসলিমদেরকে তাঁর বিরোধী করার অপচেষ্টা করা হলো।

এমন এক সময় বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছিলো, যখন সমগ্র মুসলিম জাহানে শিরক ও বিদআত মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং অধিকাংশ মুসলিম ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছিলো। ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত অধিকাংশ মুসলিম স্বঘোষিত তুর্কী খিলাফতকে প্রকৃত খিলাফতের মর্যাদা দিতো। সেই খিলাফতের পক্ষ থেকেই মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহ:) এর বিরুদ্ধে যখন ফতোয়া জারী করা হলো, তখন সাধারণ মুসলিমগণের তা বিশ্বাস করাই ছিলো স্বাভাবিক। এরই ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে যখনই কোনো আলেম ওলামা কথা বলেছেন, তখনই তাঁকে ওহাবী বলে প্রচার করে তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলিমদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছে। হাজী শরীয়তুল্লাহ (রাহ:) বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার বন্দর পরগণায় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র আঠার বছর বয়সে হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করে সেখানে তিনি দীর্ঘ আঠার বছর অবস্থান করেন।

দীর্ঘ আঠার বছর তিনি মক্কা-মদীনায় অবস্থান করে ইসলামের সকল দিক সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন করে স্বচ্ছ ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহ:) এর ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সাথে পরিচিত হন এবং এ আন্দোলন তাঁর মধ্যে অদম্য উদ্দীপনা জাগ্রত করে। এ সময় সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় আলেম ওলামাগণ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহ:) এর অনুকরণে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং অমুসলিমগণ তাঁদের আন্দোলনকে 'ওহাবী আন্দোলন' নামে আখ্যায়িত করে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছিলো। এ সময় আল্লামা হাজী শরীয়তুল্লাহ (রাহ:) মক্কা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতোপূর্বেই দিল্লী থেকে শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী (রাহ:) বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করে বলেছিলেন, যত দিন পর্যন্ত

এ দেশ 'দারুল ইসলাম' না হবে ততদিন এদেশে জুমুয়া ও ঈদের নামাজ আদায় সঙ্গত নয়। হিন্দুদের পূজা পার্বনে আর্থিক, দৈহিক বা যে কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করা হারাম।

হাজী শরীয়তুল্লাহ (রাহ:) দেশে প্রত্যাবর্তন করে একই ফতোয়া দিয়ে বললেন, 'মুসলিমদের ধুতি ত্যাগ করে লুঙ্গী ও পায়জামা পরিধান করতে হবে, দাড়ি ছাঁটা বন্ধ করে দাড়ি রাখতে হবে এবং ইসলামের বিপরীত সকল প্রথা ও নিয়ম ত্যাগ করে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবনধারা অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে'। বাংলাদেশে হিন্দু জমিদারদের দ্বারা শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মুসলিমগণ দেহে নবপ্রাণের স্পন্দন অনুভব করলো। অল্প দিনেই হাজার হাজার মুসলিম হাজী শরীয়তুল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলনে যোগ দিয়ে এক বিপুল শক্তিতে পরিণত হলো। খুব সম্ভব ফরয শব্দ থেকে ফারায়েজী শব্দটি চয়ন করা হয়ে থাকবে। ইসলাম যে কাজগুলো মুসলিমদের জন্যে ফরয করেছে, তা থেকে মুসলিমরা দূরে সরে পড়েছিলো। মুসলিমগণ পুনরায় যেনো ফরয কাজসমূহ আদায় করে এ জন্যেই বোধকরি এ আন্দোলন ফারায়েজী নামে পরিচিতি পেয়েছে। এ আন্দোলন হিন্দু জমিদারদের জন্যে এক মহাবিপদের কারণে পরিণত হলো। কারণ তারা মুসলিমদের মানুষ হিসেবেও মর্যাদা দিত না এবং ইসলাম থেকেও বহু দূরে নিয়ে গিয়েছিলো।

ফারায়েজী আন্দোলন নি:শেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে হিন্দু জমিদারগণ একতাবদ্ধ হলো এবং তাদের সাথে যোগ দিলো স্বার্থান্বেষী একশ্রেণীর নামধারী মুসলিম ও কতিপয় স্বার্থন্বেষী পীর, আলেম পদবীধারী কিছু লোক ও মাজার পূজাড়ীর দল। এরা ইসলামের ছদ্মাবরণে মুসলিমদের শিরক বিদআতে লিপ্ত করে কোনো পরিশ্রম ব্যতীতই অর্থোপার্জন করতো। হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলনের আঘাত তাদের অবৈধ উপার্জনের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলো।

হিন্দু লেখকগণ হাজী শরীয়তুল্লাহ (রাহ:) এর নাম উল্লেখ করতে গিয়ে হাজী শব্দটি কর্তন করে শরীয়তুল্লাহ্ এর স্থলে 'সরাতুল্লা' উল্লেখ করেছে। তাঁর আন্দোলন বাংলার ঢাকা, বরিশাল, নদিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলো এবং সমগ্র বাংলায় এ আন্দোলনের অসংখ্য কর্মী বাহিনী গড়ে উঠেছিলো। তিনি যখন বাংলাদেশে এ আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন, তখন আরেকদিকে সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রাহ:) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সাইয়্যেদ

আহমদ (রাহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতের সিত্তানা কেন্দ্রে প্রেরণ করতেন। ফারায়েজী আন্দোলনের কারণে বাংলার মুসলিম সমাজ থেকে বহুলাংশে শিরক বিদআত বিদূরিত হয়েছিলো। শরীয়তুল্লাহ (রাহঃ) এর সুযোগ্য পুত্র হাজী মোহাম্মাদ মুহসীন ওরফে দুদু মিয়া অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মোহাম্মাদ মুহসীন ওরফে দুদু মিয়া যখন ফারায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্বে এলেন তখন এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদারগণ ও ইংরেজ নীলকররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি নির্যাতন শুরু করেছিলো। হিন্দুরা তাঁর বাড়িঘর লুট করে তাঁকে নিঃস্ব করে দিয়েছিলো। তাঁর বিরুদ্ধে অসংখ্য মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে হতদরিদ্রে পরিণত করেছিলো। পিতা ও পুত্রের বিরুদ্ধে বিরোধিতার প্রবল ঝড় উঠলেও তাঁরা ইসলাম বিরোধী শক্তির কাছে মাথানত করেননি। ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে তাঁরা সম্মুখের দিকেই এগিয়ে গিয়েছেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ (রাহঃ) এর আন্দোলন বাংলাদেশের সংগ্রামী মুসলিমদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হতে যুগ যুগব্যাপী প্রেরণা হয়ে থাকবে।

জিহাদের ময়দানে মাওলানা তীতুমীর (রাহঃ)

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হবার পরে ১৭৮২ সালে পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার চাঁদপুর গ্রামে অতি উচ্চ মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ নিসার আলী ওরফে তীতুমীর (রাহঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ প্রায় সকলেই আল্লাহভীরু ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সে পরিবারও ছিলো ইসলামের পূর্ণ অনুসারী। তিনি অল্প বয়সেই পবিত্র কোরআন মুখস্থ করে হাফেজ হন এবং পরবর্তীকালে তিনি মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার পাশাপাশি, আরবী, উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। সেই সাথে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র, ফারায়েজ শাস্ত্র, হাদীস ও দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, ইলমে তাসাউফ এবং আরবী ফার্সী কাব্য ও সাহিত্যে ব্যাপক বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি কয়েকটি ভাষায় জ্বালাময়ী বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন।

মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু ও ইংরেজ গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ছোটো করে দেখানোর উদ্দেশ্যে তাঁর জন্ম, পিতৃ পরিচয় ও স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে নানা

ধরনের কল্পকাহিনীর জন্ম দিয়েছে। এর কারণ হলো, হিন্দু জমিদারদের অনুমোদন ব্যতীত দাড়ি রাখা ছিলো মারাত্মক অপরাধ। লুঙ্গী বা পায়জামার পরিবর্তে মুসলিমদের ধুতি পরতে হতো। টুপি ও পাগড়ীর ব্যবহার এবং মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিলো। গরু জবেহ করা ছিলো কল্পনারও অতীত এমনকি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মুসলিমগণ নিজ সন্তানের নামকরণ করার স্বাধীনতাও হারিয়ে ছিলো। মুসলিমদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করলে হিন্দু জমিদার অথবা ঠাকুররা তাদের নামকরণ করতো। তাদের দেয়া নাম ছিলো, পচা, গবরা, গোপাল, গোবর্ধন, পাঁচু, ক্ষ্যাপা, নান্টু, গেদু, নবাই, নেপাল, বাদল, চাঁপা, পদ্মা, কুশাই, পটল, নিরু, সন্ধ্যা, বাবলা, পুঁটি, ছ্যাঁদা, আমন, কামন ইত্যাদি। প্রকাশ্যে নামাজ-রোজা আদায় করা ছিলো অপরাধ। জমিদারদের নির্দেশে ইসলামের বিপরীত প্রথা ও নিয়ম পালনে মুসলিমগণ বাধ্য ছিলো। হিন্দুদের পূজা পার্বনে সার্বিক সহযোগিতা না দিলে মুসলিমদের শাস্তির সম্মুখীন করা হতো। মাওলানা সাইয়্যেদ নিসার আলী তীতুমীর (রাহঃ) হিন্দু জমিদারদের প্রজা নিপীড়ন, শোষণ, মুসলিমদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে জমিদারদের হৃদকম্পনের কারণে পরিণত হয়েছিলেন।

হিন্দু জমিদারগণ ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত অজ্ঞ মুসলিমদের কিভাবে ঈমানহারা করেছে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবদেবীর পূজা অর্চনা সাধারণ হিন্দুদের পক্ষ থেকে ব্রাহ্মণগণ করে থাকে, ফলে তাদের শ্রম দিয়ে জীবিকা অর্জন করতে হয় না। হিন্দু জমিদারগণ মুসলিম প্রজাদের ঈমানহারা করার লক্ষ্যে পরামর্শ দিলো, 'গরীব মানুষ তোরা, দিনমজুরী ও ক্ষেতে হালচাষ না করলে তোদের পেট চলে না। এখন তোরা যদি প্রতিদিন পাঁচ বার করে নামাজ পড়িস, সপ্তাহে একদিন মসজিদে যাস, রোজা রাখিস, হজ্জ, জাকাত, জানাযা, প্রার্থনা, মৃতদেহ স্নান এসব ধর্মের কাজ করার সময় কোথায় তোদের? আর এসব ধর্মের কাজ করলে রোজগার করবি কখন? রোজগার না করলে তোদের সংসার চলবে কি করে? তোরা বরং হিন্দু ব্রাহ্মণদের মতো একদল লোক ঠিক কর, তারা তোদের পক্ষ থেকে ধর্মের কাজগুলো করে দিবে। এতে তোদের ধর্ম পালনও হবে তোদের সময়ও নষ্ট হবে না'। অজ্ঞ অশিক্ষিত নিরেট মূর্খ একশ্রেণীর মুসলিমরা জমিদারদের পরামর্শে ঈমানহারা হয়ে ইসলামের বিধি বিধান অনুসরণের দায়িত্ব আরেকজনের ওপর অর্পণ করেছিলো। অন্যের হয়ে দায়িত্ব পালনের লোকেরও সে যুগে অভাব হয়নি, একশ্রেণীর

মুসলিম সামান্য কিছুর বিনিময়ে 'ধর্মের' দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলো। হিন্দু জমিদাররা এভাবেই মুসলিমদের সর্বনাশ করেছে।

তদানীন্তন যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যা শিক্ষার পাশাপাশি নিয়মিত শরীর চর্চা এবং শক্তিশালী বলিষ্ঠ দেহ গঠনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেয়া হতো। মাওলানা তীতুমীর বলিষ্ঠ শরীর গঠনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কুস্তি লড়তেন এবং কুস্তিতে তিনি সুনামও অর্জন করেছিলেন। সমকালীন মুসলিমদের দুরাবস্থা, বৃটিশ ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের নির্যাতন তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিলো। প্রবল মানসিক অস্থিরতার কারণে তিনি স্বস্তি পেতেন না। কোন্ পথে অগ্রসর হলে মুসলিম সমাজ থেকে শিরক বিদআত উৎখাত, বৃটিশ ইংরেজ ও হিন্দুদের কবল থেকে মুসলমানদের মুক্ত করা যাবে, এ চিন্তা তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। সমকালীন যুগের একজন সুশিক্ষিত, শ্রেষ্ঠ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেম হিসেবে তিনি আরাম আয়েশে জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর ঈমানের আগুন তাঁকে জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানের দিকে তাড়িত করেছে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও হৃদয়ের প্রশান্তির লক্ষ্যে তিনি পবিত্র মক্কায় হজ্জ আদায়ের জন্যে গেলেন। সেখানেই তিনি তাঁর ইপ্সিত পথের সন্ধান পেলেন।

পবিত্র মক্কায় মহান আল্লাহর ঘরের ছায়াতলে তিনি বালাকোটের শহীদ মর্দে মুজাহিদ আল্লামা সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভী (রাহ:) এর সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর হাতে শপথ গ্রহণ করেন। সাইয়্যেদ আহমাদ সে সময় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অমুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং তাঁর আন্দোলনে ভারতবর্ষের অগণিত মুসলিম ও যুগশ্রেষ্ঠ ওলামাগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভী (রাহ:) এর অনুমতি নিয়ে তীতুমীর নিজ এলাকায় ফিরে এসে আন্দোলন গড়ে তুললেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে কথার মাধ্যমে মানুষকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরতেন। হিন্দুরা যে সকল মসজিদ ধ্বংস করে দিয়েছিলো সেগুলো তিনি পুনরায় নির্মাণ করে সেখানে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করলেন। জামায়াতে নামাজ শেষে তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলিমদের প্রকৃত ইসলামের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানাতেন।

তাঁর বক্তৃতা মানুষের হৃদয়ে প্রবল প্রভাব বিস্তার করতো। মানুষ দলে দলে তাঁর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে লাগলো। ক্রমশ: মানুষের মন-মানসিকতা শিরক বিদআতের প্রভাবমুক্ত হয়ে তাওহীদের আলোয় আলোকিত হতে

লাগলো। নির্যাতিত নিষ্পেষিত ও শোষিত মানুষের মনে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হলো। জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠলো। হিন্দু জমিদারদের পায়ের নীচের মাটিতে কম্পন শুরু হলো। সম্মুখ সমরে কাপুরুষতার পরিচয় দানকারীরা চিরাচরিত নিয়মে ষড়যন্ত্রের অন্ধকার সুরঙ্গ পথে এগিয়ে গেলো। জমিদাররা কলিকাতায় একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, তীতুমীরের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম ধ্বংসের প্রচার চালিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিমদের ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে। নীলকর ও প্রশাসনে অধিষ্ঠিত ইংরেজদেরও তাঁর বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হবে। প্রকৃত সত্য আড়াল ও তাঁর বিরুদ্ধে কল্পকাহিনী আবিষ্কার করে তা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। যারা ইতোমধ্যেই তীতুমীরের অনুসারী হয়েছে, তাদের ওপর নতুন করারোপ করে শাস্তির ব্যবস্থাও করতে হবে।

জমিদাররা কলিকাতা থেকে ফিরে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন শুরু করলো। সে যুগে প্রত্যেক থানার দায়িত্বে ছিলো হিন্দুগণ, তারাও জমিদারদের সহযোগী হিসেবে তীতুমীরের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করলো। ইংরেজদের বুঝানো হলো, তীতুমীর ও তাঁর অনুসারীগণ ইংরেজদের উৎখাতের লক্ষ্যে আন্দোলন করছে। সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করা হলো, তীতুমীর ও তাঁর লোকজন গরুর মাংস দিয়ে হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র করছে এবং হিন্দুদের মুখে জোর করে গরুর কাঁচা মাংস ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করা হলো, তীতুমীর ওহাবী ধর্ম প্রচার করে মুসলিমদের ইসলাম ধর্ম থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। চারদিকে প্রচারক নিয়োগ করে এসব মিথ্যা কাহিনী প্রচার করা হলো এবং জামিদারগণ আদেশ জারী করলো, যারা তীতুমীরের অনুসরণে ওহাবী হয়ে দাড়ি রাখবে, গোঁফ কেটে ফেলবে, তাদেরকে দাড়ি রাখার জন্যে আড়াই টাকা এবং গোঁফ কাটার জন্যে একটাকা চারআনা খাজনা দিতে হবে। যতবার গোঁফ কাটবে ততবার খাঁজনা দিতে হবে। কাঁচা মসজিদ নির্মাণ করলে পাঁচশত টাকা আর পাকা নির্মাণ করলে একহাজার টাকা দিতে হবে। ওহাবী মতে আরবী নাম রাখলে প্রত্যেক নামের জন্য পঞ্চাশ টাকা খাজনা দিতে হবে। গরু জবেহ করলে ডান হাত কেটে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি ওহাবী তীতুমীরকে আশ্রয় দিবে তাকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

মাওলানা সাইয়্যেদ নিসার আলী ওরফে তীতুমীর ও তাঁর অনুসারীগণের ওপর নেমে এলো অবর্ণনীয় নির্যাতন। জুমুয়ার দিনে মুসলিমগণ মসজিদে সমবেত হয়েছে, মাওলানা তীতুমীর খুৎবা শেষ করে নামাজ আদায়ের জন্যে ইমামের স্থানে দাঁড়িয়েছেন। জমিদারের নির্দেশে হিন্দুরা মসজিদে আগুন জ্বালিয়ে

দিয়েছে। দ্রুত তাঁরা মসজিদের বাইরে এলেন, অমনি তাঁদের ওপর আক্রমণ করে কয়েকজন মুসলিমকে শহীদ করা হয়েছে এবং আহতও হয়েছে অনেকে। এ ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটিয়ে বহু মুসলিমকে শহীদ করা হয়েছে। বহু মুসলমানের বাড়িঘর ও মসজিদ হিন্দুরা আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে মর্দে মুজাহিদ তীতুমীর নারকেল বাড়িয়া গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীগণও তাঁকে অনুসরণ করলেন। আল্লামা তীতুমীরের নিরাপত্তার লক্ষ্যে তিনি যে ঘরে অবস্থান করতেন সে ঘরের চারদিকে ইসলামের মুজাহিদগণ বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন, ইতিহাসে যা 'বাঁশের কেল্লা' নামে পরিচিত।

আল্লামা সাইয়্যেদ নিসার আলী তীতুমীর অনুভব করেছিলেন, শাহাদাত অত্যাসন্ন। তাঁর সন্তানগণও তাঁর সাথেই ছিলেন, তাঁরাও শাহাদাতের অমীয় সুধা পানের অপেক্ষায় রইলেন। ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, হিন্দুরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইংরেজদের বিভ্রান্ত করে কর্ণেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে একশত ঘোড় সওয়ার ইংরেজ সৈন্য, তিনশত দেশীয় পদাতিক সৈন্য এবং দু'টি কামান আনিয়ে তীতুমীরের অবস্থান ঘিরে রেখেছিলো। কেল্লা আক্রমণের পূর্বে কর্ণেল স্টুয়ার্ট কেল্লার প্রবেশ পথে উপস্থিত হয়ে দেখলো, সৌম্য দর্শন এক ব্যক্তি সাদা রঙের লম্বা জামা, সাদা লুঙ্গী ও সাদা পাগড়ী মাথায় তসবীহ্ হাতে মহান আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁকে দেখে কর্নেল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো। অপলক নেত্রে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে পথপ্রদর্শক হিন্দু ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করলো, 'এই ব্যক্তিই কি তীতুমীর? একে দেখে তো বিদ্রোহী বলে মনে হয় না'।

আল্লাহর ওলী তীতুমীরের চেহারা দেখে খৃষ্টান কর্ণেলের মনে তীতুমীরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠেছে, এ কথা বুঝতে রামচন্দ্রের দেরী হয়নি। তৎক্ষণাত সে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, এই লোকটিই বিদ্রোহী তীতুমীর, সে নিজেকে তীতু বাদশাহ বলে পরিচয় দেয়। আপনাদের আগমন সংবাদ পেয়ে সে তার আসলরূপ পরিবর্তন করে নিজেকে সাধু সাঁজিয়েছে'। কর্ণেল ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রকে বললো, 'আপনি তীতুমীরকে বলুন, আমাকে বড়লাট লর্ড বেন্টিং সেনাপতি হিসেবে পাঠিয়েছে। তীতুমীর যেনো আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে। তীতু যা উত্তর দেয়া তা আমাকে জানান'। ষড়যন্ত্রে উৎসাহী রামচন্দ্র মুখ বিকৃত করে তীতুমীরকে বললো, 'আপনি তো নিজেকে বাদশাহ মনে করেন, কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এখন জপমালা ধারণ করেছেন, তরবারী ধারণ করে যোগ্য বাদশাহের পরিচয় দিন'। জবাবে শান্ত

কণ্ঠে তীতুমীর বললেন, 'আমি কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিনি। হিন্দুগণ যেমন তাদের প্রজা আমরাও তাদের প্রজা। জমিদার এবং নীলকরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ও অজ্ঞ মুসলিমদের প্রকৃত মুসলিম বানানোর চেষ্টা আমরা করেছি'।

সাইয়্যেদ নিসার আলী তীতুমীর যা বললেন তা গোপন করে দোভাষী ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কর্ণেল স্টুয়ার্টকে জানালো, 'বিদ্রোহী তীতুমীর বলছে, সে কোনোভাবেই আত্মসমর্পণ করবে না। সে যুদ্ধে আগ্রহী। সে বলছে, কামান আর গোলাগুলিতে ভয় পায় না। সে তার ক্ষমতা দিয়ে আপনাদের সকলকে ধ্বংস করে দিবে। সে এদেশের বাদশাহ, কোম্পানী সরকার এখানে কিছুই না'। যে কোনো উপায়ে হোক তীতুমীরকে ধ্বংস করারই ছিলো হিন্দু জমিদারদের লক্ষ্য, প্রকৃত সত্য গোপন করে তারা মুসলিম নিধন যজ্ঞে ঘী ঢেলে দিলো। সূচনা হলো এক অসম যুদ্ধের, এর পরিণতি যা হবার তাই হলো। একদিকে সে যুগের উপযোগী সমরাস্ত্র অপরদিকে তীর ধনুক লাঠি। মহান আল্লাহর ওলী মাওলানা সাইয়্যেদ নিসার আলী তীতুমীর, তাঁর সন্তানগণ ও সাথীদের কাছে শাহাদাতই ছিলো মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্য পানে তাঁরা এগিয়ে গেলেন। আল্লাহর দুশমনদের কাছে মাথানত না করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে গেলেন। যে গর্বিত ইতিহাস তারা গড়লেন, তা অনাদিকাল পর্যন্ত নন্দিত মুসলিম জাতিকে শাহাদাতের ময়দানে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে। ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর ইংরেজ সৈন্যদের কামানের গোলায় আল্লামা সাইয়্যেদ নিসার আলী তীতুমীর (রাহঃ) শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্যে গমন করেন।

বালাকোটের প্রান্তর- শহীদী ঈদগাহ

ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুজাদ্দিদ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রাহঃ) মুসলিম জাতির চিন্তার জগৎ পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে যে সকল শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে পবিত্র কোরআন হাদীসের স্বচ্ছ জ্ঞানার্জন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের চেতনায় উজ্জিবীত হয়ে অসংখ্য আলেম ওলামা ছড়িয়ে পড়ছিলেন। এদের প্রত্যেকেই এক একটি স্তম্ভ ছিলেন, যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন সেখানে ইসলামী চেতনার মশাল প্রজ্জ্বলিত করে সাধারণ মুসলমানদের হৃদয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন। ভারতবর্ষে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিলো ইসলামী

জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, তাঁদের বংশ বৃত্তান্ত পাঠ করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই কোনোভাবে নবী করীম (সাঃ) এর বংশধারার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রায় সকলেই ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। যদিও ইসলাম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ তাঁদেরকে অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে চিত্রিত করেছে।

সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভী (রাহঃ) এলাহবাদের রায় বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে বংশের পূর্বসুরীদের মধ্যে বহুসংখ্যক মর্দে মুজাহিদ জিহাদের ময়দানে পদচারণা করেছেন। তিনি মায়ের গর্ভে থাকাকালীন তাঁর মা এক অদ্ভুত স্বপ্নে দেখেন, তাঁর রক্তে লেখা একটি কাগজ বাতাসে উড়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে। এ স্বপ্ন বৃত্তান্ত একজনের কাছে প্রকাশ করলে তিনি বলেন, 'আপনার গর্ভ থেকে যিনি পৃথিবীতে আগমন করবেন তিনি ইতিহাসে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি অর্জন করবেন'। আক্ষরিক অর্থেই মায়ের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান তাঁর সন্তান সাইয়্যেদ আহমাদ (রাহঃ) এর রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলো। বাল্যকাল থেকেই তিনি নিয়মিত শরীর চর্চা করে বলিষ্ঠ দেহ গড়ে ছিলেন এবং অসাধারণ শক্তি ছিলো তাঁর দেহে। শৈশব কৈশরে তাঁর খেলার ধরণ সম্পর্কে জীবনী লেখকগণ উল্লেখ করেছেন, তিনি সাথীদের নিয়ে মুজাহিদের দল তৈরী করে সামরিক কৌশলে আক্রমণের ভঙ্গিতে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যেতেন। কল্পনা করতেন তাঁর সম্মুখে রয়েছে ইসলামের শত্রুদল। আল্লাহু আকবার বলে কল্পিত আক্রমণ করে তিনি সাথীদের নিয়ে উল্লাস ধ্বনী দিতেন, 'ইসলামের মুজাহিদরা বিজয়ী হয়েছে, আর কাফির বাহিনী পরাজিত হয়েছে'।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর স্বভাব চরিত্রে ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের প্রবণতা স্পষ্ট অনুভূত হতো। প্রকৃত জিহাদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার পূর্বেই তিনি তাঁর খেলার সাথীদের জিহাদে অনুপ্রাণিত করতেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর মনের জগতে মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার প্রেম জাগ্রত হতে থাকে। আঠার বছর বয়সে তিনি কয়েকজন সঙ্গী সাথীসহ বাড়ি থেকে বের হয়ে এক পর্যায়ে দিল্লীতে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রাহঃ) এর বড় সন্তান আলেম সম্রাট শাহ্ আব্দুল আযীয দেহলভীর কাছে পৌঁছে তাঁর ছাত্র হন। সেখানে তিনি পাঁচ বছর অবস্থান করে ইসলামের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করে আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করেন। প্রতিষ্ঠিত ইসলাম বিরোধী শক্তিকে উৎখাত করে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করতে হলে একদল

মুজাহিদ বাহিনী ও সমরাস্ত্র এবং অন্যান্য রসদ প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তিনি সে যুগের একজন নবাবের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো, তিনি নবাবকে জিহাদে অনুপ্রাণিত করে তাঁর সেনাবাহিনীকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কাজে লাগাবেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, স্বয়ং নবাব আমীর খাঁন টিকে থাকার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের সাথে সন্ধি করলেন, তখন তিনি দিল্লীতে আল্লামা শাহ্ আব্দুল আযীয সাহেবকে জানালেন, এখানে মুজাহিদ বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। নবাব নিজেই ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়েছেন।

সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভী নবাবের বাহিনী ত্যাগ করে পুনরায় দিল্লীতে শাহ্ আব্দুল আযীযের সান্নিধ্যে গমন করেন। আল্লাহর প্রেমে নিজেকে এমনভাবে নিমজ্জিত রাখতেন যে, যুবক বয়সেই তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত হবার মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। তাঁর স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আল্লাহভীরুতার গুণাবলী এমনভাবে বিকশিত হয়েছিলো যে, তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তা স্পষ্ট অনুভব করা যেতো। আর ঠিক এ কারণেই সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ওলামাগণ তাঁর হাতে জিহাদের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণ যখন তাঁর কাছে শপথ গ্রহণ করলেন, তখন সাধারণ মুসলিমগণ দলে দলে তাঁর কাছে শপথ নিতে থাকলো। শুধু তাই নয়, বহু সংখ্যক অমুসলিমও তাঁর ভক্তে পরিণত হয়েছিলো। তিনি তাঁর অনুসারীদের চরিত্রে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করাসহ জিহাদের উদ্দীপনা জাগ্রত করে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছিলেন।

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি তাঁর অনুসারীদের বলতেন, 'জিহাদের উদ্দেশ্য পার্থিব ধন-সম্পদ অর্জন অথবা প্রশংসা নাম যশ খ্যাতি অর্জন করা নয়। বিভিন্ন এলাকা জয় করা বা নিজের স্বার্থ হাসিল করা অথবা নিজের জন্যে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাও জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করা এবং মুসলিম সমাজে ইসলামের নামে যে সকল শিরক বিদআত ও কুসংস্কার প্রবেশ করেছে তা দূরিভূত করা'। আল্লামা সাইয়্যেদ আহমাদ ছিলেন নির্মল ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, ক্ষণকালের জন্যেও তিনি ব্যক্তিস্বার্থ বা পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হৃদয়ে স্থান দেননি। তাঁর সমগ্র চেষ্টা সাধনার মূলে ছিলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তদানীন্তন যুগে ভারতবর্ষের যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণ, অভিজাত মুসলিম সমাজ ও অগণিত সাধারণ মুসলিম তাঁর অনুসারী ছিলেন। পীর মুরিদী প্রথা চালু করে তিনি অতুল বিত্ত

বৈভবের মালিক হয়ে আরাম আয়েশে জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর এ বান্দা পার্থিব স্বার্থকে ঘৃণাভরে পদাঘাত করে শাহাদাতের অদম্য আকর্ষণে বিভোর থাকতেন।

তদানীন্তন যুগে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী ও তাঁর সন্তান শাহ্ আব্দুল আযীয দেহলভী ভারতবর্ষের সকল আলেম ওলামার কাছে আলেমদের সূর্য্য হিসেবে মর্যাদা অর্জন করেছিলেন, বর্তমান যুগেও তাঁরা একই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং অনাদীকাল পর্যন্ত তাঁরা ওলামা হযরতগণের পথিকৃৎ হয়ে থাকবেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর নাতী এবং শাহ্ আব্দুল আযীয এর জামাতা ও আপন ভাইয়ের সন্তান বালাকোটের আরেক শহীদ শাহ্ ইসমাঈল যখন সাইয়্যেদ আহমাদ (রাহঃ) এর হাতে শপথ গ্রহণ করলেন, তখন এ সংবাদ তড়িৎগতিতে ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়লো। এর বাস্তব ফল হলো, সমগ্র এলাকার মুসলিমগণ তাঁকে নিজেদের এলাকায় আহ্বান জানাতে থাকলো। আহমাদ (রাহঃ) তাঁর শিক্ষক শাহ আব্দুল আযীয (রাহঃ) এর অনুমতিক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় সফর করলেন। তাঁর এ সফরে অগণিত মানুষ জিহাদের শপথ গ্রহণ করলো এবং বহু সংখ্যক অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে মুজাহিদ বাহিনীতে নাম লেখালো। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংঘটিত আহমাদ সাহেবের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটলো, এসব ঘটনা দেখে মানুষ উন্মুক্ত অবারিত হস্তে মুজাহিদ বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে এলো।

ভারতবর্ষে একদিকে ইংরেজ ও হিন্দুদের অত্যাচারে মুসলিমদের প্রাণ ছিলো ওষ্ঠাগত, অপরদিকে শিখদের হাত মুসলিম পুরুষ, নারী ও শিশুদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছিলো। সাইয়্যেদ আহমাদ এ সংবাদ জেনে গভীর মর্মযন্ত্রণা অনুভব করে শিখদের অত্যাচার থেকে মুসলিমদের মুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর দলে যুগশ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম ছিলেন। তাঁদের জীবনধারা ছিলো, ফজরের নামাজের পরে ইসলামের প্রচার, কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান, এর কিছু পরে কঠোর দৈহিক পরিশ্রমে লিপ্ত হওয়া, ইশার নামাজের পরে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে রাতের বাকী অংশ নামাজে অতিবাহিত করা। সে যুগে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গমন করা ছিলো অত্যন্ত কঠিন। পথ ছিলো দুর্গম, কণ্টকাকীর্ণ ও বিপদ সঙ্কুল। সাইয়্যেদ আহমাদ (রাহঃ) ও তাঁর সাথের যুগশ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম কখনো পায়ে হেঁটে কখনো বা ঘোড়ায় চড়ে শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে মানুষের কাছে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য্য তুলে ধরেছেন। মুসলিম

সমাজ থেকে কবরপূজা ও অন্যান্য শিরক বিদআত উৎখাত করে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রাহঃ) এর লক্ষ্য ছিলো খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুরূপ একটি ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের সকল সৌন্দর্য্য বিকশিত করা এবং এর লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া। মূল লক্ষ্য অর্জনে জিহাদে অবতীর্ণ হবার পূর্বে তিনি মহান আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ যিয়ারত তথা হজ্জ আদায় করতে মন স্থির করলেন। সে যুগে ভারতবর্ষ থেকে হজ্জে যাওয়া ছিলো অত্যন্ত কঠিন। তিনি হজ্জে যাবেন, এ কথা প্রচার হবার সাথে সাথে চারশত নারী পুরুষ তাঁর সাথী হলেন। রায়বেরেলী থেকে হজ্জের এ কাফেলা যখন এলাহাবাদ পৌঁছলে তখন হজ্জযাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ালো সাতশত। সেখান থেকে বিভিন্ন এলাকা অতিক্রম করে হজ্জ কাফেলা আযীমাবাদ পৌঁছলে তিব্বতের একটি দল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াতী কাজের ভার অর্পণ করেন। সেখান থেকে তাঁরা হুগলী হয়ে কলিকাতা পৌঁছান। বাংলাদেশেরও বহু সংখ্যক মুজাহিদ তাঁর বাহিনীতে শামিল ছিলো এবং তাঁরাও জিহাদের ময়দানে শাহাদাতবরণ করেছেন। তাঁর হজ্জ কাফেলায় সর্বমোট সাতশত তিপ্পান্নজন হজ্জযাত্রী ছিলো। দশটি জাহাজে তাঁরা আরোহণ করে মক্কার দিকে যাত্রা করেন। সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন ভালো জাহাজগুলো তিনি অন্যদের দিয়ে নিতান্তই পুরনো জাহাজটিতে তিনি আরোহণ করে রায়বেরেলী থেকে যাত্রা করার দশ মাস পরে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন।

হজ্জ আদায় করে তিনি কয়েক মাস মক্কায় অবস্থান করেন এবং পবিত্র রমজান মাসে তিনি আল্লাহর ঘরে ইতেকাফ করেন। হজ্জ থেকে দেশে ফিরে এসে তিনি চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করা ফরজ, এ বিষয়টির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি সমকালীন ওলামায়ে কেরাম, নবাব ও অভিজাত মুসলিমদের কাছে বহু পত্র লিখেন। হিন্দু জমিদারদের কাছেও তিনি ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যে পত্র লিখেছেন। আন্দোলনকে সফলতার দ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তিনি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করে ভারতের প্রধান প্রধান এলাকায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং প্রতিনিধিগণের সকলেই ছিলেন বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম। অর্থাৎ নেতৃত্বের কাঠামোসমূহ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও বিচক্ষণ আলেমদের দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিলো এবং ইতিহাসে সেসব সম্মানীত আলেমদের নাম পরিচয় উল্লেখ রয়েছে। আন্দোলনের মূল কেন্দ্র স্থাপন করা হয় পাটনায়।

বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে মুজাহিদগণ সাইয়্যেদ আহমাদ (রাহঃ) এর বাহিনীতে যোগ দেয় এবং সকল এলাকা থেকেই আর্থিক সাহায্য কেন্দ্রে পৌছাতে থাকে। সাইয়্যেদ নিসার আলী তীতুমীর শহীদ (রাহঃ) অর্থ যোগাড় করে কেন্দ্রে প্রেরণ করতেন।

অতি গোপনে ভারতের সর্বত্র জিহাদের প্রচারণা ও প্রস্তুতি শেষ করে আহমাদ (রাহঃ) নিজ জন্মভূমি রায়বেরেলী ত্যাগ করেন এবং এখানে আর ফীরে আসার সুযোগ তাঁর হয়নি। শাহাদাতবরণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় জিহাদের ময়দানে জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো মুসলিম অধ্যুষিত সীমান্ত এলাকায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে অন্যান্য এলাকার দিকে দৃষ্টি দিবেন। শিখদের দ্বারা মুসলিমগণ অত্যাচারিত হচ্ছে, এ সংবাদ তিনি পূর্বেই পেয়েছিলেন। মুসলিমদের প্রতি শিখদের অত্যাচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর মাত্র নয়শত মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে নওশেরায় পৌছান। সেখান থেকে বালাকোট পর্যন্ত পৌছতে পথিমধ্যে বার তের স্থানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, রসদ ও অন্যান্য উপাদান সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে মুসলিমগণ যুগিয়ে আসছিলো। নওশেরায় পৌছার পর তিনি ইসলাম নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী সংঘর্ষ এড়ানোর লক্ষ্যে শিখদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জানিয়ে দেন, ইসলাম কবুল করে মুসলিম হও অথবা মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করে আনুগত্য স্বীকার করো। এ দুটোর একটিও যদি না করো তাহলে অস্ত্রের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হও।

শিখরা নিজেদের যোদ্ধা জাতি মনে করে বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলো। রাতব্যাপী যুদ্ধে মাত্র নয়শত মুজাহিদের আক্রমণের মুখে বিশাল শিখবাহিনী পরাজিত হলো। মুসলিম বাহিনীর বিজয়ে উল্লসিত মুসলিমগণ দলে দলে সাইয়্যেদ আহমাদ (রাহঃ) এর বাহিনীতে যোগ দিলো। এ সময়ে মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ালো এক লাখেরও অধিক। সীমান্ত এলাকার পাঠান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দও সাইয়্যেদ আহমাদকে সমর্থন দিলো। একটি বিশাল এলাকা দখল করে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেন। ইসলামী বিধি বিধান তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে জারী করলেন। স্থানীয় ধনিক শ্রেণী, যারা নানাভাবে গরীব মুসলিমদের শোষণ করে ধন-সম্পদের পাহাড় রচনা করছিলো, তাদের শোষনের পথ বন্ধ হলো। ফলে তারা সাইয়্যেদ আহমাদ ও তাঁর অনুসারীদের ক্ষতি করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকলো। পীরপূজা ও মাজার পূজা এবং শিরক বিদআত চালু রেখে যে সকল মোল্লারা পরিশ্রম ব্যতীতই অর্থোপার্জন করতো, তারাও বিরোধিতা শুরু করলো। কতক স্থানে

বিশ্বাসঘাতকতা করে মুজাহিদ বাহিনীর কয়েকশত সদস্যদের নামাজরত অবস্থায় হত্যাও করা হলো।

অপরদিকে ইংরেজ, হিন্দু ও শিখরা সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভী (রাহঃ) এর আন্দোলনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক মিথ্যা প্রচারণা শুরু করলো। দেশে ভাড়াটিয়া মাওলানার অভাব হলো না, এমনকি সাউদী আরব ও তুরস্ক থেকেও আলেম নামধারী জালিমদের ভাড়া করে আনা হলো। তাঁকে 'ওহাবী, কাফের, জালিম, মুসলিমদের দ্বীন ঈমান ধ্বংসকারী' ইত্যাদী বিশেষণে বিশেষিত করে দুনিয়া পূজাড়ী আলিমরা ফতোয়ার প্লাবন প্রবাহিত করলো। তাঁরা সকল মুসলিমকে আহ্বান জানালো, তাঁরা যেনো কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা সাইয়্যেদ আহমদের আন্দোলনে না করে, যারা করবে তারাও জাহান্নামে যাবে বলে ফতোয়া দেয়া হলো।

এ প্রচারণায় সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই বিভ্রান্ত হলো। শিখদের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হবার পরে নতুন যে সকল লোকজন মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো এবং যারা সাইয়্যেদ আহমাদ (রাহঃ) এর অনুসারী হয়েছিলো, তাদের মধ্যে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে অর্থের লোভে ইসলামের দুশমনদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ শুরু করলো। সীমান্ত এলাকার কয়েকজন মুসলিম নামধারী নেতা এবং পেশাওয়ারের নেতৃস্থানীয় লোকজন ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়লো। হযরত জাফর থানেশ্বরী (রাহঃ) উল্লেখ করেছেন, সাইয়্যেদ আহমাদ এ অবস্থায় মুজাহিদ বাহিনীকে একত্রিত করে বললেন, 'আমার আকাঙ্খা ভেঙ্গে চূর্ণ-চিূর্ণ করা হয়েছে, পাঠানরা বিশ্বাসঘাতকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। ইসলামী জীবন বিধান এখানে প্রতিষ্ঠার আশা আর নেই। এখান থেকে হিজরত করা ছাড়া আমার কোনো পথ নেই। আমি বালাকোটের গিলগিট পথে অন্য কোথাও চলে যাবো। আল্লাহ্ রহমত করলে পুনরায় এ কাজে হাত দিবো। আমি যে পথে যেতে চাই তা অত্যন্ত দুর্গম কঠিন পথ। পদে পদে রয়েছে ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা। আমার এ পথে চলার জন্যে আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাবো না। তোমরা ইচ্ছে করলে যে যার বাড়িতে চলে যেতে পারো'।

তাঁর কথা শুনে সমবেত মুজাহিদগণ বলেছিলেন, 'জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে পেছনে সরে যাওয়া কুফুরী কাজ। আমরা যে কোনো অবস্থায় আপনার সাথেই অবস্থান করবো'। সাইয়্যেদ আহমাদ (রাহঃ) ইংরেজ, শিখ, হিন্দু ও মুসলিম নামে পরিচিত মুনাফিকদের চতুরমুখী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় তাঁর একান্ত অনুগত অনুসারীদের নিয়ে বালাকোটের দিকে অগ্রসর হলেন।

আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদগণ বালাকোটের সৌন্দর্য্য মণ্ডিত উপত্যকায় পৌঁছে পথের সম্বল যা ছিলো তা গুছিয়ে রেখে নামাজের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। সেদিন ছিলো পবিত্র জুমুয়া'বার, ১৮৩১ সালের ৬ই মে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা আল্লাহর জান্নাতে মেহমান হয়ে অনাবিল বিশ্রামের জন্যে গমন করবেন, শাহাদাতের পেয়ালা তাঁদেরকে হাতছানি দিয়ে আল্লাহর জান্নাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলো, সে আহ্বান তাঁদের কতজনের কানে পৌঁছেছিলো তা মহান আল্লাহ তা'য়ালাই ভালো জানেন। সকলেই ছিলেন অপ্রস্তুত, আচমকা ইসলামের শত্রুরা তাঁদেরকে ঘীরে ধরলো।

প্রস্তুতি গ্রহণেরও সুযোগ পাওয়া গেলো না। ঝাঁপিয়ে পড়া শত্রুবাহিনীর সাথে শুরু হলো এক অসম হাতাহাতি যুদ্ধ। মুজাহিদ বাহিনী জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে একে একে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। মর্দে মুজাহিদ সাইয়্যেদ আহমাদ, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রাহ:) এর নাতী আল্লামা শাহ্ ইসমাঈল দেহলভীসহ শ্রেষ্ঠ আলেমগণ দেহে প্রাণের স্পন্দন থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন। এরপর সকলেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে মহান আল্লাহর জান্নাতের দিকে যাত্রা করলেন। সেদিন বালাকোটের সবুজ উপত্যকা ইসলামের মর্দে মুজাহিদদের তপ্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠলো। সেদিন পবিত্র কোরআনের সৈনিকদের যে রক্ত ঝরেছিলো, তা বৃথা যায়নি। ইসলামের মুজাহিদদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না। সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ ও শাহ্ ইসমাঈল দেহলভী শহীদ (রাহ:), শ্রেষ্ঠ আলেমগণ এবং মুজাহিদ বাহিনী মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজেদের দেহের যে রক্ত ইসলামী আন্দোলনের গোড়ায় ঢেলে ছিলেন, সে আন্দোলন মাত্র ২৬ বছর পরেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। অনাগত কালব্যাপী তাঁদের রক্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জিহাদের ময়দানে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আসবে।

ভূলুণ্ঠিত নয়- পতাকার হাত বদল মাত্র

সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ বেরেলভী ও সাইয়্যেদ ইসমাঈল শহীদ দেহলভী (রাহ:) ইসলামী আন্দোলনের যে পতাকা উড়িয়ে ছিলেন, তা বালাকোটের প্রান্তরে ভূলুণ্ঠিত হয়নি। এ পতাকা ভূলুণ্ঠিত কখনো হয় না, হাত বদল হয় মাত্র। ইসলামী আন্দোলনের পতাকা মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা মাহমুদ উল্লাহ, মাওলানা জাফর থানেশ্বরী, মাওলানা ইয়াহ্হিয়া আলী,

মাওলানা ইমাম উদ্দীন, সুফী নূর মুহাম্মাদ নিযামপুরী প্রমুখ ওলামাগণ হাতে তুলে নিলেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি রহমত করুন। তাঁরা সকলেই ছিলেন সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রাহ:) এর প্রতিনিধি। সে যুগের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম ছিলেন সমকালীন যুগের অভিজাত ও ধনী ঘরের সন্তান। তাঁদের শৈশব, কৈশর ও তারুণ্য অতিবাহিত হয়েছে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্য দিয়ে এবং অভাব-অনটন ও কষ্টের সাথে তাঁরা পরিচিত ছিলেন না। মাওলানা বেলায়েত আলী (রাহ:) এর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন রাজদরবারের আমীর ওমরাহ এবং সে যুগে আমীর ওমরাহগণ লক্ষ্ণৌ শহরে বসবাস করতো বলে লক্ষ্ণৌ শহর অভিজাত এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিলো।

সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ ইসলামী আন্দোলনের কাজে লক্ষ্ণৌ শহরে আগমন করলে মাওলানা বেলায়েত আলী তাঁর ভোগবিলাসের জীবন পরিত্যাগ করে জিহাদের উদ্দেশ্যে মুজাহিদ বাহিনীতে নাম লিখিয়ে দুনিয়াত্যাগী ফকীরের মতো জীবন যাপন শুরু করেন। তিনি সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রাহ:) এর সাথে কঠোর শ্রমে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে এনে মুজাহিদদের জন্যে নিজ হাতে রান্না করতেন। তিনি দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তান, সোয়াত, হায়দারাবাদ ও দাক্ষিণাত্যে ইসলামী আন্দোলনের আহ্বান পৌঁছে দেন। তিনি যখন দাক্ষিণাত্যে আন্দোলনের কাজে ব্যস্ত তখন সাইয়্যেদ আহমাদ বালাকোটে শাহাদাতবরণ করেন। কারো মৃত্যু বা শাহাদাতের মধ্য দিয়ে দ্বীনি আন্দোলন শেষ হয় না, মাওলানা বেলায়েত আলী নিজ দায়িত্বে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর আপন ভাই মাওলানা এনায়েত আলীকে বাংলাদেশে, মাওলানা যয়নুল আবেদীনকে উড়িষ্যা ও মাওলানা আব্বাস আলীকে যুক্ত প্রদেশে দায়িত্বশীল হিসেবে প্রেরণ করেন। সকলেরই মূল লক্ষ্য ছিলো দস্যু ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা।

আন্দোলনে আতঙ্কিত হয়ে ইংরেজ সরকার মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলী- এ দুইভায়ের পরিবার পরিজনের ওপর নির্মম নির্যাতন শুরু করে। তাঁদের দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দিয়ে বার বার গ্রেফতার করে নির্যাতন চালায়। সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী সকল যুগের মর্দে মুজাহিদদের আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগ তাঁদেরকে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে অনুপ্রাণীত করছিলো। সুতরাং যে কোনো নির্যাতনের মোকাবেলায় তাঁরা অনঢ় থেকে দ্বীনি আন্দোলনে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে ইংরেজ সরকার তাদের দুই ভাইয়ের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে পরিবারের নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের

নি:সম্বল ও নিরাশ্রয় করে পথে বসিয়েছিলো। তাঁদের মাথার ওপর তখন আকাশ ব্যতীত আর কোনো ছায়া ছিলো না। সকল পরিস্থিতি হাসিমুখে মোকাবেলা করে তাঁরা দ্বীনি আন্দোলনে অটল থেকে সম্মুখের দিকেই এগিয়ে গিয়েছেন।

বিপ্লবী মুজাহিদ আহমাদ উল্লাহ, তিনি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেননি। ইংরেজী ভাষায় লেখাপড়া করেছিলেন এবং আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষাতেও উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। সে যুগে তিনি ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভী (রাহঃ) কে দেখে তাঁর হৃদয়ে ঈমানের আগুন এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিলো যে, সে আগুনে পুড়ে তিনি নিজেই শুধু খাঁটি মুমিনে পরিণত হননি, তাঁর তিন সন্তান ইয়াহ্‌হিয়া আলী, ফয়েজ আলী, আহমাদ উল্লাহ ও নিজ স্ত্রীকেও পূর্ণ মুমিনে পরিণত করে ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদ বানিয়েছিলেন। আহমাদ উল্লাহ সাহেবের পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিলো আহমাদ বখ্‌ত্‌। সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ তাঁর সে নাম পরিবর্তন করে আহমাদ উল্লাহ রাখেন এবং এ নামেই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন, তাঁর ছোট পুত্রের নামও ছিলো আহমাদ উল্লাহ। বলাবাহুল্য, সে যুগে যাঁরাই ইসলামী আন্দোলনে শামিল ছিলেন, সকলকেই 'ওহাবী' নামে আখ্যায়িত করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা করা হতো। এ যুগে যেমন দ্বীনি আন্দোলনকে 'মওদুদী ফিতনা এবং আন্দোলনের লোকদের মওদুদীর অনুসারী' হিসেবে আখ্যায়িত করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হয়। সে যুগেও যেমন দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়ার আলেমের অভাব হয়নি, বর্তমান যুগেও অভাব নেই। এসব উচ্ছিষ্ট ভোগী আছে এবং থাকবে, এদের ছড়ানো আবর্জনা মাড়িয়েই মঞ্জিলে মকসুদের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গোপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণ প্রকাশ্যেই আন্দোলন করেছেন। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনে তাঁর সম্পৃক্ততার বিষয়টি বেশী দিন গোপন থাকেনি। গোয়েন্দাদের মাধ্যমে ইংরেজ সরকার বিষয়টি জেনে তাঁকে গ্রেফতার করে চাকরীচ্যুত করলো। তাঁর ও তাঁর তিন সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে সকলকেই কারারুদ্ধ করা হলো। পবিত্র ঈদের দিনে তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের বাড়ি থেকে একবস্ত্রে বের করে দেয়া হলো, পানি পানের একটি পাত্রও নিতে দেয়া হয়নি। উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত তাঁর সকল সম্পদ বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে তাঁর বসতবাড়ী ভেঙ্গে সেখানে

ইংরেজ সরকার মার্কেট নির্মাণ করলো। বিচারে ইংরেজ বিচারক তাঁদের সকলকেই ফাঁসির আদেশ শোনালো। শহীদের মর্যাদা পাবেন, এ আনন্দে যখন তাঁরা হাসছিলেন, বিচারক তাঁদের সে আনন্দটুকুও বরদাসত করলো না। তৎক্ষণাত রায় পরিবর্তন করে আন্দামানে দিপান্তরের আদেশ দেয়া হলো। আন্দামানেই পিতাপুত্র সকলেই কারারুদ্ধ অবস্থায় হাসিমুখে শাহাদাতবরণ করেছেন।

আহমাদ সাহেবের বড় সন্তান ইয়াহ্হিয়া আলী শাহাদাতবরণ করার বেশ কিছুদিন পর তাঁর ছোট সন্তান আহমাদ উল্লাহ শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো, তাঁর কবরটি যেনো বড় ভাই ইয়াহ্হিয়া আলীর কবরের পাশে দেয়া হয়। জালিম ইংরেজরা তাঁর সে আকাঙ্খা পূরণ হতে দেয়নি। ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আহমাদ সাহেবের পরিবারের সকলে যে অনুপম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা সকল যুগে দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীদের উদ্দীপনা যোগাবে। তাঁদের পরিবারের সাথে যে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হয়েছে, তা বস্তুবাদ আর জড়বাদী জীবন দর্শনে বিশ্বাসীদের পক্ষেই শোভা পায়।

শহীদ আহমাদুল্লাহ সাহেবের বড় ভাই ছিলেন মাওলানা ইয়াহ্হিয়া আলী। আহমাদ সাহেবের বড় সন্তানের নামও ছিলো ইয়াহ্হিয়া আলী। সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভী শাহাদাতবরণ করার পরে আন্দোলনের মুজাহিদদের আধ্যাত্মিক ইমামের দায়িত্ব পালন করছিলেন মাওলানা ইয়াহ্হিয়া আলী (রাহঃ)। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর পরিচালক, সামরিক প্রশিক্ষক, মাসজিদের খতীব- ইমাম, ইলমে তাসাউফের উস্তাদ, আন্দোলন ও যুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে সাংকেতিক পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে কুফুরী শাসন উৎখাতের লক্ষ্যে ওলামায়ে কেরাম প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন, এ সংবাদ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অগোচরে ছিলো না। গ্রেফতার হওয়ার অর্থই ছিলো সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত হওয়া, পরিবার পরিজনের অসহায় অবস্থায় রাস্তায় নেমে যাওয়া এবং ফাঁসি, এসব কিছু জেনেই ওলামায়ে কেরাম আন্দোলনের দুর্গম পথে অগ্রসর হয়েছেন। আলেম সমাজ ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন না করলে নন্দিত জাতি মুসলিমরা নিন্দিত পথে এগিয়ে যায়, সে যুগের শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম এ কথা অনুভব করেই পথ দুর্গম জেনেও দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেননি।

মাওলানা ইয়াহ্হিয়া আলী, হাজী মুহাম্মাদ শফী ও আল্লামা জাফর থানেশ্বরী (রাহঃ) একই সাথে গ্রেফতার হয়ে বিচারে ফাঁসির আদেশ শ্রবণ করলেন। তিনজন ইংরেজ বিচারক তাঁদের হাসি দেখে মুহূর্তকালের জন্যে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তাঁদের ধারণা হলো, ইংরেজী ভাষায় দেয়া

রায় বোধহয় এরা বুঝতে পারেনি। তাঁরা বললো, 'ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই তোমরা ফাঁসিতে ঝুলবে। তোমরা এভাবে হাসছো কেনো?' মাওলানা ইয়াহ্হিয়া আলী হাসতে হাসতেই বললেন, 'ইংরেজী ভাষা আমরা ভালো করেই বুঝি। শাহাদাত আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নেয়ামত, সে নেয়ামত আমরা লাভ করে সফলতা অর্জন করেছি। আমাদের এ আনন্দ তোমরা বুঝতে পারবে না'। আসলেই শাহাদাতবরণের বিষয়টি বস্তুবাদ আর জড়বাদীদের বুদ্ধির অগম্য। মুসিলমরা হাসবে এটিও তারা সহ্য করতে পারে না। তাদের উদ্দেশ্যই ছিলো, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে সংগ্রামী ওলামায়ে কেরামকে নি:শেষ করে দিয়ে সাধারণ মুসলিমদের নেতৃত্বহীন করে সকল দিক দিয়ে তাদেরকে অমুসলিম বানানো।

তিন ইংরেজ বিচারক তৎক্ষণাত রায় পরিবর্তন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানোর নির্দেশ দিলো। মাওলানা ইয়াহ্হিয়া আলীকে কারাগারে নিয়ে তাঁর মুখের সুশোভিত দাড়ি জোর করে কেটে দেয়া হলো। তাঁর বাড়িঘর, সহায় সম্পত্তি সকল কিছু বাজেয়াপ্ত করে পরিবারের নারী শিশুদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে পথে বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এমনকি পারিবারিক কবরস্থান মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিলো। সকল নির্যাতন তিনি হাসিমুখে সহ্য করলেও তাঁর মুখ থেকে যখন দাড়ি কেটে নেয়া হলো, তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়লো। তিনি কর্তিত দাড়ি হাতে নিয়ে আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, আল্লাহর রাসূল (সা:)কে ভালোবেসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এ দাড়ি রেখেছিলাম। জালিমরা আজকে জোর করে দাড়ি কেটে দিলো। তবে সান্ত্বনার বিষয় হলো, আল্লাহর পথে জিহাদে অবতীর্ণ হবার কারণে দাড়িও আল্লাহর পথেই কাটা পড়লো।

আল্লামা জাফর থানেশ্বরী (রাহ:) সে যুগের অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁকে যখন শৃঙ্খলবদ্ধ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন পথের দু'পাশে অগণিত মানুষ দাঁড়িয়ে ব্যথিত চিত্তে বিদায় জানাচ্ছিলো। ভীড়ের মধ্যে নাবালেগ শিশু সন্তানসহ পর্দাবৃতা একজন নারীকে দেখে আল্লামা জাফর পুলিশদের থামার অনুরোধ জানালেন। এরপর তিনি শৃঙ্খলিত অবস্থায় সে নারীর দিকে এগিয়ে গিয়ে শিশুকে আদর জানালেন। নারী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁকে বললেন, 'আমাদেরকে কার হাতে সোপর্দ করে যাচ্ছেন?' তিনি মৃদু হেসে স্ত্রীকে বললেন, 'তোমাকে বহু পুরনো সেই ইতিহাস শোনাচ্ছি। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ:) নিজ স্ত্রীকে শিশু সন্তানসহ নির্জন পাহাড়ী এলাকায় যাঁর হাতে সোপর্দ করেছিলেন, আমিও তোমাকে তাঁরই হাতে সোপর্দ করে যাচ্ছি'। তিনি দীর্ঘ আঠার বছর আন্দামানের কারাগারে

অমানবিক নির্যাতন ভোগ করে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে পুনরায় দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশেরও বহু সংখ্যক মুজাহিদ সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ বেরেলভী (রাহ:) এর আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। নোয়াখালী সদরের মাওলানা ইমাম উদ্দীন ও তাঁর ভাই আলীম উদ্দীন এবং চট্টগ্রামের নূর মুহাম্মাদ সাহেব নিজ নিজ এলাকা থেকে লোক সংগ্রহ করে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন এবং এদের অনেকে শাহাদাতবরণ করেছেন। বালাকোটের মর্মান্তিক ঘটনার পরে সমগ্র ভারতবর্ষে ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো তা অকল্পনিয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছিলো। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হঠকারিতার কারণে তাদের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়েছিলো, সে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তাঁরা ভারতবর্ষের মাটি থেকে মুসলিম উৎখাতের নিষ্ঠুর তাণ্ডব শুরু করেছিলো। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামকে লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে মুসলিমদের প্রায় নেতৃত্ব শূন্য করেছিলো।

শাহাদাতের ময়দানে আলেম সমাজ

১৮৭৫ সালে সিপাহী বিদ্রোহ কেনো ঘটেছিলো, এর অন্তর্নিহিত কারণসমূহ এবং পরিণতি চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ যার যার দৃষ্টিকোণ থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন। সে সময় যে মুসলিম নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবং ওলামায়ে কেরামকে নিশ্চিহ্ন করার ঘৃণ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিলো, সেসব মর্মান্তিক ঘটনাবলীর করুণ চিত্র ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত রয়েছে। দুশমনদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলো, ভারতবর্ষের মুসলিমদের সংগ্রামী ইসলামী চেতনা মুছে দিয়ে কাণ্ডারিহীন হাল পাল ছেঁড়া নৌকায় পরিণত করা। জ্ঞানের রাজ্যে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে দুশমনরা জ্ঞান সাধক আলেমদেরই শুধু হত্যা করেনি, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরী, মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহও ধ্বংস করে দিয়েছে। একদিকে চলছিলো ইসলামী জ্ঞানের মূল দুর্গসমূহের ধ্বংস সাধন, আরেকদিকে চলছিলো ধর্মের নামে বিকৃত খৃষ্ট আদর্শের প্রচার। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচারকরা লোভ লালসা প্রদর্শন ও নানা কৌশলে খৃষ্ট ধর্মের বিস্তৃতি ঘটাচ্ছিলো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকারের সহায়তায় খৃষ্ট ধর্মের সংগঠন শক্তিশালী করে দেশের সর্বত্র সংগঠনের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দেয়া হয়। চার্চ মিশন সোসাইটি, বাইবেল সোসাইটি, মিশন ফাণ্ড, মিশন হাসপাতাল এবং খৃষ্টিয় সন্যাসীদের নামে বাংলা অঞ্চলসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পশ্চিমা দেশ থেকে দলে দলে এদেশে খৃষ্টান পাদ্রীরা আগমন করতে থাকে। তারা এদেশীয় সহযোগিদের সহায়তায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় এমনকি এলাকা ভিত্তিক আঞ্চলিক ভাষাতেও খৃষ্টিয় বিকৃত ধর্মের বই পুস্তক ছড়িয়ে দেয়। সে যুগে দিল্লী ও আগ্রা ছিলো বিখ্যাত আলেমদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। ইউরোপ থেকে আগমনকারী পাদ্রী ফণ্ডার দিল্লীতে প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি 'মীযানে হক' যার বাংলা অনুবাদ 'সত্যের মানদণ্ড' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করে সাধারণ মুসলিমদের ঈমানহরণের ব্যবস্থা করে প্রকাশ্যেই ইসলামের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেন। ওলামায়ে কেরাম পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুমান করে পাদ্রীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ঘোষণা করেন, 'বিতর্কে যারা পরাজিত হবে তারা বিজয়ী দলের ধর্ম গ্রহণ করবে'। পাদ্রী এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে দলবলসহ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। ওলামায়ে কেরামের পক্ষে ছিলেন আল্লামা রহমতুল্লাহ ওসমানী কীরানভী, আল্লামা ফয়েজ আহমাদ বাদায়ুনী এবং খৃষ্টধর্ম বিশেষজ্ঞ ডাঃ ওয়াযীর খাঁন। বিতর্কে বিচারক কমিটিতে ভারতবর্ষের সরকারী বেসরকারী বিখ্যাত ব্যক্তিগণ অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনদিন যাবৎ বিতর্ক চলার পর খৃষ্টান পাদ্রীগণ তাদের ধর্মগ্রন্থের বিকৃতি মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু শর্তানুসারে তারা ইসলাম কবুল না করে ভারত থেকে পালিয়ে ইউরোপ চলে যান। সেদিন ওলামায়ে কেরাম সকল লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি, জেল-জরিমানা ও নির্যাতন উপেক্ষা করে জ্ঞানের বর্মে সজ্জিত হয়ে মুসলিম মিল্লাতের সম্মুখে শীশা নির্মিত প্রাচীরের ন্যায় না দাঁড়ালে ভারতবর্ষে মুসলিম অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখোমুখী হতো।

১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিলো, সে আন্দোলনে শুধুমাত্র মুসলিমগণই অংশগ্রহণ করেননি বরং ভারতবর্ষের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষই অংশগ্রহণ করছিলো। কারণ সকল ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী পেশার মানুষই দখলদার ইংরেজদের কারণে নির্মমভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলো। অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁরা নিঃস্ব ফকীরে পরিণত হয়েছিলো। দখলদার ইংরেজরা এদেশীয় অনুগতদের সহযোগিতায় অত্যন্ত বর্বোরচিত পন্থায় আন্দোলন দমন করেছিলো। ভারতবর্ষে ইসলামের দুশমন পৌত্তলিক ও অন্যান্যরা ইসলামী শক্তিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে সকল দোষ ওলামায়ে কেরামের ওপর চাপিয়ে ইংরেজ প্রভুদের কাছে নিজেরা সাধু সাজলো এবং পরবর্তীতে ওলামায়ে কেরামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলমের খোঁচায় মসীলিপ্ত করলো। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন সফল না হওয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যে সকল কারণ চিহ্নিত করেছেন, তা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তান হযরত আব্দুল আযীয দেহলভী (রাহঃ) এর হাতে গড়া যুগ শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম ইসলামী আন্দোলন শুরু করে বালাকোটে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখী হলেন। এরপরে আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা এলেন, তাঁদের পক্ষ থেকে সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেই স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করা হয়েছিলো। ফলে সে আন্দোলন তাঁদের নেতৃত্ব, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত, পরামর্শ ও সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিলো। আন্দোলনে দেশীয় সৈন্য যারা অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, তাদের সম্মুখে কোনো মহান আদর্শ ছিলো না, তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো ইংরেজদের তাড়ানো। এ আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও ছিলো না। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলার প্রকট অভাব ছিলো। প্রশিক্ষণের অভাব, আদর্শিক দৃঢ়তা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সময়োপযোগী অস্ত্র, প্রয়োজনীয় রসদ, পারস্পরিক যোগাযোগ ও বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে অসচেতনতা ইত্যাদি আন্দোলনকারীদের বিপর্যয় তরান্বিত করেছিলো। কোথাও কোনো গোলাযোগের সূচনা হলে দুষ্কৃতকারীরা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে লুট, দস্যুতা ও রাহাজানিতে লিপ্ত হয়। এদের দ্বারায় সংঘটিত অপরাধের সকল দায়িত্ব আন্দোলনে জড়িত লোকজনের ওপর আপতিত হয়। সেখানেও পরিস্থিতির নাজুকতায় তা-ই ঘটেছিলো এবং সমাজের সুশিল ভদ্র লোকজনের অনেকেই অকারণ ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা ও লুটতরাজ দেখে আন্দোলনে সমর্থন দেননি।

কিন্তু পরিকল্পিতভাবে সকল দোষ মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে সংগ্রামী ওলামায়ে কেরামকেই এককভাবে দায়ি করা হলো। ফাঁসি, দ্বীপান্তর, কারাগারে নির্যাতন, সহায় সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ ওলামায়ে কেরামের ললাট লিখনে পরিণত হলো। 'ইনকিলাবে ১৮৫৭ কি তাসভীর কা দুস্‌রা রুখ' এবং 'উলামায়ে হিন্দ-কা শান্‌দার মাঝি' নামক গ্রন্থদ্বয়ে ওলামা ও মুসলিম নিধনযজ্ঞের করুণ চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। কে কোন্ স্তরের আলেম, জনগণের সাথে বা আন্দোলনের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা বাছ বিচার করা হয়নি। দাড়ি টুপি পরিহিত লোকজন দেখামাত্রই হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, মাদ্রাসা মক্তবের শিক্ষক এমনকি ক্ষেত-খামারে কর্মরত দাড়িওয়ালা লোকদেরও রেহাই দেয়া হয়নি। মসজিদ মাদ্রাসাসমূহ ধ্বংস স্তুপে পরিণত করা হয়েছিলো। বহু মসজিদকে ইংরেজরা ক্লাব, পার্ক ও গুদামে পরিণত করেছিলো। কোনো কোনো মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে ইংরেজ মণীষীদের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। যে জনপদে প্রতিদিন পাঁচবার আযানের

ধ্বনী শোনা যেতো, সেখানে কবরের সুনসান নীরবতা নেমে এলো। কিছুকাল মসজিদে নামাজ আদায় করার মতো লোক পাওয়া গেলো না। মুসলিম প্রধান এলাকায় প্রতিদিন ফজরের পরে প্রত্যেক বাড়ি থেকে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের শব্দ বাতাসে ভেসে আসতো, সেসব বাড়িঘর ধ্বংস স্তুপে পরিণত করা হলো।

আধুনিক যুগে আফগানিস্থান ও ইরাকে মুসলিমদের হত্যার পর লাশের ওপর প্রসাব করা ও লাশের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে যেমন গর্ব প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে, সেযুগেও এরাই ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিমদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে আনন্দ উল্লাস করেছে। মিঃ উইলিয়াম হান্টার সাহেব তাঁর লিখিত The Indian Muslims গ্রন্থে নির্মম সত্য স্বীকার না করে পারেনি। মুসলিম জনপদসমূহ বিরান মরুভূমিতে পরিণত করেছিলো। কোনো কোনো গ্রামে প্রবেশ করে নারী, পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ সকলকে আগুনে পুড়িয়ে, লাঠি বা ধারালো অস্ত্রে অথবা গাছের শাখায় ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। ইংরেজদের একটি দল এলাহাবাদ থেকে কানপুর আসছিলো। পথে ৬৪জন মুসলিম তাদেরকে প্রশংসার দৃষ্টিতে না দেখে ভিন্ন দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। এ অপরাধে তাদের সকলকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

ওলামায়ে কেরামকে গ্রেফতার করে এনে গীর্জায় ঝাড়ু দেয়ার আদেশ দিয়ে বলা হতো, 'এ কাজ করলে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হবে'। এ কাজ করতে যাঁরা অস্বীকার করেছে, তাঁদেরকে তৎক্ষণাত তরবারী দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। দুর্বল ঈমানের যারা প্রাণ রক্ষার তাগিদে গীর্জা ঝাড়ু দিয়েছে, তাদেরকেও পরে হত্যা করা হয়েছে। সাধারণ মুসলিমদের গ্রেফতার করে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, তিনজন মাওলানার খোঁজ দিতে পারলে মুক্তি দেয়া হবে। নির্যাতনের মাধ্যমে আলেমদের সন্ধান জেনে গ্রেফতার করে সন্ধান দাতা এবং আলেম, কাউকেও জীবিত রাখা হয়নি। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, 'মুসলিম হওয়াই ছিলো অপরাধ এবং তাকে হত্যার জন্য গাছের ডাল আর এক গাছা রশিই যথেষ্ট ছিলো'। ঝুলন্ত অবস্থায় প্রাণ বের হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ ছটফট করতো, এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য ছিলো ইংরেজদের কাছে উপভোগ্য। আলেমদের হাতির পিঠে বসিয়ে গাছের নীচে নিয়ে গলায় রশি জড়িয়ে ডালের সাথে বেঁধে হাতিকে তাড়া করে দূরে সরিয়ে দেয়া হতো। দিল্লীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শূল স্থাপন করে অগণিত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

তামা এবং লৌহ শলাকা আগুনে উত্তপ্ত করে ওলামায়ে কেরামের দেহে দাগ দেয়া হয়েছে। ফাঁসি দেয়ার পূর্বে তাঁদের দেহে শূকরের চর্বি মাখানো হয়েছে। অনেককে শূকরের চামড়ায় জড়িয়ে প্রজ্জ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ

করা হয়েছে। কামানের সম্মুখে অনেককে বেঁধে কামান দাগা হয়েছে। অনেককে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট দিয়ে পরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। বহু আলেমকে হাত পা বেঁধে পানিতে ও আগুনে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে। দিল্লীতে এক এলাকায় মুসলিম শিশুরা ইংরেজ ও মুসলিম দুই দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছিলো। ইংরেজদের চোখে এ দৃশ্য পড়লে তারা সকল শিশুকে পাশেই এক গাছের ডালে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিলো। দিল্লী জামে মসজিদের অভ্যান্তরে মুসলিমদের হত্যা করে লাশের স্তুপ বানানো হয়েছিলো। ওলামায়ে কেরাম ও অভিজাত মুসলিমদের বাড়িঘর লুট করে ধন-সম্পদ খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে ব্যয় করা হয়েছিলো।

যুগ শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে দ্বীন মাওলানা জালাল উদ্দীন ও তাঁর সঙ্গী আলেমদের নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। মজলুম মুজাহিদ মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদীকে গ্রেফতার করে অমানবিক নির্যাতন করে আন্দামানে নির্বাসন দিয়ে তাঁর সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। আন্দামানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। মাওলানা নাসির উদ্দীন সাহেবের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী মাওলানা মুফতী সদরুদ্দীনের প্রতি অত্যাচার করে একটি চোখ প্রায় অন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো এবং তাঁর সকল সহায় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। মাওলানা সাহ্‌বীয়া, তাঁর সন্তানসহ পরিবারের ২১জনকে নদীর পাড়ে নিয়ে গুলী করে হত্যা করা হয়। মহান আল্লাহর ওলী মর্দে মুজাহিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ, শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহ্‌মাদ মাদানী এবং তাঁর উস্তাদ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদ, মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী, মাওলানা মুনীর এবং তাঁর আপন ভাই মাওলানা মাযহার প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম অকল্পনীয় নির্যাতন সহ্য করে সংগঠনের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেছেন এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র জিহাদেও অবতীর্ণ হয়েছেন। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাঁদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান বানিয়ে নিন।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ কাসিম নানতুভী (রাহ:) সশস্ত্র জিহাদ করেছেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিলো, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওলামায়ে কেরামের একটি বৈঠক হয়। সেখানে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত হলে মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদ থানভী (রাহ:) ভিন্নমত পোষণ করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানতুভী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁর কাছে জানতে চান, 'আপনি ইসলাম এবং দেশের জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরজ এমনকি জায়েযও মনে করেন না, এর কারণ কি?' জবাবে মুহাম্মাদ থানভী বলেন, 'এ জন্যে যে, আমাদের কাছে অস্ত্র বা জিহাদের উপকরণ নেই'। মাওলানা নানতুভী বললেন, 'বদর যুদ্ধে যতটা

উপকরণ ছিলো, ততটুকুও কি নেই?' শায়খ মুহাম্মাদ বললেন, 'আপনার সকল যুক্তি যদি স্বীকার করে নেয়াও হয়, তাহলেও জিহাদের সবচেয়ে বড় শর্ত হচ্ছে ইমাম বা নেতা নিযুক্ত করা। ইমাম বা নেতা কোথায়? কার নেতৃত্বে জিহাদ করা হবে?'

মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানতুভী বললেন, 'ইমাম নিযুক্তিতে দেরী হবার কারণ নেই। হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব বর্তমান আছেন। তাঁর হাতেই জিহাদের শপথ গ্রহণ করা যায়'। হাজী ইমদাদুল্লাহ ছিলেন বালাকোটের মুজাহিদ এবং মহান আল্লাহর ওলী। তাঁর নেতৃত্বে পুনরায় মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানতুভীকে সেনাপ্রধান এবং মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহীকে বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। তাঁরা সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে থানাভুন এলাকা দখল করে ইসলামী আইন জারী করে ইংরেজদের আইন বাতিল করেছেন। জিহাদের ময়দানে মাওলানা কাসিম নানতুভী রক্তাক্ত হয়েছেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা এবং অধিকাংশ শিক্ষকগণ কেউ-ই কুসুমাস্তীর্ণ শয্যায় জীবন অতিবাহিত করেননি। একদিকে তাঁরা ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণ করেছেন, অপরদিকে সমকালীন রাজনীতি ও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা দুশমনদের নির্যাতন সহ্য করে দ্বীনি আন্দোলনের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। শত্রুপক্ষের গোয়েন্দাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার লক্ষ্যে ওলামায়ে কেরাম রেশমের রুমালে লিখে সংবাদ আদান প্রদান করতেন এবং সে কারণে ইতিহাসে তা 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' নামে পরিচিতি পেয়েছে। শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহ্মাদ মাদানী এবং তাঁর উস্তাদ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রাহঃ) উক্ত আন্দোলনে যোগ দেয়ার কারণে কারানির্যাতিত হয়েছেন।

নন্দিত জাতি নিন্দিত গন্তব্যে

১৮৫৭ সাল থেকে দীর্ঘ কয়েক বছরে দুশমনদের নির্যাতনে অগণিত বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম শাহাদাতবরণ করেন। বহু সংখ্যক আলেমে দ্বীন দেশের বিভিন্ন কারাগারে অথবা দ্বীপান্তরিত হয়ে আন্দামানে কারাবন্দী। অনেকে দেশ থেকে হিজরত করে মক্কা মদীনায় গিয়ে আন্দোলনের নতুন পরিকল্পনা করছিলেন। এ অবস্থায় ভারতবর্ষের মুসলিমগণ সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছিলো। মুসলমানদের মধ্যে এক অদ্ভুত সুনসান নীরবতা ও আশা ভঙ্গের

সবহারানো প্রবল যন্ত্রণা সমাধী ক্ষেত্রের শান্তভাব বিরাজ করছিলো। কিন্তু এ নীরবতা ছিলো সাময়িক, পুনরায় তাঁরা ঈমানী চেতনা শানিতকরণে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যে কয়জন আলেম কারাগার থেকে মুক্ত হতে পারলেন এবং নির্বাসন থেকে দেশে আসার সুযোগ হলো, তাঁরা পরিবেশ পরিস্থিতি অনুধাবন করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে এগিয়ে এলেন। আশাহত ও পাশ্চাত্য সভ্যতা পরিবেষ্টিত মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে তাঁরা কোরআন হাদীসের চর্চার প্রতি সর্বপ্রথমে গুরুত্ব দিলেন। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী শিক্ষা যেভাবে মুসলিমদের গ্রাস করছিলো, এর মোকাবেলায় ঈমানকে জীবিত রাখার জন্যে কোরআন হাদীসের চর্চা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথও সে পরিবেশে খোলা ছিলো না।

এ লক্ষ্যেই মর্দে মুজাহিদ মাওলানা মুহাম্মাদ কাঁসিম নানতুভী (রাহ:) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করলেন। এ মাদরাসাও বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে নানাবিধ ষড়যন্ত্র করা হয়। মাদরাসার কাজ নিয়মিত শুরু হবার পর দুশমনরা ইংরেজ সরকারে কাছে মাওলানার বিরুদ্ধে দরখাস্ত দিয়ে উল্লেখ করে, মাওলান কাসিম ইতোপূর্বে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তিনি এখানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করে সেখানে সরকার বিরোধী লোক তৈরী করছেন। ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এবং সীমান্ত এলাকার জিহাদী মুসলিমদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং বাইরের শত্রুদের এদেশ আক্রমণে উৎসাহিত করছেন। সে সময় পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণকারী মির্জা গোলাম আহমাদ নিজেকে নবী দাবি করে ইয়াহূদী ও বৃটিশদের সহযোগিতায় এক নতুন ধর্মমত তৈরী করে মুসলমানদের ঈমানহরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। ইংরেজদের দিয়ে ভারতবর্ষ আলেম শূন্য করার ঘৃণ্য কর্মসূচীতে কাদিয়ানীরা সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়েছে। এদের কারণে বহু সংখ্যক আলেমে দ্বীন শাহাদাতবরণ অথবা কারারুদ্ধ হয়েছেন। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসার বিরুদ্ধেও কাদিয়ানীরা ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলো।

দরখাস্ত পেয়ে ইংরেজ সরকার মাওলানা নানতুভীর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি করে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের প্রেরণ করলো। তদন্ত কর্মকর্তাগণ মাওলানাকে দেখে কেমন যেনো অভিভূত হয়ে পড়লো। ফিরে গিয়ে তাঁরা রিপোর্ট করলো, 'যাঁর ব্যাপারে আমাদেরকে তদন্ত করতে প্রেরণ করা হয়েছিলো, সে ব্যক্তি একজন আধ্যাত্মিক পর্যায়ের সাধক প্রকৃতির

মানুষ। তাঁর চেহারা থেকে দ্যুতি বিকিরণ করছে। এমন জ্যোর্তিময় চেহারা বিশিষ্ট লোকের পক্ষে আইন শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে জড়িত হবার কথা চিন্তা করা যায় না। আমাদের মনে হয় সামাজিক শান্তি বিনষ্ট করতে চায় এমন কিছু লোক মাওলানা কাসিমের বিরুদ্ধে এমন একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছে'। দুর্যোগোর দিনগুলো সম্পর্কে আল্লামা নানতুভী (রাহঃ) নিজেই বর্ণনা করেছেন, 'বিপদের দিনগুলোয় আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম, নবী করীম (সাঃ) আমাকে ধরে তাঁর চাদরের মধ্যে নিয়ে আমার সমগ্র দেহ চাদর দিয়ে আবৃত করছেন'। কেউ কেউ তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন, 'শত্রুদের কবল থেকে তাঁকে হেফাজত করার জন্যই রাসূল (সাঃ) তাঁকে নিজ চাদরে আবৃত করতেন'। তবে মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানতুভী (রাঃ) এর অন্যতম ঘনিষ্ঠজন মাওলান রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রাহঃ) ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, 'এ স্বপ্নের অর্থ মাওলানা নানতুভী দ্রুত ইন্তেকাল করবেন'। সত্যই মাওলানা এরপর বেশী দিন দুনিয়ায় ছিলেন না, ১৮৮০ সালের ১৫ই এপ্রিল তিনি ইন্তেকাল করেন।

অপরদিকে মুসলমানদের ক্ষোভ প্রশমিত করার লক্ষ্যে ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন ডক্টর স্পেঙ্গার এবং ১৯২৭ সাল পর্যন্ত প্রিন্সিপাল ছিলেন আলেকজাণ্ডার হেমিলটন হালি। ৭৭ বছর ধরে ২৬ জন খৃষ্টান প্রিন্সিপালের পরিচালনার পরে একজন মুসলিম প্রিন্সিপাল নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। সে প্রিন্সিপালও ছিল খৃষ্টানদের হাতে গড়া তাদেরই মানস সন্তান এবং তিনি যে কেমন ধরনের মুসলিম ছিলেন তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। আল্লামা মুহাম্মাদ কাসিম নানতুভী (রাহঃ) সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন জিহাদের অগ্নিঝরা ময়দানে, তাঁর সম্মানীত ওস্তাদ, সঙ্গী সাথী, সহচর, বন্ধু-বান্ধব সকলেই ছিলেন জিহাদের ময়দানের সৈনিক। তিনি নিজ হাতে যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র চালনা করেছেন, আহত হয়েছেন, সাথীদের শাহাদাতবরণ করতে দেখেছেন, তিনি স্বয়ং অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করেছেন। তিনি নিজেও আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চমার্গে অবস্থান করতেন এবং তিনি যে সংগ্রামী শহিদী কাফেলার সাথে যুক্ত ছিলেন, সে কাফেলার সকলেই আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করতেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানতুভী (রাহঃ) হাজী ইমদাদুল্লাহ (রাহঃ) কে আমীরে জিহাদ নিযুক্ত করেছিলেন। এমন এক সময় ইমদাদুল্লাহ সাহেব হজ্জে রওয়ানা করেন, যখন তাঁকে গ্রেফতার করার জন্যে ইংরেজ সরকার হন্যে হয়ে ফিরছিলো। আম্বালা জেলার রাও আব্দুল্লাহ খাঁন ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং

তিনি হাজী সাহেবের ভক্ত ছিলেন। যাত্রা পথে তিনি খাঁন সাহেবের মেহমান হয়েছিলেন। সে সময় ইমদাদুল্লাহ সাহেবের মতো মানুষকে আশ্রয় দেয়ার অর্থ ছিলো নিজ হাতে নিজের ধ্বংস ডেকে আনা। গোয়েন্দাদের মাধ্যমে ইংরেজ সরকার জেনে যায় যে, ইমদাদুল্লাহ সাহেব খাঁন সাহেবের বাসায় অবস্থান করছেন। ফজর নামাজ শেষেই ইংরেজ সৈন্যরা খাঁন সাহেবের বাসা ঘিরে ফেলে। ইমদাদুল্লাহ সাহেব দ্রুত খাঁন সাহেবের ঘোড়ার আস্তাবলে প্রবেশ করে ছোট্ট একটি চৌকিতে ইশরাকের নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট খাঁন সাহেবের বাড়ির দরজার কড়া নাড়া দিলে স্বয়ং খাঁন সাহেব গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'এত সকালে আপনার আগমন! আসুন, ভেতরে আসুন'। খাঁন সাহেবের বাইরের দিক স্বাভাবিক থাকলেও ভেতরের জগতে ঝড় প্রবাহিত হচ্ছিলো। মনে মনে তিনি আল্লাহর রহমতের দরজায় ধর্ণা দিচ্ছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট ভেতরে প্রবেশ করে খাঁন সাহেবের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'শুনেছি আপনার আস্তাবলে ভালো ভালো ঘোড়া আছে। সেগুলো আমরা দেখতে এসেছি'। খাঁন সাহেবের চেহারার দিকে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও ম্যাজিস্ট্রেট কোনো রকম ভয়-ভীতির চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারলো না। হয়ত বা তিনি ধারণা করেছিলেন, গোয়েন্দারা ভুল সংবাদ দিয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট ঘোড়ার আস্তাবল ঘুরে দেখে সেই ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো, যেখানে হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব ছিলেন। তিনি দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে প্রবেশ করতে করতে বললেন, 'খাঁন সাহেব কি এখানে ঘোড়ার খাবার রাখেন!' ম্যাজিস্ট্রেট দেখলেন ধূলি মলিন ঘরে একটি ছোট্ট চৌকির ওপর জায়নামাজ বিছানো, কোনো মানুষের অস্তিত্ব নেই। তিনি জানতে চাইলেন, 'এখানে নামাজ আদায় করে কে?' খাঁন সাহেব বললেন, 'আমি এখানে এলে নামাজ আদায় করি'। ম্যাজিস্ট্রেট তল্লাসী শেষে বিদায় গ্রহণ করলে খাঁন সাহেব হন্তদন্ত হয়ে পুনরায় সেই ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন ইমদাদুল্লাহ সাহেব সেই চৌকিতে নামাজ আদায় করছেন। এ ধরনের বহু অলৌকিক ঘটনাবলী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের জীবনকে ঘিরে সংঘটিত হয়েছে।

নির্যাতনের সেই ক্রান্তিকালে মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানতুভী (রাহঃ) এর পক্ষে দেশত্যাগ সম্ভব হয়নি, আন্দোলনের কাজে তাঁকে হিন্দুস্থানেই থাকতে হয়। শুধু গ্রেফতারী পরোওয়ানাই নয়, তাঁকে ধরিয়ে দিলে পুরস্কার দেয়ার ঘোষণাও দেয় ইংরেজ সরকার। তাঁর সাথীগণ তাঁকে আত্মগোপন করার জন্যে পীড়াপিড়ী করতে থাকলে তিনি আত্মগোপনে রাজী হলে তাঁকে গোপন

স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনদিন পর তিনি প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলে আন্দোলনের সাথীগণ তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি প্রকাশ্যে এলেন কেনো?' জবাবে তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তিনদিন সাওর গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন, সে সুন্নাহ্ অনুযায়ী তিনদিনের বেশী আত্মগোপনে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়'। এরপর ছাতা মসজিদ নামক একটি মসজিদে তিনি অবস্থান করছিলেন। তাঁকে গ্রেফতার করার জন্যে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হলে তিনি ধীর স্থীরভাবে উঠে মসজিদের বাইরে এসে জুতা পরিধান করছেন। পুলিশের এক অফিসার তাঁকে প্রশ্ন করলো, 'মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম কোথায়?' ক্ষণপূর্বে তিনি মসজিদের ভেতরে যে স্থানে অবস্থান করছিলেন, হাতের ইশারায় সে স্থান দেখিয়ে তিনি বললেন, 'কিছুক্ষণ পূর্বেও তিনি ওখানে ছিলেন'। কথা শেষ করে তিনি তাঁর গন্তব্যে চলে যান। তাঁর জীবনে এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা একাধিকার ঘটেছে। বুঝতে কষ্ট হয় না, তাঁরা আধ্যাত্মিক জগতের কোন্ উঁচু স্তরে অবস্থান করতেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানতুভী (রাহঃ) এর মানসিক কাঠামো গঠিত ছিলো সাহাবায়ে কেরামের জিহাদী উদ্দীপনায়। এ চেতনার ভিত্তিতেই তিনি নিজের সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং এ চেতনার অগ্নিমশাল জ্বালাতেই তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক, শুভাকাঙ্খী সকলেই ইসলাম বিরোধী বাতিল শক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ময়দানে জিহাদী ভূমিকা পালন করবেন, এটাই ছিলো মাওলানা নানতুভী (রাহঃ) এর হৃদয়ের আকাঙ্খা। তাঁর অনুসরণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তাঁর ভক্ত, অনুরক্ত, অনুসারী ও ছাত্রগণ বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সরকারী অনুদানহীন এ সকল মাদরাসা মুসলিম মিল্লাতের দ্বীন, ঈমান, আকিদা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি হেফাজতে অভঙ্গুর ঢাল হিসেবে যে ভূমিকা পালন করে আসছে, বর্তমান সময়ে পূর্বের ভূমিকার তুলনায় আরো অধিক কঠোর ভূমিকা দেখার আশায় প্রহর গুনছে।

মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসে বিজ্ঞান শেখার ব্যবস্থা বর্তমান সময় পর্যন্তও সংযোজিত হয়নি। কোন্ স্তরে কতটুকু বিজ্ঞান শিক্ষা সংযোজন করা যেতে পারে তা ওলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের বিষয়। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ সম্পর্কে মাদরাসা ছাত্রদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকলে দাওয়াতী ময়দান যেমন সহজ হবে, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মহীনদের চক্রান্তের মোকাবেলা করাও সহজ হবে। ইংরেজদের যুগ থেকে মাদরাসা শিক্ষা ও এ শিক্ষায় শিক্ষিত সম্মানীত লোকদের প্রতি

দুশমনরা উদাসীনতা ও অবহেলা সৃষ্টি করেছিলো, বর্তমানে সে অবহেলা ও উদাসীনতাকে সন্ত্রাসের মোড়কে আবৃত করে মাদরাসা শিক্ষিতদের সন্ত্রাসী ও মাদরাসাকে সন্ত্রাসের সুতিকাগার বানানোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দুশমনদের এ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ইস্পাত নির্মিত প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে নন্দিত এ মুসলিম জাতিকে নিন্দিত পথ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র ওলামায়ে কেরামই তাঁদের সংগ্রামী ভূমিকার মাধ্যমে আত্মমর্যাদাহীন মুসলিমদের মধ্যে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে এ দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করতে যে, মুসলিম মিল্লাত এ পৃথিবীতে শাসিত হতে আসেনি, তাঁরা এসেছে শাসন করার লক্ষ্যে। ড. আল্লামা ইকবাল (রাহ:) বলেন–

ছবক্ব প্যড় ফির শাজাআ'ত কা সাদাক্বাত কা আ'দালাত কা

লিয়া জায়েগা তুজছে কাম দুনিয়া কি ইমামাত কা।

শিক্ষা গ্রহণ করো সততা, বীরত্ব ও ন্যায় পরায়ণতার, বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে তোমাকেই আহ্বান করা হবে।

ভারতবর্ষ ইংরেজদের পদানত হবার পর শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তাদের রাজনৈতিক ও মানসিক দাসত্ব করবে, এমন শ্রেণীর লোকজন তৈরীর উদ্দেশ্যে তারা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করলো। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ আর জড়বাদী জীবন দর্শনে ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষা ব্যবস্থা রচিত হলো এবং পার্থিব সকল উন্নতি অবনতির চাবিকাঠি রেখে দেয়া হলো নতুন এ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে। এই শিক্ষা অর্জনের মধ্যেই মেধার বিকাশ ঘটিয়ে সর্বোচ্চ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারলে চাকরী ক্ষেত্রে উচ্চপদে আসীন হয়ে এবং লোভনীয় পদসমূহ অধিকার করে অঢেল অর্থ বিত্ত উপার্জনের সুযোগ করা হলো। সম্মান মর্যাদার উচ্চ আসনে আসীন হয়ে নাম, যশ, সুখ্যাতি অর্জন এবং নেতৃত্বের পদও অলঙ্কৃত করার পথ তৈরী হলো। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষা অর্জনকারী লোকদের জন্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়া হলো। পাশ্চাত্যের এ শিক্ষায় শিক্ষিত লোক ব্যতীত সমাজ সংগঠন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত কেউ-ই নেতৃত্ব দেয়ার উপযোগী হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না বলে বিবেচিত হলো। দেশ ও জাতির উন্নয়নমূলক যে কোনো কর্মকাণ্ডে এ শিক্ষাই মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারিত হলো। যে ব্যক্তি এ শিক্ষা গ্রহণ করেনি তার পক্ষে রাজনীতি,

অর্থনীতি, সমরনীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন, জাতিয় উন্নয়ননীতি ইত্যাদিতে সম্পৃক্ত হয়ে ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকলো না।

অপরদিকে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের জন্য মাদরাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদিম, খুব বেশী হলে স্কুলের অবহেলিত ধর্ম শিক্ষকের পদ শূন্য রাখা হলো। উপার্জনের মাধ্যমে স্বচ্ছলভাবে জীবন ধারনের কোনো পথই তাঁদের জন্যে উন্মুক্ত রাখা হলো না। ইসলামী চিন্তানায়কগণ কোরআন হাদীস গবেষণা করে ইজতেহাদের মাধ্যমে মাদরাসার জন্যে আধুনিক যুগপোযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নও করলেন না। মাদরাসা শিক্ষিতগণ আধুনিক সমাজে অচল মুদ্রায় পরিণত হলেন। এর বিষময় ফল দাঁড়ালো এই যে, মুসলমানরা নতুন প্রজন্মদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করলো। নতুন প্রজন্মদের মেধা বস্তুবাদের পরিমণ্ডলে বিকশিত হতে লাগলো। ধনিক ও অভিজাত শ্রেণীর লোকজন তাদের সন্তানদের শিক্ষার্জনে পাশ্চাত্যের দেশসমূহেও পাঠিয়ে দিলো। জাতিয় প্রয়োজনে অকেজো, অপদার্থ ও নিতান্তই দীনহীন গরীব লোকদের সন্তানদের দ্বারা মাদরাসা পূর্ণ হলো। মাদরাসায় সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জন করলেও সমাজে এরা অবহেলিত ও অপাংক্তেয় হিসেবে বিবেচিত হলো। সমাজ সভ্যতার কোনো একটি স্তরেও এদের নেতৃত্বকে আহ্বান জানানো হলো না।

কোরআন হাদীস চর্চার জন্যে যে বিপুল মেধার প্রয়োজন, মুসলিমদের সে মেধাশক্তি ধর্মহীন বস্তুবাদ চর্চায় লিপ্ত হলো। স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে এরা শুধু বস্তুবাদ চর্চাই করলো না, ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার যে রঙে বস্তুবাদ রঙিন, সে রঙের প্রত্যেকটি কণা তারা নিজ জীবনে বাস্তবায়নে উদ্যোগী হলো। সত্য মিথ্যা নির্ধারণে পাশ্চাত্যের মানদণ্ডকেই এরা নিজেদের মানদণ্ডে পরিণত করলো। এদের দেহটুকুই শুধু এদেশীয় থাকলো, মন-মস্তিষ্ক, আবেগ-উচ্ছ্বাস, পছন্দ-অপছন্দ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, কল্পনা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী সকল কিছুই পাশ্চাত্য কাঠামোয় গঠিত হলো। কথাবার্তায়, চলাফেরায়, পোষাক পরিচ্ছদে, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিফলন ঘটালো। কবিতা-সাহিত্যে, প্রবন্ধে, আলোচনায় পাশ্চাত্য সভ্যতা কেন্দ্রিক প্রশংসার প্লাবন প্রবাহ শুরু হলো। পাশ্চাত্যের লেখক, কবি, সাহিত্যিক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, শিল্পী, খেলোয়াড়, রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদ, সমরবিদ ও বিজ্ঞানীদের নামে মুসলিম শিশুদের নামকরণ শুরু হলো।

ইসলাম এদের কাছে নিতান্তই একটি ধর্ম বলেই শুধু বিবেচিত হলো না, সে ধর্মও জটিল, সেকেলে, পশ্চাদপদ, সংশয়পূর্ণ, বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক, যুক্তিহীন, আধুনিক যুগের অনুপযোগী, প্রগতি ও উন্নতির অন্তরায় ইত্যাদি বলে ধারণা হলো। ইসলামের বিধি-বিধান ব্যঙ্গ বিদ্রুপের

বিষয়ে পরিণত করা হলো। ইসলামের বিরোধিতায় যে সকল মন্তব্য অমুসলিমগণ এ যাবৎকাল করে আসছিলো, তার তুলনায় অধিক ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য মুসলিম নামে পরিচিত লোকদের মুখ থেকে শোনা গেলো। সমাজ, দেশ, জাতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি পরিচালনার সকল পদ এই শ্রেণীর লোকজনের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলো। জাতির চালিকা শক্তির পদে আসীন হয়ে এসব লোক সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে নিন্দিত পথে এগিয়ে দিলো। ইংরেজদের বিদায়ের পরে মুসলিমরা অগণিত প্রাণ ও বহু ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে স্বাধীন দেশ পাকিস্তান অর্জন করলো। শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীগণ অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ অর্জন করলো। কিন্তু ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো উদ্যোগ নেয়া তো হলোই না, বরং একে আরো গভীর অন্ধকার বিবরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো।

ইসলাম আজ আপন ঘরে অপরিচিত

ইংরেজরা সুদূর প্রসারী লক্ষ্য স্থির করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলো, সে উদ্দেশ্য তাদের লক্ষ্য অর্জনের মাত্রার তুলনায় এত বেশী দূর অগ্রসর হয়েছে যে, মুসলিমদের ধ্বংস যজ্ঞে তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয় না, মুসলিমরা স্বয়ং নিজেদের ধ্বংস করার জন্যে যথেষ্ট। পাশ্চাত্যের রচিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলিম দেশে এমন আত্মমর্যাদাহীন আত্মঘাতী লোকজন তৈরী করেছে এবং করছে, যারা নিজ দেশ ও মুসলমানদের প্রতি সামান্যতম সহানুভূতিও পোষণ করে না। অর্থ, বিত্ত ও ক্ষমতার লোভে এরা ইসলামের ইমারত চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং জাতিয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা এদের মন-মানসিকতার গলায় গোলামীর জিঞ্জির এমনভাবে জড়িয়ে দিয়েছে যে, দেশের সকল সম্পদ পাশ্চাত্যের প্রভুদের পদতলে বিসর্জন দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে। নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে এরা যে কোনো কুৎসিত কদর্য পন্থা অবলম্বন করে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করে। জাতিয় ক্ষেত্রে নিজেরা সমস্যা সৃষ্টি করে সমাধানের আশায় প্রভুদের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'স্বাধীনতা ও স্বাধীন দেশের নাগরিক' কথাগুলো বার বার শুনিয়ে দেশের জনগণের কানের পর্দা ছিন্ন করার উপক্রম করলেও দেশের সর্বত্র বিদেশী প্রভুদের হস্তক্ষেপকে নীরবে বা প্রকাশ্যে স্বাগত জানিয়ে পরাধীনতার পরিচয় দেয়। এই শ্রেণীর লোকজনের শাসনযন্ত্রে মুসলিম জাতি নিষ্পেষিত হয়ে অমুসলিমদের গোলামী করতে বাধ্য হচ্ছে।

শাসক পরিবর্তন হবার কারণে মুসলিম দেশসমূহে শিক্ষা সিলেবাসে নিত্য নতুন বিষয় সংযোজিত করে মুসলমানদের মুসলিম পরিচিতি এমনভাবে মুছে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম আজ নিজ ঘরেই সম্পূর্ণ অপরিচিত। অধিকাংশ মুসলিমের সাথে ইসলামের পরিচয় নেই, শুদ্ধভাবে কালেমায়ে তাইয়্যেবা ও মহান আল্লাহর নামও উচ্চারণ করতে জানে না। আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের পরিচয় এদের কাছে অজানা। তাওহীদ ও রিসালাত সম্পর্কে অজ্ঞ, পরকাল সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা নেই। শির্ক সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই এবং পবিত্র কোরআন নাযিল ও কোরআন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানও নেই। কতক মুসলিম তো এমনও রয়েছে, যারা নিজ নবীর নামও বলতে পারে না। ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে এরা সম্পূর্ণ অপরিচিত। আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের সম্মান মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা নেই বিধায় চোখের সম্মুখে আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের অবমাননা হতে দেখলে মনে প্রতিক্রিয়া হয় না। যে বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক কোনো জ্ঞান নেই, সে বিষয়ের প্রতি মনেরও আকর্ষণ নেই।

নবী করীম (সা:) এর পবিত্র নাম মোবারক যেখানে উচ্চারিত হয়, নাম শোনার সাথে সাথে তাঁর সম্মানে দরুদ পাঠ করা বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম' এতটুকু অন্তত বলতে হবে। বহু উচ্চশিক্ষিত মুসলিমকে শুধুমাত্র রাসূল (সা:) এর নাম উচ্চারণ করে কথা বলতে দেখা যায়, তাঁরা 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম' বলার কষ্টটুকু স্বীকার করে না। তাঁর নাম মোবারক উচ্চারণের আদবও জানে না। ইসলাম আজ সেই মুসলিম খুঁজে পায় না, যে মুসলিমগণ পৃথিবীর সকল কিছুর তুলনায় ইসলামের অনুশাসনকে সর্বোচ্চে মর্যাদা দিয়েছে। ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় ধন-সম্পদ প্রয়োজনে নিজের প্রাণও বিলিয়ে দিয়েছে। ইসলামের শিক্ষা বঞ্চিত মুসলিমগণ জানে না 'মুসলিম' কাকে বলে এবং মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে হলে নূন্যতম কোন্ কোন্ শর্ত পালন করতে হয়। তবে আশার বিষয় হলো, অধিকাংশ মুসলিম ইসলাম সম্পর্কে না জানলেও তাঁরা ইসলামের প্রতি দুর্বল। চব্বিশ ঘন্টায় এরা পাঁচবার আযান শোনে, শুক্রবারে অনেকেই মসজিদে যায়, মসজিদ দেখে, কোনো না কোনোভাবে পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত এদের কান পর্যন্ত পৌঁছে, ওলামায়ে কেরামের ওয়াজও এদের কানে আসে। ইত্যাদি কারণে অধিকাংশ মুসলিমরা ইসলামের প্রতি দুর্বল। এখন প্রয়োজন শুধু তাদের কাছে ইসলামের সঠিক শিক্ষা পৌঁছানো। ব্যক্তিগত পরিচর্চার মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করাতে পারলে এরাই একনিষ্ঠ মুসলিমে পরিণত হবে এবং সেই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে, যা মুসলিমদেরকে ইসলামের সাথে অপরিচিত করে রেখেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সঙ্কট সমাধানে আলেম সমাজের করণীয়

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিমদের মধ্যে সততা, স্বচ্ছতা, সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, একে অপরের প্রতি কর্তব্যবোধ, মায়া-মমতা, সহানুভূতি, আমানতদারী, দ্বীনদারী, আল্লাহভীতিসহ মৌলিক মানবিক গুণাবলী যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ওলামা-মাশায়েখ ও দ্বীনি সংগঠনের অবদান। তবুও হাতী যেমন তার চক্ষু ক্ষুদ্র হবার কারণে তার দেহের আকার ও শক্তি-মত্তা বুঝতে সক্ষম হয় না, তদ্রুপ দেশের সম্মানীত আলেম সমাজ নানাবিধ সঙ্কীর্ণতার কারণে জনগণের ওপর তাঁদের প্রভাব-মর্যাদা কত গভীরে তা সকলে সমভাবে অনুধাবন করতে পারেন না। কলসী কখনো খালি থাকেনা, হয় পানি নয়তো বাতাস। ঠিক একইভাবে জনগণের নেতৃত্বের আসন কখনো শূন্য থাকে না, হয় সৎ-যোগ্য, না হয় অসৎ অযোগ্য কেউ তো বসবেই। দুর্ভাগ্য জাতির জন্য তখনই হয় যখন ইমাম নিজস্থান ছেড়ে মুক্তাদীর কাতারে দাঁড়ায় আর সুযোগ বুঝে ইমামতের জন্য অযোগ্য কোনো মুক্তাদী ইমামতের শূন্য জায়গা পূর্ণ করে।

বর্তমান সময়ে আলেম সমাজের একটি বিরাট অংশ নিজেদের স্বর্ণালী ইতিহাস ভুলে গিয়ে আত্মবিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে অল্প কিছুর বিনিময়ে পরিতুষ্ট হচ্ছেন এবং জাতির প্রতি নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলতে বসেছেন। মাদ্রাসায় শিক্ষকতা, মসজিদে ইমামত, জানাযা বা বিবাহ পড়ানো, অথবা ওয়াজ-নসীহত আলেম সমাজের দায়িত্ব এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। নিজেদেরকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমিত করার সুযোগে দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি, শিল্পনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি এক কথায় মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিশাল অঙ্গন ইসলাম বিদ্বেষীদের দখলে চলে গিয়েছে এবং সকল ক্ষেত্রেই দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে। এ সকল ক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া রাজত্ব এবং ক্ষেত্র বিশেষে দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোকজন এবং ইসলাম বিদ্বেষীগণ আলেম সমাজের কোরআন-হাদীস ভিত্তিক স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রেও অযাচিত হস্তক্ষেপ করছে। আর এ কারণেই দেশের জনগণকে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে তাবীজ, দোয়া, জানাযা, মাসলা-মাসায়েল এবং বিয়ে তালাকের বিষয়ে তারা

ওলামায়ে কেরামের স্মরণাপন্ন হয় আর জীবনের বিশাল অঙ্গন পরিচালনার জন্য দুর্বৃত্ত ও ইসলামের চরম শত্রুদের দ্বারস্থ হয়।

নবী করীম (সাঃ) এর কাছে সমকালীন লোকজন এসে যদি জিজ্ঞাসা করতেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি হৃদরোগে আক্রান্ত, আমি শ্বাস কষ্টের রোগী, আমার মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, আমার পেট খারাপ, আমার দেহে ঘা-পাচড়া হয়েছে, আমি জ্বরে আক্রান্ত, আমার বিয়ের প্রয়োজন, আমি বিয়ে করেছি কিন্তু সন্তান হচ্ছে না, আমি ও আমার স্ত্রী ফর্সা, কিন্তু আমাদের সন্তান কেনো কালো বর্ণের হলো? আমার জমির উর্বরতা নষ্ট হয়েছে, ফসল হচ্ছে না, আমার ক্ষেতের ফসল পোকায় আক্রান্ত, খেজুর গাছে মড়ক লেগেছে, আমার পশুগুলো রোগাক্রান্ত, বৃষ্টির অভাবে ফসল হচ্ছে না, ঘী বা মধুর মধ্যে ইঁদুর পড়েছে, এখন কি করবো? এ ধরণের অসংখ্য পার্থিব সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন যদি সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সাঃ) এর সম্মুখে উত্থাপন করে সমাধান চাইতেন, তাহলে তিনি কি তাঁদেরকে এ কথা বলতেন যে, 'আমি আল্লাহর নবী, ওযু-গোসল, পাক-পবিত্রতা, নামাজ-রোজা, হজ্জ কালেমা, বিয়ে-তালাক, মৃত্যু ও কবরের আযাব, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয় ব্যতীত পার্থিব বিষয়ে আমার কাছে কেনো জানতে চাচ্ছো, এসবের আমি কি জানি?'

অথচ দূর-দূরান্ত থেকে আগত ও উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম এ ধরণের অগণিত পার্থিব বিষয়াদিও নবী করীম (সাঃ) এর কাছে উত্থাপন করেছেন এবং তিনি এগুলোর সমাধানও দিয়েছেন, নেতিবাচক জবাব কখনো দেননি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক জবাবই তিনি দিতেন। 'মাথার যন্ত্রণা থেকে শুরু করে যুদ্ধ পরিচালনা, রান্না ঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা' এমন কোনো বিষয় উত্থাপিত হয়েছে বা এমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যার সমাধান তিনি দেননি? ওলামায়ে কেরাম তো নায়েবে রাসূল, লোকজন তাদের কাছে শুধু ধর্মীয় বিষয়াদি ও তাবীজ আর ঝাড়-ফুঁকের জন্যে কেনো আসবে? মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিন্যাস পদ্ধতি, ভ্রুণের ক্রমবিকাশ, কম্পিউটার ব্রাউজিং, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ওয়েব সাইট, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, পাহাড়, মাটির স্তর, পানির স্তর, বায়ূ স্তর, ছায়া, আলো-আঁধার, সৌরজগৎ, বিগ-ব্যাং, বিগ-ক্র্যাঞ্চ, আলোক বৎসর, মিল্কিওয়ে, গ্যালাক্সি, এন্টিমিউটানেজিক আমব্রেলা, কসমিং ষ্ট্রীং, এসটিরয়েড বেল্ট, ব্লাকহোল, ওজন স্তর, টাইম জিরো, প্লাঙ্ক টাইম, প্রাইমোরডিয়াল ফায়ারবল, মহাশূন্য পরিচালনা পদ্ধতি, সাত রংয়ের সমাহার তথা রংধনু রহস্য, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ কি, সুদ মুক্ত ব্যাংকিং পদ্ধতি কিভাবে সম্ভব? অন-লাইন সিস্টেম কি? ইসলামী

রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে? ইসলামী রাষ্ট্রে ভিন্নধর্মাবলম্বী নাগরিকগণ কেমন অধিকার ভোগ করবেন? নারী, শিশু, কিশোর, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শ্রমিক-মালিক, মেহনতী জনতা এদের কি অধিকার দিয়েছে ইসলাম?

এসব মৌলিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ওলামায়ে কেরামের কাছে কেনো করা হয় না? আর যদি কেউ এসব প্রশ্ন করেই তাহলে ক'জন এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে সক্ষম? মাদ্রাসার সিলেবাস ভুক্ত কতকগুলো কিতাব অধ্যয়ন করে কয়েকটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়। সেই সাথে প্রয়োজন জ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণের উচ্চাকাংখা এবং তার বাস্তবায়ন। তাহলেই সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে বাস্তবমুখী জীবনধর্মী কিছু অবদান রাখা সম্ভব হবে- যা করেছিলেন আমাদের অতীতের বিশ্ববিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দেসীন, মুফাচ্ছেরীণ, মুফাক্কেরীণ, সালফে সালেহীন, আকাবেরে দ্বীন ও বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণ। তাঁরা মানুষের সার্বিক সংশোধন-সংস্কারের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনা করেছেন, বক্তব্য রেখেছেন, দেশ-বিদেশ সফর করেছেন, হিজরত করেছেন ও জেল জুলুম সহ্য করেছেন। ইসলাম আক্রান্ত হতে পারে, এমন সকল দরজায় কলমের তরবারী হাতে নিয়ে তাঁরা অহর্নিশি ঈমান ও আকীদার ঘর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহারা দিয়েছেন। এমনকি ফাঁসির মঞ্চে আরোহন করতেও দ্বিধা করেননি। তবুও বাতিলের সাথে অসম্মানজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর এবং স্বার্থের বিনিময়ে মাথানত করেননি।

জাতির চরম দুর্ভাগ্য, সেই জগৎ বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামের উত্তরসুরীরা আজ শতধা বিভক্ত বিচ্ছিন্ন। তাদের কেউ ছুটছেন ক্যামেরা নিয়ে মাজারে, কেউ ছুটছেন জশ্নে জুলুশের পতাকা হাতে বাজারে, কেউ মিলাদ, কেউ শবে-বরাত, কেউ গোল টুপী, কেউ লম্বা টুপী, কারো জামার কোণা ফাঁড়া, কারো পাঞ্জাবীর পার্শ্ব জোড়া, কেউ কওমী, কেউ বা আলীয়া। সবমিলে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভক্তির রেখা স্পষ্ট। ওলামায়ে কেরাম হলেন প্রবহমান স্রোতস্বিনী নদীর মতো, যার গতি কখনো রুদ্ধ হবে না। তাঁরা যেখানেই যাবেন সেখানেই জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হবেন। চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে চারদিকের পরিবেশ আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলবেন। কিন্তু তাঁরা কাংখিত ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছেন না। অথচ এক সময় তাঁরা প্রবল স্রোতে পৃথিবীময় প্রবাহিত হয়ে দুনিয়ার শুষ্ক মরুপ্রান্তর সিক্ত করে নব সৃষ্টিতে

উপকরণ যুগিয়েছেন। সেই প্রবহমান স্রোতস্বিনী সহসা যেনো নিশ্চল নিথর উপত্যকায় এসে গতিরুদ্ধ হয়ে অতি ক্ষুদ্র সরোবরে পরিণত হতে চলেছে।

মুসলিম উম্মাহ্ যখন চিন্তা, গবেষণা ও নিত্য-নতুন আবিষ্কারের পথ পরিহার করে ভোগ-বিলাসের দিকে মনোযোগী হলো, তখনই পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতা ক্রমশঃ সারা দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে এক সময় তা প্রত্যেকটি জনপদের রান্নাঘর থেকে শাসনদণ্ড পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে কর্তৃত্বের আসনে আসীন হলো। ইসলামের স্বর্ণযুগে নেতৃত্ব ছিলো আলেম সমাজেরই হাতে। নেতৃত্বের আসন থেকে তাঁরা ছিটকে পড়ে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন অপরিচিত এক পরিবেশ। এই অপরিচিত পরিবেশের ঘৃণ্য অন্ধকার মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকটি নাগরিককেই কম-বেশী ছেয়ে ফেলেছে। পাশ্চাত্যের এই অন্ধকার পরিবেশের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন এবং মুসলিম উম্মাহ্কে অন্ধকার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামকে আঁক্‌ড়ে ধরার জন্যে করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে থাকলেন। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্ তাদের কথার প্রতি সামান্যতম কর্ণপাতও করলো না। কারণ দূষিত পানি ততক্ষণে অনেক দূর প্লাবিত করে ফেলেছে। মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে সবসময় প্রাণবন্ত, গতিশীল, জ্ঞানদীপ্ত ও কর্মচঞ্চল সভ্যতাই অনুসরণ করে থাকে। নিশ্চল, অথর্ব, অনড়, অবিচল, জরাজীর্ণ ও অনগ্রসর সভ্যতার অনুসরণ করে না।

ইসলাম সর্বযুগেই প্রাণচঞ্চল, কর্মমুখর ও জ্ঞানদীপ্ত জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু এই প্রাণ-চঞ্চলতা নির্ভর করে চিন্তা, গবেষণা, নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও মৌলিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যুগোপযোগী নতুন নীতিমালা প্রণয়নের ওপর। এখানেই আলেম সমাজের ছিলো সীমাহীন ব্যর্থতা। পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন প্রভাব বিস্তার করছিলো, তখন তাদের সচেতন ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন ছিলো। মানবতা বিধ্বংসী পাশ্চাত্য সভ্যতার নীতি ও ভিত্তিমূলকে সঠিকভবে উপলব্ধি করা এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহ পরিভ্রমণ করে এর মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা ছিলো ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাঁদের উচিত ছিলো, প্রভাব বিস্তারকারী ও কার্যকর যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বাস্তব প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে পাশ্চাত্যের অধিবাসীগণ ক্রমশ: বৈষয়িক উন্নতি করছে, গবেষণা শক্তি প্রয়োগ করে সেগুলোকে নিজেরা আয়ত্ব করা এবং ইসলামের মৌলিক নীতিমালার আলোকে মুসলিম উম্মাহ্কে শিক্ষা দেয়া এবং সমাজ ও জাতীয় জীবনে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। যদি এই প্রক্রিয়া অতীতে অবলম্বন করা হতো এবং বর্তমানেও যদি করা হয়, তাহলে কয়েক শতাব্দীর নিষ্ক্রিয়তাজনিত ক্ষতি ইনশাআল্লাহ পূর্ণ হবে। সেই সাথে ইসলামও

একটি গতিশীল, প্রাণবন্ত, প্রাণচঞ্চল ও কর্মমুখর সভ্যতা হিসেবে পৃথিবীর মানুষের কাছে পুনরায় নিজের গর্বিত অবয়ব উন্মুক্ত করবে।

বর্তমানে সারা দুনিয়ায় মুসলিম-অমুসলিম প্রত্যেক দেশেই পাশ্চাত্যের জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপর ভিত্তি করে ওঠা কর্মমুখর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যেকটি শিক্ষাঙ্গনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে ইসলামের প্রেমিকগণ কোরআন হাদীসের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে যে সকল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এ সকল মাদ্রাসায় উন্নত নৈতিকতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবন ও কর্মের সাথে এ শিক্ষার কোনো সাদৃশ্য নেই। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যে সকল লোকজন শিক্ষিত হচ্ছেন, তাঁরা জাতিকে নেতৃত্ব দেয়া ও দেশ পরিচালনায় বহুলাংশে অনুপোযোগী হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন। আর পাশ্চাত্য শিক্ষায় যারা শিক্ষিত তারাই জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার ও দেশ পরিচালনার যোগ্য হচ্ছেন বটে, তবে তা সততা ও স্বচ্ছতার দিক থেকে অধিকাংশই শূন্য। সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম ইসলামের প্রকৃত প্রাণচেতনা থেকে দূরে সরে রয়েছেন। তাদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে, একে তাঁরা চিন্তা-গবেষণায় প্রয়োগ করছেন না। যে বুদ্ধিমত্তা ও কর্মশক্তি রয়েছে, তা তাঁরা ব্যবহার করছেন না বিধায় বুদ্ধি ও কর্মের ওপরে জড়তা চেপে বসেছে। আল্লাহর নাযিল করা কিতাব ও নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শিক ও বাস্তব হিদায়াত থেকে ইসলামের সনাতন ও প্রাণচঞ্চল গতিশীল নীতিমালা প্রণয়ন করে যুগের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে প্রয়োগ করার কোনো চেষ্টা তাঁরা অনেকেই করছেন না। কেউ করার চেষ্টা করলেও প্রাচীন ধ্যান-ধারণাপন্থী ওলামাগণ একজোট হয়ে তাদের বিরোধিতা করছেন।

আর ঠিক এ কারণেই বর্তমানে আলেম সমাজের পক্ষে মুসলিম উম্মাহ্র সাফল্যজনক নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে এমন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে যে, অতীতের গবেষণালব্ধ জ্ঞানগর্ভ কিতাব দ্বারা এই পরিবর্তনকে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল করা কঠিন ব্যাপার। শতাব্দীকালের পুঞ্জিভূত আবরণ ভেদ করে সমাধান বের করা কেবলমাত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে ইজতেহাদের মাধ্যমেই সম্ভব এবং এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন আলেম সমাজ নিজেরা উদ্যোগী হয়ে বর্তমান সমস্যার সমাধানে নিজেদেরকে কোরআন-হাদীসভিত্তিক গবেষণায় নিয়োজিত করবেন। প্রথমে রোগীর রোগ অনুধাবন করতে হবে, তারপর যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে।

অতীতে জ্বর হলে কুইনাইন দেয়া হতো, এখন কুইনাইনের স্থলে এন্টিবায়োটিক স্থান দখল করেছে– এ কথা মনে রাখতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে যে হিংসাত্মক যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তা পারমাণবিক যুদ্ধের চাইতেও মারাত্মক। কারণ আসলে এটি হচ্ছে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যুদ্ধ তথা ইসলামী আদর্শ মূলোৎপাটনের যুদ্ধ। ওলামায়ে কেরাম পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সূচনালগ্ন থেকেই প্রাণান্তকর যুদ্ধ করে আসছেন। কিন্তু নতুন এই মহাবিপদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ হাতে গোণা কয়েকজন ব্যতীত অধিকাংশ আলেমের কাছে অজানা। মনে রাখতে হবে, ইসলাম সর্বকালে সর্বযুগেই সবথেকে বেশী আধুনিক এবং এই আধুনিকতাকে গ্রহণযোগ্য যুক্তির মাধ্যমে মানুষের সম্মুখে লেখনী ও নতুন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। একশ্রেণীর আলেম ইসলামের শিক্ষা ও তার বিধি-ব্যবস্থা প্রচার করার জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তা আধুনিক শিক্ষিত লোকজনকে ইসলামের সাথে পরিচয় ঘটানোর পরিবর্তে উল্টো বরং তাদের মনে ইসলামের প্রতি সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করছে। এসব আলেমের বক্তৃতা ও রচিত গ্রন্থসমূহ কোনো অমুসলিম শুনলে এবং পড়লে ইসলামের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণও বোধ করবে না।

মনে রাখতে হবে, মরচে ধরা হাতিয়ার দিয়ে আধুনিক অস্ত্রের মোকাবেলা যেমন করা যাবে না, তেমনি শুধু সেকেলে কল্প-কাহিনী সর্বস্ব ওয়াজ-নসিহত দিয়েও যুগের গতিকে পরিবর্তন করা যাবে না। ইসলামের সর্বাধুনিক রূপ-সৌন্দর্যের ওপর কালের যে আস্তরণ পড়েছে, সে আস্তরণ পরিষ্কার করে ইসলামের প্রকৃত রূপ-সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর সম্মুখে বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। এ জন্যে নিজেদেরকে চিন্তা-গবেষণায় নিয়োজিত করতে হবে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বুনিয়াদ ও এর দুর্বলতাসমূহ জানতে হবে। অর্জন করতে হবে যুক্তিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, ভাষাশক্তি, শব্দ চয়নশক্তি, প্রয়োগ পদ্ধতি এবং অনুধাবন করতে হবে যথাযথ ক্ষেত্র। পরিবেশ প্রভাবের মোকাবেলা ও স্থান-কালের পরিবর্তন থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার লক্ষ্যে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম উম্মাহ্কে দু'টি অতুলনীয় নিয়ামত দান করে ধন্য করেছেন। এর একটি হলো, নবী করীম (সা:) এর পবিত্র জীবনাদর্শ তথা সীরাত মোবারক, যা প্রত্যেকটি দ্বন্দ্ব ও সঙ্কটে এবং প্রতিটি পরিবর্তনকে অত্যন্ত সহজভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম। তাঁর মহান শিক্ষার মধ্যে প্রত্যেক যুগের সমস্যা সমাধানের পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও ক্ষমতা বিদ্যমান।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বয়ং ইসলামের জীবন্ত আদর্শকে উজ্জীবিত করার জন্যে প্রত্যেক শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহ্র জন্যে এমন সকল সংস্কারক পাঠাচ্ছেন, যা পূর্ববর্তীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার পরবর্তীদের জন্যে স্থানান্তর হচ্ছে এবং নিত্য-নতুন গবেষণা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে ইসলামের নীতিসমূহ যুগোপযোগী করে উম্মাহ্র সম্মুখে যৌক্তিক বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করছেন। আর এভাবেই সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র মুসলিম উম্মাহ্ই ইসলামী আদর্শকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে 'সন্তান-প্রসবিনী' হিসেবে ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা অন্য কোনো সম্প্রদায় বা আদর্শের অনুসারীগণ করতে পারেনি। ফলে অন্যান্য আদর্শগুলো যেখানে মৌলিকত্ব হারিয়ে পৃথিবীতে বিকৃত অবস্থায় অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। সেক্ষেত্রে ইসলামই একমাত্র বিশ্ব জুড়ে অগ্রসরমান জীবন্ত আদর্শ হিসেবে আজো স্বগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক যুগেই ঈমানদারগণ জ্ঞানের দিক থেকে পরিপক্ক অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন, অন্যদিকে ইসলামের দুশমনরা যেমন যুবক তেমনি তার অনুসারীগণও ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বুদ্ধিতে অপরিপক্ক যুবকই রয়ে গেছে। অর্থাৎ ইসলামের বিপরীত শক্তি প্রত্যেক যুগেই নতুন অবয়বে যুবক-রূপে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু শয়তানী বুদ্ধিতে পরিপক্ক যুবক ইসলামের দুশমনরা কোনো যুগেই জ্ঞান-বৃদ্ধ ঈমানদারদের ওপর বিজয়ী হতে পারেনি, আগামীতেও পারবে না ইনশাআল্লাহ।

নন্দিত সার্বজনীন আদর্শ ইসলামের ধারে কাছে যাতে মানুষ না আসতে পারে, সে জন্যে ইসলাম বিদ্বেষীরা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, গোল-টেবিল বৈঠক, কবিতা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, গান-বাজনা, নাটক সিনেমা, এনজিও, পত্র-পত্রিকা, যাত্রা-থিয়েটার, টিভি চ্যানেলসহ বহুবিধ মাধ্যম অবলম্বন করেছে। ইসলাম থেকে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সকলকে বের করে আনার জন্য রাতদিন পরিশ্রম করছে। প্রচুর অর্থ ব্যয় ও সময় ব্যয় করছে এবং সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। এরা ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রচার মাধ্যমগুলোয় নির্লজ্জ মিথ্যাচার করেই যাচ্ছে। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে একই ভাঙ্গা রেকর্ড 'হিজ মাস্টার ভয়েজ' জাতিকে শোনাচ্ছে। প্রয়োজনে জেল-জরিমানারও ঝুঁকি নিচ্ছে। গোটা মস্তিষ্ক জুড়ে তাদের চিন্তা-চেতনা 'যেভাবেই হোক রাষ্ট্রকে ইসলাম মুক্ত করো, যতো প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে ইসলাম আছে, যতো সংগঠন ইসলামপন্থী আর দেশ বিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব যাঁরা রয়েছেন, তাদের বদনাম করো, তাদেরকে জনসম্মুখে হেয়-প্রতিপন্ন ও নিন্দনীয় করো'।

পৃথিবীতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যত সম্পদ দান করেছেন, তার অধিকাংশ সম্পদই মুসলিম ভূ-খণ্ডে রয়েছে। তৈল ও গ্যাস সম্পদসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের অধিকাংই রয়েছে মুসলিম ভূ-খণ্ডে। বিপুল সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য থাকার পরও এ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্ বিশ্বব্যাপী প্রচার মাধ্যম গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে ইসলামের দুশমনগণ শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমে সারা দুনিয়াব্যাপী মুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরণের মিথ্যা প্রচার করে মানুষের মনে ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে এক ধরণের কল্পিত আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। ইসলাম মানেই সন্ত্রাসবাদ আর মুসলিম মানেই সন্ত্রাসী, এই ধারণা তারা পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা করছে। আমরা যে দেশে এবং এলাকায় বাস করি, সে দেশে ও এলাকায় অবশ্যই অমুসলিম নাগরিক রয়েছেন। আলেম সমাজ প্রত্যেক ধর্মের পাদ্রী ও পুরোহিত এবং বিশিষ্ট লোকদের দাওয়াত দিয়ে গোল টেবিলে আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। নিজেরা কিছু অর্থের ব্যবস্থা করে টিভি চ্যানেল এক ঘন্টার জন্য ভাড়া নিয়ে সেখানেও উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। অমুসলিম নেতৃবৃন্দকে মুক্ত মনে ইসলাম এবং মুসলমানদের ব্যাপারে প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়ে উদ্ভূত প্রশ্নের যুক্তি সম্মত জবাব দিয়ে তাদের মন থেকে ইসলাম সম্পর্কিত সংশয়-সন্দেহ দূর করার ব্যবস্থা করতে পারেন।

জ্ঞানের পরিধি পড়া-শোনার মাধ্যমে আরো শানিত করতে হবে, বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে এবং বুদ্ধি দীপ্ত চোখ-কান খোলা রেখে ইসলামের বন্ধু ও দুশমন চিনতে হবে। ইসলাম মৌলবাদ নয়, সাম্প্রদায়িক নয়, জঙ্গীবাদ নয়, উগ্রপন্থী নয়– বরং ইসলাম জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দল-মত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সার্বজনীন জীবনাদর্শ এ কথা বিজ্ঞান সম্মত যুক্তির মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষিতদের বোঝাতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেকুলারপন্থী, পাশ্চাত্যপন্থী, শাসকশ্রেণী, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজসহ এলিট শ্রেণীর সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপে অংশ নিতে হবে এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ইসলামে জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসবাদের গন্ধও নেই এবং মুসলমানরাই যে পৃথিবীতে সবথেকে সহনশীল, ধৈর্যশীল, পরোপকারী, অন্যের কল্যাণকামী, শান্তি কামী, সত্যবাদী, ইনসাফকারী, আমানতদার এবং পরধর্ম সহিষ্ণু জাতি ইত্যাদি বিষয়সমূহ গোল টেবিল আলোচনায় কোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তুলে ধরতে হবে। মুসলিম শাসকদের স্বর্ণালী শাসন সম্পর্কে জানাতে হবে। তাহলে সাধারণ অমুসলিমদের কাছে প্রচার মাধ্যমের মিথ্যা প্রচারণা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাঁরা মুসলমানদের কাছাকাছি আসবেন এবং নন্দিত আদর্শ ইসলামকে জানার চেষ্টা করবেন।

সমালোচনা শুধু নয়- সমাধান দিন

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ধর্মহীন সভ্যতা ও নীতিমালাসমূহ সমগ্র পৃথিবীতে শিকড় গেড়ে বসেছে। দু'একটি দেশ ব্যতীত প্রত্যেক মুসলিম দেশে সকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের নীতিমালাসমূহ পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরাম এসব নীতিমালার সমালোচনা করছেন, কিন্তু সমালোচনার পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে ইসলামী নীতিমালা তুলে ধরতে হবে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলিমদের চরিত্রহীনতা ও নাস্তিকতার দিকে নিক্ষেপ করছে, এ বিষয়টি সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে না ধরলে মানুষ এ বিষয়টি সম্পর্কে অন্ধকারে রয়ে যাবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে যারা মাদরাসার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই বুঝে, তাঁদের ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিতে হবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণ করাবে তেমনি তার মধ্যে দৃঢ় নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি করে দেশ ও জাতি পরিচালনায় যোগ্য ও সৎ নেতৃত্ব উপহার দিবে।

প্রায় দেশেই সংবাদ জগতে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধিত হয়েছে। অসংখ্য ইলেক্ট্রিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ায় অগণিত মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। মিডিয়ার মালিকগণ তাদের চিন্তাধারা ও আদর্শের অনুসারীদের নিজ নিজ মিডিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মে নিয়োগ দিয়েছে। মিডিয়ার মালিক ও মিডিয়া কর্মীদের ভূমিকার সমালোচনা করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, পাশাপাশি সমাধানও দিতে হবে। পবিত্র কোরআনের সূরা হুজুরাতের ৬ নং আয়াতে বর্ণিত সাংবাদিকতার ইসলামী নীতিমালা মানুষের সম্মুখে তুলে ধরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইসলামী চরিত্রের মিডিয়াকর্মী তৈরী করতে হবে।

রাজনৈতিক অঙ্গনে দুর্বৃত্তায়ন ঘটার কারণে একশ্রেণীর দুর্বৃত্ত রাজনীতিবিদরা মুসলিমদের নন্দিত পথ থেকে নিন্দিত পথে নিক্ষেপ করেছে। ওলামায়ে কেরাম ও আল্লাহভীরু লোকজন যখন রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, তখনই দুর্বৃত্তগণ সে অঙ্গনে প্রবেশ করে আসন গেড়ে বসেছে। পবিত্র কোরআন হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহভীরু লোকদের সচেতন করতে হবে যে, রাজনীতির অঙ্গন সৎ লোকদের জন্যে, অসৎ লোকদের জন্য নয়। ওলামায়ে কেরামকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী রাজনৈতিক অঙ্গনে ভূমিকা পালন এবং মুসলিম জনসাধারণকে রাজনীতি সচেতন করতে হবে। রাষ্ট্র ব্যতীত ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক, এ বিষয়টি মুসলিম জনসাধারণের মন-মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নবী-রাসূলগণ ও সাহাবায়ে

কেরাম রাজনৈতিক ময়দানে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছেন, এসব বিষয় মুসলিমদের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে।

পুঁজিবাদী সুদভিত্তিক শোষণমূলক অর্থনীতি ও নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির শুধু সমালোচনা নয়, এর পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতিও সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে সবিস্তারে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে। গবেষণাধর্মী সাহিত্য ও প্রবন্ধ রচনা করে মানুষকে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। শ্রমিকগণ অধিকার আদায়ে আন্দোলনের সূচনা করলে তাদের সম্মুখে নাস্তিক্যবাদী আদর্শ তুলে ধরে মুসলিম শ্রমিকদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা হয়। এ অবস্থায় শ্রমিকদের কাছে ইসলামী শ্রমনীতি তুলে ধরে তাঁদেরকে এ কথা বোঝাতে হবে যে, পৃথিবীর সকল শ্রমনীতির তুলনায় ইসলামী শ্রমনীতিই শ্রমিক ও মালিকদের প্রতি সকল দিক দিয়ে ইনসাফ করেছে। ওয়াজের ময়দানে যে সকল ওলামা রয়েছেন, তাঁদের জন্যে এ দায়িত্ব পালন করা খুবই সহজ।

অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকা তথা শিল্পী সমাজ জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে এটিকে গ্রহণ করেছেন। এ পথে তাঁরা প্রচুর অর্থ-সম্পদ উপার্জন করছেন এবং তাঁদের ভক্তের সংখ্যাও কম নয়। ওলামাগণ শুধু তাঁদের সমালোচনা করলে ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হবে এবং কখনোই তাঁরা ইসলামী আন্দোলন, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন দিবে না বরং বিরোধিতা করবে। গান-বাজনা, অভিনয়, খেলা তথা আনন্দ ফূর্তি এবং চিত্তবিনোদনের ব্যাপারে ইসলামী নীতিমালা তুলে ধরতে হবে। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে তাঁদের অবস্থান কি, তাঁরা কিরূপ মর্যাদার অধিকারী হবেন তা স্পষ্ট করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে অল্প ক্ষতি স্বীকার করে বৃহৎ ক্ষতির পথ রুদ্ধ করতে হবে।

আইন ও বিচারাঙ্গনে যেসব আইন চালু রয়েছে এবং এসব ক্ষেত্রে যাঁরা কর্মরত রয়েছেন তাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ধন-সম্পদের মালিক হয়ে স্বচ্ছল বিলাসী জীবন যাপন করেন। তাঁরা কখনোই ইসলামী আইনের পক্ষাবলম্বন করবে না। বরং ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রবল বাধার সৃষ্টি করবে। চোর-ডাকাত, মদ্যপায়ী, সুদের ব্যবসায়ী, স্বৈরাচারী, সন্ত্রাসী, দুর্বৃত্ত, দেহব্যবসায়ী, মুনাফাখোর, মজুদদার, ধর্মব্যবসায়ী, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবগণ যেমন ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষ বিচারাঙ্গনের বিচারক ও আইনজীবীগণও ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধী। ইসলামপন্থীরা শুধু ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের হাতেই নিহত হয় না, আদালতের বিচারকগণও আইনের মাধ্যমে ইসলামপন্থীদের মানবিক অধিকার হরণ ও হত্যা করে। এ জন্যে ওলামায়ে কেরামকে যোগ্যতা অর্জন করে এসব অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করতে হবে অথবা সাংগঠনিকভাবে ইসলামী চরিত্রের লোক তৈরী করে আইন ও বিচারাঙ্গনে বসাতে হবে।

সার্বিক পরিবর্তনের কণ্টকাকীর্ণ পথ

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ্ যে সকল সমস্যায় জর্জরিত, এ সমস্যা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় মহান আল্লাহর বিধানকে জীবনের সকল অঙ্গনে বাস্তবায়িত করা। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত পবিত্র কোরআন হাদীসের সকল বিধান অনুসরণ করা সম্ভব নয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের সহযোগিতা ছাড়া মুসলিম উম্মাহ্র পক্ষে আপন শক্তিতে বিকশিত হওয়াও সম্ভব নয়। এ জন্যে ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণকে রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে লোক তৈরী করে সমাজ থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত নেতৃত্বের সকল আসন আল্লাহভীরু লোকদের হাতে তুলে দিতে হবে। আর এ জন্যে ওলামায়ে কেরামকেই অগ্রণী ভূমিকা পালনে ময়দানে সক্রিয় হয়ে জনগণকে সজাগ সচেতন করতে হবে, তাঁরা যেনো সকল পর্যায়ের নির্বাচনে ঐ সকল লোকদেরই নির্বাচিত করে, ক্ষমতায় গিয়ে যাঁরা ইসলামের বিধান কার্যকর করবে। বর্তমান পৃথিবীতে অধিকাংশ দেশে নেতৃত্বের পরিবর্তন ও ক্ষমতার পালাবদল হয়ে থাকে নির্বাচনের মাধ্যমে, আধুনিক যুগে নির্বাচনও জিহাদের একটি অংশ এবং নির্বাচনী জিহাদে বিজয়ী হবার লক্ষ্যে ওলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম ব্যবহার করতে হবে।

নির্বাচন ও ভোট এগুলো পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবিষ্কার এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক'। এ বিষয়টি মুসলিমদের ঈমান আকিদার সম্পূর্ণ বিপরীত, স্পষ্ট শির্ক এবং এই শিরকের সাথে মুসলিমরা আপোষ করতে পারে না। কোনো মুসলিম যদি আপোষ করে উক্ত কথাগুলোর প্রতি স্বীকৃতি দেয়, তাহলে তার পক্ষে মুসলিম থাকা সম্ভব নয়। বর্তমান গণতন্ত্রে নির্বাচন ও ভোট, বিষয় দু'টি ক্রটিযুক্ত হলেও নেতৃত্বের পরিবর্তনে এ দু'টি বিষয়কে কাজে লাগিয়ে নেতৃত্বের আসন পর্যন্ত পৌঁছা যায়। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা মুখরোচক ও আকর্ষণীয় হলেও পরাশক্তিগুলো তাদেরই গণতন্ত্রের সংজ্ঞার প্রতি বিশ্বাসী নয়। জনগণ নিজেদের পছন্দের দলকে ভোট দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় পাঠালেও পরাশক্তিগুলো সে দলকে যদি নিজেদের বন্ধু মনে না করে তাহলে সে দলকে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করতে দিবে না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলেও ইসলামপন্থী কোনো দলকে তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় দেখতে চায় না, আলজেরিয়া, মিসর ও তিউনিসিয়ায় এর প্রমাণও তারা দিয়েছে।

সুতরাং নির্বাচন ও ভোটের মাধ্যমে বিজয়ী হলেও সে বিজয়কে প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী লোকগুলো ব্যর্থ করে দিবে। অর্থাৎ নির্বাচনে বিজয়ী হলেও ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। কারণ, প্রত্যেকটি দেশেই একটি প্রশাসনিক, সামরিক, বিচার বিভাগীয় ও রাজনৈতিক অবকাঠামো বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক দেশেই কোনো না কোনো বৃত্তিকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মানুষ জীবিকা অর্জন করে। মানব রচিত আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো অবলম্বন করে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপুল অর্থ উপার্জন করে। দেশের বিভিন্ন ধরনের বাহিনী, সরকারী চাকরিজীবীগণ, ব্যবসায়ী সমাজ, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীগণ, মিডিয়াকর্মীগণ, বিচারপতি ও আইনজীবীগণ, ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ইসলামের বিপরীত অবকাঠামোগত রাষ্ট্রে বৈধ অবৈধ পথে বিপুল অর্থ উপার্জন করে। আর এরাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বা ইসলামের বিপরীত মতাদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রের অতন্দ্র প্রহরী। এরা কোনোক্রমেই ইসলামপন্থী দলকে সমর্থন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে দিবে না। সাধারণ জনগণ ইসলামী দলকে বিজয়ী করলেও এরা সে বিজয়কে নস্যাৎ করে দিবে।

এ জন্যেই সর্বাগ্রে ইসলামী চরিত্র বিশিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন লোকজন তৈরী করে সকল স্তরে সরবরাহ করতে হবে। প্রশাসন, আইন ও বিচারাঙ্গন, বিভিন্ন ধরনের বাহিনীতে কর্মরত ইসলামপন্থী লোকজনের আধিক্য থাকলে নির্বাচনে ইসলামী দলের বিজয়কে কেউ নস্যাৎ করতে পারবে না। ইসলামী বিপ্লবের পথটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও চেষ্টা সাধনার পথ। নবী করীম (সা:) দীর্ঘ তেরটি বছর মক্কায় বিপ্লবের উপযুক্ত লোক তৈরী করেছেন, মদীনায় জনসমর্থন তৈরী এবং স্থানীয় নেতৃত্ব পর্যায়ের লোকদের ইসলামী আদর্শের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। এরপর সেখানে হিজরত করে ইসলামী বিপ্লব সাধন করেছেন। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার এ কন্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিতে কোনো পর্যায়েই ধৈর্য্যহারা বা হতাশ হলে এ পথে সফলতা আসবে না। মনে রাখতে হবে, নবী-রাসূলগণ, সাহাবায়ে কেরাম এবং তৎপরবর্তী যুগের চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ কেউ-ই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নিয়মতান্ত্রিক পথ পরিহার করে অনিয়মতান্ত্রিক পথে সামান্যতমও অগ্রসর হননি। মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে সর্বাত্মক জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে ইসলামী আন্দোলনের দুর্গম পথে লক্ষ্য পানে এগিয়ে যেতে হবে। কবি নজরুল ইসলামের কথাটি স্মরণে রাখতে হবে–

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লংঘিতে হইবে রাত্রি নিশিতে যাত্রীরা হুশিয়ার।

ভারতীয় উপমহাদেশের সংগ্রামী ওলামায়ে কেরাম কখনোই ইসলামের বিপরীত শক্তির সম্মুখে মমনীয় ভূমিকা পালন করেননি। মাওলানা জুলফিকার আলী দেওবন্দী, তাঁর সুযোগ্য সন্তান শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহ্মুদুল হাসান, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী, মাওলানা ফজলুর রহমান দেওবন্দী, মাওলানা আব্দুল হক, মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী, মাওলানা ফৎহে মুহাম্মাদ থানভী, মাওলানা আব্দুল্লাহ জালালাবাদী, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী, মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ, মাওলানা মনসুর আনসারী, মাওলানা হাবীবুর রহমান, আল্লামা শাব্বীর আহমাদ ওসমানী, আল্লামা আশরাফ আলী থানভী, মাওলানা ইবরাহীম বিলইয়াবী, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার, ফুরফুরার পীর সাহেব মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক, মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী, শর্ষিণার পীর মাওলানা নেসারুদ্দীন আহমাদ, মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী, মাওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগী, মাওলানা রুহুল আমীন, মাওলানা মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী শহীদ, মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আযমী, মাওলানা আতহার আলী, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মুফতী দ্বীন মুহাম্মাদ খাঁ, মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, খতীব এ আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ, মাওলানা মুফতি আমিনী, মাওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, চরমোনাইর পীর মাওলানা ইসহাক সাহেব, বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা আব্দুল জব্বার, বায়তুল মুকাররমের সম্মানীত খতীব মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেব, মাওলানা নূর উদ্দীন সাহেব (আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের সকলকে জান্নাতের মেহমান বানিয়ে নিন) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম কেউ-ই ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে আপোষ করে আরাম আয়েশে জীবন অতিবাহিত করেননি। জেল জুলুম ও নির্যাতনের মধ্য দিয়েই তাঁরা আন্দোলন সংগ্রামের ময়দানে জিহাদী জীবন অতিবাহিত করেছেন। বর্তমানে নন্দিত জাতি মুসলিমগণ নিন্দিত পথে অগ্রসর হয়ে যে ধ্বংস গহ্বরের অতলান্তে তলিয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে উদ্ধার পেতে জিহাদের বিকল্প নেই। আমাদের পূর্বসুরীদের অনুরূপ সর্বাত্মক জিহাদের মাধ্যমেই হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার সম্ভব।

জিহাদ ঈমানের অনিবার্য দাবী

ঈমান আনার পূর্বে একজন মানুষ থাকে তাগুতের গোলাম। সে তার প্রবৃত্তি অনুসারে জীবন-যাপন করে থাকে। জীবন পরিচালনার ব্যাপারে সে কোনো নিয়ম-কানুনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। হালাল-হারামের সীমা রেখা

অনুসরণের তাগিদ তার মধ্যে সক্রিয় থাকে না এবং সে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এক সৃষ্টি মনে করে। কে তাকে সৃষ্টি করেছে এবং কেনো করেছে, এই পৃথিবীতে তাকে কোন্ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, এখানে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, এসব প্রশ্ন নিয়ে সে চিন্তা-গবেষণা করতে মোটেও ইচ্ছুক থাকে না। পৃথিবীর পশু-প্রাণী আহার করে, জৈবিক তাড়নায় বিপরীত লিঙ্গের সাথে মিলিত হয়, বংশ বৃদ্ধি করে, নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় পরস্পরে হিংস্রতায় লিপ্ত হয়, এভাবে এক সময় তার নির্ধারিত জীবনকাল শেষ হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

ঈমানহীন মানুষের জীবনও ঠিক তেমনি হয়ে থাকে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি যাদের ঈমান নেই, তাদের জীবনধারার প্রতি লক্ষ্য করলেই উপরোক্ত কথার যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হবে। জীবন পরিচালনার ব্যাপারে এদের সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই। প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিবর্গ যেসব নিয়ম-বিধান রচনা করে, এরা তা অসহায়ত্বের কারণে অথবা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুসরণ করে এবং প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রচিত বিধান পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করে। ব্যক্তি জীবনকে যেভাবে খুশী ভোগ করে। সামষ্টিক জীবনে নিজেদের স্বার্থের কারণে ভিন্ন জাতির সাথে যে কোনো ধরনের দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়। একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী কোনো সত্তার কাছে নিজেদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি করতে হবে—এ অনুভূতি এদের মধ্যে নেই। অর্থ-সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের সীমারেখা এরা মানে না। জৈবিক ক্ষুধা মেটানোর ক্ষেত্রে এরা কোনো নিয়ম-বিধান অনুসরণ করে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে এদের ওপরে বিপদ-মুসিবত, অসহায়ত্ব বা রোগে আক্রান্ত হলে নিজেদের কল্পিত কোনো সত্তার বেদিমূলে বা পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত যুক্তিহীন ধারণার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। মূর্তি নির্মাণ করে নিষ্প্রাণ মূর্তির কাছে নিজেকে নিবেদন করে, মৃত মানুষের কবর-মাজারে গিয়ে কাঁকুতি-মিনতি জানায় অথবা আল্লাহর বিধানের অধীন প্রাকৃতিক কোনো শক্তির কাছে সাহায্য কামনা করে থাকে।

পক্ষান্তরে একজন মানুষ যখন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে, তখন সে নিজেকে আল্লাহর বিধানের সামনে নি:শর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। মস্তিষ্ককে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত করে। পূর্বপুরুষদের যাবতীয় প্রথা সে অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সমাজ ও দেশে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত আল্লাহ বিরোধী বিধানের প্রতি সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের প্রদর্শিত পথ ব্যতীত অন্য পথ ও মত সে

অনুসরণ করতে ইচ্ছুক নয়। জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সে প্রতিটি পদক্ষেপে অনুসন্ধান করতে থাকে, তার মালিক, তার প্রভু, তার রব্, তার ইলাহ্, তার মা'বুদ, তার মুনিব আল্লাহ্ তা'য়ালা কিভাবে পদ নিক্ষেপ করতে বলেছেন। একজন ঈমানদার মানুষের যখন আহারের প্রয়োজন হয়, তখন সে অনুসন্ধান করে–তার রাসূল তাকে কিভাবে আহার গ্রহণ করতে শিখিয়েছেন। সে যখন মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন অনুভব করে, তখন সে সেই নিয়মই অনুসরণ করে, যে নিয়ম তার নেতা বিশ্বনবী (সাঃ) অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। জৈবিক তাড়নায় এবং বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সে যখন নিজ অর্ধাঙ্গিনীর সাথে মিলিত হতে যায়, তখন সে উন্মত্ত হয়ে বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে পশু সুলভ আচরণে লিপ্ত না হয়ে সেই নিয়মই অনুসরণ করে–যে নিয়ম তাকে রাসূল শিখিয়েছেন। এভাবে একজন ঈমানদার মানুষের জীবন হয় নিয়ন্ত্রিত তথা আল্লাহর আইনের অধীন।

মানুষ হিসাবে ঈমানদার মানুষ ও ঈমানহীন মানুষের ভেতরের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য নেই। ঈমানহীন মানুষের মধ্যে যেমন আবেগ-উচ্ছ্বাস, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, মায়া-মমতা, কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা রয়েছে, অনুরূপ ঈমানদার মানুষের ভেতরেও রয়েছে। পক্ষান্তরে ঈমানদার মানুষ এসব প্রবৃত্তি ব্যবহার করে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে আর ঈমানহীন মানুষ তা ব্যবহার করে তাগুতের পথে। ঈমানদার মানুষ যখন কারো প্রতি হৃদায়াবেগ অনুভব করে, তখন প্রথমেই অনুসন্ধান করে, এ ব্যাপারে তার আল্লাহ্ তার প্রতি কি নির্দেশ দিয়েছেন। কারো প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি হলে সে প্রথমে অনুসন্ধান করে, এই ক্ষোভ প্রকাশের আল্লাহর নির্দেশিত পথ কোনটি। প্রেমানুভূতি সৃষ্টি হলে সে ঐ পথেই তার অনুভূতিকে পরিচালিত করে, যে পথে তাকে তার মুনিব–আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পরিচালিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে কারো প্রতি আঘাত করতে হলে, সর্বপ্রথম সে জানতে চায়–আল্লাহ্ তাকে কিভাবে আঘাত করতে বলেছেন। উপস্থিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাসূল ও তাঁর সম্মানীত সাহাবা কেরাম কি ধরনের ভূমিকা অবলম্বন করেছেন।

এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাকে কোন্ পথ ও মত, কোন্ নিয়ম-বিধান অনুসরণ করতে হবে, সে তা অনুসন্ধান করে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে। কোরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানের বিপরীত নিয়ম-নীতি ঈমানদার মানুষ অনুসরণ করে না। এভাবে ঈমানদার মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে জিহাদ করতে হয়। ঈমানদার তথা মুমিন জীবনে

এই জিহাদ কোনো একটি স্তরে বা সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। তাকে এই জিহাদ করতে হয় পৃথিবীর জীবনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত। প্রতিটি কাজ ও কথা বলার ক্ষেত্রে তাকে জিহাদ বা মুজাহাদা করতে হয় এবং এই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সে সময়ের বিবর্তনে আল্লাহর বান্দায় উন্নীত হয়। জিহাদ বা মুজাহাদা ব্যতীত ঈমান আনয়নকারী একজন মানুষ কোনোক্রমেই আল্লাহর গোলামে পরিণত হতে পারে না বা কল্যাণকর শুভ পরিণতিও সে লাভ করতে পারে না। জিহাদ বা মুজাহাদার কাজ ঈমানদারকে নিজের কল্যাণের জন্যই করতে হবে। এর যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী সে নিজেই হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ–

যে ব্যক্তি (আল্লাহ তা'য়ালার পথে) সংগ্রাম সাধনা করে, সে তো আসলে তা করে তার নিজের কল্যাণের জন্যেই, কারণ আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিকুল থেকে প্রয়োজনমুক্ত। (সূরা আনকাবুত-৬)

যে ব্যক্তি ঈমান আনে, তাকে সর্বপ্রথমে তাগুতকে অস্বীকার করতে হয়। তাগুত হলো সেই শক্তি, যে শক্তি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এই তাগুত শত-সহস্র রূপে পৃথিবীতে বিদ্যমান। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মৌসুমে আরামের শয্যা ত্যাগ করে ফজরের নামাজ আদায় করতে হবে, কিন্তু নিজের মন আরাম ত্যাগ করে নামাজ আদায় করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে মনের এই কামনা হলো তাগুত। ব্যক্তি ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছে, নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে। ব্যবসার কারণে সে নামাজ আদায় করছে না, এই ব্যবসা তখন তাগুতে পরিণত হলো। ব্যক্তি সুদ পরিহার করতে আগ্রহী, কিন্তু রাষ্ট্র তাকে সুদ দিতে ও গ্রহণ করতে বাধ্য করছে, রাষ্ট্রের এই নিয়ম তাগুত হিসাবে ব্যক্তির সামনে দণ্ডায়মান। ব্যক্তি অশ্লীল গান-বাজনা, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি পরিহার করে চলতে ইচ্ছুক, কিন্তু সমাজ ও দেশের প্রচলিত বিধান তাকে এসবের মুখোমুখি হতে বাধ্য করছে, দেশের এই প্রচলিত বিধান তাগুত। অর্থাৎ এসব নিয়ম-বিধান ব্যক্তিকে আল্লাহর বিধান অনুসরণে বাধার সৃষ্টি করছে। এসবই তাগুত আর এই তাগুতের বিরুদ্ধেই ঈমানদারকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে জিহাদ বা মুজাহাদা করতে হয়।

মুজাহাদা আরবী শব্দ এবং এই শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো, কোনো প্রতিকুল বা বিরোধী নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান বা শক্তির মোকাবেলায় দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, সাধনা

ও প্রচেষ্টা করা। আবার যখন কোনো বিশেষ বা নির্দিষ্ট প্রতিকূল অবস্থা বা শক্তিকে চিহ্নিত না করে মুজাহাদা করা হয়, তখন মুজাহাদা শক্তির অর্থ দাঁড়ায় সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। একজন ঈমানদার মানুষকে এই পৃথিবীতে সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে জীবন পরিচালিত করতে হয় আর এরই নাম হলো মুজাহাদা। ঈমানদার ব্যক্তিকে শয়তানের সাথে জিহাদ বা সংগ্রাম করতে হয়। মুজাহাদার মাধ্যমে ঈমানদার গোষ্ঠী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নির্দেশ দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। কারণ শয়তান তাকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সৎ কাজের মারাত্মক ক্ষতির ভয় প্রদর্শন করে এবং অসৎ কর্মের প্রভুত লাভ ও স্বাদ উপভোগের লালসা প্রদর্শন করতে থাকে। ঈমানদারকে নিজের দেহের অভ্যন্তরের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ-সংগ্রাম করতে হয়। কারণ এই কুপ্রবৃত্তিই ঈমানদারকে সর্বক্ষণ নিজের অশুভ ইচ্ছা, কামনা-বাসনা ও আকাংখার গোলামে পরিণত করার জন্য জিহাদ করে যাচ্ছে। ঈমানদার গোষ্ঠীকে নিজের আবাসস্থল থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্বের এমন সব মানুষের সাথে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, যেসব মানুষের চিন্তা-চেতনা, মতবাদ, আদর্শ, মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক নীতি-নৈতিকতা, জীবনধারা, প্রথা, রাজনৈতিক বিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা, সাংস্কৃতিক নীতিমালা, অর্থনৈতিক মতবাদ, সামাজিক নীতি-পদ্ধতি ইত্যাদি তার চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতার বিপরীত। সম্পূর্ণ পরিবেশ তার জীবন বিধান পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক।

ঈমানদার ব্যক্তিকে এমন সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, যে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদাত, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা ও গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে নিজেরা মনগড়া বিধান রচনা করে তা জারী করে এবং সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পরিবর্তে অসুন্দর, অকল্যাণ ও অশুভ-অসততাকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ঈমানদারের এই জিহাদ, এই মুজাহাদা—এই প্রচেষ্টা, এই দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। বা পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোনো ভূ-খণ্ডের মধ্যেও আবদ্ধ নয়, আমৃত্যু তাকে এই জিহাদ করতে হয় এবং পৃথিবীর যে কোনো ভূ-খণ্ডেই সে অবস্থান করুক না কেনো সেখানেই তাকে এই জিহাদে লিপ্ত হতে হয়। জীবনের বিশেষ কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেও এই জিহাদ বা মুজাহাদা আবদ্ধ থাকে না, বরং জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরেই তাকে জিহাদ করতে হয়। ঈমানদারের জন্য এই জিহাদ বাধ্যতামূলক। ঈমানদারকে এভাবে কোনো ধরনের বাহ্যিক অস্ত্র ব্যতীতই

জীবনের প্রতিটি ময়দানে জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়। এই ধরনের জিহাদ সম্পর্কে হযরত হাসান বাসরী (রাহঃ) অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন, 'মানুষ এমন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, তাকে একটি মুহূর্তের জন্যেও তরবারী চালনা করতে হয় না'।

অর্থাৎ ঈমানদারকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে এমন জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয় যে, এই জিহাদে তাকে মাধ্যম হিসাবে অস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না। অবয়বধারী দৃশ্যমান অস্ত্র ব্যতীতই তাকে সবচেয়ে বড় অস্ত্র দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জিহাদ চালিয়ে যেতে হয়। আর সেই বড় অস্ত্রের নামই হলো ঈমান। এ জন্য বলা হয় যে, ঈমান হলো একটি সুদৃঢ় বৃক্ষ আর সেই বৃক্ষের শিকড় হলো জিহাদ। শিকড় ব্যতীত যেমন কোনো বৃক্ষ টিকে থাকতে পারে না, তেমনি জিহাদ ব্যতীত ঈমান টিকে থাকে না। শিকড় সতেজ থাকলে বৃক্ষের ওপরি ভাগের পত্র-পল্লব সতেজ থাকে, বৃক্ষ ফুল-ফল দেয়। শিকড় সতেজ না থাকলে বৃক্ষ ক্রমশঃ শুকিয়ে জ্বালানি কাঠে পরিণত হয়। শিকড় ব্যতীত বৃক্ষের অস্তিত্বই যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি জিহাদ ব্যতীত মুসলমানের জীবন কল্পনা করা যায় না। মুসলমানদের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে তার জিহাদী চেতনার ওপরে। এই চেতনা যতদিন মুসলমানদের মধ্যে শানিত ছিল, ততদিন পৃথিবীতে এরা নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল।

মুসলমান জনগোষ্ঠী যেদিন থেকে তার ঈমান নামক বৃক্ষের শিকড় জিহাদের প্রতি উদাসিন হয়ে পড়েছে, মুজাহাদা ত্যাগ করেছে, তখন থেকেই তার ঈমানের মৃত্যু ঘটা শুরু হয়েছে। ফলে সমগ্র পৃথিবীতে তারা আজ ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। অঢেল সম্পদ ও বিপুল জনশক্তির অধিকারী হয়েও তারা অমুসলিমদের গোলামী করতে বাধ্য হচ্ছে। অমুসলিমরা যখন তাদের ওপরে বন্য হায়েনার হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তখন এরা মৃত লাশের ন্যায় নীরব ভূমিকা পালন করছে। নিজেদের স্বার্থে অমুসলিমরা অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা অনুসরণ করতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে বাধ্য করছে।

বর্তমান পৃথিবীতে শতকোটি মুসলমানদের এই করুণ পরিণতির একমাত্র কারণ হলো, তারা ঈমান নামক বৃক্ষের শিকড় জিহাদকে নিজেদের জীবন থেকে কেটে ফেলেছে। অমুসলিমরা জিহাদের যে ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে, সেই ব্যাখ্যাকে তারা একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করে জিহাদের অধ্যায়কে নিজেদের জীবন থেকে মুছে দিয়েছে। অমুসলিমরা এদেরকে বুঝিয়েছে, জিহাদ মানেই হলো সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং এই জিহাদ নামক সন্ত্রাসের

বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করতে হবে, এরাও অমুসলিম প্রভুদের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে নিজেদের যাবতীয় শক্তি জিহাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছে। পৃথিবীর মানচিত্রে যেসব ভূ-খণ্ড মুসলিম দেশ হিসাবে পরিচিত এবং তার শাসকবৃন্দও আদম শুমারীর খাতায় মুসলিম নামে পরিচিত, সেসব দেশে আল্লাহর কোনো বান্দা যখন আল্লাহর বিধানের বিপরীত চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে, তখন মুসলিম নামধারী শাসকবৃন্দ এদেরকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, জাতীয় ঐক্য বিনষ্টকারী ও সর্বশেষে সন্ত্রাসী বিশেষণে বিশেষিত করে তাদের গলায় ফাঁসির রশি পরিয়ে দেয়।

মুমিনের জিন্দেগী ও জিহাদ

জিহাদ হচ্ছে ইসলামী জীবনের স্পন্দন, প্রাণশক্তি, অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং ঈমানের ঐকান্তিক দাবী। ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রকেই জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়, এই জিহাদে আন্তরিকভাবে লিপ্ত না থাকলে কোনো মুসলমানের পক্ষে ঈমানদার থাকা সম্ভব নয়। একজন মানুষ যে মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করে তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে, সেই মুহূর্ত থেকেই জিহাদ করা তার ওপরে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন থেকেই শুরু হয় তার জিহাদী জীবন। এই জিহাদ নিরবচ্ছিন্নভাবে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। ঈমান আনার মুহূর্ত থেকে আল্লাহ বিরোধী শক্তির সাথে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূচনা ঘটে, যে সংগ্রামমুখর জীবনের সূত্রপাত হয়, এই সংগ্রামী জীবন থেকে ঈমানদারের অবসর ঘটে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এই সংঘাত ও সংগ্রাম থেকে মুমিন জীবনে মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম গ্রহণ করার সামান্যতম অবকাশ নেই। নেই শৈথিল্য প্রদর্শনের সুযোগ। কারণ যখনই সে জিহাদের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে, আল্লাহ বিরোধী তাগুতী শক্তি সেই মুহূর্তেই তার ঈমান হরণ করার লক্ষ্যে চতুরমুখী আক্রমন শুরু করবে।

ইসলাম গ্রহণ বা ঈমান আনার সাথে সাথেই যে জিহাদ শুরু করতে হবে, এ বিষয়টি আমরা দেখতে পাই নবী করীম (সাঃ) এর মক্কী জীবনে। নবুয়্যাত লাভ করার সাথে সাথে তিনি আল্লাহর দ্বীন মানুষকে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। বিরোধিতার প্রচণ্ড তাণ্ডব সৃষ্টি হলো এবং বিরোধী শক্তি তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য হুশিয়ার করে দিল। তাদের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুসারে জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর রাসূলের

ওপরে চাপ সৃষ্টি করা হলো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও তাঁর রাসূলকে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন–

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا-

হে রাসূল! আপনি কোনক্রমেই কাফিরদের আনুগত্য করবেন না; বরং এই কোরআন নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তম জিহাদ করুন। (সূরা ফুরকান-৫২)

এই আয়াতে 'জিহাদান কাবিরা' বলতে যা বুঝানো হয়েছে, তাফসীরকারগণ এর তিনটি অর্থ করেছেন। একটি অর্থ হলো, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা–অর্থাৎ প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে প্রাণ দেয়ার মতো পর্যায়ে উপনীত হওয়া। আরেকটি অর্থ হলো, বড় ধরনের প্রচেষ্টা চালানো। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজের যাবতীয় উপায়-উপকরণ নিয়োজিত করা। জিহাদান কাবিরা তথা বড় ধরনের জিহাদের আরেকটি অর্থ হলো, ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার কোনো একটি দিকও অপূর্ণ না রাখা এবং প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় ময়দান ত্যাগ না করা। প্রতিপক্ষের অনুকুল শক্তি ময়দানে যেসব স্থানে সক্রিয় রয়েছে, ময়দানের সেসব স্থানে নিজের শক্তি নিয়োজিত করা এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যেসব ক্ষেত্রে কাজ করার প্রয়োজন হয়, সেসব দিকে কাজ করা। যেখানে নিজের ব্যবহার ও মধুর আচরণ দিয়ে জিহাদ করার প্রয়োজন, সেখানে তা প্রয়োগ করা। যেখানে কথা দিয়ে বা বক্তৃতা দিয়ে জিহাদ করা প্রয়োজন, সেখানে তা করা। যেখানে লেখনী দিয়ে জিহাদ করার ক্ষেত্র রয়েছে, সেখানে লেখনী শক্তি প্রয়োগ করা। যেখানে অস্ত্র ধারণ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেখানে অস্ত্র ধারণ করা। অর্থাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সূরা ফুরকানের উল্লেখিত আয়াত রাসূলের মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয় এবং এই আয়াতে যে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সেই জিহাদ নয়, যে জিহাদে রাসূল ও তাঁর সম্মানীত সাহাবা কেরাম বদর ও ওহূদের প্রান্তরে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। অর্থাৎ রাসূলের মদীনার জীবনে যে জিহাদের নির্দেশ এসেছিল, মক্কী জীবনের জিহাদ সেই জিহাদ নয়। মক্কী জীবনের এই জিহাদের অর্থ ছিলো ইসলাম বিরোধী শক্তিকে আদর্শ দিয়ে মোকাবেলা করা। অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে ইসলামী আদর্শের যথার্থতা উপস্থাপন করা এবং প্রচলিত আদর্শ ও ভাবধারার অসারতা দেখিয়ে দেয়া। রাসূল উপস্থাপিত আদর্শই যে মানবতার একমাত্র মুক্তি সনদ, এ কথা মানুষের চিন্তার জগতে প্রতিষ্ঠিত করা। সমাজ ও জাতি যে পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সে পথ যে ধ্বংস

গহ্বরে মিলিত হয়েছে, এ বিষয়টি সমাজ ও জাতির কাছে পরিষ্কার করে দেয়া। এ জন্যই মক্কী সূরা সমূহে দেখতে পাওয়া যায় অখণ্ডনীয় যুক্তি দিয়ে মানুষকে সত্য বুঝানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। গভীর মমতার সাথে মানুষকে সত্য গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

মক্কী জীবনে জিহাদের ধরণ ছিল সত্যবিরোধিদের সামনে অস্পষ্টতা বা জড়তার আশ্রয় গ্রহণ না করে স্পষ্ট ভাষায় মহাসত্য প্রকাশ করা, সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য নির্দেশ করা, ইসলাম বিরোধিদের সামনে ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য, বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করা। সত্যের শত্রুদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও বিরোধিতার প্রবল স্রোতের মুখে ক্লান্ত না হয়ে তাদেরকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতে থাকা। এটাই ছিল রাসূলের মক্কী জীবনের জিহাদ এবং এই জিহাদে অবিচল ও অটল ভূমিকা পালন করেছেন রাসূল (সাঃ)। রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর কয়েকজন মজলুম অনুসারীদের নানা ধরনের প্রলোভন দেখানো হয়েছে, লোভ-লালসার গণ্ডীতে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, অবশেষে তাদের ওপরে অবর্ণনীয় লোমহর্ষক নির্যাতন অনুষ্ঠিত করা হয়েছে, তবুও তাঁরা এই জিহাদ থেকে ক্ষণিকের জন্যেও সামান্য শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। আর এটাই হলো মুমিনের জিন্দেগীর বাস্তব রূপ।

ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি সর্বপ্রথম জিহাদ শুরু করে তার নিজের নফ্ছের বিরুদ্ধে। ইসলামের বিপরীত যাবতীয় চিন্তা-চেতনা, নীতি-পদ্ধতি, বিধি-বিধান, মতবাদ-মতাদর্শ পরিহার করার প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং এটাই জিহাদের সূচনা। মানুষের ভেতরে যে কুপ্রবৃত্তি রয়েছে, এই কুপ্রবৃত্তি বা নফছ ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় না। পক্ষান্তরে এই নফ্ছকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর অনুগত করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে আল্লাহর গোলাম হিসাবে জীবন পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। কেননা এই নফছ্ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শক্তি। মানুষের ভেতরের এই শক্তি মানুষকে অসৎ কাজে প্ররোচিত করতে থাকে, এর প্ররোচনা থেকে যে ব্যক্তি নিজেকে হেফাজত করতে সক্ষম, সে ব্যক্তির পক্ষেই আল্লাহর গোলাম হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। ইসলামের বিপরীত শক্তির সাথে যে ব্যক্তি জিহাদ করে তাকেই হাদীস শরীফে মুজাহিদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রকৃত মুজাহিদের পরিচয় দিতে গিয়ে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَه فِيْ طَاعَةِ اللهِ–

যে ব্যক্তি নিজের নফছকে আল্লাহর অনুগত বানানোর লক্ষ্যে জিহাদ করলো, সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুজাহিদ। (মুসনাদে আহ্‌মাদ)

সুতরাং মুমিনের জিন্দেগী শুরুই হয় তার নিজের নফ্ছের বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনার মাধ্যমে। একজন মানুষ বাহ্যিক দিক দিয়েই শুধু মুসলিম হবে না, তার সমস্ত হৃদয়-মনকে সে আল্লাহর বিধানের সামনে অনুগত করে দিবে, তার নফছ আল্লাহর বিধানের সামনে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে, কিন্তু তাকে নফছের সিদ্ধান্তের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে, আর এভাবেই সে মুমিন শ্রেণীতে উপনীত হবার সোপানে যাত্রা শুরু করবে। মুমিন হওয়ার শর্ত উল্লেখ করতে গিয়ে নবী করীম (সা:) বলেছেন–

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ-

তোমাদের মধ্যে কোন মানুষই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না–যতক্ষণ তার হৃদয়-মন, সমস্ত অন্তর আমার নিয়ে আসা আল্লাহর বিধানের অধীন না হবে। (বোখারী-মুসলিম)

শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতিই নয়, সমগ্র হৃদয়-মনকে আল্লাহর বিধানের সামনে নত করে দিতে হবে তথা নফছের বিরুদ্ধে অবিরাম জিহাদ পরিচালিত করে নিজেকে মুমিনের স্তরে উপনীত করে জান্নাত লাভের যোগ্য হিসাবে গড়তে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى- فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

আর যে ব্যক্তি নিজের রব-এর সামনে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করে ভয় পাবে এবং নিজের হৃদয়-মনকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে, জান্নাতই হবে তার চূড়ান্ত পরিণতির স্থান। (সূরা নাযিয়াত-৪০-৪১)

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জান্নাত লাভের শর্তই হলো নিজের হৃদয়-মন-মানসিকতাকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর বিধানের অধীন করে দেয়া। নফছ প্রদর্শিত পথের বিপরীত পথ অতিক্রম করা। সুতরাং একজন মানুষকে মুমিনের স্তরে উপনীত হতে হলে সর্বপ্রথমে তাকে নিজের নফছের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। এরপর তাকে জিহাদ করতে হবে সে যে পরিবেশে অবস্থান করে সেই পরিবেশের সাথে। মনে রাখতে হবে, মানুষের ভেতরে

আল্লাহদ্রোহী যে শক্তি অবস্থান করছে সে শক্তির নামই হলো কুপ্রবৃত্তি বা নাফছ এবং মানুষের দেহের বাইরে আল্লাহদ্রোহী যে শক্তি রয়েছে, তার নাম হলো শয়তান। ঈমানদারকে এই দুই শক্তির বিরুদ্ধেই জিহাদ চালিয়ে যেতে হয়। শয়তান অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য। এই শয়তান মানুষের অভ্যন্তরে নফছের ওপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে এবং মানুষের বাইরের পরিবেশকে নিজের অনুকূলে এনে তার আধিপত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ জন্য ঈমানদার ব্যক্তিকে জিহাদের মাধ্যমে নিজের নফছকে আল্লাহর অনুগত বানিয়ে শয়তানের কর্তৃত্ব উৎখাত করতে হবে। তারপর বাইরের আল্লাহ বিরোধী পরিবেশের সাথে জিহাদ করে শয়তানের সাম্রাজ্যে ধ্বস নামিয়ে দিতে হবে।

মানুষের মধ্যে যারা শয়তানের মুরিদ হয়ে তার গোলামী করে, শয়তান এদের মাধ্যমেই তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই মানবরূপী শয়তানদের সাথেও মুমিনকে প্রতি নিয়ত জিহাদ করতে হয়। এই জিহাদ করার পূর্বে একজন ঈমানদারকে সর্বপ্রথমে সেই অবস্থান থেকে হিজরত করতে হয়, ঈমান আনার পূর্বে সে যে অবস্থানে ছিল। অর্থাৎ ঈমান আনার পূর্বে তাকে তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا–

যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, সে এমন এক শক্তিশালী অবলম্বন ধরেছে যে, যা কখনই ছিঁড়ে যায় না। (সূরা বাকারা-২৫৬)

অর্থাৎ আল্লাহ বিরোধী শক্তি তথা তাগুতের সাম্রাজ্য থেকে মানুষকে প্রথমে হিজরত করে ঈমান আনতে হয় বা ইসলামী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়। এরপরই শুরু হয় জিহাদের পর্যায়। আর মুমিনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে হিজরত তখনই করতে হয়, যখন তার নিজের দেশে অবস্থান করে আল্লাহর গোলামী করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এভাবে যারা প্রথমবার কুফরীর জগৎ থেকে হিজরত করে ঈমান এনেছে এবং নিজের নাফছের বিরুদ্ধে, তার অবস্থানের পরিবেশের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে এবং সমাজ ও দেশে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে আল্লাহর নির্দেশিত

পথে, তারাই আল্লাহর রহমত লাভ করবে। মুমিন যে কোনো অবস্থায় সত্য অবলম্বন করবে এবং এটাই তার জিহাদ। সত্য বলার ক্ষেত্রে সে কোনো বিপদেরই তোয়াক্কা করবে না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, 'অত্যাচারী শাসকের সামনে ইনসাফ ও সুবিচারের কথা বলা বড় ধরনের জিহাদের শামিল'। (তিরমিজী)

অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে জেলে যেতে হবে, তার বিরুদ্ধে নির্যাতনের খড়গ নেমে আসবে, এসবের কোন পরোয়া মুমিন করবে না। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'অত্যাচারী জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা অতীব উত্তম জিহাদ'। (আবু দাউদ)

মুমিনের জিন্দেগীতে আপোষ বলে কোনো কথা নেই। বাতিল শক্তির সাথে সে বিন্দুমাত্র আপোষও করবে না, তাদেরকে ভয়ও করবে না। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে প্রস্তুত থাকে। মুমিনের এই দুর্লভ গুণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ-

তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এমনভাবে যে, তারা এই পথে কোনো উৎপীড়কের উৎপীড়নকে একবিন্দু ভয় করে না। (সূরা মায়িদা-৫৪)

সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে স্থান কাল পাত্র কোনো বিষয় নয়। পৃথিবীর যে কোনো ভূ-খণ্ডে মুমিন যাক না কেনো, সেখানে যদি সত্য প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়, অবশ্যই সে তা করবে। হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (সাঃ) এর হাতে আমরা বায়'আত করে ওয়াদা করেছিলাম যে, আমরা যেখানেই এবং যে অবস্থায়ই থাকি না কেনো, সত্য কথা, ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলবো এবং এ ব্যাপারে আমরা কোনো উৎপীড়কের উৎপীড়নকে বিন্দুমাত্র ভয় করবো না'। (বোখারী)

ইসলামী বিধান অনুসরণ করার ব্যাপারে মুমিন কোনো প্রতিকুল পরিবেশের পরোয়া করবে না। সর্বাবস্থায় সে সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলতেই থাকবে। এ ব্যাপারে সে কারো রক্তচক্ষু, কারো অভিযোগ-আপত্তি, কারো বিদ্রুপের পরোয়া করবে না। পরিবেশ ও দেশের জনমত ইসলামের বিরোধী হলেও মুমিন সামান্য বিচলিত হবে না, সেই প্রতিকুল পরিবেশেই সে ঐ পথেই জিহাদ করতে থাকবে, যে পথ তাকে ইসলাম প্রদর্শন করেছে।

জিহাদই ঈমানের কষ্টি পাথর

মুসলিম হিসাবে দাবীদার একজন মানুষ ঈমানদার কি না, তা যাচাই করার একমাত্র মাধ্যম হলো জিহাদ। কারণ কুফর আর ইসলামের জিহাদ বা দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও সংঘাত হচ্ছে এমন একটি বিশেষ কষ্টি পাথর বা মানদণ্ড, যা প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয় যেমন প্রকাশ করে তেমনি ঈমানের দাবীর ব্যাপারে কারা ভূয়া-মেকি, কৃত্রিম, তাদের পরিচয়ও সুস্পষ্ট করে। যে ব্যক্তি এই জিহাদ তথা ইসলামী বিরোধী শক্তির সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মন প্রাণ দিয়ে ইসলামের জন্য কাজ করবে এবং যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ, সমগ্র উপায়-উপকরণ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ও পালন করার কাজে নিয়োজিত করবে এবং কোনো প্রকার আত্মত্যাগে কুণ্ঠিত হবে না, সেই ব্যক্তিই হলো প্রকৃত ঈমানদার। আর যে ব্যক্তি বাতিল শক্তির সাথে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ইসলামের পক্ষ সমর্থন করবে না, ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শের জৌলুশ ও শক্তিমত্তা দেখে ভীতগ্রস্থ হয়ে ময়দান ত্যাগ করবে, ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের লক্ষ্যে জান-মাল উৎসর্গ করাকে বৃথা মনে করে কুণ্ঠিত হবে, তার এই আচরণই প্রমাণ করবে যে, সে ব্যক্তি ঈমানের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যা–সে মুনাফিক।

তাবুক অভিযানের সময় এই কৃত্রিম ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিদের পরিচয় রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সামনে আল্লাহ তা'য়ালা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। ঈমানের ব্যাপারে যারা মেকী, তারা তাবুক অভিযানের কথা শুনেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর রাসূল যখন এই অভিযানে জান-মাল দিয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য ঘোষণা দিলেন, তখন মেকি ঈমানদার তথা মুনাফিকী রোগে যারা আক্রান্ত ছিল, তাদের রোগ প্রকটভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো। তাদের নফছ ও শয়তান তাদেরকে বুঝালো, 'এই জিহাদে অংশগ্রহণ করলে মারাত্মক ক্ষতির মোকাবেলা করতে হবে। সুতরাং এই ক্ষতি থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখার জন্য রাসূলের কাছে অজুহাত পেশ করতে হবে যে, আমাকে এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, বর্তমানে আমার পক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়'। এরা রাসূলের আহ্বানের মোকাবেলায় শয়তানের পরামর্শকে প্রাধান্য দিয়ে রাসূলের কাছে কাকুতি-মিনতি করে আবেদন পেশ করেছিল, তাদেরকে যেন এই জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দেয়া হয়। এদের কৃত্রিম ঈমান সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিলেন–

لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ– إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ–

যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার, তারা তো কখনই আপনার কাছে আবেদন করবে না যে, জান-মালসহ জিহাদ করার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেয়া হোক। আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভালো করেই জানেন। এ ধরনের আবেদন শুধুমাত্র তারাই করতে পারে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার নয়, তাদের মনে সন্দেহ রয়েছে আর তারা নিজেদেরই সন্দেহের আবর্তে পড়ে আবর্তিত হচ্ছে। (সূরা তওবা-৪৪-৪৫)

যারা প্রকৃতই তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করে, তারা যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে হলেও আল্লাহর পথে জিহাদ করে। ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে তাদের ওপরে যখন কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তখন তাঁরা অজুহাত প্রদর্শন করে না, ওজর-আপত্তি ছাড়াই সে দায়িত্ব আন্তরিকভাবে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। আর তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি যাদের বিশ্বাস ঠুনকো, এসব ব্যাপারে যারা সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে আবর্তিত হতে থাকে, তারা পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হলেও এই আন্দোলন যখন বিপদের মোকাবেলা করতে থাকে বা এই আন্দোলনের ওপরে বাতিল গোষ্ঠী হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ওপরে নির্যাতন নেমে আসে, তখন এই মেকি ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ আন্দোলন থেকে ছিটকে পড়ে। এরা পথ খুঁজতে থাকে, কিভাবে আন্দোলনের কাজ থেকে দূরে অবস্থান করা যায়। আন্দোলন বিপদ-সঙ্কুল পথ অতিক্রম করার সময় যারা দৃঢ় প্রত্যয়ে আন্দোলনের কাজে সক্রিয় থাকে তারাই প্রকৃত ঈমানদার। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ-

পক্ষান্তরে যাদের অবস্থা এই যে, ঈমান আনার কারণে যখন তারা নির্যাতিত হয়েছে, তারা বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে, তাদের জন্য অবশ্যই তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা নাহ্‌ল-১১০)

এসব লোকদের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করবেন। এই শ্রেণীর লোকদের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে

অনেক বেশী। আল্লাহর পথে যারা জিহাদ করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ- خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ-

আল্লাহর কাছে তো সেই লোকদের অতি বড় মর্যাদা, যারা ঈমান এনেছে, যারা তাঁর পথে নিজেদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করেছে এবং প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করেছে আর তারাই হচ্ছে সফলকাম। তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত ও সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী সুবিন্যস্ত রয়েছে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহর কাছে কাজের প্রতিফল দেয়ার অফুরন্ত সামগ্রী রয়েছে। (সূরা তওবা-২০-২২)

ঈমান এনেছি, এ কথা বললেই ঈমানদারের দায়িত্ব-কর্তব্য শেষ হয় না, তাকে জিহাদে অবতীর্ণ হতে হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষা শুধু বিশ্বনবী (সা:) এর অনুসারীদেরই করা হয়নি, অতীতেও যারা কুফরী ত্যাগ করে ঈমান এনেছে তাদেরকেও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই পরীক্ষা তথা জিহাদের ময়দানেই প্রমাণিত হয় কে ঈমানের দাবীর ব্যাপারে দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। মহান আল্লাহ বলেন–

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ- وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ-

লোকেরা কি এ ধারণা করেছে নাকি, 'ঈমান এনেছি' কেবলমাত্র এ কথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক। (সূরা আনকাবুত-২-৩)

পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য আমার যেসব প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না। বরং ঈমানের দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তিকেই অনিবার্যভাবে কঠিন পরীক্ষার স্তর সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে হবে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ-

তোমরা কি মনে করেছো তোমরা জান্নাতে এমনিতেই প্রবেশ করবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারগণ? তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও কঠিন যন্ত্রণার, তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলেছিল আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? তখনই তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল এই মর্মে যে, জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য অত্যন্ত কাছে। (সূরা বাকারা-২১৪)

মহান আল্লাহ বলেন, ঈমানের দাবীদারকে নিজের দাবীর সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে হবে। আমার জান্নাত এতটা মূল্যহীন নয় এবং পৃথিবীতেও আমার বিশেষ অনুগ্রহ এত সহজ লভ্য নয় যে, তোমরা শুধু মুখে আমার প্রতি ঈমান আনার কথা উচ্চারণ করবে আর অমনিই আমি তোমাদেরকে সেসব নিয়ামত দান করবো। আমার এসব নিয়ামত লাভ করতে হলে অবশ্যই পরীক্ষার ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। চার দেয়ালে আবদ্ধ থেকে পরীক্ষা দেয়া যায় না, পরীক্ষা দিতে হলে অবশ্যই পরীক্ষার ক্ষেত্র তথা আন্দোলনের ময়দানে নামতে হবে। তখন আমি দেখবো, কে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ-

তোমরা কি মনে করেছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে ধৈর্যশীল? (সূরা ইমরান-১৪২)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমার নিয়ামত লাভ করতে হলে অবশ্যই দুঃখ-কষ্ট মুসিবত, নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য করতে হবে, জেলে যেতে হবে, ফাঁসির রশি গলায় পরতে হবে, অর্থ-সম্পদের ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। বিপদ-মুসিবত ও সঙ্কটের মোকাবেলা করতে হবে। ভীতি ও আশঙ্কা দিয়ে এবং লোভ-লালসা দিয়েও তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। এমন প্রতিটি জিনিস যা তোমরা প্রিয় মনে করো ও পছন্দ করো, আমার সন্তুষ্টির জন্য তা কোরবান করতে হবে। আর এমন প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট যা তোমরা কামনা করো না, তোমাদের কাছে যা অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত, তা আমার জন্য অবশ্যই সহ্য করতে হবে। তারপরেই তোমরা আমার প্রতি ঈমানের যে দাবী করেছিলে, তার সত্য-মিথ্যা যাচাই হবে। এভাবে জিহাদের কষ্টি পাথরে ঈমান যাচাই করে নেয়া হবে।

জিহাদ-আল্লাহর প্রদর্শিত পথে

জিহাদের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, ঈমান ও জিহাদ মুমিন জীবনে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। জিহাদ ব্যতীত একজন মানুষ মুমিনের স্তরে উপনীত হতে পারে না এবং ঈমানও টিকে থাকে না। জিহাদ ব্যতীত ঈমানের দাবীর ব্যাপারে নিশ্চিতও হওয়া যায় না। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান তথা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর, রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে একজন মানুষ নিজেকে এই মূল কাজ তথা জিহাদের জন্যই প্রস্তুত করে। ব্যক্তিকে সৎ চরিত্রবান ব্যনানোর লক্ষ্যে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে, অর্থাৎ নামায আদায়, রোজা পালন, যাকাত আদায়, হজ্জ আদায়, নিজেকে শয়তানী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা ইত্যাদী যে কাজগুলো একজন মানুষকে করতে হবে এবং এ কাজের মধ্য দিয়েই মানুষ সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে।

বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিস্কার হতে পারে, যেমন সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীতে লোক রিক্রুট করার পর বিশেষ সময় পর্যন্ত তার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। যাবতীয় ট্রেনিং সম্পন্ন হবার পরই তাকে নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তেমনি একজন মানুষ যখন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে এবং নবীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার পরে মুসলিম দলে শামিল হলো তখন নামায, রোজা, হজ্জ ইত্যাদীর. মাধ্যমে তাঁর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তাঁর ভেতরে ক্রমশঃ সেই যোগ্যতা সৃষ্টি হতে থাকে, যে

যোগ্যতা থাকলে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। সৈনিককে যেমন ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়, তেমনি নামায রোজার মাধ্যমেও ট্রেনিং দিয়ে মানুষকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য প্রস্তুত করা হয়।

একটি মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুসলমানদের সুদক্ষ সুসংগঠিত যোগ্যতা সম্পন্ন একটি বাহিনীতে পরিণত করার জন্যই জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের মূল কাজই হলো মানুষকে পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির গোলামী থেকে মুক্ত ও সকল শক্তির নেতৃত্ব-প্রভুত্ব, শাসন উৎখাত করে এক আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, এক আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত করা, সকল মানুষকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করা, এটার নামই হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। আর জিহাদই হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রাণশক্তি, ঈমানের মৌলিকভাবধারা, কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। এই জিহাদই হওয়া উচিত মুমিনদের একমাত্র সাধনা।

জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা

ইসলামের বিপরীত যা কিছু মানুষের চিন্তার জগতে স্থান দখল করে রয়েছে, তা নির্মম নিষ্ঠুর হাতে উৎপাটন করার লক্ষ্যে ব্যক্তিকে যেমন সক্রিয় ও সচেষ্ট হতে হয় তেমনি ব্যক্তির বাস্তব জীবন পরিচালিত করতে হয় যে কোনো ধরনের প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তিকে সফলভাবে অতিক্রম করে ইসলামী আইন-বিধান তথা রাসূল নির্দেশিত নিয়ম নীতি অনুসারে। তারপর সেই ব্যক্তিকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয় সামষ্টিকতার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসরের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের অঙ্গন থেকে বিশাল সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনের মহাসাগরের দিকে। এই যাত্রা পথে তাকে প্রতিটি পদক্ষেপে মোকাবেলা করতে হয় ইসলাম বিরোধী নিয়ম-নীতি, প্রথা, আইন-কানুন ও ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রবল প্রতিবন্ধকতা। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এসব ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে মোকাবেলা করার নামই হলো জিহাদ। এই জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম বিরোধী শক্তিকে একের পর এক আঘাত হেনে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে প্রচলিত নিয়ম-প্রথা, আইন-কানুন উৎখাত করে সেখানে আল্লাহ তা'য়ালার একক সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করা।

আসলে এটাই হলো জিহাদের অব্যাহত ও সার্বক্ষণিক কার্যক্রম এবং একজন মুমিনকে সকল সময়ই জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়। এই জিহাদে আন্তরিকভাবে লিপ্ত না থাকলে তার পক্ষে মুমিন থাকা সম্ভবপর নয়। এ জন্য জিহাদই হলো নন্দিত জাতি গঠনের ঐকান্তিক তাগিদ, জিহাদই হলো মুমিন জীবনের সর্বোচ্চ স্তর। একজন ঈমানদারের ইসলামী জীবনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। কারণ ইসলাম হলো মানুষের জীবনের শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট একটি বিশাল নন্দিত বৃক্ষের নাম। এই বৃক্ষের মূল নিহিত, গ্রথিত ও বিস্তৃত ঈমানের অতল গভীরে। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে ঈমানদারকে বাতিল সৃষ্ট প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবের সাথে সংগ্রাম করে ঝড়ের প্রতিকূলতাকে জয় করতে হয়। বাতিল সৃষ্ট ঝড় তাকে আঘাত করলে তাকেও প্রত্যাঘাত করে ঈমান টিকিয়ে রাখতে হয়।

এটাই হলো একজন ঈমানদার ব্যক্তির প্রতি মুহূর্তের জীবনধারা। এই জীবন ধারাকে এড়িয়ে যাওয়া বা অবহেলা করাই হলো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানকে অস্বীকার করার শামিল। জিহাদ-ই জীবনধারার বিপরীত জীবনধারার নামই হলো বৈরাগ্যবাদী জীবনধারা, আর বৈরাগ্যবাদের স্থান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ইসলামে দেননি।

নন্দিত জাতি মুসলমানদের জীবনই হলো জিহাদ-ই জীবন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্তমান পরিবেশে ইসলামী নিয়ম-নীতি সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়, এসব নিয়ম-নীতি আদর্শের বিপরীত কোরআন নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালিত করার নামই হলো জিহাদ-ই জীবন। এই জিহাদকে যারা অস্বীকার করে জীবন অতিবাহিত করতে চায়, তারা প্রকারান্তরে ইসলামকেই অস্বীকার করে। জিহাদকে অস্বীকার করে এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র দু'ধরনের জীবন-যাপন করা যেতে পারে। একটি হলো চরম স্বেচ্ছাচারীতামূলক পশুসুলভ জীবন আরেকটি হলো বৈরাগীর জীবন। পক্ষান্তরে ইসলাম এই দুই ধরনের জীবন-যাপন প্রণালীকেই হারাম বলে ঘোষণা করেছে এবং মানব স্বভাবের সাথে এই দু'ধরনের জীবনের কোনো সামঞ্জস্য নেই।

স্বেচ্ছাচারীতামূলক পশুসুলভ জীবন হলো এ পৃথিবীতে বৈধ-অবৈধের কোনো সীমার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে যেমন খুশী তেমনভাবে জীবনকে পরিচালনা করা। বৈধ পথ অবলম্বন করা এবং অবৈধ পথ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন জিহাদ। চাকরী জীবনে বেতন লাভ করা যায় এবং অবৈধ পথে অর্থ সংগ্রহ করা যায়। বেতন লব্ধ অর্থে দারিদ্র সীমার নিচে জীবন-যপন করতে হয়। আর অবৈধ অর্থ সংগ্রহ করলে অত্যন্ত স্বচ্ছলভাবে জীবন-যাপন করা যায়। চরম

দারিদ্রতাকে হাসিমুখে স্বাগত জানিয়ে অবৈধ অর্থ সংগ্রহ থেকে বিরত থাকাও জিহাদ। যৌবনকে অবৈধ উপায়ে ভোগ করার যাবতীয় উপকরণ সম্মুখে উপস্থিত, এ অবস্থায় তা থেকে বিরত থাকাও জিহাদ। অবৈধ অঢেল অর্থের প্রলোভন, ভোগ-বিলাসের হাতছানি থেকে নিজেকে হেফাজত করাও জিহাদ। জিহাদের এ ধরনের অসংখ্য ক্ষেত্র রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে জিহাদে বিজয়ী হলেই মুমিন হওয়া সম্ভব। আর এই ধরনের মুমিনের পক্ষেই আল্লাহর সাহায্যের প্রতি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাতিলের সামনে রক্তঝরা ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব।

জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে এ ধরনের অসংখ্য জিহাদের মুখোমুখি হতে হয়। এসব ক্ষেত্রে জিহাদ করতে ব্যর্থ হয়ে কোনো ব্যক্তি যদি আত্মরক্ষার আশায় মসজিদের চার দেয়াল ও খানকার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখে, দ্বন্দ্ব মুখর পৃথিবীর জটিলতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে, কোনো ধরনের সমস্যা নিয়ে মস্তিষ্ক পরিচালনা করতে অস্বীকার করে যে ধরনের জীবন-যাপন করে, সেই জীবন গ্রহণ করার নামই হলো বৈরাগ্যবাদ। পৃথিবীর বুকে কোনো নবী-রাসূলই এ ধরনের বৈরাগী সৃষ্টি করার জন্য আগমন করেননি। তাঁরা আগমন করেছেন মানুষকে বিপ্লবী বানানোর জন্য। আল্লাহ বিরোধী পরিবেশ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে, মানব রচিত আইন-কানুনের বিরুদ্ধে মানুষ বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহী ভূমিকা পালন করে তা উৎখাত করে আল্লাহর বিধান পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক জিহাদ করবে, এই ধরনের মানুষ তৈরী করার জন্যই নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন।

ইসলামের এই জিহাদ সম্পর্কে দুশমনরা মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। তারা ইসলামী জিহাদের স্বেচ্ছাচারমূলক বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে। যে মহান ও কল্যাণকর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের জন্য জিহাদকে বিধিবদ্ধ করেছেন, সেই কল্যাণকর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তারা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিয়ে সমগ্র পৃথিবীবাসীর দৃষ্টির অন্তরালে রেখে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তারা জিহাদের একটি বিকৃত কুৎসিত অবয়ব মানুষের সামনে উপস্থাপন করে তার ওপরে যাবতীয় হিংস্রতার আবরণ, বীভৎসতার ছায়া, লোমহর্ষক পৈশাচিকতার পর্দা ও অমানবিকতার আচ্ছাদন দিয়ে দিয়েছে। তারা এই জিহাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে তাদের কুটিল কুৎসিত জঘন্য মানসিকতার সমস্ত আক্রোশ প্রকাশ করেছে।

দুশমনরা জিহাদের অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ইসলামের যাবতীয় কল্যাণকর দিক, মহান মানবতাবাদী আন্দোলনকে মানুষের কাছে সংশয়াপন্ন করে ঘৃণিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইসলামী আন্দোলন যারা আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন তাদের উপস্থাপিত ও প্রচারিত যাবতীয় মহামূল্যবান নীতি-আদর্শকে যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সর্বমুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে অমুসলিম জনগোষ্ঠী বৈরী আচরণ করেছে। তাদের সাথে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংঘটিত সাধারণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে পুঁজি করে ইসলামের এই মহান জিহাদকে কলুষিত করতে ইসলামের শত্রুরা স্বয়ং এবং তাদের বশংবদ গোলামরা সক্রিয় রয়েছে। মিডিয়ায় দাড়ি টুপিধারী রক্তলোলুপ দানবের চিত্র অঙ্কন করে ইসলামপন্থীদের উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং সেই সাথে এ কথা বুঝানো হচ্ছে যে, 'জিহাদ ইসলামপন্থীদের হিংস্র ও রক্তলোলুপ দানবে পরিণত করেছে'। এরা অকারণে প্রচার করে থাকে যে, 'ইসলামপন্থীরা সহিংস এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর চরিত্রের, মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাস থেকে রক্তের গন্ধ আসে, ইসলাম অস্ত্রের শক্তিতে প্রচারিত হয়েছে, ইসলাম মানুষকে হৃদয়হীন পশুতে পরিণত করে, অমুসলিমদের হত্যার নির্দেশ নিয়েই কোরআনের আগমন, এই পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট করার জন্যই ইসলামের আগমন, পৃথিবীর বুকে যতদিন কোরআন টিকে থাকবে ততদিন হিংস্রতা দূর হবে না'। এই ধরনের অমূলক-অশোভন ও হিংসা-বিদ্বেষমূলক প্রচারের কারণে সমগ্র পরিবেশকেই বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে।

এই অপশক্তির অপপ্রচারের কারণেই মুসলমানদের মধ্যেও একটি বিরাট অংশ মনে করে যে, 'বিভৎস একটি যুদ্ধ প্রক্রিয়ার নামই হলো জিহাদ'। জিহাদ শব্দটি কর্ণকুহরে প্রবেশের সাথে সাথে তাদের মানস পটে ভেসে ওঠে শ্মশ্রু মণ্ডিত, লম্বা জোব্বায় আবৃত, টুপি পাগড়ী পরিহিত একটি জনগোষ্ঠী, হাতে কোষমুক্ত বিশালাকারের শাণিত তরবারী নিয়ে রক্তলোলুপ হায়েনার মতই দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটছে আর নির্বিচারে অমুসলিম শিশু বৃদ্ধ তরুণ যুবকদের হত্যা করছে। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বের প্রচার মাধ্যম নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে মুসলমানদের সমগ্র পৃথিবীর সামনে হিংস্ররূপে উপস্থাপন করেছে। এ জন্য ফারসী ভাষায় একটি কথা বলা হয়ে থাকে যে, 'ওয়ালেকিন কলমদার কাফে দুশ্‌মনাস্ত' অর্থাৎ শত্রুর হাতের কলম ইচ্ছে মাফিক মুসলমানদের চরিত্র অঙ্কন করেছে।

মুসলমানদের প্রতিপক্ষ কলমের সাহায্যে ইসলামকে দেখিয়েছে একটি পশুসুলভ দানবীয় আদর্শ হিসেবে। তাদের অপপ্রচারে এক শ্রেণীর মুসলমানরা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে কোনো ধরনের জ্ঞানার্জন

ব্যতীতই পাশ্চাত্যের শেখানো বুলি তোতা পাখীর মতই আওড়িয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত এক শ্রেণীর মুসলমানরাই ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার করছে যে, জিহাদ মানে হলো ধর্মযুদ্ধ। এসব ব্যক্তিদের আলোচনা শুনলে বা এদের রচিত গ্রন্থ পাঠ করলে মনে হয় না যে, এদের স্বাধীন চিন্তা শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। এদের হাতে আলো রয়েছে, কিন্তু তারা সে আলো জ্বালায় শত্রুর শিবিরে, এদের মুখে জিহ্বা আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা অন্যের কথা বলে। ডঃ আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) এর ভাষায়–

উনকি মাহ্ফিল মে সাওয়ার তা হোঁ, চেরাগ মেরী হায় রাত উন্কি

উন্কি মাত্লাব্ কাঁহা রাহা হো, যবাঁ মেরী হ্যয় বাত্ উন্কি।

অপরের অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হয়ে আমার প্রদীপ দিয়ে আমি তার রাতকে আলোকিত করি, আমি আমার জিহ্বা দিয়ে অপরের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি।

জিহাদ ও যুদ্ধ সমান্তরাল নয়

ইসলামের দুশ্মনগণ আরবী 'জিহাদ' শব্দের অনুবাদ করেছে, Holy war. Religious war পবিত্র যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ। এরা বুঝাতে চেয়েছে, আরবী 'কিতাল' শব্দ ও 'হারব্' শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, 'জিহাদ' শব্দ দিয়েও সেই একই অর্থ প্রকাশ করে। Holy war, Religious war শব্দের মাধ্যমে আরবী জিহাদ শব্দের শত ভাগের একভাগ অর্থও প্রকাশ পায়না। ইংরেজী ভাষা-ই শুধু নয়, পৃথিবীর বুকে এমন কোনো ভাষা নেই, যে ভাষার একটি শব্দ দিয়ে আরবী জিহাদ শব্দের পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা যেতে পারে। মহান আল্লাহ স্বয়ং এই শব্দ নির্বাচন করেছেন। এই জিহাদ শব্দ যাবতীয় অসৎ ধ্যান ধারণা এবং ক্ষতিকর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। জিহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ হলো, যে কোনো উদ্দেশ্যকে সফলতার শীর্ষে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা পরিচালিত করা হয়, এই চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়। অর্থাৎ কোনো লক্ষ্যে পৌছার জন্য বা কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অথবা কোনো কাজ সমাপ্ত করার জন্য চূড়ান্তভাবে চেষ্টা সাধনা করা। শত্রুতামূলক, আক্রমণাত্মক বা প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধের ধারণা থেকে 'জিহাদ' শব্দ সম্পূর্ণ মুক্ত। এই শব্দটিই জানিয়ে দেয়, একজন ঈমানদারের প্রকৃত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবী

থেকে যাবতীয় হিংসা বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, অশান্তি, অত্যাচার, অশ্লিলতা, নোংরামী, জুলুম, অনিষ্ট ইত্যাদী দূরিভূত করা। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য যতটুকু চেষ্টা সাধনা, কর্ম তৎপরতা চালানো প্রয়োজন ততটুকুই সে করবে, সীমা লংঘন সে করবে না।

মহান আল্লাহ নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে যে জীবন বিধান দান করেছেন, সেখানে যুদ্ধের বিধানের পরিবর্তে জিহাদের বিধান দান করা হয়েছে। যুদ্ধ এবং জিহাদ এক জিনিস নয়। যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে প্রতিপক্ষকে চরম শিক্ষা দেয়া, কোনো জাতিকে, দেশকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা, তাদেরকে শোষণ করা, বিজিত দেশের অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করা। মোট কথা যুদ্ধের মাধ্যমে এক জাতি আরেক জাতিকে নিজের গোলামে পরিণত করে। কিন্তু জিহাদের উদ্দেশ্য তা নয়। এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, আল্লাহর প্রভুত্ব যেখানে প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানেই যাবতীয় অশান্তি ফণা বিস্তার করেছে। এই অশান্তির মূলোৎপাটন করার লক্ষ্যেই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এই লক্ষ্যে পরিচালিত চেষ্টা-সাধনাকেই জিহাদ বলে। এই চেষ্টা-সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে যদি অস্ত্র ধারণ করতে হয়, তবে সে পথই ইসলাম নির্দেশিত উপায়ে অবলম্বন করতে হয়। ইসলাম মুসলিম ব্যক্তিকে ইসলামের যাবতীয় বিধানের প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে সেই বিধান অনুসারে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন-যাপনের আদেশ দিয়েছে।

ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে যে পথে, যে কোনো পদ্ধতিতে, প্রক্রিয়াতে কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা অতিক্রম করে লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হওয়ার জন্য ঈমানদারকে আদেশ দেয়া হয়েছে। এ পথে ঈমানদারের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে তাঁর নিজের নফ্স, শয়তান, পরিবারের কোনো সদস্য, সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি, দেশীয় ও সমাজের আচার-প্রথা, ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠিত কোনো শক্তি, রাজনৈতিক শক্তি, প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তি, এসব শক্তির বিরুদ্ধেও ঈমানদারকে জিহাদ করতে হয়। ইসলামী আদর্শ নিজের জীবনের একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ বলে ঘোষণা দিয়ে সেই আদর্শ অনুসারে জীবন পরিচালনা করাকে যারা অপরাধ মনে করে, ইসলামের কিছু বিধান পালন করার ব্যাপারে আপত্তি করে না এবং কিছু বিধান পালন করতে দেয় না অর্থাৎ খণ্ডিত ইসলামকে পালন করার আদেশ দেয়, এই ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরুদ্ধেও ঈমানদারদের জিহাদ

করতে হয়। আর এই জিহাদ করতে হয় আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি একনিষ্ঠ ঈমান সহকারে এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। এই জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায় সশস্ত্র জিহাদ। অনেকে সশস্ত্র এই জিহাদকে বাহ্যিক দিক দিয়ে যুদ্ধ বলেই ধরে নিয়েছেন, কিন্তু জিহাদ সশস্ত্র পর্যায়ে উপনীত হয়েও এর গোটা কাঠামোটি জিহাদই থাকে, যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় সে পর্যায়ে উপনীত হয় না।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই সশস্ত্র জিহাদের উদ্দেশ্য

নবী করীম (সা:) পৃথিবীতে প্রচলিত যুদ্ধের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাতিল করে একটি পবিত্র উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত করলেন। সে সময় যুদ্ধের যে পৈশাচিক এবং বিভৎস উদ্দেশ্য ছিল তিনি তার কবর রচনা করলেন। তিনি এ লক্ষ্যে যোদ্ধাদের চরিত্র সংশোধন করলেন। শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে যুদ্ধের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের চিন্তা চেতনার জগৎ আচ্ছন্ন করেছিল, এ কারণে নবী করীম (সা:) সর্বপ্রথম চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটালেন। ব্যবহারিক জীবনে বিপ্লব ঘটানোর পূর্বে মানুষের চিন্তার জগতে সর্বপ্রথম বিপ্লব ঘটানো হলো। যা ছিল মানুষের চেতনার অতীত, তাই বাস্তবে করে দেখানো হলো। যুদ্ধের বিষয়টি মানুষের বুদ্ধির অগম্য ছিল যে, যুদ্ধ যদি নিজের ক্ষমতা প্রকাশের, স্বার্থ উদ্ধারের, সাম্রাজ্য বিস্তারের, ধন-সম্পদ বৃদ্ধির ও সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে না হয় তাহলে কেনো নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধ করা হবে?

এ সকল কিছুর উর্ধ্বে এক বিশাল মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুদ্ধ পরিচালিত হতে পারে তা ছিল মানুষের চিন্তা চেতনা, ধারণা কল্পনারও অতীত বিষয়। অদৃশ্য স্বার্থের কারণে, অদেখা স্বার্থ অর্জনের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা ঐ জাতির জন্য সামান্য ব্যাপার ছিল না, যাদের কাছে প্রাণ উৎসর্গ করার অর্থই ছিল ধন-সম্পদ অর্জন, ক্ষমতার প্রকাশ ঘটানো বা প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। অথচ সেই মানুষগুলোকেই নবী করীম (সা:) পবিত্র কোরআনভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করলেন যে, তাদের কাছে সমগ্র পৃথিবীর ধন-সম্পদের তুলনায় অদেখা আখেরাতের স্বার্থ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজের প্রাণ পর্যন্ত দান করতো।

নবী করীম (সা:) ঈমানদারদের আল্লাহর পথে জিহাদের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জিহাদ করতে বলেছেন তা তাদের মন-মগজে প্রবিষ্ট করলেন। এ সম্পর্কে একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত মুসা আশয়ারী (রা:) বর্ণনা

করেন, একজন লোক এসে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! একজন যুদ্ধ করে সম্পদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে, একজন যুদ্ধ করে প্রশংসা এবং খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে, একজন যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের লক্ষ্যে। এদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করলো? নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বললেন, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তথা তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে সেই ব্যক্তিই কেবল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একজন লোক দরবারে নববীতে এসে জানতে চাইলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যুদ্ধ করে প্রতিহিংসার কারণে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে। কোনো ব্যক্তি যুদ্ধ করে তাদের জাতিয় আভিজাত্য প্রকাশের লক্ষ্যে। কিন্তু আল্লাহর পথে যুদ্ধ কি ধরণের যুদ্ধ? আল্লাহর রাসূল তাঁকে জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে তাঁর যুদ্ধই হলো আল্লাহর পথের যুদ্ধ। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, একজন লোক নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে জানতে চাইলো, হে আল্লাহর নবী! যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ বৃদ্ধি এবং প্রশংসা লাভের জন্য যুদ্ধ করে, এমন লোক সম্পর্কে আপনার মতামত কি? সে কি সওয়াব লাভ করবে? নবী করীম (সাঃ) লোকটিকে জানালেন, এমন লোক কোনো সওয়াব অর্জন করবে না। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহর নবীর উত্তর শোনার পরে প্রশ্নকারী অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর লোকটি চলে গেল এবং পুনরায় এসে ঐ একই প্রশ্ন করলো। আল্লাহর নবী তাকে পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। এভাবে লোকটি চারবার এসে ঐ একই প্রশ্ন করেছিল। শেষের বার নবী করীম (সাঃ) লোকটিকে বলেছিলেন, শোন, যতক্ষণ কোনো কাজ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা না হয়, ততক্ষণ সে কাজ আল্লাহ কবুল করেন না। (বুখারী)

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) একদিন বললেন, 'কোনো মানুষ আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সে এই যুদ্ধ থেকে তাঁর উটকে বাঁধার জন্য একটি রশি সংগ্রহ করবে। সে ব্যক্তি শুধু ঐ রশিই লাভ করবে, কোনো সওয়াব লাভ করবে না'। মুসিলম জীবনের প্রতিটি কর্ম অনুষ্ঠিত হতে হবে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। সে যুদ্ধ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং যুদ্ধ থেকে বিরতও থাকবে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য। নবী করীম (সাঃ) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কর্ম একমাত্র আল্লাহ

তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সম্পাদন করা না হয় ততক্ষণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা কবুল করেন না'।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, যুদ্ধ দুই ধরনের হয়। প্রথম ধরনের যুদ্ধ হলো, একজন কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে এবং নেতার আনুগত্য করে। নিজের উত্তম ধন-সম্পদ সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং কোনো ধরনের বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না। সে জেগেই থাক বা ঘুমিয়েই থাক, সওয়াব সে অর্জন করবে। আরেক ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে, সুনাম ও প্রশংসা অর্জন করতে চায়, নেতার আদেশ পালন করেনা। পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। সে কেবলমাত্র শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই ভোগ করবেনা'।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন নবী করীম (সাঃ) বললেন, কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচার করা হবে। তার ভেতরে প্রথম ঐ ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিল। বিচারের জন্য নিয়ে আসা হলে তাকে মহান আল্লাহ তাঁর দেয়া অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে ব্যক্তি তার স্বীকৃতি দিবে। এরপর মহান আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন, 'তুমি আমার জন্য কোন্ কাজ করেছো?' লোকটি জবাব দিবে, 'আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছি'। মহান আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি যুদ্ধ করেছিলে বীরত্ব প্রকাশের জন্য মানুষ যেন তোমাকে বীর হিসেবে আখ্যায়িত করে, তোমার প্রশংসা করে। তুমি তোমার উদ্দেশ্যে সফল হয়েছো। এসব কথা বলে আল্লাহ নির্দেশ দিবেন একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো'।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বললেন, কিয়ামতের দিন একজন মানুষ আরেকজন মানুষের হাত ধরে আল্লাহর সামনে এনে বলবে, হে আল্লাহ! এই লোক আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, তুমি তাকে কেনো হত্যা করেছিলে? লোকটি জবাব দিবে, আমি তাকে হত্যা করেছিলাম যেন প্রভুত্ব আপনারই জন্য নির্দিষ্ট হয় এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাকে হত্যা করেছিলাম। আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, প্রভুত্ব আমারই।

এরপর আরেকজন লোক আরেকটি লোকের হাত ধরে নিয়ে আসবে। আল্লাহর দরবারে আবেদন করবে, হে আল্লাহ! এই লোক আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি কেনো তাকে হত্যা করেছিলে? লোকটি জবাব দিবে, আমি একজনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে হত্যা করেছিলাম। আল্লাহ বলবেন, প্রভুত্ব শুধু আমারই। অন্য কারো প্রভুত্ব নেই। তারপর তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া হবে।

নবী করীম (সাঃ) ঈমানদারদের যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখিত শিক্ষা এবং ধ্যান ধারণা দিলেন। এ সব শিক্ষার কোথাও নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব শিক্ষা মানুষের মন থেকে যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বের প্রতিষ্ঠিত সব ধরণের ধ্যান ধারণা চিন্তা চেতনা মুছে দিয়েছিল। যুদ্ধ করে গণিমতের সম্পদ, বীরত্ব, প্রশংসা ও যুদ্ধের মাধ্যমে ব্যক্তিগত শত্রুতার বা জাতিগত শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ তথা পার্থিব যাবতীয় উদ্দেশ্যই নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছিল। পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধ করা আল্লাহর রাসূল বৈধ করেননি। এসব স্বার্থকে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরে শুধু অবশিষ্ট ছিল, পার্থিব স্বার্থের স্বাদ গন্ধহীন আখেরাতের সেই অদৃশ্য স্বার্থ। এই স্বার্থ অর্জনের জন্য যুদ্ধের ফলে কোনো ধরণের বিশৃংখলা বা মারাত্মক ধ্বংস সাধন হবে এমন চিন্তাই করা যায় না। এমনকি শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলেও তখনই সশস্ত্র জিহাদ করা যাবে, যখন অস্ত্র ধারণ না করলে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হবার নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ কারণে নবী করীম (সাঃ) যুদ্ধকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি নন্দিত জাতি মুসলিমদের শিক্ষা দিয়েছেন, 'শত্রুর সাথে মোকাবেলা যেন করতে না হয় তোমরা এই কামনা করো। মহান আল্লাহ্ পাকের কাছে শান্তির জন্য দোয়া করতে থাকো। কিন্তু যদি শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে তোমরা বাধ্য হও, তাহলে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করো। জেনে রেখো, আল্লাহর জান্নাত অবস্থান করছে তরবারীর ছায়ার নীচে'। সশস্ত্র জিহাদ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শ স্পষ্ট হয়ে গেল। যুদ্ধ অত্যন্ত খারাপ জিনিষ। কারো পক্ষেই যুদ্ধ কামনা করা উচিত নয়। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জানিয়ে দিলেন, যুদ্ধ যেন করতে না হয় আল্লাহর কাছে এমন দোয়া করো। কিন্তু নরপিশাচের দল যদি তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্যই করে, তাহলে তাদের সাথে এমনভাবে যুদ্ধ করবে যেন তারা তাদের অত্যাচারের হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। যে অশান্তি তারা সৃষ্টি করছে, তা যেন আর করতে না পারে। আর এই যুদ্ধ করতে গিয়ে তুমি যদি শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ দাও তাহলে মনে রেখো, শত্রুর ঐ অস্ত্রের নীচেই তোমার জন্য রয়েছে আল্লাহর জান্নাত। অত্যাচারী জালিমের জুলুমকে স্তব্ধ করতে যেয়ে তাদের অস্ত্রের আঘাতের ভয়ে পালিয়ে এসো না।

সশস্ত্র জিহাদের এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ নন্দিত জাতি মুসলিমদের আচরণ যুদ্ধের ময়দানে কি ধরণের ছিল এ সকল বিবরণে ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ। যুদ্ধের ময়দানে শত্রু পক্ষের বুকের ওপর হযরত আলী (রাঃ) উঠে বসেছেন। ক্ষণিকের মধ্যে তিনি তাঁর তীক্ষ্মধার তরবারী শত্রুর বুকে প্রবিষ্ট করাবেন।

পতিত শত্রু আলী (রা:) এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করলো। তিনি শত্রুকে হত্যা না করে ছেড়ে দিলেন। বিস্ময়ে বিমূঢ় শত্রু উঠে দাঁড়িয়ে আলী (রা:) এর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অবাক কণ্ঠে জানতে চাইলো, 'তুমি আমাকে হত্যা না করে মুক্ত করে দিলে যে?' তিনি স্থির শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'তোমাকে আমি হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু যখন তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলে, এরপর যদি তোমাকে আমি হত্যা করতাম আর আল্লাহ যদি আমাকে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করতো, আলী! তোমার মুখে লোকটি থুথু নিক্ষেপ করেছিল, এ কারণে তাকে তুমি হত্যা করেছিলে? আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দিবো! এ কারণে আমি তোমাকে হত্যা না করে মুক্ত করে দিয়েছি।

হযরত আলীর কথা শুনে লোকটি তৎক্ষণাত ইসলাম কবুল করেছিল। থুথু নিক্ষেপের কারণে আলী (রা:) এর মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ জাগতে পারে। এ কারণে তিনি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে হত্যা না করে মুক্ত করে দিলেন। ইসলামের সশস্ত্র জিহাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, ব্যক্তিগত আক্রোশে যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের ময়দানেও ব্যক্তিগত আক্রোশে কাউকে হত্যা করা যাবে না। ইসলামের শত্রুরা যখন যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, তখন নবী করীম (সা:) ঈমানদারদের মধ্যে এভাবেই যুদ্ধের উদ্দেশ্যের পরিশুদ্ধি সাধন করেছিলেন। তাঁরা যুদ্ধের সেই উত্তপ্ত রক্তঝরা ময়দানেও নবীর শিক্ষা বাস্তবায়ন করেছেন। আক্রোশে অন্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা কোনো গর্হিত কাজ করেননি, ইসলামের শিক্ষার বিপরীত কিছুই করেননি। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে এসেছেন, তাঁর বাইরে তাঁরা একটি কদমও নিক্ষেপ করেননি।

রাসূল প্রদর্শিত সশস্ত্র জিহাদের পদ্ধতি

সশস্ত্র জিহাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে নবী করীম (সা:) আল্লাহর পথের সৈনিকদের শিক্ষা দিয়ে এবার শিক্ষা দিলেন যুদ্ধের পদ্ধতিসমূহ। আবহমান কাল থেকে যুদ্ধের ময়দানে যে নিয়ম এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত, মুসলিমদের জন্যে তিনি তার সবকিছুই রহিত করলেন। তদানীন্তন যুগে যুদ্ধ চলাকালে যে সব পৈশাচিক পদ্ধতি বহাল ছিল, তিনি মুসলিম সৈন্যদের জানিয়ে দিলেন, এসব পদ্ধতির কোনো একটিও প্রয়োগ করা যাবেনা। আল্লাহর রাসূল (সা:) শত্রু পক্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।

একভাগ সামরিক এবং আরেকভাগ বেসামরিক। সামরিক লোকদের আওতায় তাদেরকেই আনলেন, যারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, প্রচলিত নীতি অনুযায়ী বা সাধারণ বুদ্ধি বিচারে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সামর্থবান বলে চিহ্নিত হয়। বেসামরিক লোকদের আওতায় আনলেন, যারা প্রচলিত নীতি অনুযায়ী বা সাধারণ বুদ্ধি বিচারে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সামর্থবান বলে চিহ্নিত হয় না। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।

এই শেষোক্ত দলের মধ্যে রয়েছে শান্তি প্রিয় নিরীহ ধরনের লোকজন। ধর্মস্থানের সেবক, সংসারত্যাগী সন্যাসী, ধর্মস্থান, নারী, শিশু, পর্যটক, পাগল, ভিক্ষুক, আহত, বৃদ্ধ, অসুস্থ রোগী, অন্ধ এ ধরণের লোকজনের ওপর আক্রমণ করা যাবে না। আল্লাহর নবী এই শ্রেণীর লোকজনকে হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিলেন। অর্থাৎ যাদের দ্বারা কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা যাবে না। একবার যুদ্ধের ময়দান পরিদশর্ন কালে আল্লাহর নবী এক নারীর মৃতদেহ দেখতে পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'এই নারী তো সামরিক বাহিনীর লোক ছিল না। তাকে হত্যা করা হলো কেনো?' এরপর তিনি যুদ্ধের সিপাহসালার হযরত খালিদ (রা:)কে ডেকে তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিলেন, 'কোনো নারী বা শ্রমিককে হত্যা করা যাবে না'। এই ঘটনার পর থেকে তিনি নারী এবং শিশুদের হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষনা করলেন। সশস্ত্র জিহাদের ময়দান সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ঘোষনা করলেন, কোনো নারী, শিশু বা বৃদ্ধকে হত্যা করো না। গণিমতের সম্পদ (যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে শত্রু বাহিনীর কাছ থেকে যে সম্পদ দখল করা হয়) অপহরণ করো না। যুদ্ধে যা কিছু হস্ত গত হয় তা সব একত্র করো। উত্তম কাজ করো এবং উত্তম আচরণ করো। যারা উত্তম কাজ করে মহান আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন'।

মক্কা বিজয়কালে আল্লাহর নবী স্পষ্ট ভাষায় ঘোষনা করেন, 'কোনো আহত মানুষের ওপরে আক্রমণ করবে না। প্রাণের ভয়ে যারা পালিয়ে যাচ্ছে, এমন মানুষের পেছনে ধাওয়া করা যাবেনা। যারা ঘরের দরোজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছে, তাদের ওপরে আক্রমণ করা যাবে না'।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, 'কোথাও অভিযানে প্রেরণ করার সময় আল্লাহর রাসূল (সা:) সৈন্য বাহিনীকে আদেশ দিতেন, তাঁরা যেন কোনো ধর্মস্থানের নিরীহ সেবকদের ও আশ্রমের তপস্বী বা সাধক সন্যাসীদের হত্যা না করে'। আল্লাহর নবী এই নীতি মুসলিমদের শিক্ষা দিলেন যে, যুদ্ধের

সাথে যারা জড়িত নেই, তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। তাদেরকেই এই শিক্ষা দিলেন, যারা সামান্য কারণে, অহংকার ও ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ শুরু করে প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ করতো। প্রতিপক্ষের নারী, শিশু, রোগী, বৃদ্ধ তথা সকল মানুষকে শেষ করে দিত, তাদের পশু সম্পদ, বৃক্ষরাজিসহ যাবতীয় কিছুই ধ্বংস করে দিত।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যাদের আচরণ নৃশংসতার শেষ পর্যায় অতিক্রম করেছিল, আর ইসলাম গ্রহণের পরে কোরআনের স্পর্শে এসে তাঁরাই যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করেছে, সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য তাদের আচরণ অনুসরণীয় হয়ে রয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করলেন, 'সশস্ত্র জিহাদে সামরিক ব্যক্তিদের ওপরে আক্রমণ করা যাবে বটে কিন্তু সে আক্রমণের ক্ষেত্রেও নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে হবে। অবাধে আক্রমণ করা যাবে না'। সে যুগে আক্রমণের কোনো নিয়ম নীতি ছিল না। রাতের অন্ধকারে বিশেষ করে শেষ রাতে মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকতো, সেই মুহূর্তে তারা হঠাৎ আক্রমণ করতো। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জানিয়ে দিলেন, 'অতর্কিত আক্রমন করা যাবে না। রাতের অন্ধকারে আক্রমন করা যাবেনা। রাতের অন্ধকারে শত্রুপক্ষকে ঘেরাও করে রাখলেও তাদের আক্রমণ করা যাবেনা'। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) খয়বর যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, নবী করীম (সাঃ) শত্রু গোষ্ঠীর কাছে রাতে পৌঁছলেও তিনি সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না।

সে যুগে যুদ্ধের আরেকটি বীভৎস নীতি ছিল যে, তারা আক্রোশে অন্ধ হয়ে প্রতিপক্ষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতো। এই ঘৃণ্য এবং নৃশংস প্রথা নবী করীম (সাঃ) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে বললেন, 'আগুনে পোড়ানের শাস্তি শুধু মাত্র আগুনের যিনি মালিক তিনি ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না'। আগুনে পুড়িয়ে মানুষকে হত্যাই শুধু নয়, কোনো প্রাণীকেও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একবার আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের যুদ্ধে যেতে বললেন। তিনি দু'জন লোকের নাম উল্লেখ করে আদেশ দিলেন, তাদেরকে ধরে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে। আমরা যাত্রা করা মাত্র তিনি আমাদেরকে ডেকে বললেন, 'আমি তোমাদের আদেশ দিয়েছিলাম তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে। কিন্তু আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করো না। আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া শুধু আল্লাহরই শোভা পায়। তোমরা লোক দুটোকে পেলে হত্যা করো'।

হযরত আলী (রাঃ) একবার বেশ কিছু নাস্তিককে ধরে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। এ সংবাদ জেনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁকে ডেকে নবী করীম (সাঃ) এর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'আগুন আল্লাহর শাস্তি। এই আগুন দিয়ে কোনো মানুষকে শাস্তি দিয়োনা'। যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষকে নির্যাতন করে বা বেঁধে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত উবায়েদ ইবনে ইয়ালা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) এর সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমাদের সৈন্যরা শত্রু পক্ষের বারজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলো। হযরত আব্দুর রহমান তাদেরকে বেঁধে হত্যা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এ ঘটনা জেনে তাঁকে বলেছিলেন, আমি শুনেছি নবী করীম (সাঃ) কাউকে বেঁধে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর শপথ! আমি মুরগীও বেঁধে জবাই করতে রাজী নই। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) এ কথা জেনে তাঁর ভুলের কাফ্ফারা স্বরূপ চারজন দাস মুক্ত করেছিলেন'।

সে যুগে যুদ্ধই হত লুটতরাজ করার জন্য। আর নবী করীম (সাঃ) শিক্ষা দিলেন, যুদ্ধের পরে বিজিত অঞ্চলে লুটতরাজ করা যাবে না। খয়বর বিজিত হবার পরে কিছু সংখ্যক মুসলিম সৈন্য ইয়াহূদীদের এলাকায় সম্পদ আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইয়াহূদী গোত্রপতি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে অভিযোগ করে রাগত কণ্ঠে বলেছিল, 'হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! গাধা হত্যা করা, গাছের ফল ভক্ষণ করা আর নারীদের আঘাত করা আপনাদের জন্য কি শোভা পায়?' এ কথা শোনার সাথে সাথে আল্লাহর নবী (সাঃ) হযরত আব্দুর রহমানকে আদেশ করলেন, মুসলিম বাহিনীর সকল সদস্যকে ডাকো'। তিনি 'নামাজের জন্য সমবেত হও' বলে ডাক দিলেন। মুসলিম সৈন্য একত্রিত হলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি গর্বিত হয়ে এ ধারণা করেছে নাকি, আল্লাহর কোরআন যা নিষেধ করেছে এর বাইরে আর কিছু নিষেধ নয়? আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে যে সব উপদেশ এবং আদেশ দিয়ে থাকি, যা নিষেধ করে থাকি, এসবও কোরআনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তোমাদেরকে আহলে কিতাবদের বাড়িতে তাদের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা, তাদের নারীদের আঘাত করা লাঞ্ছিত করা, অনুমতি ব্যতীত তাদের গাছের ফল খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। কারণ তাদের যেসব জিনিষ দেয়া প্রয়োজন ছিল তারা তা দিয়েছে'।

এক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কয়েকজন সদস্য ছাগল ধরে এনে তা জবাই করে রান্না করেছিল। গোস্ত খাবে এমন সময় নবী করীম (সাঃ) জানতে পেরে

সেখানে উপস্থিত হয়ে গোস্তের হাড়ি উল্টিয়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'জোরপূর্বক নিয়ে আসা জিনিষ মৃত প্রাণীর গোস্তের মতই হারাম'। যুদ্ধে জয়ী হয়ে পরাজিত সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে যা পাওয়া যায় তা নিয়মিতভাবে বন্টন করার আগে যদি কেউ গ্রহণ করে তাহলে তা হারাম হবে। কিন্তু বেসামরিক লোকদের কাছ থেকে কোনো কিছু জোর পূর্বক গ্রহণ করা, বিজিত এলাকায় প্রবেশ করে শত্রু দেশের সাধারণ জনগণের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়া আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। লুটের সামান্য একটি রশিও তিনি হারাম করে দিয়েছেন। যে জাতি যুদ্ধই করতো লুটতরাজ করার জন্য, তাঁরাই ইসলামের সশস্ত্র জিহাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজিত এলাকায় এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, শত্রু দেশের জনগণ তাদের পবিত্র চরিত্র এবং সম্পদের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। তাঁরাও অনুভব করেছে, এদের যুদ্ধের লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণকালে ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করা, বৃক্ষ ধ্বংস করা, দেশের সম্পদ ধ্বংস করা, কোনো কিছু আগুনে পুড়িয়ে দেয়া, গণহত্যা করা এসব সে যুগেও যেমন ছিল বর্তমানেও আছে। কিন্তু নবী করীম (সা:) এসব করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এসব কাজকে পবিত্র কোরআন 'ফাসাদ' বা অরাজকতা বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ-

সে যখন শাসক পদে অধিষ্ঠিত হয় তখন পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করা এবং ফসল বিনষ্ট করা ও গণহত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ অরাজকতা সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা বাকারা-২০৫)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) সিরিয়া এবং ইরাকে সৈন্য প্রেরণ করার সময় যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে একথাও ছিল, 'জনপদসমূহ ধ্বংস করা যাবে না। ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করা যাবে না'। অবশ্য সামরিক প্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করে বা পুড়িয়ে ফেলার অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু প্রতিহিংসামূলকভাবে করা যাবে না। সে যুগে মুসলমানগণ বনী নজীর গোত্র অবরোধ করার সময় তা করেছিল। কিন্তু ধ্বংসাত্মক মন-মানসিকতা নিয়ে এসব করা যাবে না। যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের নিহত ব্যক্তির লাশ বিকৃত

করা যাবে না। ইসলাম এ সম্পর্কে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ আনসারী (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (সাঃ) লুটের জিনিষ গ্রহণ করতে এবং লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন'।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন যুদ্ধের জন্য সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করতেন তখন তিনি স্পষ্টভাবে নিষেধ করতেন, 'অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। গণিমতের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না। লাশের বিকৃতি ঘটাবে না'। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিলেন বন্দীদের হত্যা করা যাবে না। অথচ সে যুগে বন্দীদের নির্বিচারে হত্যা করা হত। বর্তমানেও ভিন্ন কৌশলে করা হয়। মক্কা বিজয়ের পরে আল্লাহর নবী যখন মক্কা শহরে প্রবেশ করেন তখন তিনি মুসলিম বাহিনীর প্রতি নির্দেশ জারী করেন, 'আহত মানুষকে আক্রমন করা যাবে না। যে ব্যক্তি পালিয়ে যাচ্ছে তাকে ধাওয়া করা যাবে না। যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা যাবে না। যে ব্যক্তি ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে অবস্থান করবে তার ওপরে হামলা করা যাবে না'।

মুসলিম ইতিহাসের নিষ্ঠুর শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একজন বন্দীকে হত্যা করার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) কে নির্দেশ দিয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে বন্দী হত্যার অনুমতি দেননি। তবে নিদের্শ দিয়েছেন মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দিতে বা ক্ষমা করতে'। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এর কথা ইসলামের সাধারণ নির্দেশের ব্যাপারে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক এবং প্রশাসন অবশ্যই এই ক্ষমতা সংরক্ষণ করে যে, ইসলামের ভয়ংকর শত্রু, মুসলমানদের ওপরে যে ব্যক্তি লোমহর্ষক নির্যাতন করেছে তাকে, চরম বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, ক্ষতিকর ব্যক্তি, দেশের সর্বনাশকারী ইত্যাদী ধরণের লোকদের বন্দী করে হত্যা করা যেতে পারে। নবী করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধের বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দিয়েছিলেন কিন্তু উকবা ইবনে আবু মুইয়িতকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ইসলামী সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা আপোষহীনভাবে গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মিত্র শক্তিবর্গ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে প্রহসন চালিয়েছিল ইসলামী সরকারের সে প্রহসন চালানোর অবকাশ নেই।

তদানীন্তন যুগে দূত হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করতো না। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) প্রতিপক্ষের দূত বা প্রতিনিধিকে হত্যা করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। সে যুগে মিথ্যা নবীর দাবীদার জাহান্নামি মুসাইলামার পক্ষ থেকে উবাদা ইবনে হারিস দরবারে রেসালাতে এমন এক নিকৃষ্ট বাণী নিয়ে আগমন

করেছিল, যার মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের সম্মানের প্রতি আঘাত করা হয়েছিল। নবী করীম (সা:) তাকে বলেছিলেন, 'দূত হত্যা করা যদি হারাম না হত তাহলে আমি তোমার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করতাম'। নবী করীম (সা:) নির্দেশ দিলেন, প্রতিপক্ষের সাথে চুক্তি করে তা লংঘন করা যাবে না। প্রতিপক্ষের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা, বিশ্বাস ঘাতকতা করা, চুক্তিবদ্ধদের সাথে অশোভন আচরণ করা স্পষ্ট হারাম ঘোষনা করলেন। তিনি আরো ঘোষনা করলেন, 'চুক্তিবদ্ধ মানুষকে হত্যা করবে সে জান্নাতের গন্ধও পাবেনা। পক্ষান্তরে জান্নাতের গন্ধ ৪০ বছরের পথের দুরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে'। নবী করীম (সা:) ঘোষনা করলেন, 'চারটি খারাপ গুণ এমন যে, যার ভেতরে তা দেখা যাবে সে সম্পূর্ণ মুনাফিক হয়ে যাবে। সে খারাপ গুণগুলো হচ্ছে, যখন কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে। যখন অঙ্গীকার করবে তখন তা ভঙ্গ করবে। যখন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে তখন তা লংঘন করবে। যখন ঝগড়া করবে তখন অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করবে'।

বিশ্বাসঘাতক এবং চুক্তি ভঙ্গকারীদের সম্পর্কে নবী করীম (সা:) ঘোষনা করলেন, 'কিয়ামতের দিন প্রতিটি বিশ্বাসঘাতক এবং চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য একটি পতাকা থাকবে যা তার কর্ম ফলের প্রতীক হিসাবেই চিহ্নিত হবে। মনে রেখো, যে জননেতা বিশ্বাসঘাতক হয় তার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর কেউ হতে পারে না'। রোম সাম্রাজ্যের ওপরে হযরত মুয়াবিয়া (রা:) একবার আক্রমন করতে যাচ্ছিলেন। অথচ তাঁর সাথে রোমের চুক্তি বহাল ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথেই আক্রমন করবেন। কিন্তু আমর ইবনে আম্বাছা (রা:) সন্ধির মেয়াদকালে যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং রোমের দিকে বাহিনী প্রেরণকে চুক্তি ভঙ্গ হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা:) কে বললেন, 'সর্বনাশ! আপনি এটা কি করতে যাচ্ছেন? চুক্তি মেনে চলুন!' মুয়াবিয়া (রা:) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এমন করছেন কেনো, কি হয়েছে?' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি, 'যাদের সাথে কোনো জাতির চুক্তি থাকবে তাদের উচিত চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিতে পরিবর্তন না করা। যদি প্রতিপক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা থাকে তাহলে সমতা বজায় রেখে চুক্তি শেষ হবার কথা জানানো উচিত'।

সে যুগে যোদ্ধাদের নীতি ছিল, তারা যে পথ দিয়ে যেতো সে পথে যাকে পেত তাকেই উত্যক্ত করতো। যে এলাকায় শিবির স্থাপন করতো সেখানে এমন এক বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করতো যে, পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর জীবন

ধারণ অতিষ্ঠ করে তুলতো। যেখানে সেখানে শিবির স্থাপন করে মানুষের চলাফেরা বন্ধ করে দিত। আল্লাহর রাসূল (সা:) একবার ঈমানদারদের সাথে নিয়ে অভিযানে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে সংবাদ এলো, মুসলিম সৈন্যদের কিছু লোকজন এমন বিশৃংখলার সৃষ্টি করেছে যে, মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। সাথে সাথে তিনি ঘোষনা করলেন, 'যে ব্যক্তি স্থানীয় বেসামরিক লোকদের বিরক্ত করবে অথবা পথিকদের সম্পদ লুট করবে তার জিহাদ হবে না। তোমাদের এভাবে বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়া শয়তানের মত কাজ'। রাসূলের এই আদেশের পর থেকে মুসলিম বাহিনীতে এমন সুশৃংখল অবস্থা বিরাজ করতো, তাঁরা কোনো স্থানে শিবির স্থাপন করলে তাদের সংঘবদ্ধতার কারণে মনে হত যে, একটি চাদর বিস্তার করলে তার নীচে সবাই চলে আসবে। সে যুগে যুদ্ধের ব্যাপারে আরেকটি নীতি ছিল, সমগ্র বাহিনী মহা-শোরগোল সৃষ্টি করে পথ অতিক্রম করতো এবং যুদ্ধের ময়দানে নিজের খ্যাতি, বীরত্ব প্রকাশ ও শত্রুর প্রতি অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে গালি দিত। মুসলিম বাহিনী এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে ইচ্ছুক হলে নবী করীম (সা:) তা নিষিদ্ধ করে বললেন, 'কোনো অবস্থাতেই অহংকার প্রকাশ করা যাবেনা। এমন কথাও বলা যাবে না যে কথায় অহংকার প্রকাশ পায়। অবশ্য ইসলাম নিয়ে গৌরব প্রকাশ করা যেতে পারে। কোনো অশালীন ভাষা উচ্চারণ করা যাবেনা'।

হযরত আবু মুসা আসয়ারী (রা:) বলেন, আমরা নবী করীম (সা:) এর সাথে অভিযানে বের হতাম। কোনো স্থানে পৌঁছলে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহর নাম নিতাম। এ অবস্থা দেখে আল্লাহর নবী নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা ধীর স্থিরভাবে চলবে। মধ্যম স্বরে আল্লাহকে ডাকবে। কারণ যাঁকে তোমরা ডাকছো তিনি বধির নন এবং অনুপস্থিতও নন। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন অতি কাছেই আছেন'। নবী করীম (সা:) যখন অভিযানে বাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন সে বাহিনীকে বলতেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে যাত্রা আরম্ভ করো। আল্লাহকে যারা স্বীকৃতি দেয় না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কিন্তু যুদ্ধে কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎ করো না। লাশ বিকৃত করো না। শিশুকে হত্যা করো না'। এরপর তিনি বলতেন, 'শত্রুর সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করবে। ইসলাম গ্রহণ, জিজিয়া প্রদান ও যুদ্ধ। যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কিছুই বলো না। যদি জিজিয়া প্রদান করতে সম্মত হয় তাহলে তাদের

ওপর হস্তক্ষেপ করো না। এ দুটোর কোনটিই যদি না করে তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে যুদ্ধ করবে'।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের সময় যখন সিরিয়াতে অভিযান চালিয়েছিলেন তখন তাঁর বাহিনীকে আদেশ করেছিলেন, 'নারী শিশু ও বৃদ্ধদের কেউ যেন হত্যা না করে, লাশ বিকৃত করা না হয়। সন্যাসী ও তপস্যাকারীর কোনো অসুবিধা করা না হয় এবং কোনো ধর্মস্থান ভাঙ্গা না হয়। ফসলের ক্ষেতের কেউ যেন ক্ষতি না করে এবং ফলবান গাছ কেউ না কাটে। ফসলের ক্ষেত আগুনে জ্বালানো না হয়। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জনবসতির মধ্যে আতংক ছড়িয়ে সে জনবসতী শুন্য করা না হয়। যুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে না এমন পশু-প্রাণীকে হত্যা করা না হয়। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা না হয়। যারা আনুগত্য স্বীকার করবে, তাদের প্রাণ ও সম্পদ মুসলমানের প্রাণ ও সম্পদের মতই নিরাপত্তা দিতে হবে। যুদ্ধের ময়দান থেকে যেন পালানো না হয়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎ করা না হয়'।

সংক্ষেপে এটাই হলো নন্দিত জাতি মুসলিমদের সশস্ত্র জিহাদের অবয়ব। ইসলামে সশস্ত্র জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি এবং কেনো সশস্ত্র জিহাদ করতে হয় তা স্পষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহর নবীর সশস্ত্র জিহাদের পদ্ধতি কি ছিল সেটাও স্পষ্ট হয়ে গেল। অথচ ইউরোপের যারা ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে সমালোচনা করেন, তারা মাত্র কিছুদিন পূর্বেও অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামঝি সময়েও জানতেন না যে, কোনো বাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণের পূর্বে তাকে নানা ধরণের আদেশ নিষেধ দিতে হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর রাসূল সেই সপ্তম শতাব্দীতেই এই নীতি উদ্ভাবন করেছিলেন। পৃথিবীর সমগ্র জাতির যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি যা ছিল এবং বর্তমানেও বহাল আছে, এসবের বিপরীত উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি আল্লাহর রাসূল দান করেছেন এবং বাস্তবে তা করেও দেখিয়েছেন। আর এমন এক জাতির মাধ্যমে তিনি তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন, যাদের কাছে ছিল না নিয়ম নীতির বিন্দুমাত্র চিহ্ন। যুদ্ধই ছিল যাদের জীবিকা নির্বাহের সর্বোত্তম মাধ্যম। অপরের সম্পদ লুট করে নেয়ার মধ্যে যারা গৌরব বোধ করতো। নারী শিশু অসহায় বৃদ্ধদের হত্যা করে যারা পৈশাচিক আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করতো। তাদের মাধ্যমেই আল্লাহর রাসূল মানুষের কল্পনার অতীত নিয়ম নীতি বাস্তবায়ন করেছিলেন।

নন্দিত আদর্শ ইসলামের সশস্ত্র জিহাদ নীতি অধ্যয়ন করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর রাসূল যুদ্ধকে যাবতীয় নারকীয়তা ও পৈশাচিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। সে যুগে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছিল

যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য নীতি বা অংশ। হৈ চৈ শোরগোল গালাগালি সহকারে যুদ্ধ করা, সৈন্যদের অরাজকতা বিশৃংখলা, সেনাপতির আদেশ অমান্য করা, চুক্তিভঙ্গ ও অঙ্গীকার রক্ষা না করা, লুটতরাজ ও যুদ্ধবন্দীদের হত্যা, চুক্তিবদ্ধদের হত্যা, দূত হত্যা, আহতদের হত্যা, বেসামরিক লোকদের হত্যা, লাশ বিকৃত ও লাশের অবমাননা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, রাহাজানি করা, ফসল বৃক্ষ তরু লতা ধ্বংস করা, যুদ্ধরত নয় এমন জনপদের ক্ষতি সাধন করা এ সবই নিষিদ্ধ করা হলো। যুদ্ধের একমাত্র পরিচয় অবশিষ্ট থাকলো, একজন বীর সৈনিক দুশমনের সবচেয়ে কম ক্ষতি সাধন পূর্বক তার পক্ষ থেকে অকল্যাণ বা ক্ষতিরোধ করে যে কাজের মাধ্যম, তাই হলো যুদ্ধ। নবী করীম (সাঃ) এর দশ বছরের সামরিক জীবনে তিনি প্রায় ত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকার শাসক ছিলেন। এই বিশাল এলাকা তাঁর নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসার জন্য মুসলিম বাহিনী প্রতিপক্ষের মাত্র ২৫১ জনকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর পক্ষে শাহাদাতবরণ করেছিলেন মাত্র ১২০ জন মুজাহিদ।

পৃথিবীর ইতিহাসে সন্ধান করলেও মানুষের প্রাণের প্রতি এমন নির্মল সম্মান প্রদর্শনের একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যুদ্ধ তো অনেক দূরের ব্যাপার, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে নিজের স্বৈরাচারী শাসন টিকিয়ে রাখার জন্যে পুলিশ বাহিনীকে দিয়েই শাসকগণ মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে হাজার হাজার নিরীহ জনগণকে হত্যা করছে। রাজনৈতিক কর্মসূচী পালনের নামে তারা অসংখ্য নারী, শিশু, বৃদ্ধকে মৃত্যু গহ্বরের দিকে নিক্ষেপ করছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির যুদ্ধের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে বা তাদের দাঙ্গা মারামারির ঘটনা পত্রিকার পাতায় পাঠ করলে ঘৃণায় দেহ-মন কুঞ্চিত হয়ে যায়।

ইসলামে জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য অর্জনের জন্য চূড়ান্ত মাত্রায় শ্রমদান, কষ্ট স্বীকার নিজের যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য নিঃশেষে প্রয়োগ করাই হলো জিহাদ শব্দের মূল তাৎপর্য। ঈমানদার ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যেই হলো আল্লাহর যমীন থেকে যাবতীয় প্রভুত্ব উৎখাত করে আল্লাহ তা'য়ালার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই হলো জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে তাঁর দেয়া বিধানের আনুগত্য করা, তাঁর রাসূলকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর আনিত বিধানের অধীনতা স্বীকার করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ শর্তহীনভাবে

অকুণ্ঠিত চিত্তে অনুসরণ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই হলো মুসলিম ব্যক্তির জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোনো প্রতিবন্ধক ও পরিপন্থী শক্তির মোকাবেলা করে দীর্ঘ মেয়াদী সংগ্রাম ও প্রাণান্তকর কষ্ট স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে হবে। হতে পারে তা বোধ-বিশ্বাসের, ইবাদাত-বন্দেগীর, অর্থ উপার্জনের, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের, চরিত্র গঠনের এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই ধরনের চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রাখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে জিহাদ করাকেই বলা হয় নফ্সের সাথে জিহাদ। এই নফ্সের সাথে যে ব্যক্তি জিহাদ করতে অক্ষম, তারপক্ষে জিহাদে আকবর তথা বাতিল শক্তির সাথে রক্তঝরা ময়দানে জিহাদ করা সম্ভব নয়।

মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পরিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনে আল্লাহ তা'য়ালার একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই হলো জিহাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, এই জিহাদ করা প্রতিটি সচেতন মুসলিম ব্যক্তির জন্যই অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই কঠিন কাজ সমাধা করা একক বক্তির পক্ষে অসম্ভব। পবিত্র কোরআনে ইসলাম বিরোধী যাবতীয় মতবাদ, মতাদর্শ, চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস, ঐতিহ্য-প্রথাকে 'ফিতনা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ফিতনাকে উৎখাত করার উদ্দেশে জিহাদ করা মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য একান্ত কর্তব্য বলে কোরআন ঘোষণা করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ-

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না অরাজকতা ও বিশৃংখলা দূরীভূত হয় এবং আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয় ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। (সূরা বাকারাহ-১৯৩)

মুসলমানদের পরস্পরের সাথে অথবা অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে যাবতীয় সম্পর্ক নির্ধারণের প্রধান অবলম্বন জিহাদ। মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণের আদেশ দেয়াও জিহাদ। অমুসলিমদের কাছে ইসলামের শাশ্বত বাণী পৌঁছানো, ঈমান আনয়নের জন্য তাদেরকে উৎসাহ দেয়াও জিহাদ। মানবীয় প্রভুত্বমূলক শক্তি-ক্ষমতা, শাসন, নিয়ম পদ্ধতি ও বিধান উৎখাত করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করাও জিহাদ। আর চূড়ান্ত পর্যায়ের জিহাদ হলো অত্যাচারিত বিশ্বমানবতাকে মানবীয় প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বজনিত যাবতীয় নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ বঞ্চনার ষ্টীম রোলার থেকে মুক্তি দেয়া। পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালার গোলামী করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাও জিহাদ। আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, আল্লাহকে যারা একমাত্র রব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে আর এ কারণে যারা নির্যাতিত হচ্ছে, তাদের জন্য তোমরা অবশ্যই যুদ্ধ করবে। নির্যাতিত ব্যক্তিদের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করার জন্য নন্দিত জাতি মুসলিমদের চূড়ান্ত জিহাদে অবতীর্ণ হতে আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا–

কি অজুহাত থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেসব নারী, পুরুষ, শিশু বৃদ্ধদের জন্য সংগ্রাম করবে না, যারা শক্তিহীন হবার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে, অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে, নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং এ কথা বলে আবেদন করছে যে, আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে উদ্ধার করো, অথবা তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্য এমন সাহায্যকারী বন্ধু পাঠিয়ে দাও যিনি আমাদেরকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিবে। (সূরা নিছা-৭৫)

বিশ্বের যে কোনস্থানে মুসলমান অত্যাচারিত হতে থাকে আর অন্যান্য মুসলমানরা নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করবে এটা এক অসম্ভব বিষয়। ঐ সকল মুসলিম শাসকদের আল্লাহর দরবারে জবাবদীহী করতে হবে, যারা মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন দেখেও বোবার মতই নীরব থাকে। অত্যাচারিতদের সাহায্যে যথাযথ ভূমিকা পালন করা জিহাদের অন্যতম লক্ষ্য। মুসলমানদের তাদের নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ও তাদের ওপরে আক্রমণ করা হলে সেখানে জিহাদ করতে হবে। পৃথিবীতে নানা ধরনের মত পথ আবিষ্কার করে যারা অশান্তি সৃষ্টি করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ-

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না অরাজকতা ও বিশৃংখলা দূরীভূত হয় এবং আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয় ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। (সূরা আনফাল-৩৯)

শয়তান কর্তৃক প্রবর্তিত আদর্শ সম্পূর্ণ উৎখাত করে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত না পর্যন্ত জিহাদ পরিচালিত করতে হবে। মুসলমানরা অমুসলিমদের সাথে যদি কোনো বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ থাকে, আর সে চুক্তি অমুসলিমরা বাতিল করে যদি অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করতে হবে। প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতা যারা করবে তাদের বিরুদ্ধেও সংগঠিত মুসলিম জনগোষ্ঠী জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

জিহাদে নিয়োজিত হবার শর্তাবলী

জিহাদ করা যাদের ওপরে অবশ্য কর্তব্য, তাদেরকে সর্বপ্রথমে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ যে জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সে জিহাদে আত্মনিয়োগ করবে, সে বিধান সম্পর্কে যদি জিহাদকারীর কোনো ধারণাই না থাকে, তাহলে তাঁর জিহাদে শিথিলতা আসতে বাধ্য। কেননা মানুষ যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে, উক্ত কাজ সম্পর্কে তাকে অবশ্যই পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হয়। মূল কাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করে কাজ শুরু করলে সে কাজে সফলতা আশা করা বৃথা। এ জন্য জিহাদকারীকে সর্বপ্রথমে আল্লাহর ওপরে ঈমান আনতে হবে এবং দ্বিতীয়ত তাকে রাসূলের আনুগত্য করতে হবে ও তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করতে হবে। জিহাদকারী জিহাদ করবে ইসলামের বিপরীত শক্তির সাথে। ইসলামের বিপরীত শক্তি কি, তা কত প্রকার, কোন্ ধরনের অবয়বে সে শক্তি ঈমানের ওপরে আক্রমণ করে, এই শক্তির উৎসমূল কি, কারা এই শক্তির বিস্তৃতি ঘটাতে মদদ যোগায়, এসব বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জিহাদকারীকে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। জিহাদকারীর যদি জানাই না থাকে, সে কোন্ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করছে, তাহলে সে জিহাদ করবে কিভাবে? ইসলামের বিপরীত বাতিল শক্তি সম্পর্কে আল্লাহর পথের সৈনিকদের ঐ

পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যে জ্ঞান তার কাছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী নোংরা সভ্যতা ও অন্যান্য জাহিলিয়াতের পরিচয় প্রকাশ করবে।

জিহাদকারী তাঁর জীবন বিধান ইসলাম সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জন করবে, এ জ্ঞান হতে হবে সম্পূর্ণরূপে নির্ভূল এবং যে কোনো ধরনের সংশয় ও অস্পষ্টতা মুক্ত। একজন ব্যক্তি আল্লাহর পথের জিহাদকারী হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিবে আবার বিপদ দেখলে আল্লাহর কাছে সাহায্য না চেয়ে অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য ধর্ণা দিবে, এটা যুক্তিযুক্ত নয়। ঈমানদার ময়দানে যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সংগ্রাম করে বিপদের মুখোমুখি হয় তখন আল্লাহ তা'য়ালা নীরব থাকেন না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيرًا–

মুমীনদের শত্রুগণ আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত সুতরাং মুমীনদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা নিছা-৪৫)

এ জন্য জিহাদকারীর ঈমানে কোনো ধরনের জড়তা ও সংশয় থাকলে তার পক্ষে জিহাদ করা সম্ভব নয়। যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা হচ্ছে, সে আদর্শ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান তাকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে। সেই সাথে তাকে ইসলামের বিপরীত আদর্শ সম্পর্কেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যেন কুফুরী শক্তির বাহ্যিক প্রকাশমান চাকচিক্য ঈমানদারকে প্রতারিত করতে সক্ষম না হয়। ইসলামের বিপরীত আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা ঈমানদারদের জন্য চরম ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করে।

ইসলাম অচেতন মুসলিম সৃষ্টি করার জন্য আগমন করেনি, মানুষকে সচেতন করার জন্যই আগমন করেছে। জ্ঞান অর্জন করা ইসলাম মুসলিম নারী-পুরুষের প্রতি ফরজ করেছে। কলুর বলদের চোখে যেমন ঠুলি পরিয়ে এক দিকেই ঘুরানো হয়, ইসলাম তেমন কলুর বলদ সৃষ্টি করতে চায় না। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা হলো না, আর শয়তান দাড়ি টুপি লাগিয়ে বিছমিল্লাহ বলে ঈমানের গলায় ছুরি চালিয়ে দিল, ঈমানদার বুঝলো না যে তার ঈমান শেষ হয়ে গিয়েছে, এমন অচেতন ঈমানদার জিহাদ করার উপযুক্ত নয়।

ঈমানদারকে পত্র-পত্রিকা পাঠ ও রেডিও-টিভির সংবাদ জানতে হবে, ইসলামের বিপরিত আদর্শ সম্পর্কে সাধ্যানুসারে অধ্যয়ন করতে হবে, কুফুরী শক্তি কোন্ কোন্ ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রাণ

প্রিয় আদর্শ ইসলামকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আক্রমণ করতে পারে, এসব দিক সম্পর্কে ঈমানদারকে অবশ্যই ধারণা অর্জন করতে হবে। তবে ইসলামের বিপরীত আদর্শ সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করা আল্লাহর পথের প্রতিটি সৈনিকের জন্য অবশ্য কর্তব্য নয় এবং সে ধরনের জ্ঞান অর্জন করা সবার পক্ষে সম্ভবও নয়। এই ধরনের জ্ঞান তাদেরকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে, যারা নেতৃত্বের আসনে আসীন। জিহাদকারীদের নেতৃত্বের ঝাণ্ডা যাদের হাতে রয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনা, মতবাদ-মতাদর্শ, আদর্শ সম্পর্কে পরিপূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। নতুবা তার পক্ষে জিহাদকারীদের ওপরে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব নয়।

জিহাদের স্তরসমূহ

সশস্ত্র জিহাদ হলো জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়। একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অস্ত্র আর শক্তির ওপরই নির্ভর করা হয় না। বিশেষ করে ইসলামী আদর্শের ক্ষেত্রে এ কথা মোটেও প্রযোজ্য নয়। ইসলাম পৃথিবীতে কোথাও শক্তির মাধ্যমে প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছে তার অনুপম আদর্শিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে। এ জন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা অবিরাম চেষ্টায় নিয়োজিত, তাঁদেরকে এ কথা জানতে হবে যে, কোন্ কোন্ পথে কিভাবে জিহাদ করতে হয় এবং এই জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তৃতি ও আন্দোলনের প্রভাবে জনগণকে প্রভাবিত করা যায়। প্রতিটি মানুষের ভেতরেই নফ্‌স রয়েছে। এই নফ্‌স অত্যন্ত শক্তিশালী এবং মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো এই নফ্‌সকে মহান আল্লাহর গোলামে পরিণত করা। কেননা এই নফ্‌স মানুষকে আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথে পরিচালিত করতে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ–

নিশ্চয়ই নফ্‌স নিশ্চিতভাবে অন্যায়, গর্হিত কর্ম সম্পাদন করতে আদেশ করে। (সূরা ইউসুফ-৫৩)

যারা আল্লাহর পথের সৈনিক হিসেবে কাজ করবে তাদেরকে সর্বপ্রথমে এই নফ্‌সকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করতে হবে। নবী করীম (সাঃ) বলেন,

'তোমাদের মধ্যে কেউ-ই প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার মন-মানসিকতা, হৃদয়-অন্তর আমার নিয়ে আসা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের অধীন না হবে'। (বোখারী)

এই নফ্সের সাথে মানুষকে সময়ের প্রতিটি মূহূর্তে সংগ্রাম করতে হয়। জীবনের প্রতিটি বাঁকে এই নফ্স মানুষকে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের অপছন্দনীয় পথের দিকে লোভনীয় ভঙ্গীতে হাতছানি দিতে থাকে। এ জন্য এই নফ্সের সাথে সংগ্রাম করে যারা বিজয়ী হবে, নফ্সকে যারা আল্লাহর গোলামে পরিণত করতে সক্ষম হবে, সে ব্যক্তি একজন মুজাহিদ হিসেবে পরিগণিত হবে। নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নফ্সকে আল্লাহর অনুগত বানানোর লক্ষ্যে জিহাদ করলো সে একজন প্রকৃত মুজাহিদ। (মুসনাদে আহমদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কর্মী সর্বপ্রথম নিজেকে সেই চরিত্রের অলঙ্কারে সজ্জিত করবেন, যে চরিত্র নবী করীম (সাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। ঈমানদারের চিত্তাকর্ষক আকর্ষণীয় অনুপম চরিত্র মাধুর্যে কেউ যদি মুগ্ধ হয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, তাহলে এটাও জিহাদ বলে পরিগণিত হবে। ঈমানদার তার প্রতিবেশীকে, চাকুরী ক্ষেত্রে সহকর্মীকে তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য দিয়ে মুগ্ধ করবেন, কর্মনিষ্ঠা দিয়ে, আমানতদারীর মাধ্যম্যে, অধিকার দানের মাধ্যমে তাঁর আদর্শের প্রতি, দলের প্রতি আকৃষ্ট করবেন। এসব কাজও জিহাদের মর্যাদা অর্জন করবে।

এ আন্দোলনের কর্মী নিজের নফ্সকে আল্লাহর বিধানের অনুগত বানানোর পর তার প্রথম কর্তব্য হবে তার বাইরের পরিবেশকে আল্লাহ তা'য়ালার বিধানের অনুগত বানানোর জন্য জিহাদ করা। আর এই বাইরের পরিবেশের মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে তার পরিবার এবং পরিবারের সদস্যবৃন্দ। নিজের নফ্সকে আল্লাহর বিধানের অনুগত বানানোর পর আন্দোলনের কর্মীর প্রথম কাজ হলো সে তার পরিবারের সদস্যদেরকে আল্লাহর বিধানের অনুগত হিসেবে গড়ে তুলবে যেন তারা পরকালে নিজেদেরকে আল্লাহর জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا–

হে ঈমানরগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। (সূরা তাহরীম-৬)

এরপর ইসলামী আন্দোলনের কর্মী বৃহত্তম সমাজ-পরিবেশকে আল্লাহর বিধানের অনুগত বানানোর জন্য জিহাদ করবে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে নানা ধরনের বাধা বিপত্তির মোকাবেলা করতে হয়। এ দায়িত্ব পালন করা বড় ধরনের জিহাদ। এই জিহাদ কিভাবে পালন করা যেতে পারে এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের যে কেউ আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোনো কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখতে পাবে সে যেন তা তার হাতের শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেয়। যদি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে মুখ দিয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলবে। তাতেও যদি সমর্থ না হয় তাহলে অন্তর দিয়ে ঐ ঘৃণ্য কাজের বিরোধিতা করতে হবে। (বোখারী, মুসলিম)

ক্রেতা-বিক্রেতা সততা প্রদর্শনের মাধ্যমে জিহাদ করবে, শ্রমিক তাঁর কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে জিহাদ করবে, ছাত্র তার কর্তব্য পালনের মাধ্যমে জিহাদ করবে, শিক্ষক তার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জিহাদ করবে অর্থাৎ ঈমানদার যেখানে যে অবস্থানে অবস্থান করছেন, তার সে অবস্থান থেকেই জিহাদ করে যাবেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্যই হবে এটা যে, সে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করবে। কিভাবে সে আকৃষ্ট করবে, এ কৌশল তার অবস্থানে থেকে তাকেই আবিষ্কার করতে হবে। এ ব্যাপারে তার মেধা ও চিন্তা শক্তিকে সে প্রয়োগ করবে। মসজিদের ইমাম কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে মানুষকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট করবেন, এ কৌশল পরিস্থিতি যাচাই করে তাকেই নির্ধারণ করতে হবে। আল্লাহর দেয়া মেধা ও চিন্তা শক্তি নিষ্ক্রিয় করে রাখা যাবে না। কেউ যদি তার সাধ্যানুযায়ী মেধা ও চিন্তা শক্তিকে প্রয়োগ না করে, তাহলে আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে।

ঈমানদার যে অবস্থানেই থাকবে, সে অবস্থান থেকেই ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ভূমিকা পালন করবে, তার এই ভূমিকাও জিহাদ বলে বিবেচিত হবে। একজন লেখক তাঁর লেখনীর মাধ্যমে জিহাদ করবেন। বক্তা তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে জিহাদ করবেন। ব্যবসায়ী তাঁর ব্যবসার মাধ্যমে জিহাদ করবেন। সংসদ সদস্য সবর্ত্র ইসলামের পক্ষে ভূমিকা পালন করে জিহাদ করবেন। ইসলামকে উচ্চে তুলে ধরার লক্ষ্যে একজন ঈমানদার সামান্যতম সুযোগও হেলায় হারাবেন না। সুযোগ এলেই তিনি আল্লাহর বিধানের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবেন। মুখের কথা দিয়ে যেখানে ইসলামের বিপরীত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায়, সেখানে তাই করতে হবে। যেখানে শক্তি প্রয়োগ করার পরিস্থিতি বিরাজিত, সেখানে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। যেখানে ইসলামের বিপরীত কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে মুখ দিয়ে

প্রতিবাদ করার পরিবেশ যদি না থাকে, তাহলে সে কাজের প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করতে হবে এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ কিভাবে উৎখাত করা যায়, এ ব্যাপারে জনমত গঠনে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

জিহাদের প্রতিটি দিক চিহ্নিত করে দেয়া যায় না। ঈমানদার ব্যক্তি যখন জিহাদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে, ইসলামের বিপরীত কর্মকাণ্ড বন্ধ করার ব্যাপারে মেধা ও চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে, তখন তার সামনে জিহাদের বিস্তীর্ণ অঙ্গন উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ঈমানদার স্বয়ং অনুভব করে, কোন্ পথে কিভাবে তাকে জিহাদ করতে হবে। চোখ দুটো যদি আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে যায়, তখন এই চোখ দিয়ে যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, সেদিকেই সে জিহাদের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখতে পাবে। কান দুটো যখন ইসলামের অলঙ্কারে সজ্জিত হবে, তখন এই কানে ইসলামের বিপরীত কিছু প্রবেশ করলে কানে জ্বালা শুরু হবে। ঈমানদারের মন-মানসিকতা গোটা পরিবেশের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। এই বিরোধী পরিবেশকে নিজের আদর্শের অনুকূলে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা বা জিহাদে সে আত্মনিয়োগ করবে। ব্যক্তি তার অবস্থানে থেকে যোগ্যতানুযায়ী জিহাদ করবে। অবশেষে সংঘবদ্ধ শক্তি তথা ইসলামী আন্দোলন যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, তখন যদি প্রয়োজন হয় অস্ত্র ধারণ করার, অস্ত্র ধারণ করতে হবে। আর এটাই হলো জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়।

ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদ করতে হবে

যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে প্রস্তুত তাদের মধ্যে অবশ্যই তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, জিহাদকারীর মধ্যে এই চেতনা ও দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে যে, সে আল্লাহর পথেই সংগ্রাম করছে। তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত এমন পথে পরিচালিত হচ্ছে না, যে পথ আল্লাহর নয়। আল্লাহর পথ সে চিনতে ভুল করেছে কিনা, এ ব্যাপারে তার সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। সঠিক পথ কোনটি, এটা চিনতে ভুল করলে শয়তান তাকে এমন পথে পরিচালিত করবে যে, তার কাছে মনে হবে এটাই আল্লাহর পথ। প্রকৃত পক্ষে সেটা শয়তানের পথ।

আল্লাহর পথের সৈনিক জিহাদকারীর দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, তাহলো তারা উচ্ছৃংখল হবে না বরং আনুগত্য পরায়ণ হবে। সংগঠনের

নিয়ম-নীতির বিপরীত পথে তারা অগ্রসর হবে না। এমন কোনো কাজে তারা জড়িয়ে পড়বে না, যে কাজের দরুন সংগঠন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অনিয়মতান্ত্রিকতায় এরা বিশ্বাসও করবে না এবং অনিয়মতান্ত্রিকতাকে তারা প্রশ্রয়ও দিবে না। এরা অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে ও সুদৃঢ় সাংগঠনিকতা সুসংবদ্ধতা ও নিয়মানুগত্যতা সহকারে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করবে। সহযাত্রীর সাথে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে আল্লাহ ও রাসূল প্রদর্শিত পথে সে মতানৈক্য দূর করবে।

জিহাদকারী তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে, তাহলো এরা প্রতিপক্ষের তথা ইসলামের দুশমনদের মোকাবেলায় ইস্পাত-কঠিন প্রাচীরের মতই দুর্ভেদ্য হবে। বাতিল শক্তি শত-সহস্র বার আঘাত করে, প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারবে না। প্রয়োজনে এরা শাহাদাত বরণ করবে কিন্তু বাতিল শক্তির কাছে মাথানত করবে না। এই ধরনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ–

আল্লাহ তা'য়ালা তো ভালোবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে সংগ্রাম করে যেন তারা ইস্পাত নির্মিত প্রাচীর। (সূরা আস্ সফ-৪)

একতাবদ্ধ হয়ে সংগঠনের মাধ্যমে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করবে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে তাদের মধ্যে অবশ্যই ঐকান্তিক অনুরাগ থাকতে হবে। লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ় ইচ্ছা বা সঙ্কল্পই সংগঠনের প্রতিটি নেতা-কর্মীকে আত্মদান ও জীবন কোরবান করার দুর্জয় আবেগে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে। এ কারণেই তারা প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় ইস্পাত কঠিন দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে অবিচল ও অটল হয়ে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকতে সক্ষম। আল্লাহর পথে জিহাদকারী সৈনিকদের ভেতরে নৈতিক চরিত্রের উন্নতমান থাকা একান্তই অপরিহার্য। ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনের নেতা-কর্মী চারিত্রিক মান থেকে নিচে অবস্থান করলে তাদের কারো মধ্যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা এবং সহমর্মিতা সৃষ্টি হবে না। কেউ কাউকে ভালোবাসবে না, একে অপরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে এবং ফলশ্রুতিতে কোন্দল সৃষ্টি হবে। আর এই কোন্দলই লক্ষ্য অর্জনের পথে বিরাট বাধার বিন্ধ্যাচল তুলে দিবে। আল্লাহর পথে জিহাদকারী প্রতিটি

ব্যক্তিকে নিষ্ঠাবান হতে হবে এবং পরস্পরের প্রতি গভীর আস্থা থাকতে হবে। নিষ্ঠা না থাকলে ইসলামী সংগঠনের কর্মসূচী সুচারুরূপে বাস্তবায়িত হতে পারে না। জিহাদকারী প্রতিটি ব্যক্তির আকিদা বিশ্বাস একই সূত্রে গ্রথিত থাকবে আর এই বিষয়টিই প্রতিটি ঈমানদারকে ঐকমত্য ও ঐক্যবদ্ধ রাখে। এসব বিষয়ে যারা পূর্ণ ও সজাগ দৃষ্টি রেখে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, মহান আল্লাহ তাদেরকেই ভালোবাসেন এবং তাদেরকেই তিনি তাঁর নিয়ামত দান করবেন।

জিহাদ মৃত্যু ভীতি দূর করে

জিহাদই মুসলিমের ভেতর থেকে মৃত্যুর ভয় দূর করে দেয়। সত্য কথা বললে, সত্য প্রচার করলে বিরোধী শক্তি তাকে হত্যা করতে পারে, এ ভয় তার ভেতরে থাকে না। ঈমানদার ব্যক্তি বীর মুজাহিদে পরিণত হয়, সে কাপুরুষ হয় না। তার আচার-ব্যবহারে নির্ভীকতা প্রকাশ পায়। মানুষের সবচেয়ে বড় ভয় হলো মৃত্যুকে। যে জিনিস ভীতি সৃষ্টি করে তা থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা মানুষের স্বভাব। গভীর অরণ্যে হিংস্র জানোয়ার বাস করে। মানুষ এসব হিংস্র জানোয়ার অধ্যুষিত এলাকা এড়িয়ে চলে। বিদ্যুৎ যেন মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে না পারে, এ জন্য মানুষ বিদ্যুত ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। অর্থাৎ সতর্কতা অবলম্বন করলে যা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তা থেকে মানুষ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয়ে এ কথা জাগ্রত থাকে যে, জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। এ দুটো জিনিস আল্লাহর গোলাম। মৃত্যুকে তিনি যখন আদেশ দিবেন, তখনই সে তার কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসবে। মৃত্যু থেকে নিজেকে রক্ষা করা যাবে না।

মহান আল্লাহ যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, তা সবই একদিন মৃত্যু বরণ করবে। পৃথিবীতে একজন নাস্তিকও এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, একদিন তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। চোখের সামনে যা কিছুই দেখা যাচ্ছে, তা সবই একদিন মৃত্যুবরণ করবে, সকল মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুও মহান আল্লাহর আদেশ ব্যতীত আসে না। মহান আল্লাহ যখন এ কাজে নিয়োজিত ফেরেশতার প্রতি অর্থাৎ মালাকুল মাউতের প্রতি নির্দেশ দেন তখন তিনি তাঁর কাজ সম্পাদন করেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً-

কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত মৃত্যুবরণ করতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো নির্দিষ্টভাবে লিখিত রয়েছে। (সূরা ইমরাণ-১৪৫)

মৃত্যুর ক্ষেত্রে শুধু প্রাণীই নয়, পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই একদিন মৃত্যুবরণ করবে তথা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সূরা আর রাহমানে বলা হয়েছে–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ- وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ-

সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, টিকে থাকবে শুধু তোমার মহীয়ান গরীয়ান রব-এর সত্তা। (সূরা রাহমান-২৬-২৭)

ঈমানদার ব্যক্তি জানে মৃত্যু আল্লাহর নির্দেশেই আগমন করবে। আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ ব্যতীত মৃত্যু কারো ওপর হামলা করতে পারে না। মৃত্যু আল্লাহ তা'য়ালা নির্ধারিত করে রেখেছেন। এর সময় ও স্থানও পূর্ব নির্ধারিত। এক মুহূর্ত পূর্বে বা পরে কারো মৃত্যু হবে না। নির্দিষ্ট সময়েই মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ-

মৃত্যু সে তো তোমরা যেখানেই থাকবে সকল অবস্থায়ই তা তোমাদেরকে গ্রেফতার করবে, তোমরা যত মজবুত দুর্গের মধ্যেই আত্মগোপন করো না কেনো। (সূরা নিছা- ৭৮)

জীবের প্রাণ হরণের জন্য মহান আল্লাহ যে ফেরেশ্তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নির্দেশ পাবার পর তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

حَتَّىَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ-

যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশ্তা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের কর্তব্য পালনে তারা একবিন্দু ত্রুটি করে না। (সূরা আনআ'ম-৬১)

মৃত্যু যখন আসবেই তখন তাকে ভয় করে কি হবে। এ জন্য ঈমানদার মৃত্যুকে ভয় করে না। সে শুধু মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের পুজি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। মৃত্যু কোথায় হবে, কি অবস্থায় হবে, সেটাও কেউ বলতে পারে না। মহান আল্লাহ মৃত্যুর স্থানও নির্ধারিত করে রেখেছেন। মুমীনের হৃদয় হয় মৃত্যুভীতি শূন্য। ঈমানদার জানে, মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে না, তাহলে কেনো সে মৃত্যুকে ভয় করবে। সে শয্যাশায়ী হয়ে মৃত্যুবরণ করাকে অবমাননাকর মনে করে। সে শহিদী মৃত্যু অনুসন্ধান করে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাতিল শক্তির সাথে লড়াই করে সে মৃত্যুকে বরণ করতে যায়। সে বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে শৃগালের মতো কয়েক শত বছর জীবিত থাকার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। সিংহের মতো বীরত্বের সাথে পাঁচ মিনিট জীবিত থাকার মধ্যে গৌরব নিহিত। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের মতো পঞ্চাশ বছর জীবিত থাকার মধ্যে লাঞ্ছনাই নিহিত থাকে, সিরাজ-উদ্দৌলার মতো কয়েক ঘন্টা জীবিত থাকাই হলো আত্মমর্যাদার বিষয়। ঈমানদারের মধ্যে আত্মমর্যাদা, বীরত্ব, অজেয় মনোবল, নির্ভীকতা সৃষ্টি হয় বলে সে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সেই অনন্ত সুখের জীবনের জন্য উৎসর্গ করে দেয়। ঈমানদার সব সময় শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে। সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায়, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে কাপুরুষের মতো মৃত্যু দিও না। আমাদেরকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করো'।

ঈমানদার শয়নে স্বপনে জাগরণে শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে। শাহাদাত বরণ করার মধ্যেই সে তার জীবনের সার্থকতা নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। ঈমান মানুষের মধ্যে দুর্বিনীত সাহস আর প্রচণ্ড বীরত্ব সৃষ্টি করে দেয় বলে সে বাতিল শক্তির আধিক্য দেখে বিচলিত হয় না। কারণ তাঁর আল্লাহ তাকে বলে দিয়েছেন–

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا–

নিশ্চয় শয়তানের শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। (সূরা আন নেসা-৭৬)

ঈমানদার জানে, ইসলাম বিরোধী বাতিল শক্তি দেখতে বিশাল হলেও তাদের মনোবল নেই, সাহস নেই। এরা সেই অগণিত পাখির ঝাঁকের মতো। শুধু একটি মাত্র শব্দেই সব পালিয়ে যায়। ঈমানদার জানে তাঁর শক্তির উৎস হলো ঐ আল্লাহ, যিনি অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী। আল্লাহ হলেন তাঁর অভিভাবক। আর বাতিল শক্তির অভিভাবক হলো শয়তান। আর শয়তানের শক্তি হয় মাকড়সার জালের মতই ভঙ্গুর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ-

যেসব লোক আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সার মতো। মাকড়সা নিজের জন্য ঘর নির্মাণ করে। আর সব ঘরের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল হলো মাকড়সার ঘর। (সূরা আনকাবুত-৪১)

ঈমানদার ব্যক্তি জানে, বাতিলের অভিভাবক হলো শয়তান আর মুমীনের অভিভাবক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। এ কারণে মুমীন বাতিল শক্তির কোনো পরোয়া করে না। আল্লাহর ওপরে ঈমান আনার কারণে মুমীন অকুতোভয় মর্দে মুজাহিদে পরিণত হয়। পৃথিবীর কোনো শক্তিকে সে ভয় পায় না। ইতিহাসে এর অসংখ্য ঘটনা সোনালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মুমীন ব্যক্তি কখনও মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর লক্ষ্য অর্জনের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। সে এ কথা বিশ্বাস করে, কোনো বুলেটের ওপরে যদি তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে সমগ্র পৃথিবীর জনবল নিরাপত্তা দিয়ে ঐ বুলেট থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। আর যদি কোনো বুলেটে তার নাম লিপিবদ্ধ না হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীর মানুষ তার বক্ষদেশ লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো বুলেট বর্ষণ করলে একটি বুলেটও তাকে স্পর্শ করবে না। এই বিশ্বাসই ঈমানদারকে দুর্বার. দুর্বিনীত দুর্জেয় করে তোলে। আর এই ধরনের দুর্জেয় শক্তির অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব হয় না।

মুমীন ব্যক্তি ক্ষতির ভয় করবে না, কোনো ক্ষতি যদি তার হয়ই তাহলে সে এ কথাই বিশ্বাস করবে, স্বয়ং আল্লাহ তার তক্দীরে এটা নির্ধারণ করেছিলেন। বাহ্যিক কোনো ক্ষতি দেখেও সে তার লক্ষ্য পথ থেকে একবিন্দু সরে আসবে না। হয় সে প্রাণ দান করে শাহাদাতবরণ করবে না হয় সে বিজয়ী হয়ে গাজীর মতই ফিরে আসবে। ঈমানদার ব্যক্তি জানে তাঁর নিজের বলতে কিছুই নেই। সবকিছু তার কাছ থেকে আল্লাহ তা'য়ালা ক্রয় করে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا-

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা মুমীনের কাছ থেকে তাদের প্রাণ এবং তাদের ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে মারে এবং মরে। তাদের প্রতি জান্নাত দানের যথার্থ ওয়াদা করা হয়েছে। (সূরা তাওবা-১১১)

মুমীনের প্রাণ, ধন-সম্পদ যা কিছু রয়েছে, এসব দান করেছেন মহান আল্লাহ এবং ক্রয়ও করে নিয়েছেন তিনি। বিনিময়ে তাকে মর্যাদার সাথে জান্নাত দান করা হবে। একজন মানুষ যখন ঈমান আনে, তখন সে এই উপকারীতা লাভ করে যে, তার মধ্যে ভীতি থাকে না। সংগ্রামের ময়দানে কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা তার মধ্যে বাসা বাঁধে না। তার আদর্শের ওপরে কেউ আঘাত করলে সে তা সহ্য করতে পারে না, সিংহ গর্জনে রুখে দাঁড়ায়।

জিহাদের সম্মান ও মর্যাদা

দুর্বল ঈমানের লোকদের দিয়ে জিহাদ অসম্ভব। এ জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হলে যেসব পর্যায় অতিক্রম করে ময়দানে আল্লাহর সৈনিকে পরিণত হতে হয়, এসব স্তর অতিক্রম করে আসাটা বেশ কষ্টসাধ্য। এ কারণেই আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার কাজে যারা লিপ্ত তাদের মর্যাদার তুলনা হয় না। বিশ্বনবী (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, একটি সকাল অথবা একটি বিকাল আল্লাহর পথে অতিবাহিত করা পৃথিবী ও পার্থিব সমস্ত জিনিসের থেকেও উত্তম। (বোখারী)

আল্লাহর দেয়া বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মসূচী বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা যারা করে, তাদের সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) নিশ্চয়তা দিয়েছেন, যে বান্দার দুটো পা আল্লাহর পথে ধুলি ধূসরিত হবে, কঠিন জাহান্নামের আগুন তার ঐ পা দুটোকে কখনই স্পর্শ করতে পারবে না। (বোখারী)

বোখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে প্রিয় কাজগুলোর মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করা অন্যতম প্রিয় কাজ'। ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি যদি বিরোধী শক্তির হাতে নিহত হয় তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ–

আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত তোমরা তা অনুভব করতে পারো না। (সূরা বাকারা-১৫৪)

ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয় অথবা বিজয়ী হয় তাদের সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا–

যে ব্যক্তি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে বিজয়ী হবে অথবা ইসলাম বিরোধিদের হাতে প্রাণ হারাবে তাদেরকে আমি বড়ো ধরনের পুরস্কারে ভূষিত করবো। (সূরা নিছা-৭৪)

হযরত সাহ্ল ইবনে সাদ (সাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, 'আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত প্রহরা দেয়া পৃথিবী ও পৃথিবীর উপরস্থ সমস্ত কিছুর থেকেও উত্তম। আর জান্নাতে তোমাদের কারো এক চাবুক পরিমাণ স্থান পৃথিবী ও তার উপরস্থ সবকিছু থেকে উত্তম। আর সন্ধ্যায় আল্লাহর পথে বের হওয়া অথবা সকালে বের হওয়া পৃথিবী ও তার উপরস্থ সমস্ত কিছু থেকে উত্তম। (বোখারী, মুসলিম)

ইসলামী আন্দোলন কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনকারী আল্লাহর পথের সৈনিকের মর্যাদা আকাশচুম্বী। হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) বলেন, একদিন ও একরাত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা দেয়া এক মাস যাবৎ রোযা পালন ও রাতে ইবাদাত করার থেকেও অধিক মূল্যবান। এ অবস্থায় যদি কেউ ইন্তেকাল করে তাহলে যে কাজ সে করে যাচ্ছিল ইন্তেকালের পরও তা তার জন্য জারী থাকবে, তার রিযিকও জারী থাকবে এবং কবরের পরীক্ষা থেকে সে থাকবে নিরাপদ। (বোখারী)

হযরত ফাদালা ইবনে উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেন, ইন্তেকালের পর প্রত্যেক মৃতের কর্মধারা নিঃশেষ করে দেয়া হয়। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা দেয় তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করতে থাকবে এবং কবরের আযাব থেকে সে নিরাপদ থাকবে। (বোখারী)

বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনের দেয়া দায়িত্ব পালন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা দেয়ার শামিল। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে তাঁদের মর্যাদাও অনুরূপই হবে, যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা দেয়। হযরত উসমান (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহর পথে একদিন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা দেয়া হাজার দিন অন্যান্য সওয়াবের কাজে নিয়োজিত থাকার চেয়েও উত্তম। (আবু দাউদ-তিরমিযী)

জিহাদকারীর জিম্মাদারী স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেন

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বের হয়েছে তার জন্য স্বয়ং আল্লাহ জিম্মাদার হয়ে যান। আমার পথে জিহাদ করা, আমার প্রতি ঈমান আনা ও আমার প্রেরিত রাসূলদেরকে সত্য বলে গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো কারণ যাকে আবাসস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য করেনি, আল্লাহ তার জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সেই ঘরের দিকে তাকে সফলভাবে প্রত্যাবর্তন করাবেন সওয়াব সহকারে বা গনীমাত সহকারে, যেখান থেকে সে জিহাদের লক্ষ্যে বের হয়েছিল। আর মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রাণ যে সত্তার মুষ্টিতে তার শপথ! সে আল্লাহর পথে যে কোনো আঘাত পাবে তা তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এমনভাবে উপস্থিত করা হবে যেমন আঘাত পাবার দিন তার শারীরিক কাঠামো ছিল। তার বর্ণ হবে তখন রক্ত বর্ণ। তার গন্ধ হবে মিশ্‌কের গন্ধ। আর যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রাণ তার শপথ! মুসলমানদের ওপর আমি এটা যদি কঠিন মনে না করতাম তাহলে যে সেনাদলটি আল্লাহর পথে জিহাদরত, তার থেকে আমি কখনও পশ্চাতে অবস্থান করতাম না। কিন্তু আমি এতটা স্বচ্ছলতা অর্জন করতে পারিনি

যে, সবাইকে সওয়ারী দিতে পারি আর মুসলমানরা এতটা স্বচ্ছলতা অর্জন করতে পেরেছে। আর এটাও তাদের জন্য কষ্টকর হবে যে, তাদেরকে পিছনে রেখে আমি জিহাদে চলে যাবো। আর সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রাণ! অবশ্যই আমি ইচ্ছা পোষণ করি, আমি আল্লাহর পথে জিহাদে যাবো এবং শাহাদাতবরণ করবো, তারপর আবার জিহাদে যাবো এবং পুনরায় শাহাদাতবরণ করবো, তারপর পুনরায় জিহাদে গমন করবো এবং শাহাদাতবরণ করবো। (তিরমিযী)

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিয়ে জিহাদ করে তাদের জন্য আল্লাহর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। হযরত মাআয (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, মুসলিম জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যে ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও আল্লাহর পথে জিহাদ করবে তার জন্য আল্লাহর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে আহত হয়েছে বা তাঁর শরীরে কোনো আঁচড় লেগেছে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তেমন অবস্থা নিয়েই উপস্থিত হবে যেমন অবস্থা ছিল আঘাত সংঘটনের সময়। এর রং হবে জাফরানী এবং গন্ধ হবে মিশকের। (বোখারী)

ইসলামী আন্দোলনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার কাজে যতটা সময় ব্যয় হবে, এই সময়ের উত্তম বিনিময় আল্লাহ দান করবেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমাদের কারো আল্লাহর পথে অবস্থান করা নিজের ঘরে বসে সত্তর বছর ধরে (নফল) নামায আদায় করার চেয়েও বেশী উত্তম। আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, এটা কি তোমরা পছন্দ করো না? আল্লাহর পথে জিহাদ করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ক্ষণিকের জন্যও জিহাদ করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আবু দাউদ)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, জিহাদের সমান সওয়াব লাভ করা যেতে পারে, এমন ধরনের সওয়াবের কাজ কোনটি? তিনি এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, সে কাজ করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এভাবে তাঁকে তিনবার প্রশ্ন করা হলে তিনি একই জবাব দিলেন। অবশেষে বললেন, আল্লাহর পথের সৈনিক জিহাদ করার জন্য বের হয়ে গেল আর তুমি তোমার কাছের মসজিদে গিয়ে বিরতি না দিয়ে নামায আদায় করতে থাকলে, ইফতার না করে দিনের পর দিন রোযা পালন করতে থাকলে। এমনটি করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি আল্লাহর পথে জিহাদ করার ব্যাপারে সমান সওয়াব অর্জন করাও সম্ভব নয়। (বোখারী, মুসলিম)

জিহাদকারী সর্বোত্তম জীবনের অধিকারী

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, মানুষের জীবনের মধ্যে সর্বোত্তম জীবন হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং যখনই জিহাদের আহ্বান আসে তখনই সে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যা ও মৃত্যুকে সে জিহাদের পথে অনুসন্ধান করে। (মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতে এক শত দরজা রয়েছে। আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তা তৈরী করেছেন। তার একটি দরজার সাথে আরেকটির দূরত্ব আকাশ ও যমীনের দূরত্বের সমান। (বোখারী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে যাবতীয় বিধানদাতা বা রব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল বা একমাত্র অনুসরণীয় নেতা হিসেবে অনুসরণ করেছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। হযরত আবু সাঈদের কাছে এ কথাটি বিস্ময়কর মনে হলো এবং তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কথাটি আপনি আমাকে পুনরায় বলুন। তিনি কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর বললেন, আরেকটি বিষয় রয়েছে যার সাহায্যে আল্লাহ জান্নাতে তাঁর বান্দাকে একশটি মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন। এই মর্যাদাসমূহের মধ্যে একটির থেকে আরেকটির ব্যবধান হবে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের ঐ বিশাল শূণ্য মার্গের সমান। এই মর্যাদা লাভ করবে কেবল মাত্র আল্লাহর পথের জিহাদকারী। (মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি, দুই ধরনের চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে আর যে চোখ আল্লাহর পথে বিনিদ্র রাত অতিবাহিত করেছে। (তিরমিযী)

ইসলামী আন্দোলনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য যে চোখ নিদ্রাহীন যামিনী অতিবাহিত করেছে, সে চোখ জাহান্নামে যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, এতটুকু সময়ও যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে যতটুকু সময় প্রয়োজন একটি উটকে দোহন করতে। তাহলে তার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত ওয়াজিব করে দিবেন।

তবে শর্ত হচ্ছে তার জিহাদ হতে হবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য। (তিরমিযী)

বর্তমানে মুসলিম জনগোষ্ঠী জিহাদী চেতনা শূন্য হয়ে পড়েছে। অথচ এই জিহাদী চেতনা-ই মুসিলম জনগোষ্ঠীকে সারা বিশ্বে নন্দিত আসনে আসীন করেছিল। মুসলমানদের মধ্যে সেই জিহাদী চেতনা জাগ্রত হয়, সেই ঈমান যদি সৃষ্টি হয়, তাহলে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। জিহাদের ফযিলত সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনে ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানদের জিন্দেগী হলো জিহাদী জিন্দেগী। জিহাদ ব্যতীত মুসলমানদের জীবনই কল্পনা করা যায় না। কারণ একজন ঈমানদারকে সিরাতুল মুস্তাকিমে চলার পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তার নফ্স, ইবলিস শয়তান, জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান। এসব শয়তানের বিরুদ্ধে তাকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত সংগ্রাম করতে হয়। যে পরিবারে, সমাজে সে বাস করে, সে সমাজে ইসলামের বিপরীত পরিবেশ বিরাজ করছে। এই পরিবেশের বিরুদ্ধে তাকে সংগ্রাম করে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য করতে হয়।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমানকে জিহাদ চালিয়ে যেতে হয়। জিহাদের পথে থেকেই তাকে মৃত্যু যবনিকার ওপারে যাত্রা করতে হয়। আর এ কারণেই জিহাদের এত বেশী ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জানেই না যে, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি। আরেক শ্রেণীর মুসলমান যদিও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রাখে, তবুও ময়দানে প্রতিকূল পরিবেশ দেখে চতুষ্পদ প্রাণী বিড়ালের স্বভাব গ্রহণ করেছে। বিড়াল যেমন আরামদায়ক বিলাসী জীবনে অভ্যস্থ, মুখরোচক খাদ্য আহার করবে, কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটবে না, শীতের দিনে উষ্ণ জায়গা ছাড়া ঘুমাবে না, এই শ্রেণীর মুসলমানও বিড়ালের মতই আরামদায়ক জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। আল্লাহর রাসূলের সস্তা সুন্নাত এরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করবে, লাউ বা কদু খাবে, আহারের পরে মিষ্টি খাবে, ফজরের পরে ঘুমাবে, রাতেও দ্রুত ঘুমিয়ে পড়বে, নানা ধরনের তসবিহ-তাহলিল পাঠ করবে, নফলের পর নফল নামায আদায় করবে, নফল রোযা পালন করবে, এসব কাজে তারা অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে আর মূল কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে।

এসব কাজ তো অবশ্যই করবে, কিন্তু যে মূল কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য এসব কাজ করতে হয়, সেই মূল কাজই যদি আঞ্জাম দেয়া না হয়, তাহলে এসব

সস্তা কাজের মূল্যায়ন করা হবে না। ময়দানে বাতিল শক্তি প্রবল ঝড় সৃষ্টি করেছে আর মুসলমান ঘরের দরজা বন্ধ করে আল্লাহর নামের যিকির করছে। বাতিল সৃষ্ট ঝড় এসে তার বদ্ধ দুয়ারে আছ্ড়ে পড়ছে, সেদিকে তার চেতনা নেই, সে আল্লাহ নামের যিকিরে মগ্ন। ইসলামকে উৎখাত করার শ্লোগান দিয়ে মিছিল করা হচ্ছে, আর মুসলমান দাড়ি টুপি পাগড়ী পরিধান করে সেই মিছিলের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছে, তার ভেতরে প্রতিবাদের আগুন প্রজ্জলিত হচ্ছে না। আল্লাহর জান্নাত এসব মুসলমানদের স্বাগত জানাতে মোটেও প্রস্তুত নয়। আল্লাহর জান্নাত অনন্ত সুখের অফুরন্ত সুখসামগ্রীসহ জিহাদকারীদের স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

জিহাদে ধন-সম্পদ ও প্রাণ নিয়োগ করতে হবে

আল্লাহর পথে জিহাদ করার ব্যাপারে প্রথমে প্রাণ উৎসর্গের কথা বলা হয়নি, ধন-সম্পদের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, ধন-সম্পদ মানুষের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হয়ে থাকে এ কথা প্রমাণিত সত্য। একজন মানুষ শারীরিক শ্রম দিয়ে সহজেই অপরের উপকার করতে পারে, কিন্তু নি:স্বার্থভাবে অর্থ দিয়ে উপকার করাটা বেশ কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এখানে আরেকটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, ধন-সম্পদ বলতে শুধু নগদ অর্থ, ভূ-সম্পত্তি, পশু-সম্পদ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি বুঝায় না। মানুষের সন্তান-সন্ততি, জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শীতা, বিচক্ষণতা, কৌশল, বাগ্মিতা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বুঝায়। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এসবের ব্যবহার করতে হবে।

আর প্রাণ বলতেও শুধু রুহ্ বুঝায় না। পৃথিবীতে মানুষের আগমনকাল থেকে শুরু করে শেষ বিদায়ের দিন পর্যন্ত, এই সময়কালকেই মানুষের জীবনকাল বলা হয়। এই জীবন দিয়েই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ তথা ইসলামী আন্দোলন করতে হবে। সমগ্র জীবনকেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওয়াক্ফ করে দিতে হবে। ঈমানদারের জীবনের লক্ষ্যই হবে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে এ কাজে জীবনের প্রতিটি স্পন্দন ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা সাধনা করা। আবেগ হঠাৎ আগুনের মতই প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে এবং সেই আবেগের বশবর্তী হয়ে গুলীর সামনে বুক টান করে দাঁড়ানো অসম্ভবের কিছু নয়। কিন্তু ধীর স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধন-সম্পদ ও প্রাণ উৎসর্গ করা বড় কঠিন কাজ।

পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই, যে কাজ যতটা কঠিন সে কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারলে তা থেকে অধিক লাভবান হওয়া যায়। আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলেই আল্লাহ তা'য়ালা এই কাজের বিনিময়ও দিবেন সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস দিয়ে এবং তার সম্মান মর্যাদা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী।

ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে সাধারণত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতরে দুটো শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রথম শ্রেণী হলো, তারা ইসলামী বিধানের আরামদায়ক বিধিগুলো অনুসরণ করে থাকে। এরা নামায আদায় করে, রোজা পালন করে থাকে, সম্ভব হলে হজ্জ আদায় করে, কোরআন তিলাওয়াত করে, তাসবিহ-তাহলিল পাঠ করে অর্থাৎ ইসলামের সেই দিকগুলো এরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে থাকে, যেদিকগুলো অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আর্থিক এবং দৈহিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। মুসলমানের মধ্যে এই শ্রেণীর সংখ্যাই সর্বাধিক।

দ্বিতীয় শ্রেণী হলো, যারা আল্লাহর দেয়া ও রাসূল প্রদর্শিত আরামদায়ক বিধানগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করে এবং সেই সাথে ঐ বিধানসমূহও অত্যন্ত নিষ্ঠার ও আন্তরিকতা সহকারে পালন করে, যে বিধানসমূহ অনুসরণ করতে গেলে আর্থিক, দৈহিক ক্ষতি এমনকি প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়। কারাবরণ করতে হয়, প্রহৃত হতে হয়, সম্পদের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, মান-সম্মানের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, অপবাদের মুখোমুখি হতে হয় প্রয়োজনে শাহাদাতবরণ করতে হয়। মুসলমানদের মধ্যে এই শ্রেণীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। পক্ষান্তরে এই শ্রেণীর মুসলমান সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং অসংখ্য নবী রাসূল এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন।

এই দুই শ্রেণীর মুসলমান সম্মান ও মর্যাদায় আল্লাহর কাছে কোনক্রমেই সমমানের নয়। তাদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিরাজমান। ক্ষেত্র বিশেষে প্রথম শ্রেণীর মুসলমানদেরকে ইসলাম জালিম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আর জিহাদের রক্তঝরা ময়দানে জান-মাল অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে যাবতীয় নির্যাতন হাসি মুখে সহ্য করেছে, বাতিল সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার পরোওয়া না করে সামনের দিকেই অগ্রসর হয়েছে, তাদের উচ্চ সম্মান মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা অনন্ত সুখের স্থান জান্নাতে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'য়ালা যাদেরকে অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছলতাদান করেছেন, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে তাদেরকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হতে হবে। উন্মুক্ত অবারিত হস্তে দান করতে হবে। অর্থ-সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে জিহাদের কর্মকাণ্ড

যদি ব্যহত হয়, তাহলে আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে। তাবুকের যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বনবী বসেছিলেন আর মদীনার মানুষ তাঁর সামনে নগদ অর্থ ও অলংকার দান করছিলেন। তাঁর সামনে অর্থ এবং অলংকার এতটা উচ্চতা লাভ করেছিল যে, নবী করীম (সাঃ) অর্থ ও অলংকারের স্তুপের আড়াল হয়ে পড়েছিলেন। (তিরমিজী, আবু দাউদ)

জিহাদ বাস্তবায়নে দান করার মর্যাদা

কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যেমন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব নয়–সংগঠন একান্ত প্রয়োজন, সংগঠিত শক্তির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটিয়ে প্রশিক্ষিত সুশৃংখল জনশক্তির দ্বারা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তেমনি প্রয়োজন আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠন বা দল পরিচালনার জন্য অর্থশক্তি। এই অর্থ অদৃশ্য বলয় থেকে আমদানী হবে না, নিজেদের উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকেই তা দান করতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে, অর্থ হলো আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠনের প্রাণশক্তি। শিরা-উপশিরায় ধাবমান রক্ত যেমন মানব দেহকে সচল রাখে, তেমনি অর্থ সচল রাখে আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠনকে। অর্থই হলো সংগঠনের প্রাণশক্তি। এই অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব হলো আল্লাহর পথের সৈনিকদের। যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অর্থ ব্যয় করবে না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা সাবধান বাণী উচ্চারণ করে সূরা তওবায় বলেছেন, তাদের অর্জিত ধন-সম্পদ তাদের কোনই কল্যাণে আসবে না, বরং এসব সম্পদ জ্বালিয়ে তা দিয়ে তাদের কপালে কিয়ামতের ময়দানে সিল্ মারা হবে। অর্থ-সম্পদকে হিংস্র সরীসৃপের আকৃতি দান করা হবে আর সেই বিষাক্ত সরীসৃপ তাদেরকে দংশন করতে থাকবে। সে দংশনের যন্ত্রণা অনন্তকাল ধরে তারা ভোগ করবে।

জিহাদের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য যারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তাদেরকে আল্লাহ সাতশত গুণ বেশী বিনিময় দান করেন। হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সামান্য কিছু পরিমাণ ব্যয় করবে তার জন্য সাতশত গুণ বেশী সওয়াব লেখা হবে। (তিরমিযী)

মুসলিম গোষ্ঠীর ওপরে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যে, তারা জান-মাল দিয়ে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান বাস্তবায়ন করার সংগ্রাম করবে। তারা যদি

তা না করে, তাহলে তারা কোনো জালিম জাতির গোলামী করতে বাধ্য হবে। **আল্লাহ তা'য়ালা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন–**

هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ–

শোন, তোমরা তো তারাই, যাদেরকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্যয় করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, এরপরও তোমাদের অনেকেই কৃপণতা প্রদর্শন করছো। যারা কৃপণতা প্রদর্শন করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত আর তোমরাই অভাবী-অভাবগ্রস্থ। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। অবশ্য তারা তোমাদের মত হবে না। (সূরা মুহাম্মাদ-৩৮)

অর্থাৎ তোমাদেরকে দান করার কথা বলা হচ্ছে তা আল্লাহর কল্যাণের জন্য নয়, বরং দান করলে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। আল্লাহ তোমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নয়, তার সম্পদের ভাণ্ডার কখনও শূণ্য হয় না। তিনিই ধনী আর তোমরা সবাই ফকীর। তোমাদেরকে যে আদর্শ বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাতে তোমাদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই আদর্শ যদি তোমরা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা না করো, তাহলে তখন তোমরা ভিন্ন জাতির গোলামী করতে বাধ্য হবে। তখন তোমাদের ভাগ্যে অবমাননা আর লাঞ্ছনাই জুটবে।

জিহাদী কর্মকান্ডে ব্যয় না করার পরিণতি

জিহাদ বা আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শন করলে তাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ– يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ– كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ– وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ– نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ– الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ–

যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং তা গুণে গুণে রাখে, সে ধারণা করে তার এই ধন-সম্পদ অনন্তকাল তার কাছে থাকবে। কক্ষনো নয়। সে ব্যক্তিতো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি অবগত আছো, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটি কি? তা হচ্ছে আল্লাহর আগুন। প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত যা কলিজা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (সূরা হুমাঝা)

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেও না এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করো'। জিহাদের ক্ষেত্রে দান করার ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শন করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কৃপণতা থেকে নিজেদের রক্ষা করো। কারণ কৃপণতার কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম)

যারা অর্থ-সম্পদ দান না করে জমা করে রাখে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ–

যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দিন। জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পৃষ্ঠদেশ ও পার্শ্বদেশে ছ্যাকা দেয়া হবে আর বলা হবে, এগুলোতো তোমরা সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এর স্বাদ আজ গ্রহণ করো। (সূরা তাওবা-৩৫)

জিহাদী কর্মকাণ্ডে ব্যয়কারী উত্তম বিনিময় লাভ করবে

কী পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ দান করতে হবে–এ সম্পর্কে বলা যায় অর্থ-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি স্বয়ং ভালো জানেন যে, তিনি কি পরিমাণ দান করতে সক্ষম। আল্লাহ তার সক্ষমতা সম্পর্কে অধিক অবগত, সবার চোখকে ধোকা দিলেও আল্লাহর চোখকে তো ধোকা দেয়া যাবে না। এ কথা অনুভূতিতে জাগ্রত রেখেই দান করতে হবে। এক কথায় সাধ্যানুযায়ী অবশ্যই দান করতে হবে। সে দানের পরিমাণ যদি একটি খোরমা খেজুরের সমানও হয় তবুও তা দান করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী ঈমানদার দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যা

দান করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তার উত্তম বিনিময় দিয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ–

তোমরা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষে যা কিছুই ব্যয় করো না কেনো, তার যথাযথ বিনিময় তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের ওপরে সামান্যতম বে-ইনসাফ করা হবে না। (সূরা আনফাল-৬০)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামমুখর কর্মসূচী বাস্তবায়নে অর্থ ব্যয় করার মানেই হলো একটি লাভজনক বিরাট ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করা। এটা এমনই এক ব্যবসা যে, যেখানে সামান্যতম ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নেই। আর এই বিনিয়োগে লাভের পরিমাণ যে কত, তার নির্দিষ্ট সীমা নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ–

যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো–এমন একটি সজীব বীজ, যা থেকে সাতটি শীষ নির্গত হয় এবং প্রতিটি শীষে একশ' করে দানা হয়। তবে আল্লাহ যাকে চান এরচেয়েও অধিক বৃদ্ধি করে দেন। কারণ আল্লাহ তো প্রাচুর্য দানকারী-সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা-২৬১)

যারা আল্লাহর পথে দান করে তিনি তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। নবী করীম (সা:) বলেছেন, দান-খয়রাতে সম্পদ হ্রাস পায় না বরং ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে উন্নত করেন। (মুসলিম)

পবিত্র কোরআনে মুমিনের গুণাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে–

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ– أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ–

সেসব ব্যক্তি–যারা নামায আদায় করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই হলো প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য নির্দিষ্ট

রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (সূরা আনফাল-৪-৫)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে যারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে নিজের রহমতের বর্মে পরিবেষ্টন করে রাখবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ–

আর তারা নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং রাসূলের দু'আ লাভের মাধ্যম বলে মনে করে। জেনে রেখো, অবশ্যই তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল-করুণাময়। (সূরা তাওবা-৯৯)

বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য অগণিত বস্তুর সাহায্য প্রয়োজন হয়। এই লক্ষ্য সামনে রেখে কোনো আলোচনা সভার প্রয়োজন হয়। এই আলোচনা সভার স্থান দেয়ার মত ক্ষমতা যার রয়েছে তিনি তা দান করবেন, মাইক দানের ক্ষমতা যার রয়েছে, তিনি তা দান করবেন, খাদ্য দানের ক্ষমতা যার রয়েছে তিনি তা দান করবেন, মিছিল অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে মিছিলের উপকরণ দান করবেন, এ ধরনের অসংখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু দানের ক্ষেত্র রয়েছে। এসব যারা দান করবেন, তিরমিযী শরীফের হাদীসে নবী করীম (সাঃ) এসব দানকে উত্তম দান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বদর যুদ্ধের সৈনিক হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, একজন লোক আল্লাহর রাসূলের কাছে লাগাম পরানো একটি উট নিয়ে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এই উটটি আল্লাহর পথে দান করলাম। রাসূল বললেন, তোমার এই লাগাম পরানো উটনীর বিনিময়ে আল্লাহ্ কিয়ামতের ময়দানে সাতশ' লাগাম পরানো উটনী দান করবেন। (মুসলিম)

সে যুগে বর্তমান যুগের মত আধুনিক যান-বাহন থাকলে সাহাবায়ে কেরাম তাই অকাতরে দান করে দিতেন সন্দেহ নেই। সে যুগের সবচেয়ে উন্নত বাহন ছিল উট এবং সে উটের লাগামও অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করতে হতো। সাহাবায়ে কেরাম লাগাম ক্রয় করে উটের মুখে পরিয়ে তা দান

করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে যার যে বাহন রয়েছে, তাই দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কর্মসূচী সফল করবেন। এই কাজে যারা সহযোগিতা করবেন, আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় অবশ্যই দিবেন। আল্লাহর পথে দান করার অর্থ হলো সেই দানকে নিজের ও জাহান্নামের মাঝে আবরণ টেনে দেয়া। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করো, যদিও তা খেজুরের একটি টুকরো দিয়েও হয়। (বোখারী-মুসলিম)

যিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করেন তার জন্য ফেরেশতাগণ উত্তম বিনিময় দানের দোয়া করে থাকে, আর যিনি সক্ষম হবার পরও দান করেন না, তার ওপরে অভিশাপ বর্ষন করে থাকেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন, মানুষের জীবনে প্রতিটি দিনই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। একজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার রাস্তায় ব্যয় করে তার জন্য উত্তম বিনিময় দাও। আরেকজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি দান করা থেকে বিরত থাকে তার সম্পদ ধ্বংস করে দাও। (বোখারী-মুসলিম)

ইবনে মাজাহ্ হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) বলেন, অনিবার্য কারণে যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে না পেরে জিহাদের কাজে অর্থ-সম্পদ প্রেরণ করে সে প্রতিটি অর্থের বিনিময়ে সাতশ' অর্থ ব্যয়ের সওয়াব অর্জন করবে। আর যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদসহ শারীরিকভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায়, তার প্রতিটি অর্থের বিনিময়ে সাত লক্ষ অর্থ ব্যয় করার সওয়াব দান করা হবে। এ কথা বলে আল্লাহর নবী কোরআনের সেই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যে আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন'। (ইবনে মাজাহ্)

দ্বিন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীতে যে ব্যক্তি প্রবল ইচ্ছা থাকার পরও বৈধ কোনো কারণে নিজে অংশগ্রহণ করতে পারলো না কিন্তু যারা অংশগ্রহণ করলো, তাদেরকে সে নানাভাবে সহযোগিতা করলো, জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তার সহায়-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে দেখা-শোনা করলো, সে ব্যক্তিও সক্রিয়ভাবে জিহাদের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার মতই সওয়াব অর্জন করবে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জিহাদকারীকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করলো অথবা জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করলো, তার জন্য ঠিক জিহাদকারীর অনুরূপ সওয়াব লিখিত হবে। কিন্তু সে কারণে যে জিহাদে গিয়েছে তার সওয়াব থেকে সামান্যতম হ্রাস করা হবে না। (মুসনাদে আহমাদ)

জিহাদই জান্নাত লাভের একমাত্র মাধ্যম

আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভের একমাত্র মাধ্যম হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। কেবলমাত্র জিহাদই জাহান্নামের কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি থেকে মানুষকে হেফাজত করতে পারে। সূরা সফে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ- تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-

হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে কি আমি এমন একটি ব্যবসার কথা বলবো, যা তোমাদের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (অর্থাৎ অবশ্যই বলবো এবং সে ব্যবসা হলো) তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণের সাহায্যে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা (প্রকৃতই) জ্ঞান রাখো। (যদি তোমরা এমন করো) আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার নীচ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত, আর চিরন্তন জান্নাতের উৎকৃষ্ট আবাসে তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন। এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম সফলতা। (সূরা সফ-১০-১২)

যে তিনটি বিষয়ের কথা আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ ও আল্লাহর পথে জিহাদ-এবং এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই তিনটি কাজ করা ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাত লাভ করা যাবে না, জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে না। এই তিনটি কাজ ব্যতীত অন্য কোনো পথ কেউ যদি অবলম্বন করে, তাহলে সে ব্যক্তি যে পথভ্রষ্ট এবং জাহান্নামের পথের পথিক, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শাহাদাত ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। শাহাদাতের মর্যাদা অসাধারণ। ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা উত্তপ্ত ময়দানে বাতিল শক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছেন, তাদের সবারই

শাহাদাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহর পথের সৈনিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো মানুষের কাছে এ কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যে, মহান আল্লাহ মানুষের জন্য নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন, একমাত্র এটাই সত্য। ইসলামী আদর্শের বিপরীত যত মত ও পথ এ পৃথিবীতে রয়েছে তা চূড়ান্ত বিবেচনায় মিথ্যা। মুখের ভাষার মাধ্যমে যে ব্যক্তি এই দায়িত্ব পালন করলেন তিনি মৌখিকভাবে শাহাদাতের দায়িত্ব পালন করলেন। শাহাদাতের দায়িত্ব নানাভাবে পালন করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহর বিধান অনুসরণ করলো এবং অন্যদেরকেও এই বিধান অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানালো তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ–

আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালো এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করলো এবং ঘোষণা করলো আমি একজন মুসলমান। (সূরা হামীম সিজ্দা-৩৩)

অর্থাৎ নিজে সে আল্লাহর সৈনিকের গুণাবলী অর্জন করলো এবং অন্যান্যদেরকেও আল্লাহর সৈনিক হবার জন্য আহ্বান জানালো। এভাবে করে একজন মানুষ তার মুখের ভাষা দিয়ে শাহাদাতের দায়িত্ব পালন করতে পারে। আল্লাহর পথের সৈনিক আল কোরআনের রঙে নিজেকে রঙিন করবেন অর্থাৎ তার জীবনের বিস্তীর্ণ দিকসমূহ কোরআনের বিধান অনুসারে সজ্জিত করবেন। তিনি মুখের ভাষা দিয়ে যে জীবন বিধানের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন, নিজের জীবনে সেই বিধানের বাস্তব প্রতিফলন ঘটাবেন। এটাকে বলা যেতে পারে আমালী শাহাদাত তথা কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সৈনিক হিসেবে সাক্ষ্যদান করা। চূড়ান্ত পর্যায়ের শাহাদাত হলো ইসলাম বিরোধী শক্তির অতর্কিত আক্রমণে বা আন্দোলনের ময়দানে ইসলামী আদর্শের ওপরে অটল অবিচল থেকে দুশমনের আঘাতে প্রাণ উৎসর্গ করা। ময়দানে আল্লাহর পথের সৈনিক প্রতিটি মুহূর্তেই নিঃশঙ্ক চিত্তে অবস্থান করতে থাকে। কারণ তার জান-মাল সবই একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।

নির্ভীক মুজাহিদদের জন্যই আল্লাহর জান্নাত

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ময়দান থেকে আল্লাহর পথের সৈনিকগণ মুহূর্তের জন্যও পিছু হটতে পারে না। বাতিল শক্তির তর্জন-গর্জন দেখে ভয়ে বা পার্থিব ক্ষতির আশঙ্কায় কোনো ব্যক্তি যদি পালিয়ে যায় বা নিষ্ক্রীয় ভূমিকা পালন করে তাহলে তার পক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয় এবং পরিণামে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ– وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ–

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হও তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। যুদ্ধ কৌশল অথবা নিজেদের বাহিনীর সাথে একত্রিত হবার উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি পিছু হটলে সে আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হবে আর ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা আনফাল-১৫-১৬)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'যারা নিজেদের আল্লাহর পথের সৈনিক হিসেবে পরিচয় দিচ্ছো, তারা কোনো অবস্থাতেই আন্দোলনের ময়দান থেকে পালিয়ে যেও না। এ ধরনের পলায়নপর মনোবৃত্তি যাদের তারা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে'। কাপুরুষের পক্ষে আল্লাহর সৈনিক হবার সুযোগ ইসলামে নেই এবং কাপুরুষদের জন্য আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হয়নি। যারা অকুতোভয়, নির্ভীক, ধন-সম্পদ এবং নিজের জীবনের পরোয়া করে না, আল্লাহর বিধান তাদের জন্য-তারাই কেবলমাত্র আল্লাহর সৈনিক হবার যোগ্যতা রাখে। আল্লাহর জান্নাত ভীরু কাপুরুষের জন্য নির্মিত হয়নি। সিংহ হৃদয় বীরদেরকেই আল্লাহর জান্নাত স্বাগত জানাবে। সুতরাং আল্লাহর পথের সৈনিকদের অসীম সাহসী হতে হবে। আর এই সাহস মনের গহীনে সৃষ্টি করতে হলে আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীসহ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণ দানের একমাত্র সত্তা আল্লাহ, জীবন ও মৃত্যুর মালিক আল্লাহ, এই বিশ্বাস যার দৃঢ় হবে তার মনে একমাত্র আল্লাহর ভয় ব্যতীত আর কারো ভয় স্থান লাভ করতে পারে না।

শাহাদাত আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার

শাহাদাত সবার ভাগ্যে জোটে না। আল্লাহর পথে শহীদ হতে চাইলেই শহীদ হওয়া যায় না। মহান আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদায় সকলকে ভূষিত করেন না। শাহাদাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক দূর্লভ পুরস্কার। এই পুরস্কার কেবলমাত্র তারাই লাভ করেন, স্বয়ং মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যাদেরকে নির্বাচিত করেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেন। নানাভাবে বান্দাকে পরীক্ষা করা হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ–

মানুষ কি এ কথা মনে করে নিয়েছে নাকি যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (সূরা আনকাবুত-২)

এই পরীক্ষা কি ধরনের হতে পারে, সেটাও মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারায় স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ– الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ– أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ–

আমি নিশ্চয় ভয়, বিপদ, অনশন, জান-মালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো। যারা এসব পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করবে তাদেরকে সুসংবাদ দাও। এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে'। তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, প্রতিপালকের রহমত তারা লাভ করতে পারবে। আর প্রকৃত পক্ষে এসব লোকই সঠিক পথপ্রাপ্ত। (সূরা বাকারা-১৫৫-১৫৭)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সাধারণ বান্দাদের সাথে যেমন আচরণ করে থাকেন তেমন আচরণ নবী-রাসূল বা তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের

সাথে করেন না। তাদেরকে যে সকল মহাপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় তা সাধারণ মানুষকে হতে হয় না। নবী করীম (সা:) বলেছেন, 'নবীদের প্রত্যেকটা দলকে তাদের নিজেদের সম্মান মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা ও কঠিন কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়'।

এ কারণে ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, কোনো নবীকে কঠিন পীড়া দিয়ে, কাউকে মাছের পেটে নিক্ষেপ করে, কাউকে করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে, কারো কাছ থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে, কাউকে আগুনে নিক্ষেপ করে, কাউকে তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে আবার কারো ওপরে ভিন্ন ধরণের বিপদ মুসিবতের পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ্ পরীক্ষা করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ:) বিশ্বনবীর পূর্ব পর্যন্ত অন্য নবীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নবী ছিলেন। পবিত্র কোরআনে তাঁর নামের সাথে খলীল উপাধি যুক্ত করা হয়েছে। তিনি মহান আল্লাহর এমন এক বন্ধু যিনি তাঁর সমস্ত নিয়মের পরিবর্তন করেছেন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। নিজের পিতা-মাতা ও জন্মভূমি ত্যাগ করেছেন। নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তান ও স্ত্রীকে জনমানবহীন প্রান্তরে নির্বাসন দিয়েছেন। আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন। নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকেও কোরবানী করার লক্ষ্যে তাঁর গলায় ছুরি চালিয়েছেন। এ কারণেই তাকে খলীল বলা হয়েছে। তাঁর জীবনে আপন সন্তানকে কোরবানী দেয়ার পরীক্ষাই ছিল বোধহয় সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

আল্লাহর পথের সৈনিকদেরকে এসব পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হতে হয়। মহান আল্লাহ্ শাহাদাতের মর্যাদায় তাঁর যে প্রিয় গোলামদের অভিষিক্ত করবেন, তাদের জন্য আল্লাহ শাহাদাতবরণের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন। বাতিল শক্তির সাথে ইসলামপন্থীদের এক সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহর পথের সৈনিকদের পরীক্ষা এবং নির্বাচিতদের শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করার লক্ষ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই উত্তপ্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء–

এখন যদি তোমাদের ওপরে আঘাত এসে থাকে তবে ইতোপূর্বে তোমাদের প্রতিপক্ষের ওপরও এসেছিল। এটি সময়ের আবর্তন যা আমি মানুষের

মধ্যে ঘটিয়ে থাকি। আর আল্লাহ্ জানতে চান তোমাদের মধ্যে কারা প্রকৃত মুমিন এবং তিনি চান তোমাদের মধ্য থেকে কিছু শহীদ গ্রহণ করতে। (সূরা আলে ইমরাণ-১৪০)

সুতরাং শাহাদাত হলো মুমিন জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। এই উপহার আল্লাহ অনুগ্রহ করে দান করেন। এই দান লাভ করতে হলে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। হযরত উমার (রাঃ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে এই দোয়া করতেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلْمَوْتُ فِيْ بِلَادَةِ الرَّسُوْلِ–

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত নছীব করো এবং মৃত্যুদান করো তোমার রাসূলের দেশে।

মৃত্যু থেকে কোনক্রমেই নিজেকে রক্ষা করা যখন যাবে না তখন সে মৃত্যু আল্লাহর পথেই হওয়া উচিত। এই কামনা ও চেষ্টা প্রতিটি মুমিনের অন্তরে জাগ্রত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে ওয়াদা করেছেন, যারা আল্লাহর পথে প্রাণদান করে তাদের কোনো আমলই বৃথা যায় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ–

এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় আল্লাহ তাদের আমলসমূহ বৃথা যেতে দেন না। (সূরা মুহাম্মদ-৪)

সমগ্র জীবনব্যাপী আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করে জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা যতটা না আছে, আল্লাহর জন্য শাহাদাতবরণ করলে জান্নাত লাভ করা যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। শাহাদাতবরণ করলে আল্লাহ তার সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ–

সুতরাং যারা একমাত্র আমার জন্যই হিজরাত করেছে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে এবং আমার দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করে প্রাণদান করেছে আমি তাদের সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দিব

ও তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। (সূরা ইমরাণ-১৯৫)

যার হৃদঁয়ে শহীদ হবার আকাংখা নেই তার মৃত্যু হবে মুনাফেকীর মৃত্যু। শহীদ হবার আকাংখা নিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। এ অবস্থায় যদি কেউ শয্যায় শুয়েও ইন্তেকাল করে তবুও সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। যার হৃদয়ে শহিদী তামান্না জাগ্রত রয়েছে, সে যদি মহামারীতে বা কলেরায় ইন্তেকাল করে তবুও সে আল্লাহর দরবারে শহীদের সম্মান লাভ করবে। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, শহীদ পাঁচ ধরনের, মহামারীতে মৃত্যুবরণ করলে, কলেরায় মৃত্যুবরণ করলে, পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করলে, দেয়াল চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করলে এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে বাতিল শক্তির হাতে নিহত হলে। (বোখারী)

নবী করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার কারণে নিহত হলো সে শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো সে শহীদ। যে ব্যক্তি মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলো সে শহীদ। যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলো সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করলো সে শহীদ। (বোখারী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের অর্থ-সম্পদ হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হলো সে ব্যক্তি শহীদ। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আ'ওয়ার সায়ীদ ইবনে যায়িদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের দ্বীনকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণদান করে সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারায় সে ব্যক্তি শহীদ। (বোখারী ও মুসলিম)

জিহাদ এবং শাহাদাত কথাটি একটির সাথে আরেকটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। জিহাদ চূড়ান্ত সফলতা এনে দেয় এবং মুমিন জীবনের একমাত্র কাম্য হলো শাহাদাত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ-

যদি তোমরা আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করো অথবা ইন্তেকাল করো, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রয়েছে অজস্র ক্ষমা ও রহমত। মানুষ যা কিছু সঞ্চয় করে তার থেকে এটি সবচেয়ে বেশী উত্তম। (সূরা আলে ইমরাণ-১৫৭)

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বা সাহায্য করতে গিয়ে ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতে কেউ যদি নিহত হয়, তাকে মৃত বলতে আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করেছেন। আল্লাহর গোলাম নয় এমন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার জীবনের সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে যায়, তার যাবতীয় অর্জন হয় বৃথা। সমস্ত আমল ও কর্মকাণ্ড বিনষ্ট হয়ে যায়। মৃত্যুর পরে লাঞ্ছনামূলক জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। আর ঈমানদার শাহাদাতবরণ করে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান-মর্যাদা অর্জন করে সাফল্যমণ্ডিত জীবনে প্রবেশ করে। শাহাদাত বরণকারী অমর। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ-

যারা আল্লাহর পথে জীবন দান করেছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তারা রিযিক লাভ করছে। (সূরা আলে ইমরাণ-১৬৯)

জিহাদকারীর অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ

ইসলাম বিরোধী শক্তি ময়দানে লড়াই করে, তাদের পেছনে কোনো শক্তি থাকে না। আর ঈমানদার যখন ময়দানে লড়াই করে তাদের সাহায্যকারী থাকেন স্বয়ং আল্লাহ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ-

আর ঐ মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে সংগ্রাম করো যেমনভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে সংগ্রাম করে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা তাওবা-৩৬)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ অনুভব করতে পারে না কোনটা তার জন্য কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর। এ কারণে মানুষ জিহাদকে কষ্টকর মনে করে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের এ ধারণা খণ্ডন করে বলেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ-

জিহাদ তোমাদের ওপরে ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) তোমাদের কাছে কষ্টসাধ্য বিষয় বলে মনে হচ্ছে। হতে পারে তোমরা কোনো জিনিস কষ্টকর মনে করো অথচ তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর হতে পারে তোমরা কোনো জিনিস উত্তম মনে করো অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ অবগত আছেন এবং তোমরা জানো না। (সূরা বাকারাহ্-২১৬)

জিহাদের পথই হলো সবচেয়ে কল্যাণকর পথ। এ পথে পা বাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া যাবে না। অজুহাত প্রদর্শন বা শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না। কল্যাণের পথে উদাসীনতা প্রদর্শন করা চরম মূর্খতা বৈ আর কিছু নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

انفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ-

তোমরা ভারী অথবা ও হালকা যে অবস্থায়ই হোক (আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার) সংগ্রামে বেরিয়ে পড়ো এবং জিহাদ করো তোমাদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে। (সূরা তাওবা-৪১)

শহীদের সম্মান-মর্যাদা যে কত বেশী, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। হযরত আবু বাক্‌র ইবনে আবু মুছা আল-আশআরী (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতা আবু মুছা আশআরী (রাঃ)কে ইসলামের শত্রু বাহিনীর সামনে উপস্থিত অবস্থায় বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারির ছায়াতলে

অবস্থিত। এই কথা শুনে এলোমেলো চেহারার এক ব্যক্তি জানতে চাইলো, হে আবু মুছা! আপনি কি নিজে আল্লাহর রাসূলকে এ কথা বলতে শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমি নিজে এ কথা শুনেছি। ঐ ব্যক্তি তাঁর সাথীদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে জীবনের মতই বিদায় গ্রহণ করার জন্য এসেছি এবং তোমাদেরকে আমার জীবনের শেষ সালাম জানাচ্ছি। এ কথা বলে লোকটি জিহাদের ময়দানের দিকে চলে গেল এবং লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত শাহাদাতবরণ করলেন। (মুসলিম)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আসলাম গোত্রের একজন যুবক দরবারে রেসালাতে আগমন করে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিন্তু আমার কোনো সরঞ্জাম নেই। রাসূল তাঁকে বললেন, তুমি অমুকের কাছে যাও। সে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল কিন্তু হঠাৎ করেই সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যুবকটি রাসূলের উপদেশ অনুযায়ী চলে গেল এবং লোকটিকে রাসূলের নির্দেশ জানালো। জিহাদে গমনেচ্ছুক রোগাক্রান্ত লোকটি যুবকের মুখে রাসূলের নির্দেশ শুনে সে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললো, আমি জিহাদে গমন করার লক্ষ্যে যেসব উপকরণ প্রস্তুত করেছিলাম, তা সবই একে দিয়ে দাও। তা থেকে একটি জিনিসও যেন অবশিষ্ট না থাকে। আল্লাহর শপথ! এসব উপকরণ থেকে তুমি একটি জিনিসও রেখে দিও না, আল্লাহ তা'য়ালা এতে তোমাকে বরকত দান করবেন। (মুসলিম)

সমগ্র জীবনব্যাপী নামায রোযা পালন করা হলো তবুও জান্নাতের নিশ্চয়তা পাওয়া গেল না। অথচ ক্ষণপূর্বে ঈমান এনেই জিহাদে অংশগ্রহণ করে শাহাদাতবরণ করলো এবং আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী হয়ে গেল। মদীনার বনী সালাবা গোত্র ছিল ইয়াহূদী গোত্র। এই গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিল মুখাইরীক। ওহূদের যুদ্ধের সংবাদ পেয়ে সে তাঁর গোত্রের লোকদের আহ্বান করে বলেছিল, 'ওহে ইয়াহূদীগণ! তোমরা উত্তম রূপে অবগত আছো যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সাহায্য করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য'। ইয়াহূদীরা তাঁকে জানালো, 'আজ আমাদের ধর্মীয় দিন শনিবার। আজ কি করে আমরা যুদ্ধে যেতে পারি?' মুখাইরিক বললেন, 'তোমরা যে যুক্তি দিচ্ছো সে যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়'।

হযরত মুখাইরিক (রাঃ) এর এ কথা বলার কারণ হলো, ইয়াহূদীদের সাথে আল্লাহর নবীর চুক্তি ছিল, মদীনা আক্রান্ত হলে তারা রাসূলের সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। মক্কার কুরাইশরা এসেছিলও মদীনা আক্রমন করতে। হযরত মুখাইরিক তাঁর গোত্রের লোকদের কথাগুলো বলে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে ওহূদের ময়দানে ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করতে এসে শাহাদাত

বরণ করেছিলেন। যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্বে সে তাঁর নিজের লোকদের বলে এসেছিল, 'আমি যদি যুদ্ধে নিহত হই তাহলে আমার সমস্ত সম্পদের মালিক হবে মুহাম্মাদ (সাঃ), তিনি যেভাবে খুশী সে সম্পদ ব্যবহার করবেন'। নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে যখন তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তখন পর্যন্তও আল্লাহর রাসূল জানতেন না, মুখাইরিক ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ জন্য মুখাইরিক (রাঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে যুদ্ধে যোগ দেয়ার পরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'মুখাইরিক ইয়াহূদীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি'। হযরত হুসাইন ইবনে আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, 'আমি মাহমুদ ইবনে আসাদ (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মুখাইরিক কেমন মানুষ ছিলেন?'

তিনি তাঁকে বলেছিলেন, মুখাইরিক প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) যেদিন ওহূদের দিকে যুদ্ধযাত্রা করলেন, সেদিন সে ইসলামের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারপর তরবারী নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে যুদ্ধে যোগ দেয় এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ময়দানে স্পন্দনহীনের মতই পড়েছিল। এরপর তাঁর গোত্রের লোকজন তাঁকে অনুসন্ধান করতে এসে লাশের ভেতরে আহত অবস্থায় তাঁকে খুঁজে পায়। তাঁর গোত্রের অনুসন্ধানকারীরা পরস্পরে বলাবলি করতে থাকে, 'মুখাইরিক এখানে কি করে এলো? সে তো ইসলাম পছন্দ করতো না?' তারপর আহত মুখাইরিককে তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কি কারণে এখানে যুদ্ধ করতে এসেছিলে? গোত্র প্রীতির কারণে না ইসলামের আকর্ষণে?' হযরত মুখাইরিক (রাঃ) ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি ইসলামের আকর্ষণে যুদ্ধ করতে এসেছিলাম। আমি সত্যের সন্ধান লাভ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি। তারপর তরবারি নিয়ে রাসূলের কাছে এসেছিলাম। তারপর যুদ্ধ করে গুরুতর আহত হয়েছি'। এই কথাগুলো বলার কিছুক্ষণ পরেই হযরত মুখাইরিক (রাঃ) শাহাদাতবরণ করেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) হযরত মুখাইরিকের ঘটনা শুনে বললেন, 'অবশ্যই সে জান্নাতের অধিবাসী'।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, 'আমাকে তোমরা বলতে পারো, কোন্ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ সে জীবনে নামাজ আদায় করেনি?' অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম জবাব না দিয়ে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করতেন, 'কে সে মহান ভাগ্যবান ব্যক্তি?' হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) জানিয়ে দিতেন, 'সে ব্যক্তি হলো উসাইরিম আমর ইবনে সাবিত'। উল্লেখ্য হযরত মুখাইরিকের প্রকৃত নাম ছিল হযরত উসাইরিম

আমর (রাঃ) ইবনে সাবিত। তিনি নামাজ আদায় করার সময় পাননি। কারণ ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি ওহূদের রণপ্রান্তরে ছুটে এসেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেই তিনি শত্রুর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

হযরত বারাআ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে এসে রাসূলের কাছে আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রথমে জিহাদ করবো না ইসলাম গ্রহণ করবো? রাসূল (সাঃ) বললেন, প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করো তারপর জিহাদ করো। লোকটি ইসলাম গ্রহণ করলো তারপর জিহাদের ময়দানে প্রবেশ করে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত শাহাদাতবরণ করলো। আল্লাহর রাসূল লোকটি সম্পর্কে বললেন, এই ব্যক্তি খুব সামান্য আমল করলো কিন্তু বিশাল প্রতিদান লাভ করলো। (বোখারী ও মুসলিম)

জান্নাতে শহীদের কামনা

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য যে জান্নাত সৃষ্টি করেছেন, সে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, মানুষের কোনো দৃষ্টি তা অবলোকন করেনি। কল্পনা প্রবণ কোনো মন সে জান্নাতের পরিবেশ সম্পর্কে কল্পনাও করতে পারে না। এই জান্নাতে যে ব্যক্তি একবার প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে, সে আর কখনও সেখান থেকে বের হওয়ার কল্পনাও করবে না। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন, তাদেরকে যখন জান্নাত দান করা হবে, তখন তাঁরা সে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে এসে পুনরায় শাহাদাতবরণ করার আকাংখা পোষণ করবেন। এ থেকে অনুভব করা যেতে পারে যে, শহীদদের সম্মান মর্যাদা কত বিশাল। এই মর্যাদা বার বার লাভ করার জন্য শহীদ আকাংখা পোষণ করবে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা কল্পনাও করবে না, যদিও সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত জিনিস ভোগ করার অধিকার তাঁর থাকবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে যে ব্যক্তি প্রাণ উৎসর্গ করেছে, সে যখন তাঁর সম্মান মর্যাদা দেখবে, সে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা পোষণ করবে এবং দশবার আল্লাহর পথে জীবন দান করতে চাইবে। (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন নবী-রাসূলগণ। তারপরেই জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করবেন তাঁরাই যাঁরা এই পৃথিবীতে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাতিলের সাথে লড়াই করে জীবন দান

করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর নবী বলেছেন, 'সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী তিন ধরনের মানুষকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। এই লোকগুলো হবে, আল্লাহর পথে জীবন দানকারী শহীদগণ, ধৈর্যশীল ও পরম যত্নের সাথে আল্লাহর ইবাদাতকারীগণ এবং মনিবের হিতাকাংখী অনুগত ক্রীতদাস'। সত্য-আর মিথ্যার প্রথম সংঘাত বদরের যুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ তাদের অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের যাবতীয় পাপসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যোগ দেয়া কত বিশাল সম্মান মর্যাদার বিষয়। সে সময়ের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র নগর রাষ্ট্র মদীনাতেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্ষুদ্র এই রাষ্ট্রটিকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারলেই পৃথিবী থেকে ইসলামকে বিদায় করে দেয়া যেত। ইসলাম বিরোধী শক্তি এ আশায় সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে মদীনা আক্রমন করার লক্ষ্যে এগিয়ে গেল। সংঘটিত হলো ওহূদের প্রান্তরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। শহীদদের রক্তে ওহূদের প্রান্তর রাঙা হয়ে উঠলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে জানালেন, তোমাদের যেসব ভাইয়েরা ওহূদের প্রান্তরে আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ করেছে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের রুহগুলোকে সবুজ পাখীর অভ্যন্তরে স্থাপন করে দিয়েছেন। তাঁরা জান্নাতের প্রবাহমান ঝরণাসমূহের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়ায় এবং জান্নাতের ফল-মূল আহার করে। আল্লাহর আরশের ছায়ায় ঝুলন্ত ঝাড়বাতিতে গিয়ে অবস্থান করে। যখন তারা এই ধরনের আরামদায়ক পরিবেশ লাভ করলো, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁরা আপন মনেই স্বাগতিকভাবে বলে উঠলো, 'আহ! এমন কি কেউ নেই যে, জান্নাতে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে পৃথিবীতে জীবিত আমাদের ভাইদের জানিয়ে দিয়ে বলে যে, এখানে আমরা কত সম্মান মর্যাদা লাভ করেছি। যেন তাঁরা এ সংবাদ জেনে জিহাদের ময়দান থেকে পিছু হটে না আসে এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শিথিলতা প্রদর্শন না করে'।

শহীদদের মনের এই আকাংখার উত্তরে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে জানালেন, 'আমি তোমাদের পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানিয়ে দেবো'। এরপর আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا-بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ-

যারা আমার দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে জীবন দান করেছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনো করোনা, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জীবিকা লাভ করছে।

শহিদী মৃত্যুর পূর্বক্ষণে জান্নাত দেখানো হবে

নবী করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহর পথের সৈনিকের রক্তের প্রথম ফোটা মৃত্তিকা স্পর্শ করার পূর্বেই তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং জান্নাতের আবাসস্থল তাকে প্রদর্শন করা হয়। কবরের ভয়াবহ আযাব থেকে তাকে নিরাপত্তা দান করা হয়। কিয়ামতের বিভিষীকা দেখে সবাই যখন ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়বে, তখন শহীদদেরকে কোনো ধরনের ভয়-ভীতি স্পর্শ করতে পারবে না। কিয়ামতের ময়দানে তার মাথায় এমন মহামূল্যবান মুকুট পরিধান করানো হবে যে, সে মুকুটের ক্ষুদ্র একটি পাথরও এই পৃথিবী ও তার ভেতরে যা কিছু রয়েছে, তারচেয়েও অধিক মূল্যবান। জান্নাতে তার সাথী হিসেবে অসংখ্য হুর দেয়া হবে। তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের ভেতর থেকে সত্তর জনের ব্যাপারে তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। (তিরমিযী)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, দুটো ফোটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তার একটি ফোটা হলো, আল্লাহর ভয়ে যে চোখ ফোটায় ফোটায় অশ্রু ঝরায়। এই অশ্রু বিন্দু আল্লাহ তা'য়ালার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এর কারণ হলো, মানুষ আল্লাহকে দেখেনি, তাঁর জান্নাত-জাহান্নাম দেখেনি। এসব না দেখেও গভীরভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাঁর ভয়ে আরামের শয্যা ত্যাগ করে গভীর রাতে নির্জনে আল্লাহর দরবারে অশ্রু ঝরিয়েছে। আরেকটি ফোটা হলো, আল্লাহর পথের সৈনিকের দেহের তপ্ত রক্তের ফোটা। লড়াইয়ের ময়দানে ইসলামের শত্রুগণ তাকে আঘাত করেছে, এই আঘাতে তাঁর শরীর থেকে যে রক্তের ফোটা গড়িয়ে পড়েছে, এই রক্তের ফোটা আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করেন। ইসলামের শত্রুরা ঈমানদারের দেহে আঘাত করে যে চিহ্ন সৃষ্টি করেছে, এই চিহ্ন আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করেন। ঈমানদার বান্দা ফরয ইবাদাত করেছে এ কারণে তাঁর দেহে যেসব চিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে, এসব চিহ্ন আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসেন। (তিরমিযী)

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর রাসূলের চাচা হযরত হামযা (রাঃ) রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে উঠবেন। ওহূদের ময়দানে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী তাঁর বুক চিরে কলিজা চিবিয়েছিল। তাঁর নাক কান কেটে মালা বানিয়ে তা গলায় পরিধান করেছিল হিংস্র হায়েনার দল। তিনি এই অবস্থা নিয়ে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবেন। এভাবে অসংখ্য শহীদগণ তারবারীর, বর্শার ও বুলেটের আঘাত নিয়ে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবেন। তাদের সামনে নাদুস-নুদুশ চর্বি থলথলে দেহ নিয়ে ইসলামের সৈনিক দাবীদারগণ কিভাবে দাঁড়াবেন? দাবী করা হয় আমরা ইসলামের খাদেম অথচ জীবনে তাকে কখনো কোনো অপবাদের মুখোমুখী হতে হলো না, ইসলামের শত্রুপক্ষের মুখপত্র পত্রিকাসমূহে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো লেখা প্রকাশ হলো না, জেলে যেতে হলো না, ময়দানে বাতিল শক্তি তাকে প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে এলো না, নাগরিকত্ব বাতিল হলো না, তার কুশপুত্তলিকা কেউ দাহ করলো না, আদালতে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা হলো না, ইসলামের পক্ষে জীবনে একটি মিছিল পর্যন্ত করলো না, অথচ নিজেকে রাসূলের আশেক, আল্লাহর সৈনিক, যুগের মুজাদ্দিদ, ওলীয়ে কামিল ইত্যাদি বলে প্রচার করা হয়। এসব লোককে কিয়ামতের ময়দানে ঐসব লোকদের সামনে লজ্জিত হতে হবে, যারা ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে নির্যাতন সহ্য করেছেন।

শহীদগণ নবী-রাসূলদের কাতারে অবস্থান করবেন

জীবন-যৌবন, স্ত্রী-পুত্র সকল কিছুর মমতা পরিত্যাগ করে যারা ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে বিরোধী শক্তির সাথে মোকাবেলা করতে গিয়ে মৃত্যুকে স্বাগত জানায়, তাদের সৌভাগ্য দেখে কিয়ামতের ময়দানে মানুষ ইর্ষাবোধ করবে। কারণ নবী-রাসূলগণের কাতারে তারা স্থান লাভ করবে। স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে নিজের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, 'একবার আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে ভ্রমণে যাচ্ছিলাম। যখন আমরা হাররাতে ওয়াকীম নামক স্থানে উপনীত হলাম সেখানে পাহাড়ের উপত্যকায় বেশ কয়েকটি কবর দেখতে পেলাম। আমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে জানতে চাইলাম. হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো কি আমাদের ভাইয়ের কবর! আল্লাহর নবী আমাদেরকে জানালেন, এগুলো আমাদের সাথী বন্ধুদের কবর। এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে আল্লাহর পথে নিহতদের কবরের কাছে গেলাম, তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, এগুলো আমাদের ভাইদের কবর'।

শহীদদের কত বড় মর্যাদা! আল্লাহর পথে যারা জীবন দান করেছেন, স্বয়ং আল্লাহর হাবিব তাদেরকে নিজের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত উতবা ইবনে আব্দুস সুলামী (রাঃ) বর্ণনা করেন আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর পথে নিহত মানুষ তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণী হলো, ঐসব মুমিন ব্যক্তি, যারা নিজের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে থাকে এবং প্রয়োজনে বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করতে করতে অকুতোভয়ে শাহাদাত বরণ করে। এসব লোক হলো পরীক্ষিত শহীদ, এরা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে। তাদের আর নবীগণের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য হলো, শহীদগণকে নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়নি আর নবীদেরকে নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত করে অধিক মর্যাদা দান করা হয়েছে। অর্থাৎ নবীগণকে যে সম্মান মর্যাদায় আল্লাহ তা'য়ালা অভিষিক্ত করবেন, শহীদগণকেও প্রায় অনুরূপ মর্যাদা দান করা হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী হলো ঐসব মুমিন ব্যক্তি, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে এবং মানবীয় দুর্বলতার কারণে পাপ তাকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করেছে। তবুও এই ধরনের ব্যক্তি জিহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিরোধী শক্তির সাথে নির্ভীকভাবে লড়াই করে শাহাদাতবরণ করেছে। এভাবে সে নিজের পাপ মুছে ফেলেছে। কারণ জিহাদের অস্ত্রই সমস্ত অপরাধ মোচন করে দেয়। এই ধরনের ব্যক্তি জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে তার ইচ্ছে মতো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে।

আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, ইসলামের প্রতি যাদের অন্তরে রয়েছে সন্দেহ সংশয়। ইসলামকে এরা মোটেও ভালোবাসে না। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক, এ ধরনের তৎপরতা তাদের নেই। কিন্তু এরা তাদের মনের ভাব আল্লাহর পথের সৈনিকদের কাছে প্রকাশ করেও সাহস পায় না। জাগতিক সুবিধা লাভের আশায় এরা ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে। এরা পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে জিহাদে অসন্তুষ্টির সাথে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। লোকজনকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদও দান করে থাকে। এরা যদি জিহাদের ময়দানে শহীদ হয় তবুও এরা জাহান্নামী। কারণ জিহাদের অস্ত্র মুনাফেকী মুছে দিতে সক্ষম নয়। (মুসনাদে আহমাদ)

শহীদগণ মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্ত

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ অস্বাদন করাবেন। মৃত্যুর সময় ঈমানের শ্রেণী অনুসারে মানুষ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন শহীদগণ। ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যারা আন্দোলন করে এবং জিহাদের ময়দানে বাতিলের আঘাতে শাহাদাতবরণ করে, তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা নেই। তাঁরা যন্ত্রণাবিহীন মৃত্যু লাভ করে থাকে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর পথে জীবন দানকারী ব্যক্তি মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করে না, তবে তোমাদের কেউ পিঁপড়ের কামড়ে যেটুকু কষ্ট অনুভব করে কেবল সেটুকুই সে অনুভব করে মাত্র। (তিরমিযী)

জিহাদের ময়দানে আমরা দেখতে পাই, অবর্ণনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে শহীদ করা হয়। আসলে তাঁরা কোনো কষ্টই অনুভব করে না। ছোট্ট একটি পিঁপড়া দংশন করলে মানুষ যে কষ্ট অনুভব করে থাকে, আল্লাহর পথের সৈনিক শাহাদাতবরণ করার সময় সেই কষ্ট অনুভব করে থাকে। সুতরাং ইসলাম বিরোধী শক্তি লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যম্যে হত্যা করবে, এই আশঙ্কায় জিহাদের ময়দানে কর্মসূচীতে যোগদানের ব্যাপারে যারা শিথিলতা প্রদর্শন করে থাকে, তাদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রয়োজন শুধু ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছা। বাতিল শক্তিকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে অনেক বিশাল দেখা যায়। তাদের মিছিল-সমাবেশ দেখে মনে হয় কত বিশাল এদের শক্তি। আসলে ঈমানদারদের 'আল্লাহু আকবর' গর্জনে ওদের কলিজায় কম্পন দেখা দেয়। ভয়ে ওরা ময়দান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

বাড়িতে যদি কেউ চুরি করার মানসিকতা নিয়ে প্রবেশ করে, তাহলে তার মন থাকে দুর্বল। সামান্য শব্দে সে চমকে ওঠে। চোরকে দেখে যদি সে বাড়ির ছোট্ট একটি শিশুও 'কে?' বলে আওয়াজ দেয় চোরের কলিজায় কম্পন সৃষ্টি হয়। বাড়ির মালিক জেগে উঠে তাকে ধরবে, এই ভয়ে সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক হলেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন আর ঈমানদারদের অভিভাবক তিনিই। আল্লাহ তা'য়ালা এই যমীনের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব ঈমানদারকেই দান করেছেন। সুতরাং এই যমীনে ইসলাম বিরোধী শক্তি হলো চোরের মতই ভীরু, এদের মিছিল-সামবেশ আকারে বড় হলেও গুটি কয়েক ঈমানদার যখন তাদের মোকাবেলায় 'আল্লাহু আকবর' বলে গর্জন করে ওঠে তখন তারা আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ইতিহাসে যেমন এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে,

বর্তমান ময়দানেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে শর্ত হলো একটিই ঈমানদার হতে হবে, মুমিন হতে হবে।

জিহাদের কামনা যে ব্যক্তি অন্তরে পোষণ করে না, সে ব্যক্তির মৃত্যু হবে মুনাফিকীর মৃত্যু। আর মুনাফিকের স্থান হবে জাহান্নামে কাফিরের পায়ের নীচে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ না করে এবং জিহাদের কোনো আকাংখাও অন্তরে পোষণ না করে মৃত্যুবরণ করলো, তার মৃত্যু হলো মুনাফিকী স্বভাবের ওপর। (মুসলিম)

শাহাদাতের তামান্না মুমিন হৃদয়ে জাগ্রত থাকে। যে হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না নেই, সেই হৃদয় মুনাফিকদের হৃদয়ের মতো। সুতরাং মনে এই আশা পোষন করতে হবে, আল্লাহ যখন মৃত্যু দিবেন তখন যেন শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন। মৃত্যু একটি কঠোর বাস্তবতা। এই মৃত্যু থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা যাবে না। তাহলে মৃত্যু যখন হবেই তখন শাহাদাতের মৃত্যুই আল্লাহর কাছে কামনা করতে হবে। হযরত সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) বলেন আল্লাহর রাসূল বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য দোয়া করে তাহলে সে যদি শয্যাশায়ী হয়েও মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে শহীদদের স্তরে পৌঁছে দিবেন। (মুসলিম)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হৃদয়-মন দিয়ে আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের কামনা করে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে, যদিও তাঁর মৃত্যু অন্যভাবে হয়ে থাকে। (মুসলিম)

আল্লাহর পথের সৈনিকদের মধ্যে শাহাদাতের তীব্র আকাংখা থাকা প্রয়োজন। এই আকাংখাই ঈমানদারকে জিহাদের ময়দানে অগণিত বাতিল সৈন্যদের বিরুদ্ধে তাকে বিজয়ী হতে সাহায্য করে থাকে। কেননা বান্দা যখন আল্লাহর জন্য ইসলামকে বিজয়ী করার ইচ্ছায় প্রাণ দেয়ার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যায় তখন আল্লাহর সাহায্য অবধারিত হয়ে যায়। শাহাদাতের এই আকাংখা ঈমানদারকে দুর্বার দুর্বিনীত করে তোলে। আল্লাহর পথে যারা জীবন উৎসর্গ করে তাদের জীবনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয় কিন্তু সে যদি ঋণগ্রস্থ থাকে, এই ঋণ ক্ষমা করা হয় না। কারণ ঋণ হলো অন্যের অধিকার, যার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে, সে যদি তা ক্ষমা না করে তাহলে আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ঋণ ব্যতীত শহীদের সমস্ত কিছুর গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (মুসলিম)

জিহাদকারীকে সহযোগিতা করার সম্মান ও মর্যাদা

যিনি আল্লাহর পথের সৈনিক, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যে ব্যক্তি বা দল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা যারা করবে তারা ময়দানে জিহাদ করার মতই সওয়াব লাভ করবে। বর্তমান ইসলামের বিপরীত পরিবেশে যারা ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে, তাদেরকে অর্থ, যান-বাহন, থাকার জায়গা, খাদ্যদ্রব্য, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। কেউ যদি এভাবে সাহায্য করে, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকেও জিহাদকারীর অনুরূপ সওয়াব দান করবেন। ছাত্র অঙ্গনে ইসলামী আন্দোলন করছে এমন অনেক তরুণ-যুবক রয়েছে, যাদের আর্থিক ক্ষমতা নেই শহর এলাকায় অবস্থান করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা। এদেরকে সাহায্য করার জন্য ঈমানদারদের এগিয়ে আসতে হবে। এদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে এরা একদিকে শহরে থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, তেমনি তারা স্থানীয় পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে। এদেরকে যারা সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে উত্তম বিনিময় অবশ্যই দান করবেন। অপরকে সাহায্য করতে গেলে নিজের কিছুটা অসুবিধা হতে পারে, আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে অসুবিধাকে গুরত্ব না দিয়ে আল্লাহর পথের সৈনিকদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

আল্লাহর পথের সৈনিকদের যেদিক থেকেই হোক, যেভাবেই হোক সাহায্য করতে হবে। এই সাহায্যের অভাবেই অনেকে ময়দানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা ইচ্ছা থাকার পরও পালন করতে পারেন না। রাসূলের সাহাবা কেরামের মধ্যে এ ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করার মনোভাব তীব্রভাবে জাগ্রত ছিল। হযরত জাফর (রাঃ) যখন শাহাদাত বরণ করলেন, তখন তাঁর পরিবারের প্রতি অগণিত সাহায্যের হাত এগিয়ে গিয়েছিল। তাঁর শিশু কন্যাকে লালন-পালনের জন্য সাহাবায়ে কেরাম প্রতিযোগিতা শুরু করেছিলেন। অর্থের অভাবে যারা জিহাদের ময়দানে যেতে অক্ষম হয়েছেন, সাহাবা কেরাম তাদেরকে সাহায্য করেছেন, যেন তাঁরা জিহাদের ময়দানে যেতে পারেন। যিনি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান দেশের বুকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, যার পক্ষে যেভাবে যতটুকু সম্ভব তাঁর পাশে, তাঁর পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহর পথের সৈনিকের মনে যখন এ প্রত্যয় জন্মে, আমি শাহাদাতবরণ করলেও আমার সন্তান-সন্ততি, আমার স্ত্রী, আমার বৃদ্ধা মাতা, বৃদ্ধ পিতার অসুবিধা হবে না, আমার অসংখ্য ঈমানদার

ভাই এসে তাদের পাশে দাঁড়াবেন। তাঁরা স্নেহ, মমতা, প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে আমার সন্তানদের আল্লাহর পথের সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলবেন। তাঁরা সেবা, খাদ্য-বস্ত্র, পানীয়, ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে আমার চেয়ে অধিক উত্তমরূপে তাদের জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করবেন। তখন আল্লাহর পথের সৈনিক জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

ঈমানদারদের মনে রাখতে হবে, সবার ঈমানী শক্তি এক রকম হয় না, সবার ঈমানী জজবাও সমান নয়। জাগতিক এসব চিন্তা জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনেককেই সংশায়িত, দ্বিধান্বিত, কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত করতেই পারে। এটা সহজাত, এটাই স্বাভাবিক মানবীয় দুর্বলতা। আর এই দুর্বলতার উর্ধ্বে যাঁরা উঠতে পারেন, তাঁরা অসাধারণ অসামান্য। পিতা সর্বস্ব বিক্রি করে সন্তানের লেখা-পড়ার খরচ জুগিয়েছেন এ আশায় যে, তাঁর সন্তান একদিন উপযুক্ত হয়ে সংসারের অভাব দূর করবে। সেই সন্তান ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে জিহাদের ময়দানে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হতে পারে এতে অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু যখন সে অনুভব করবে যে, আমি যদি শাহাদাতবরণ করি, তাহলে আমার পিতামাতার কোনো সমস্যা হবে না। আমার অগণিত সাথী ভাই রয়েছেন, যাঁরা আমার মাতা-পিতার আকাংখা পূরণে এগিয়ে আসবেন। তখন সে ব্যক্তি সিংহ বিক্রমে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে। বর্তমান ময়দান জিহাদের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। সময়ের ডাকে সাড়া দেবার মত মর্দে মুজাহিদ অকুতোভয় তরুণ-যুবকের অভাব নেই আমাদের সমাজে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, তাদের কাজে লাগানোর ও পৃষ্ঠপোষকতা করার এবং আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করার মত কোনো ব্যবস্থা আমাদের মাঝে নেই।

ইসলামী আন্দোলনের রক্তঝরা ময়দানে অনেকে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেন। কেউ চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ করেন। নিঃশেষে প্রাণ উৎসর্গ করে শাহাদাতবরণ করেন। তাদের প্রতি আমরা সহানুভূতি জ্ঞাপন করি, পত্রিকায় তাদের প্রশংসা করে লিখি, বক্তৃতায় তাদের কথা বলি, তাদের অসহায় বৃদ্ধ মাতা, কর্ম ক্ষমতাহীন পিতা, এতিম শিশুদের কথা শুনে, শহীদের বিধবা স্ত্রীর আহাজারী শুনে আমরা কেউ দুঃখিত হই, কেউ দু'ফোটা অশ্রু ঝরিয়ে আমাদের ইতিকর্তব্য পালন করি। আমরা কেউ আল্লাহর পথের সেই সৈনিকের দুর্দশাগ্রস্থ পরিবারের দুর্দশা মোচন করার লক্ষ্যে কোনো ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে যাই না। এটা ঈমানদারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট নয়। আমাদের অবস্থা হয়েছে সেই কুকুর প্রেমিক এক ভ্রমণকারীর মতই। ধনাঢ্য ভ্রমণকারী তার প্রভুভক্ত কুকুরকে সাথে নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছিল। পথে খাদ্যের অভাবে অনাহারে কুকুরটি মুমূর্ষ হয়ে

পড়লো। মৃতপ্রায় কুকুরটিকে নিয়ে এক বৃক্ষের নীচে বসে কুকুরের মনিব লোকটি অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল। একজন পথিক সে পথ অতিক্রমকালে ভ্রমণকারীকে কাঁদতে দেখে তার কাঁদার কারন জানতে চেয়েছিল। কুকুরের মনিব কান্না জড়িত কণ্ঠে জানিয়েছিল, খাদ্যের অভাবে অনাহারে তার প্রিয় কুকুরটি মারা যাচ্ছে, এ জন্য সে কাঁদছে।

পথিক সেই ভ্রমণকারীর থলের দিকে ইশারা দিয়ে জানতে চেয়েছিল, থলেতে কি আছে। লোকটি জানিয়েছিল, তার থলেতে রয়েছে রুটি ও অন্যান্য খাদ্য। পথিক অবাক বিস্ময়ে কুকুরের মনিবকে বলেছিল, খাদ্যের অভাবে অনাহারে তোমার প্রিয় কুকুর মারা যাচ্ছে অথচ তোমার থলেতে রয়েছে খাদ্য। এ খাদ্য কুকুরটিকে খেতে দিলেই তো প্রাণে বেঁচে যায়। কুকুরের মনিব লোকটি পথিকের দিকে রোষকষায়িত লোচনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলেছিল, আপনি ভালো পরামর্শই দিচ্ছেন জনাব! আমি কুকুরের জন্য অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছি এতে আমার অর্থ ব্যয় হচ্ছে না। কিন্তু ওকে খাদ্য দিলেই তো আমার অর্থ ব্যয় হবে। আমি অর্থ ব্যয় করতে পারবো না।

আজ অনেকের অবস্থা হয়েছে ঐ মনিবের মতই। আল্লাহর পথে যারা অকাতরে কোরবানী দিচ্ছেন, তাদের জন্য আমরা শুধু সহানুভূতিই জ্ঞাপন করি, তাদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই না। আমাদের এ অভ্যাসের পরিবর্তন করতে হবে। প্রাণের চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই। আল্লাহর পথের সৈনিক সেই প্রিয় প্রাণটিই উৎসর্গ করে দেন। তাঁর বিপন্ন, বিধ্বস্ত, অসহায় পরিবারের প্রতি সব ধরনের সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব, ইসলাম যে মানবতা শিক্ষা দিয়েছে সেই মানবতার দাবী। এ দাবী আদায়ে মুসলমানদের সক্রিয় হতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে দেশ ও সমাজে যে জুলুমের প্লাবন বয়ে যায়, জুলুমের সে স্রোত শুধু জিহাদকারীর প্রতিই আঘাত করে না, দেশের প্রতিটি মানুষকেই তা আঘাত করে।

এই জুলুমের গতি পথ রুদ্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন যারা করছেন, তাদেরকে অকাতরে সাহায্য করতে হবে। এই সাহায্যের বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাত দান করবেন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ (রা:) থেকে বর্ণিত, বিশ্বনবী (সা:) ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের সৈনিকদের জিহাদের উপায়-উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছে সে ব্যক্তিও জিহাদ করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের সৈনিকের অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করেছে তাঁরাও জিহাদ করেছে। (বোখারীও মুসলিম)

নারীর জিহাদ

নিজের দেহের অভ্যন্তরের নাফছের সাথে, দেহের বাইরের পরিবেশের সাথে, শয়তানের সাথে এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও দেশের আল্লাহ্ বিরোধী বিধি-বিধানের সাথে পুরুষ যেমন জিহাদ করবে, নারীকেও তেমনি জিহাদ করতে হবে। তবে জিহাদ যখন অস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে উন্নীত হয়, সশস্ত্র জিহাদ করতে হয়, তখন নারীদের এই কঠিন কাজ থেকে ইসলাম দূরে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ প্রকৃতিগতভাবে নারী ও পুরুষ দৈহিক ও মানসিক দিয়ে দিয়ে সমান নয়। ইসলামের বিপরীত মতামত, আদর্শ ও বিধি-বিধানের অসারতা প্রমাণ করে নারী সাহিত্য রচনা করবে, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করবে। পর্দার বিধানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে নারী লিখবে, ইসলামের বিধি-বিধান পালনে নারী তার সমগোত্রীয়দের উদ্বুদ্ধ করবে, তাদের প্রশিক্ষণ দিবে, ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটাবে, স্বামীর অবর্তমানে তার ঘর-সংসারের প্রতি যত্নবান হবে এবং সজাগ দৃষ্টি রাখবে, সন্তান-সন্তুতিদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত করে গড়ে তুলবে, এসবই হলো নারীর জিহাদ।

নারীর সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো, সন্তানদের সে আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদ হিসাবে গড়ে তুলবে। নারীকে এমন চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে যে, সন্তান তার কোলে দৃষ্টি মেলেই যেন পূর্ণ ইসলামী পরিবেশ দেখতে পায়। সন্তানের মধ্যে ইসলামী চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। এ ব্যাপারে পিতার থেকে মায়ের দায়িত্ব অনেক বেশী। কারণ পিতা স্বাভাবিকভাবেই বাড়ির বাইরে অবস্থান করে। সন্তান অধিকাংশ সময়ে মায়ের সান্নিধ্য লাভ করে। মায়ের প্রভাবই সন্তানের ওপরে অধিক কার্যকর হয়ে থাকে। এ জন্য মা তার সন্তানকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিবেন, যেন সন্তান আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদ হিসাবে ময়দানে ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামের স্বর্ণালী যুগে কতিপয় নারী জিহাদের মর্যাদা ও ফযিলত অনুধাবন করে এই সম্মান মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে অস্থির হয়ে পড়েছিল। তারা ধারণা করেছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের তুলনায় পুরুষগণ অগ্রগামী। এ ধারণার বশীভূত হয়ে তারা আল্লাহর রাসূলের দরবারে অভিযোগের সুরে নিবেদন করেছিল, 'হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষরা তো সকল শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লুটে নিচ্ছে। তারা জিহাদ করে এবং আল্লাহর পথে বড় বড় কাজের আঞ্জাম দিচ্ছে। আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের সমান প্রতিদান লাভের জন্য আমরা কেমন কাজ করবো?' আল্লাহর দরবারে সম্মান মর্যাদা লাভের নারীদের এই আকুতি দেখে নারীমুক্তির অগ্রদূত নবী করীম (সা:) তাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে বাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থান করবে, সে মুজাহিদদের মর্যাদা লাভ করবে'।

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যে নারী তার স্বামীর সংসারে প্রতি যত্নবান, সন্তানদের আল্লাহভীরু হিসাবে গড়ে তোলে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে নারী আল্লাহর জান্নাতের যে দরোজা দিয়ে খুশী প্রবেশ করবে'।

ঈমানদার পুরুষগণ তো তখনই দৃঢ়পদে ও স্থিরচিত্তে আল্লাহর দুশমনদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারবে যখন সে নিজের ঘর-সংসারের দিক থেকে পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। তার অর্ধাঙ্গিনী-সহধর্মিনী তার সংসারের যাবতীয় কিছুর প্রতি সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখবে এবং সন্তানদের ইসলামের মুজাহিদ হিসাবে গড়ে তুলবে, এই বিশ্বাস পুরুষকে জিহাদের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকার উদ্দীপনা যোগাবে। যে নারী তার স্বামীকে এই নিশ্চয়তা দিবে, সে নারী সেই সম্মান মর্যাদাই অর্জন করবে, যে মর্যাদা তার স্বামী ময়দানে জিহাদ করে অর্জন করবে। নারীর নিজের বাড়ির মধ্যে অবস্থান করার অর্থ এটা নয় যে, তারা শিক্ষা অর্জন করবে না বা সমাজ-দেশের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে না। তারা তাদের জন্য নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করবে, দেশ ও জাতির জন্য স্বীয় মেধা ও শ্রম দিবে, জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখবে। এখানে আরেকটি বিষয় স্মরণে রাখতে হবে যে, ঈমানদার জনগোষ্ঠী তখনই হাতে অস্ত্র ধারণ করে জিহাদে লিপ্ত হয়, যখন সর্বসাধারণ এক বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় নিপতিত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি দাবী করে যে, জাতির সকল শক্তি আত্মরক্ষায় নিয়োগ করা উচিত।

এমন পরিস্থিতি যদি কখনো সৃষ্টি হয়, তখন ইসলাম নারীকে সামরিক সেবায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়। যার প্রকৃতিতে মায়ের অসীম মমতা দান করা হয়েছে, তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়ার অনুমতি ইসলাম দেয়নি। নারীর হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার অর্থই হলো, মুজাহিদ তৈরীর কারখানা থেকে তাকে বের করে নিয়ে আসা এবং তার নারী প্রকৃতিকে নির্মমভাবে হত্যা করা। পক্ষান্তরে নারীকে ইসলাম তখনই অস্ত্র হাতে তুলে নিতে অনুমতি দিয়েছে, যখন তার জীবন, সতীত্ব ও সম্ভ্রম হারানোর আশঙ্কা দেখা দেয়। জিহাদের ময়দানে যেখানে অস্ত্রের ঝংকার ওঠে, সেখানে নারীদের কাছ থেকে আহত মুজাহিদদের জন্য নার্সিং গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের পর্দার বিধান কিছুটা শিথিল করা হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্র নারী-পুরুষের মৌলিক ও মানবিক অধিকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখেনি, ইসলামী রাষ্ট্র নারীর জান-মাল ও মান ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করবে। নারী তার ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ রাখতে পারবে এবং রাষ্ট্র তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। বক্তৃতা ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা

নারীর থাকবে। সমিতি বা কোনো সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করার, সরকারের সমালোচনার, নারীদের দাবী পেশ করার এবং দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার থাকবে। নারীর ব্যক্তিগত মর্যাদা সংরক্ষিত থাকবে। শরীয়ত সম্পর্কিত বাধা নিষেধ ছাড়া অন্য কোনো বাধা বা নিষেধ তার প্রতি প্রয়োগ করা হবে না। আইনের চোখে পুরুষের মতো নারীকেও সমান দৃষ্টিতে দেখা হবে, নারীর মধ্যেও বর্ণ, বংশ বা গোত্রের দিক দিয়ে কোনো বৈষম্য রাখা হবে না। ধনী, গরীব, উচ্চ-নীচের মধ্যে বৈষম্য থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের 'বায়তুল মাল' এ পুরুষের ন্যায় নারীর পূর্ণ অধিকার থাকবে। প্রত্যেক অভাবগ্রস্থ নারীর দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে। এ ছাড়া পুরুষের ন্যায় নারী শিক্ষারও ব্যাপক ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে। রাষ্ট্রের যে কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে আবেদন করার এবং তার সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকার নারীর থাকবে।

নারীকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহায়তা করতে হবে। রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় পরিষদের স্বতন্ত্রভাবে একমাত্র নারীদের দ্বারা নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি থাকবে এবং তারা নারীদের স্বার্থ ও ন্যায় সঙ্গত দাবীসমূহ পরিষদের সম্মুখে পেশ করবে। যাবতীয় নারী প্রতিষ্ঠান যেমন, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মুসাফিরখানা প্রভৃতি নারীর তত্ত্বাবধানে চলবে। পুরুষদের ক্ষেত্রে পুরুষের তত্ত্বাবধানে চলবে। সামরিক শিক্ষা, সামরিক কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করার কঠিন দায়িত্ব ইসলাম নারীকে দেয়নি। এসব কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। তবে সামরিক অস্ত্রের ব্যবহার, প্রাথমিক চিকিৎসা, নার্সিং ইত্যাদি বিষয়ে তার জ্ঞানার্জন করা একান্ত প্রয়োজন। এসবের একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, যুদ্ধের সময় অত্যন্ত জরুরী পরিস্থিতিতে তারা যেন জাতির অন্তত: বেসামরিক জনসাধারণের এবং আরো বিশেষ করে নারী ও শিশুদের সেবা করতে সক্ষম হয়। প্রয়োজন হলে নারী যেন দেশের নিরাপত্তার জন্য কিছু সেবা দিতে পারে, তারই যোগ্য করে তোলার জন্যই এই ব্যবস্থা।

এর অর্থ এটা নয় যে, নারী সেনাবাহিনী গঠন করে স্ফীত বক্ষা তরুণী-যুবতী নারীদের প্রকাশ্যে সর্বসম্মুখে দিনরাত প্যারেড ও মহড়া চলতে থাকবে। অর্ধনগ্ন যুবতী নারীর একটি বাহিনী এ জন্য পোষা হবে না যে, কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় মেহমান আগমন করলে তার চিত্তবিনোদনের জন্য এ বাহিনী তাকে 'গার্ড অব অনার' দিবে। এটা ভোগবাদীদের বিকৃত মানসিকতা ও নারীর যৌবনকে লেহন করার কুরুচিরই পরিচায়ক। সশস্ত্র জিহাদ ব্যতীত পুরুষদের ন্যায় নারীকেও জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে জিহাদ করতে হবে। প্রতিদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী ও পুরুষদের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করবেন না। কোরআন ও

সুন্নাহর বিধি-বিধান অনুসরণ করলে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে পুরুষগণ যে সম্মান মর্যাদার অধিকারী হবে, নারীও অনুরূপ সম্মান মর্যাদার অধিকারী হবে। আল্লাহর কোরআন বলছে–

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا-

মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ মুমিন নারী, আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজাদার পুরুষ ও নারী, যৌন অঙ্গসমূহের হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, সর্বোপরি আল্লাহ তা'য়ালাকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, নি:সন্দেহে এদের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা ও মহাপুরস্কার ঠিক করে রেখেছেন। (সূরা আহ্‌যাব-৩৫)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের তথা নারী ও পুরুষের কোন্ কোন্ গুণাবলী পছন্দ করেন, তাঁর দরবারে কোন্ ধরনের গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে মূল্য ও মর্যাদা দেয়া হবে, উল্লেখিত আয়াতে তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এগুলো একজন ঈমানদারের মৌলিক গুণাবলী ও ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ। এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। কাজের ভিত্তিতে নি:সন্দেহে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক। পুরুষদের জীবনের কিছু ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদন করতে হয় এবং নারীদের কর্ম করতে হয় ভিন্ন ক্ষেত্রে। কিন্তু উল্লেখিত আয়াতে উপস্থাপিত গুণ ও বৈশিষ্ট্য যদি নারী ও পুরুষের মধ্যে একই মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে উভয়ের সম্মান মর্যাদা সমান এবং তাদের প্রতিদানও সমান। নারী রন্ধনশালায় নিয়োজিত আর পুরুষ দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইসলামী বিধান অনুসারে দেশ শাসন করলো, নারী সন্তান-সন্তুতি লালন-পালন করলো আর পুরুষ সশস্ত্র জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করে শাহাদাতবরণ করলো, এসব কারণে নারী ও পুরুষের সম্মান মর্যাদায় প্রতিদানে কোনো পার্থক্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ-

যে অন্যায় কাজ করবে সে যতটুকু অন্যায় করবে ততটুকুরই প্রতিফল লাভ করবে। আর নারী হোক বা পুরুষ, যে সৎ কাজ করবে সে যদি ঈমানদার হয় তাহলে তারা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে কোনো ধরনের হিসাব ব্যতীতই রিযিক দেয়া হবে। (সূরা মু'মিন-৪০)

মানুষকে যে জিহাদে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে অগণিত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা সর্বাত্মকভাবে এবং নিজেদের শক্তির সবটুকু নিঃশেষ করে তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। সর্বশেষে নবী করীম (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের আল্লাহর পথে জিহাদের সার্বিক দিক বাস্তবে প্রদর্শন করে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেছেন এবং তাঁর উম্মতদের এই জিহাদ মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বশক্তি দিয়ে পরিচালিত করার লক্ষ্যে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সঠিক অর্থে আল্লাহর পথে জিহাদী জীবন-যাপন করার মাধ্যমে নন্দিত জাতি মুসলিমগণ যে নিন্দিত পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে, সেখান থেকে তাঁদেরকে ফিরিয়ে এনে মর্যাদার আসনে আসীন করার তাওফিক এনায়েত করুন। আমিন।

সহায়িকা গ্রন্থপঞ্জী

(১) আল কুরআনুল কারীম (২) সহীহ্ বোখারী (৩) সহীহ্ মুসলিম (৪) সুনানে তিরমিজী (৫) সুনানে আবু দাউদ (৬) সুনানে নাসাঈ (৭) সুনানে ইবনে মাজাহ্ (৮) তাব্রাণী (৯) সীরাতে ইবনে হিশাম

(১০) তাফহীমুল কুরআন, আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী
(১১) ফী যিলালিল কুরআন, শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব
(১২) বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ড. এম. এ. রহীম
(১৩) বাংলাদেশে ইসলাম, আব্দুল মান্নান তালিব

(১৪) বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর, শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়
(১৫) বাঙালীর ইতিহাস, ড. নীহাররঞ্জন রায়
(১৬) বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়
(১৭) মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, মোহাম্মদ আকরম খাঁ
(১৮) বাংলাদেশের ইতিহাস, রমেশচন্দ্র মজুমদার
(১৯) ভারত বর্ষ ও ইসলাম, সুরঞ্জিত দাসগুপ্ত
(২০) হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, যদুনাথ সরকার
(২১) ভারতীয় সাংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, ডঃ তারা চাঁদ
(২২) বাংগালীর ইতিকথা, আখতার ফারুক
(৩২) দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার
(২৪) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন
(২৫) বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, মুহাম্মদ নূরুল আমীন
(২৬) ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, এম. এন. রায়
(২৭) সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ড. হাসান জামান
(২৮) স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর
(২৯) ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস, এ.কে.এম. আব্দুল আলীম
(৩০) মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, আসকার ইবনে শাইখ
(৩১) বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খাঁন
(৩২) মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী
(৩৩) সীরাতে সরওয়ারে আলম, আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী
(৩৪) উলামায়ে হিন্দ-কা শানদার মাঝি, মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা
(৩৫) শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সিয়াসী তাহরীক, মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা
(৩৬) দিল্লী কী আখিরী শামা, মির্যা ফারহাতুল্লাহ বেগ
(৩৭) ইনকিলাবে ১৮৫৭ কি তাসভীর কা দুসরা রুখ
(৩৮) শিক্ওয়া জওয়াবে শিক্ওয়া, আল্লামা ইকবাল
(৩৯) ওহাবী আন্দোলন, আব্দুল মওদুদ
(৪০) শীহদ তিতুমীর, আব্দুল গফুর সিদ্দীকী
(৪১) সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসূল মেহের
(৪২) আল বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ, ইবনে কাসীর
(43) Mohammad At Medina-By W.M. Watt
(44) Cambridge History of India
(45) The Prophet and Islam-By Stanlely Lane Pool

(46) The Life of Muhammad-By Sir W. Muir
(47) History of Arabs_By Philip K. Hitti
(48) The Arab Civilization-ByJoseph Hell
(49) What is Islam-W. Montgomery Watt
(50) History of Persia-By Sykes
(51) The Decline and Fall of the Roman Empire-By Gibbon,
(52) Early Days of Christianity-By Ferrar
(53) Byzantine Empire-By E.A. Ford
(54) History of Christianity-By Millman
(55) Budhism as a Religion-By Hackman
(56) Encyclopedia of Religions
(57) Encyclopaedia Britanica
(58) Islam and the cross road by Abul Asad
(59) History of European Morals by Lecky
(60) The Making of Humanity by Robert Brifult.

সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে-১ ▶ মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে-২ ▶ হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন ▶ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী ও আমাদের সংবিধান ▶ বর্তমান প্রেক্ষাপটে সম্মানিত আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ▶ চরিত্র গঠনে নামাজের অবদান ▶ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা ▶ কাদিয়ানীরা কেন মুসলিম নয়? ▶ সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম ▶ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার দাবী ▶ শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে ▶ জিহাদ ঈমানের অপরিহার্য দাবী ▶ মানবতা বিধ্বংসী দু'টি মতবাদ ▶ বিশ্ব সভ্যতার মুক্তি কোন্ পথে ▶ ইসলাম-ই ঐক্য ও শান্তির পথ ▶ ইসলামের রাজনৈতিক বিধান ▶ বিশ্ব সভ্যতায় নারীর মর্যাদা ▶ ইসলামী রাজনীতি কি কেন ▶ মাওলানা সাঈদী রচনাবলী-১ ▶ মাওলানা সাঈদী রচনাবলী-২ ▶ মাওলানা সাঈদী রচনাবলী-৩ ▶ তাফসীরে আয়াতুল কুরসী ▶ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মুনাজাত ▶ জান্নাত লাভের সহজ আমল ▶ সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) এর অনুসরণের সঠিক পদ্ধতি ▶ ঈমানী জিন্দেগীর সাফল্য ও ব্যর্থতার মানচিত্র ▶ আল কুরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ ▶ বর্তমান বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা ▶ আল কুরআনের মানদণ্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা ▶ দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরহির্যতা ▶ আল্লাহ তা'য়ালা মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন? ▶ দ্বীনে হক এর দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি ▶ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার মূলনীতি ▶ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ▶ ইসলামে ভূমি কৃষি ও শিল্প আইন ▶ আল্লাহ তা'য়ালা কোথায় আছেন? ▶ আল্লাহ তা'য়ালার শেখানো দোয়া ▶ আখিরাতের জীবন চিত্র ▶ নারী অধিকারের সনদ ▶ খোলা চিঠি ▶ শিশুর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ▶ ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা ▶ নীল দরিয়ার দেশে ▶ আল্লাহর প্রতি ও তার দাবি ▶ ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মহীনতাঃ একটি পর্যালোচনা? ▶ ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্কটের নেপথ্যে ▶ কুসংস্কারের সংস্কার কে করবে ▶ বিশ্বনবীর অমীয় বাণী ▶ জিয়ারতে বাইতুল্লাহ্ ▶ তা'লিমুল কুরআন-১ ▶ তা'লিমুল কুরআন-২ ▶ জীবন্ত ঈমানের স্বাদ ▶ সৎমানুষের সন্ধানে ▶ রিয়াদুল মু'মিনীন ▶ বেহেশতের চাবি ▶ পরকালের সাথী ▶ নাজাতের পথ ▶ যুগের দর্পন ▶ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী কেবলমাত্র অজ্ঞ ও জ্ঞানপাপীরাই করতে পারে ▶ সীরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন-২ (প্রকাশিতব্য)

একটি মূল্যবান স্বপ্নের কথা

'ক্ষুধা-দারিদ্র, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ত্রাসমুক্ত, জাতি-ধর্ম, দল-মত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদার নিশ্চয়তা, ন্যায় বিচার প্রাপ্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ সহাবস্থানে ধন্য নতুন এক পৃথিবীর স্বপ্ন আমি দেখি। প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে মূলতঃ সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেয়াই আমার সমগ্র জীবনের সাধনা।

আপনিও কি হৃদয় গহীনে এমন স্বপ্ন লালন করেন?

আপনার উত্তর যদি "হ্যাঁ" হয় তাহলে বিশ্বাস করুন, কেবলমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের নাযিলকৃত বিধান জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এ স্বপ্ন পূরণ হওয়া অবশ্যই সম্ভব। আসুন, আমরা সবাই মিলে এর ক্ষেত্র তৈরীতে সময় ক্ষেপন না করে কার্য্যতঃ অংশ গ্রহণ করি।'

- আল্লামা সাঈদী

ISBN 984-83-9433-8